Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 10	Place of Publication: Prarthana Publishers; No. 22, Sibnarayan Das Lane, Calcutta
Collection: Sharmadip Basu	Publisher: Shyamsundar Majumdar
Title: *Bahumukhi Mon Bahumukhi Prem*	Year of Publication: *Bhadra*, 1372 B.S. **1965**
	Size: 20 c.m. x 14 c.m.
Author: Nripendrakumar Basu (1898 – 1979)	Condition: Good.
	Remarks: Hard bound copy. Total pages: 379; Title page, content list, full page picture are not included in numbered pages.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

বহুমুখী মন
বহুরূপী প্রেম

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

বহুমুখী মন, বহুরূপী প্রেম

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

একমাত্র পরিবেশক
কাত্যায়নী বুক স্টল
২০৩, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৭২
প্রকাশক : শ্রীশ্যামসুন্দর মজুমদার
প্রার্থনা পাবলিশার্স
২২, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬
মুদ্রাকর : শ্রীরামকৃষ্ণ পান
লক্ষ্মী সরস্বতী প্রেস
২০৯বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬
নিচোলপট-অঙ্কন : লক্ষ্মীদাস
ব্লক ও নিচোল-মুদ্রণ : প্রসেস্ সিণ্ডিকেট্
৫০, ভোলানাথ পাল লেন
কলিকাতা-৬

[গ্রন্থস্বত্ব গ্রন্থকারের]

মূল্য সাড়ে-সাত টাকা

প্রাগ্‌ভাষণ

আমার অনেকগুলি পাঠকপাঠিকার পুনঃপুনঃ শ্রদ্ধারসসিক্ত সম্পীড়নে দীর্ঘকাল পরে জরাব্যাধিগ্রস্ত দেহমন নিয়ে আবার আমাকে লিখতে বস্‌তে হ'লো। কেউ কেউ অনুযোগ করেছিলেন চেতন মন সম্বন্ধে কোনো বই না লিখে আগেই অচেতন মন নিয়ে বই লিখেছি কেন। এবার তাঁদের অনুযোগের ভিত্তিমূল শিথিল করে দিলুম। যাঁরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা মোটামুটি রকমের সার্বাঙ্গিক জ্ঞান লাভ করতে চাইবেন, তাঁরা সর্বপ্রথম পড়্‌বেন এই বইখানি, তারপর পড়বেন "ফ্রএডের ভালবাসা", তারপর "ফ্রএডের নারীচরিত্র"। যদি বেঁচে থাকি, তাহলে এরপর অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের উচ্চতর স্তর নিয়ে আর একখানা বই লিখে বের করতে পারি আগামী সালের প্রথম ভাগে। ব্যস্, তাহলেই আমার কর্তব্য শেষ হয়।

প্রথমেই সাবধান করে দিই যে, বৈঠকী বক্তৃতার আকারে লেখা হ'লেও এ বই জনসাধারণের বা অল্প-বিদ্যার শফরীদের জন্যে মোটেই নয়। আঠারো বৎসরের ঊর্ধ্ববয়স্ক, উচ্চজ্ঞানরসপিপাসু, মন ও প্রেম সম্বন্ধে একান্ত নিষ্ঠাবান সংস্কারবর্জিত অনুসন্ধিৎসু, শিক্ষিত, পরিচ্ছন্নরুচি, চিন্তাশীল পাঠকপাঠিকাদের জন্যে বইখানি লেখা। অপকৃষ্ট মনের অবিমিশ্র কামকণ্ডূতি-তৃপ্তির জন্যে এ নয়। সেইজন্যে সকলকে বুঝে কিন্‌তে বলি। এই বইটি পড়্‌লে মানুষ নিজেকে যেমন ভালো করে চিনতে পারবে, তেমনি অন্যকেও পার্‌বে, হয়তো আত্মোন্নতির কোনো নতুন পথেরও সন্ধান পাবে। এযাবৎ ভারতীয় কোনো ভাষায় অথবা ইংরাজি ও জার্মান ভাষায় ঠিক এই ধরনের একখানি বই বেরিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

নিন্দা ও স্তুতিকে সমভাবে প্রত্যুদ্গমন করার জন্যে তৈরি হয়ে রইলুম। ভীমরতি সুরু হয়েছে জানতে পারলেই লেখনীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কর্‌ব। জানিয়ে রাখি যে, পুস্তকোক্ত সমস্ত উদাহরণই হয় আমার প্রত্যক্ষলব্ধ, নয় অপরের জীবনী থেকে আহৃত সত্য ঘটনা। অনেকগুলি পরিভাষা আমার নিজের গড়া। ৪ বছর আগে থেকেই চিঠির জবাব দেওয়া ও দর্শনার্থীদের সাথে আলাপালোচনা করা আমার সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। ইতি।

ভাদ্র, ঝুলনপূর্ণিমা, ১৩৭২।
১১, পদ্মনাথ লেন, কলিকাতা-৪

শ্রীনৃ. কু. বসু

প্রসঙ্গমালিকা

১।	প্রাণ ও মন	১
২।	মনের সিংহদ্বারে	১০
৩।	মনের সচিবালয়	২৩
৪।	সচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তর	৩৩
৫।	আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়	৬১
৬।	সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ—স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক	৭৩
৭।	বহিঃস্রাবী ও অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিনিচয়	১২০
৮।	চৈতন্য ও অভিনিবেশ	১৪০
৯।	সহজপ্রবৃত্তি ও সংক্ষোভ	১৭০
১০।	স্মৃতি, প্রতিরূপ ও ভাবরূপ	২০২
১১।	কল্পনা ও চিন্তা	২২৪
১২।	বুদ্ধিবৃত্তি	২৪৭
১৩।	প্রকৃতি. চরিত্র, ব্যক্তিত্ব	২৬১
১৪।	"পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর"	২৮৪
১৫।	ব্যবহারিক ও প্রেমে কতকগুলি অস্বাভাবিকতা	৩১১
১৬।	সুস্মিতার গোপনীয় পত্র	৩৪৬
১৭।	কুনালের অরুন্তুদ আত্মকাহিনী	৩৫৩
১৮।	দুইটি প্রাণ, পাঁচখানি চিঠি	৩৭০

বহুমুখী মন, বহুরূপী প্রেম

প্রথম প্রসঙ্গ

প্রাণ ও মন

অন্যূন চারি সহস্র বৎসর পূর্বে বৈদিক ঋষিগণ অসংশয়িত-চিত্তে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, আমরা প্রত্যেকেই ব্রহ্ম, অমৃতের পুত্র। তারপর ঔপনিষদিক ঋষিগণ আমাদিগকে উপদেশ দিলেন "আত্মানং বিদ্ধি।" আগে নিজেকে জানো, তারপর ভগবানকে জানার চেষ্টা করিয়ো। কারণ ভগবানের একটা অপূর্ণ অংশ মানুষের মধ্যেই বর্তমান। তাই বাঙালী দার্শনিকগণ বলেন, "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।"

প্রকারান্তরে কথাটা দাঁড়াইতেছে এই যে, মানুষকে জানিলেই মোটামুটি-ভাবে ভগবানকে জানা যায় যেমন ভাণ্ডকে জানিলেই ব্রহ্মাণ্ডকে জানা যায়। এই কথাটি নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়া, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া, বিচারবিশ্লেষণ অনুমিতি-পরিমিতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া যিনি মানুষকে সম্পূর্ণভাবে অধ্যয়ন করিলেন, তিনি পুরুষোত্তম দর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করিলেন। অর্জুনের মত তিনিই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভক্তি-গদগদভাষে বলিতে পারেন—

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং ॥

সর্ব সভ্যদেশের বিজ্ঞানী, কবি, দার্শনিক ও মানবতাবাদী ধর্মপ্রচারকগণ একবাক্যে মানবের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং মানুষের নারায়ণকে পূজা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে জীবে প্রেম করিয়া ঈশ্বরসেবা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। চণ্ডিদাস গাহিয়া গেলেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' কথাটা আর একটু ব্যক্ত

করিলে এই দাঁড়ায় যে, মানুষের চেয়ে ঈশ্বরও বড় সত্য নহেন; তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে তিনিও মিথ্যা। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছেন মানুষের মধ্যে। সুতরাং ভগবানকে জানিতে মানুষের অন্তর্লোকে প্রবেশ কর। কবি পোপ তাঁহার *Essay On Man*এ আগে নিজেকে, পরে আর পাঁচটি মানুষকে চিনিতে পরামর্শ দিলেন—

"Know then thyself, presume not God to scan,
The proper study of mankind is man.

মানুষকে চিনিতে গেলে, শুধু তাহার দেহটির তত্ত্ব লইলে হয় না, তাহার মনের ও প্রাণের খোঁজ-খবর লইতে হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে তাহার আচরণের হেতু নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এই স্থলে উল্লেখ করা বোধহয় সমীচীন হইবে যে, মন ও প্রাণ এক জিনিস নহে। কোনো মানুষ যদি কাহাকেও মন দেয়, তাহা হইলে সে বাঁচিয়া থাকিয়া যাহাতে মন দিল তাহা উপভোগ করিতে পারে। কিন্তু কাহারো জন্য যদি সে প্রাণ দেয়, তাহা হইলে মুহূর্তের জন্য তাহার মরজগতে টিকিয়া থাকিবার আশা নাই। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, কাহাকেও ভালবাসিতে গেলে তাহাকে মন সমর্পণ করিতে হয়। আবার, কেহ ভালবাসার প্রতিদান না পাইলে অথবা প্রেমপাত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা ধরা পড়িলে ক্রোধে-ক্ষোভে-হতাশায় প্রাণত্যাগ করে।

প্রাণ কি শুধু বায়ু?

প্রাণের স্বরূপ কি—থাকে কোথায়? থাকে অবশ্য দেহের অভ্যন্তরেই, কিন্তু ঠিক দেহের একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ নহে। মানুষ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন সে প্রাণের অধিকারী। দেহের ভিতর-বাহিরের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশে, প্রত্যেকটি অণু-পরিমাণ দেহকোষের মধ্যে প্রাণ বিতত হইয়া রহিয়াছে। প্রতি শরীরের আগাগোড়াই প্রাণলক্ষ্মী তাঁহার পদ্মাসন মেলিয়া বসিয়া আছেন। শরীরের একটি অংশে একটা আলপিন্ ফুটাইলে সমস্ত প্রাণসত্তাই বেদনাবোধ করে। আবার, নাসিকার মধ্যে সুরভিত সমীরণ প্রবেশ করিলে সমস্ত শরীর পুলকিত হইয়া উঠে।

প্রাণ জীবনেরই নামান্তর। প্রতি মুহূর্তেই আমাদের প্রত্যেকের দেহের এক এক অংশের ক্ষয় হইতেছে ও তন্মুহূর্তে তাহার সম্পূরণ হইতেছে, অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বিভিন্ন শ্রেণীর দেহকোষ মরিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে তৎস্থলে নূতন দেহকোষের সৃষ্টি হইতেছে। যেদিন দেহের এই কোষগুলি ক্রমাগত মরিতে থাকিবে, তাহার জায়গায় আর নূতন কোষ জন্মলাভ করিবে না, সেইদিনই জীব মৃত্যুর পথে পা বাড়াইবে।

প্রাণ একটা শক্তি সন্দেহ নাই, যে শক্তি প্রাণীকে গতি দেয়, স্থিতি দেয়, যাহা কর্মে উদ্বুদ্ধ করে, বিশ্রামে বিনোদিত করে। প্রাণের উৎস বা মূলকেন্দ্র থাকে অবশ্য মস্তিষ্কে। ঐ কেন্দ্রটির একটি বিশেষ বিন্দুতে সূচ বিঁধাইলে অথবা কোনোভাবে উহা গুরুতররূপে আহত হইলে, জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমাদের শাস্ত্রকারগণ কিন্তু প্রাণকে একপ্রকার বায়ু বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আমাদের জীবিতাবস্থায় শরীরের মধ্যে পাঁচ প্রকার বায়ু—প্রাণ, সমান, অপান, উদান, ব্যান—আবদ্ধ থাকিয়া ও মানুষকে জীবিত রাখিয়া পাঁচ প্রকার শারীরক্রিয়া নির্বাহ করে। প্রাণবায়ুর স্থান বক্ষে অর্থাৎ ফুসফুস দুইটির মধ্যে এবং এই বায়ুই আমাদের শ্বাসক্রিয়া আজীবন পরিচালন করে। প্রাচীন হিন্দু শারীরবিদ্‌গণ বিশ্বাস করিতেন যে, মৃত্যুর কিছু পূর্ব হইতে ব্যান, উদান প্রভৃতি বায়ু একে একে প্রাণিদেহ হইতে বাহির হইয়া যায়; সর্বশেষে মৃত্যুর সমসময়ে প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করে।

কিন্তু এসকল থিওরি বর্তমান পাশ্চাত্য শারীরবিজ্ঞান একেবারে নির্মূল করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, পাঁচ প্রকৃতির বায়ু দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ক্রিয়া সাধনের জন্য নিযুক্ত থাকে না। একই প্রকার অক্সিজেন-সমৃদ্ধ প্রশ্বাস-বায়ু ফুসফুস দুইটি হইতে শরীরের সর্বত্র রক্তপ্রবাহ-দ্বারা বাহিত ও সঞ্চালিত হইতেছে মিনিটে আঠারো বার করিয়া। আবার ঐ বায়ুই খানিকটা অক্সিজেন শরীরের সর্বত্র বিতরণ করিয়া ও তথাকার বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড, কিছু মৃত দেহকোষ, কিছু উত্তাপ, কিছু জলীয়াংশ প্রভৃতি আবর্জনা বহিয়া ফুসফুস দুইটির নিখর্ব-নিখর্ব

অণুদেহী বায়ুকোষগুলির মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছে ও নিঃশ্বাস-বায়ুরূপে বাহির হইয়া যাইতেছে মিনিটে আঠারো বার করিয়া।

আমাদের প্রাণধারণের প্রধান উপকরণই হইল বায়ুমধ্যস্থ অক্সিজেন। উহাই মৃদু মৃদু পুড়িয়া ও পরিপাকপ্রাপ্ত খাদ্যের একাংশ পুড়াইয়া আমাদের দেহে তাপ-সঞ্চার করিতেছে এবং ঐ তাপের একাংশকে কর্মশক্তিকে রূপান্তরিত করিয়া দিতেছে। তাহা ছাড়া মৃত দেহকোষগুলি ও অন্যান্য আবর্জনাও দহন করিতেছে। একটি নিদষ্ট মাত্রার আলোকশূন্য অগ্নি আমাদের দেহে আমরণ জ্বলিতে থাকে। ভগবান আমাদের জন্ম-মুহূর্ত হইতে আগুনের পরশমণি প্রাণে জ্বালাইয়া দিয়াছেন।

প্রাণবায়ু না শ্বাসবায়ু ?

পূর্ণবয়স্ক মানুষের দুইটি ফুস্‌ফুসের মধ্যে বড়-জোর প্রায় ৩৫০ ঘন-ইঞ্চি বায়ু ধরে। আমরা প্রত্যেকে প্রতিবার ৩০ ঘন-ইঞ্চি বায়ু ভিতরে টানিয়া লই ও বাহির করিয়া দিই। কঠিন কায়িক পরিশ্রম-কালে, দৌড়-ঝাঁপ করিবার সময়, ব্যায়াম করিবার বা যোগাভ্যাস করিবার সময় আরো ১০০-ইঞ্চি বায়ু আমরা ভিতরে আকর্ষণ করিতে পারি। তারপর, প্রায় ২৩০ ঘন-ইঞ্চি বায়ু ফুস্‌ফুস ও শ্বাসনালীর মধ্যে সর্বদা অবস্থান করে। ইহার মধ্য হইতে আরো ১০০ ঘন-ইঞ্চি বায়ু কষ্টেসৃষ্টে বাহির করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু বাকি ১৩০ ঘন-ইঞ্চি বায়ু আর কোনো অবস্থায়ই বাহির করা যায় না। ইহাকে নিয়তাবশিষ্ট (residual) বায়ু বলিয়া আমরা অভিহিত করিতে চাই।

এই বায়ুটুকুকেই যদি কেহ 'প্রাণবায়ু' বলিয়া প্রচার করিতে চান্, তাহা হইলে তাহাতে আমি আপত্তি করিব ; শুধু আমি কেন, আধুনিক চিকিৎসক মাত্রেই আপত্তি করিবেন। স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হইলেও এই ১৩০ ঘন-ইঞ্চি বায়ু ফুস্‌ফুস দুইটির মধ্য হইতে বাহির হইয়া যায় না ; কেবল যে ক্ষেত্রে উচ্চ স্থান হইতে কোনো ব্যক্তি ঘুরপাক খাইতে খাইতে দলা-মোচড় পাকাইয়া পড়িয়া মারা যায়, তাহার ঐ নিয়তাবশিষ্ট বায়ুটুকু একেবারে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু এইরূপ উচ্চস্থান হইতে পতিত ব্যক্তির যদি মস্তক, হৃদয়, ফুস্‌ফুস

দুইটি বেশী রকমের আহত না হয়, তাহা হইলে নিয়তাবশিষ্ট বায়ু বাহির হইয়া গেলেও তাহার পুনরুজ্জীত হওয়ার কতকটা সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ ব্যক্তি অথবা কোনো জলমজ্জিত ব্যক্তি পাঁচ-সাত-দশ মিনিট পর্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ হইয়া থাকিলেও শেফারের বা সিল্‌ভেস্টারের কৃত্রিম শ্বাস-পরিচালন পদ্ধতির সহায়তায় তাহাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঁচানো সম্ভবপর হয়।

আসলে, শুধু শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া নয়, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া যদি বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রাণের আশা থাকে না। তথাপি এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পূর্বে যাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ডাক্তার যাহাকে মৃত বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন, সেইরূপ কয়েক শ্রেণীর তথাকথিত মৃত ব্যক্তিকেও আজকালকার চিকিৎসা-বিজ্ঞান বাঁচাইয়া দিবার আঙ্গিক ও কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। পুনরুজ্জীবিত-করণের সর্বাপেক্ষা সহজ প্রণালীটি হইল কতকটা এইরূপ।—তাড়াতাড়ি প্রতীয়মানতঃ বিগতপ্রাণ ব্যক্তিটিকে শোয়াইয়া, অস্ত্রোপচার-দ্বারা তাহার বক্ষের বাম দিকের চর্ম ও পেশী সন্তর্পণে কাটিয়া ও গুটাইয়া রাখিয়া, দুইখানি বা তিনখানি পঞ্জরাস্থি তুলিয়া ফেলা হয় এবং হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগ সরাসরি উন্মুক্ত করিয়া তাহার পেশীর উপর মৃদু চাপ দিয়া উদ্বর্তন-ক্রিয়া পরিচালন করিয়া যাওয়া হয়—যতক্ষণ পর্যন্ত-না হৃৎপিণ্ড সহজভাবে আপনা-আপনি সঙ্কুচিত-প্রসারিত হইয়া রক্তগ্রহণ ও সঞ্চালন-কর্ম পুনরায় সুরু করে। এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা, এমন কি দুই ঘণ্টা পর্যন্ত এইভাবে হৃৎপিণ্ডের পেশী-উদ্বর্তন চালাইয়া যাইবার পর তবে সুফল প্রত্যক্ষ করা যায়।

প্রাণের কর্তা কে ও কোথায় ?

আসল কথা হইল—মস্তিষ্কের প্রাণকেন্দ্র ও প্রাণদা নার্ভ্, ফ্রেনিক নার্ভ, সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) প্রভৃতি যাহারা আমাদের শ্বাসযন্ত্র দুইটিতে বায়ু আগম-নির্গম এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পরিচালন করে, তাহারাই আমাদের প্রাণধারণের বড়কর্তা, অথচ তাহাদিগকে একমাত্র কর্তাও বলা কিছুতেই উচিত হইবে না। কারণ, রক্ত-সঞ্চালন, বিভিন্ন প্রকার রসস্রাব, জটিল

পরিপাকক্রিয়া, নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞানলাভের নানা কেন্দ্রীয় আফিস ও স্থানীয় ম্যানেজার রহিয়াছে। প্রাণের একটি বিরাট সেক্রেটেরিয়েট্।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে কোন দেশে কোন মনীষিমণ্ডলী প্রাণশক্তির স্বরূপ নির্ণয় লইয়া বিশেষ মাথা ঘামান নাই। আমাদের আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রাণকে জড়শক্তির একটি উন্নত সংস্করণ বলিয়াছেন। সাঙ্খ্য যে ২৪টি তত্ত্ব-দ্বারা জীব-দেহ সৃষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বুদ্ধির নাম দিয়াছেন 'মহত্তত্ত্ব' এবং উহাকে 'মন' হইতে পৃথক রাখিয়াছেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার, ঐ চব্বিশটি তত্ত্বকেই তিনি পদার্থ নামে অভিহিত করিয়াছেন! 'প্রাণ'কে তিনি বুদ্ধির অঙ্গীভূত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু প্রাণের স্বরূপ লইয়া উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর শারীর-বৈজ্ঞানিক ও জীবতাত্ত্বিকগণ বহু পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ করিয়াছেন। আবার হেগেল, ক্যাণ্ট, দেকার্ত, বের্জ্‌স্‌ প্রমুখ বহু দার্শনিক অনুধ্যান করিয়াছেন। অথচ কেহই বের্জ্‌স্‌র ওই creative elanয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারেন নাই। তবে অনেকের মতে এই প্রাণশক্তি দেহাশ্রয়ী হইয়া একটি নির্দিষ্ট সময় অবধি একটা যান্ত্রিক নিয়মশৃঙ্খলানুযায়ী কাজ করিয়া যায়। ইহার চৈতন্যশক্তি আছে, কিন্তু চিৎশক্তি নাই।...

মনের কথা

এই তো গেল প্রাণের কথা। এইবার মনের কথায় আসি। এতক্ষণে বোধ হয় আপনারা বুঝিয়াছেন যে, প্রাণ ও মন এক নয়। তাহারা ভিন্নগোত্রীয়। কবিগুরু যখন গাহিলেন 'তোমারি অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূর আমি যাই', তখন তিনি দুইটিকে পৃথক করিয়াই দেখিয়াছিলেন। আবার তিনি যখন উচ্চারণ করিয়াছিলেন 'প্রাণ দেওয়া-নেওয়া অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে', তখন বুঝিতে হইবে যে, তিনি 'প্রাণ' শব্দটি 'মন' অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। এই চরণটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কবি তাঁহার যৌবনে বহু নারীর সহিত প্রেম-বিনিময় করিয়াছেন এরূপ প্রগাঢ়ভাবে যে তাহাতে নিজের অস্তিত্ব নিজের ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিতে বসিয়াছিলেন এবং প্রতিবারই তাহাদের

সহিত প্রেমের সম্পর্ক ভাঙিয়া গিয়াছিল। এখানে 'মরা' অর্থে কাহাকেও হৃদয় দেওয়া, তদ্গতচিত্ত হওয়া অথবা কাহারো বিরহ মৃত্যুতুল্য জ্ঞান করা।

এই গ্রন্থে প্রাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু তথ্য গ্রন্থন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। মনের ছোট ব্যাপারী আমি, উহা লইয়াই কিছু বেচাকেনা করিব এবং খুব সীমাবদ্ধভাবেই। মন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যেরূপ অগভীর, তেমনি মন জিনিসটি সাগরের মত অতলস্পর্শী ও কূলহীন। সুতরাং আমাদের তরণীকে আমি একটি পাড়ের কাছে রাখিয়া বাহিব এবং মনের পরিচয় লইতে গিয়া সংক্ষিপ্ত সারিগান গাহিব।

প্রাণ বা জীবন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ মানুষের মনও আছে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত ও পরস্পরের মুখাপেক্ষী। একজন অন্যজনকে বল দেয়, ভরসা দেয়, সাহস দেয়। প্রাণের পটভূমিকায় মনের ছবি। অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীর পশুদের মধ্যে অভ্যাসলব্ধ স্মৃতিশক্তির ও ব্যবহারিক বুদ্ধির আমরা কিছু কিছু পরিচয় পাই। তবুও তাহাদের মস্তিষ্ক ও নার্ভতন্ত্র অত্যন্ত নিম্নস্তরের। তাহাদের ইচ্ছাশক্তি হয়তো খানিকটা আছে, কিন্তু চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি নাই; অর্থাৎ 'মন' বলিয়া একটা মূল্যবান সম্পদের অধিকারী বলিয়া তাহাদিগকে পরিচিত করিতে আমরা দ্বিধা করি। কেবল ওরাং-উটাং, শিম্পাঞ্জি, গোরিলা ও কয়েক শ্রেণীর নিম্পুচ্ছ বানরদিগের (anthropoid apes) একটু উন্নত ধরণের মস্তিষ্কের সহিত একটা অর্ধস্ফুট মনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়াছে, যাহার ফলে তাহারা যেমন অনুকরণপ্রিয় তেমনি উপায়কৌশলী হয়। কিন্তু পরিপুষ্ট, সর্বগুণযুক্ত ও প্রসারক্ষম মন একমাত্র মানুষেই সম্ভবে।

মানুষের দেহ অধ্যয়ন করা সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের যুগে সহজসাধ্য হইয়াছে। যে-কোন সুলিখিত একখানা শারীরস্থান (Anatomy) ও একখানা শারীরবৃত্ত (Physiology) সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য পুস্তক পাঠ করিলে মানুষের শরীরের ভিতর ও বাহিরের সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করা যায়। একমাত্র অসুস্থতা ব্যতীত মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বা আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলির ক্রিয়ার কোনো বৈলক্ষণ্য ঘটে না। একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুস্থ অবস্থায় মানুষের দেহের

সর্বাংশ বাড়ে। তারপর একটা কাল পর্যন্ত বাড়েও না, কমেও না। তারপর একটা কালক্রম আসে যখন দেহের সর্বাংশে ভাঙ্গন ধরে। পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া তাহার দেহ হইতে প্রাণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

দেহকে ধরাছোঁয়া যায়, জ্ঞানের সীমার মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু মনকে? এই সসীম দেহের মধ্যে মনের পরিসর অপরিসীম। তাহাকে দেহের সর্বাংশের মত দেখাও যায় না, অন্য কোন ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করাও যায় না। অথচ আমরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও পারি না। কারণ প্রতিমুহূর্তে চতুর্দিকে তাহার সহস্র বিকীরণ দেখিতে পাই আমরা। মানুষ মননশীল ও মনস্বী বলিয়া শুধু জীবকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে না, স্বকপোলকল্পিত দেবতা-সমাজের মধ্যেও উচ্চাসন গ্রহণের স্পর্ধা পোষণ করে। মানুষকে জানিতে যাওয়ার অর্থ হইল তাহার মনের হদিস্ লওয়া।

মানুষকে জানা অর্থ তাহার মনকে জানা

মানুষ সত্য সত্যই তাহার দেহ জুড়িয়া বাস করে না, মন জুড়িয়া বাস করে। কাজে কাজেই মানুষকে অধ্যয়ন করিতে হইলে আগে তাহার মনের তত্ত্ব লইতে হইবে। মুনিঋষিরা আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতে যে ধ্যানদৃষ্টির সাহায্য লইয়াছিলেন, মনের ক্ষেত্রে তাহা লইলে চলিবে না; জ্ঞানদৃষ্টির উপর ষোলো আনা নির্ভর করিতে হইবে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রকমারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা মনের বিভিন্ন স্তর বা বিভাগ, আবেগ, ইচ্ছা, কল্পনা, অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতি কার্যাবলী, বিভিন্ন পরিবেশে উহার রূপান্তর, দেহের সহিত উহার সম্বন্ধ ও দেহের উপর উহার প্রভাব··· ইত্যাদি বিষয়গুলি আয়ত্ত করিতে হইবে। পরিশেষে মনের সাধারণ ধর্ম ও মৌলিক বিধিগুলি স্থির করিতে হইবে। এইভাবে মনকে সর্বাংশে জানিতে পারিলে মানুষকেও জানিতে পারা যাইবে।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আমাদের "ফ্রএডের ভালবাসা" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, অধ্যয়নের সুবিধার জন্য কার্যভেদে মনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ অদৃশ্য নির্বাস্তব মনের তিনটি প্রকোষ্ঠ

কল্পনা করা হইয়াছে—ঠিক যেভাবে ভূগোলকের নির্দিষ্ট স্থানগুলির উপর একটি নিরক্ষরেখা ও দুইটি ক্রান্তিবৃত্ত কল্পনা করা হইয়াছে। এই তিনটি বিভাগের নাম—সচেতন বা সজ্ঞান মন, অন্তর্জ্ঞানীয় বা অধিচেতন মন এবং অচেতন বা নির্জ্ঞান মন। অচেতন ও অধিচেতন মন সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা ও তথ্য-সমাবেশ করা হইয়াছে "ফ্রএডের ভালবাসা" ও "ফ্রএডের নারীচরিত্র" নামক গ্রন্থ দুইখানিতে। সুতরাং ঐ দুইটি বিভাগ সম্বন্ধে বেশী কিছু পরিচয় এ গ্রন্থে দেওয়ার আবশ্যকতা দেখি না।

যাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তাঁহারা শেষোক্ত বিভাগ দুইটি সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ বলিয়া অনুমান করিব। বস্তুতঃ পুস্তকের শেষভাগে অচেতন বা নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রেমজীবনের উপর ইহার প্রভাব সম্বন্ধে বেশ খানিকটা তথ্যপ্রমাণ দৃষ্টান্ত লইয়া আমাদিগকে নাড়াচাড়া করিতে হইবে। সুতরাং সেগুলি সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে, "ফ্রএডের ভালবাসা" বইখানির উপর দিয়া আগেই একবার চোখ বুলাইয়া লওয়া ভালো।

এই গ্রন্থে আমরা প্রধানতঃ সচেতন বা সজ্ঞান মনের রাজ্য আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণ করিব। মনের এই বিভাগটি সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করা আধুনিক মনস্তত্ত্বের প্রধান কাজ। সোজা কথায় এই বইখানির মাধ্যমে আমরা সাধারণ বুদ্ধি দিয়া মনস্তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব এবং মনের নাগাল পাইবার বিধিমত প্রয়াস করিব।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

মনের সিংহদ্বারে

এই পৃথিবীতে আমরা তিনটি পৃথক জগৎ, লোক বা রাজ্যের সন্ধান পাই—জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মনোজগৎ। প্রত্যেকটি জগৎ কতকগুলি বাঁধা নিয়মে পরিচালিত হইতেছে এবং উহার অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তু বা ভাবের এমন কতকগুলি বিশেষ ধর্ম বা গুণ আছে যেগুলি অপরের মধ্যে নাই। প্রত্যেকটি রাজ্য স্বতন্ত্র হইলেও ঠিক স্বয়ংতন্ত্র নয়, পরস্পর পরস্পরের অল্পবিস্তর মুখাপেক্ষী। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে, একটি রাজ্যের সীমানার একদিক অপর রাজ্যের সীমানার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কাহারও স্বাধীনতা অতিক্রান্ত হয় নাই, বরং তাহাতে সকল পক্ষের সুবিধাই হইয়াছে।

এই তিনটি জগৎ বা রাজ্যই এমন মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ যে, তাহাদের মধ্যে সহস্র রকমের বৈষম্য সত্ত্বেও একটা পরমোদ্দেশ্য সাধনোপযোগী ঐক্যসূত্র তাহাদের মধ্য দিয়া অনুস্যূত বলিয়া অনুমান করা কঠিন নহে। যেখানে দুই জগতের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বাধে দেখি, সেখানেই বুঝিতে পারি যে, তাহাদের মধ্যে একটা নূতন কিছু সৃষ্টির সম্ভাবনা বা প্রেরণা রহিয়াছে। একটি হয়তো ধ্বংস হয় অপরটিকে বাঁচাইবার অথবা সমৃদ্ধ করিবার জন্য। জড়ে ও জীবে অথবা জীবে ও জীবে সঙ্ঘর্ষ হয় যোগ্যতমের উদ্বর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন-বিধিকে ফলবান করিবার জন্য।

এককোষযুক্ত প্রাণী

জড়জগৎ যদি না থাকিত, তাহা হইলে জীবজগৎ সৃষ্টই হইত না। আবার জড় জগতের সাহায্য ব্যতীত জীবজগৎ এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারে না। পৃথিবীতে প্রায় শতাবধি সংখ্যক যে মৌল পদার্থ আছে, তাহাদের অধিকাংশই একটি জীবদেহ গঠনে নিয়োজিত হয়। জীবের ক্ষুদ্রতম অংশ বা অখণ্ড-একককে (unitকে) বলা হয় দেহকোষ (cell)। অনেকগুলি শ্রেণীর

এককোষযুক্ত আদ্যজ প্রাণী (protozoa) পৃথিবীতে বহু কোটী বৎসর পূর্বে প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল ; তাহাদের অধিকাংশ শ্রেণী আজও টিকিয়া আছে।

ইহাদের মধ্যে প্রায় সবগুলিই এত ক্ষুদ্র যে, স্থূলচক্ষে ইহাদের একটি বা একত্র কয়েকটিকে দেখিতে পাওয়াও দুষ্কর। তাহারা সাধারণভাবে "জীবাণু" বা "বীজাণু" নামে পরিচিত। ইহাদিগকে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দর্শন করিতে হয়। ভাইরাস্ জাতীয় নানাপ্রকার জীবাণু আছে, যাহাদিগকে সাধারণ অণুবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যেও ধরা যায় না ; ইলেক্‌ট্রন্ মাইক্রস্কোপের সহায়তা লইতে হয়। এই এককোষাণুযুক্ত জীবাণু পৃথিবীর সর্বত্র জলে স্থলে বায়ুতে অগণ্য সংখ্যক ছড়াইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে একদল জীবের পক্ষে উপকারী, আর একদল মহাপকারী। ইহারাই কলেরা, প্লেগ, টাইফএড, গলক্ষীতি, ধনুষ্টঙ্কার, মুখক্ষত, শোষ ও নালী ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, ক্ষয়রোগ, ডিফ্‌থিরিয়া, নিউমনিয়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগ উৎপন্ন করে। হাম, বসন্ত, সর্দিকাশি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, শৈশব পক্ষাঘাত, কর্ণমূলপ্রদাহ প্রভৃতি রোগের বীজাণুরা ভাইরাস্ জাতীয়। আবার কয়েক শ্রেণীর বীজাণু কন্দজাতীয় আনাজগুলিকে পরিপুষ্ট করে, ফলের মিষ্টত্ব সম্পাদন করে, ফুলে গন্ধ সঞ্চার করে, দুধকে দধিতে পরিণত করে, আঙুরের রস বা বার্লির কাথকে মদ্যে রূপান্তরিত করে।

আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, পৃথিবীতে এই-যে শত শত প্রকারের এককোষযুক্ত প্রাণী আছে, তাহাদের এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর জীবের কোথাও আকৃতি-প্রকৃতিতে লক্ষণীয় সাদৃশ্য নাই ; তাহাদের প্রত্যেকের দেহ বিভিন্ন মাত্রার বিভিন্ন প্রকার মৌলপদার্থ দ্বারা গঠিত। সেইরূপ, প্রত্যেক জাতীয় বৃহৎ ও বৃহত্তর জীবের দেহ যে দেহকোষ দিয়া গঠিত, তাহাদের উপাদানে, আকারে ও ধর্মেও অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। অবশ্য প্রত্যেক দেহকোষের দৈহিক গঠন-সংস্থান ও বৃদ্ধির রীতি প্রায় একই ধাঁচের। প্রত্যেক প্রকার দেহকোষের মাঝখানে এক ক্ষুদ্রতম বিন্দু পরিমাণ ঘনতর 'নিউক্লিয়াস্' বা প্রাণকেন্দ্র, তাহার চারিপার্শ্ব মুড়িয়া জেলিবৎ 'প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম্'। সমস্তটা আবার যৎপরোনাস্তি পাতলা চাদর দিয়া মোড়া। মনে রাখিতে হইবে, একটি দেহকোষকে চর্মচক্ষে দেখা দুঃসাধ্য, অথচ ইহা প্রাণবন্ত, জীবেরই একটি ক্ষুদ্র ক্ষীণ স্বয়ম্পূর্ণ প্রতিরূপ।

প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অনুকূল পরিবেশে বৃদ্ধি পায়। তারপর নিউক্লিয়াসের মাঝামাঝি জায়গায় ফাট ধরে নতুবা ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়। শেষে একটি কোষ মাঝামাঝি ঐ সরু জায়গাটিতে ছিন্ন হইয়া দুইটি কোষে পরিণত হয়। এইভাবে দুই হইতে চারিটি, চারি হইতে আটটি ক্রমশঃ শত শত দেহকোষ পাশাপাশি যুক্ত হইয়া একটি জীবভ্রূণ গঠন করে—যেমন করিয়া একটি বীজ একটি চারাগাছকে বিকশিত করে, যাহা কালক্রমে একটি বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। এই-যে একটি দেহকোষ অসংখ্য দেহকোষের জন্ম দিয়া একটি জীবদেহ সৃষ্টি করে, তাহা মূলতঃ আসে কোথা হইতে?

প্রাণিজন্মের সূত্রপাত

একজন পুরুষের প্রতিবারের সহবাসে যে পরিমাণ শুক্র নির্গত হয়, তাহার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে কুড়ি কোটি শুক্রাণু (spermatozoa) থাকে। ভাগ্যক্রমে একটিমাত্র শুক্রাণু যদি স্ত্রীলোকের যোনির অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ ও জরায়ু অতিক্রম করিয়া, দুইটি অণ্ডাণুপ্রবার (Fallopian tubes) যে-কোন একটির মধ্যে আগত একটি অণ্ডাণুর (ovum) সম্মুখে আসিয়া পড়ে এবং নিজের সরু মাথাটি অণ্ডাণুটির কোমল দেহমধ্যে অণুপ্রবিষ্ট করাইয়া যদি আপনাকে তাহার মধ্যে মিশাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে একটি জীবাঙ্কুরের সূচনা হয়। তখন তাহা এককোষযুক্ত প্রাণীর প্রায় সমধর্মী হইয়া এবং জরায়ু-অভ্যন্তরের কোমল প্রাচীরে বৃক্ষবীজের মত প্রোথিত হইয়া, সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে সুরু করে।

যখন পুরুষজীবের শুক্রাণু ও স্ত্রীজীবের অণ্ডাণু সম্মিলিত ও সংমিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া যায়, তখন বাহির হইতে ইহাদের দুইটিকে আর পৃথক করিবার উপায় থাকে না; রাসায়নিকগণ যাহাকে chemical compound বা যৌগিক সংমিশ্রণ বলেন, ইহারা উভয়ে বরং তাহার চেয়েও বেশী কিছু হইয়া যায়। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, নূতন জীবাঙ্কুর গঠিত হইলে, তাহাতে শুক্রাণু বা অণ্ডাণু কেহই প্রাধান্যলাভ করে না। ইহাদের প্রত্যেকের নিউক্লিয়াসের মধ্যে জাতি ও বংশচরিত্রবাহী যে কয়টি ক্রোমোসোম নামক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাঠির মত আকারের বস্তু থাকে, তাহার অর্ধেক অকেজো হইয়া

বিনষ্ট হইয়া যায়। কাজেই একটি জীবাঙ্কুর তাহার দেহমধ্যে অণ্ডাণুর অর্ধেক সংখ্যক ও শুক্রাণুর অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোম্ বহন করে। সুতরাং একটি জীবাঙ্কুরের মধ্যে একদিকে লক্ষ কোটি বৎসরের মনুষ্যজীবনের ইতিহাস—অন্যদিকে একটা বিশিষ্ট মহাজাতি, জাতি, উপজাতি এবং পিতৃ ও মাতৃপুরুষের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ও চিন্তা-ভাব-চেষ্টা-ধারার বীজ ওতপ্রোত থাকে। প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীর শুক্রাণু ও অণ্ডাণু দেখিতে এক আকারের নহে, তবে একমাত্র মৎস্য ব্যতীত গর্ভোৎপাদনোদ্দেশ্যে তাহাদের সংযোগের পদ্ধতি এক।

প্রত্যেক শুক্রাণু বা অণ্ডাণুর মধ্যে বিভিন্ন হারে জোড়-সংখ্যক ক্রোমোসোম্ থাকে। নিম্নতর প্রাণীর ক্ষেত্রে দুই, তিন বা চারি জোড়া; উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে আট, দশ, বারো জোড়া করিয়া ক্রোমোসোম থাকিতে দেখা যায়। স্ত্রীপুরুষের অর্ধেক অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোম্ একটি মানুষকে শুধু আকারগত-ভাবে মানুষরূপেই গঠন করে না, মনুষ্যজাতির সাধারণ চরিত্র ও আপন বংশধারার বিশেষ চরিত্র বিভিন্ন পরিমাণে দান করে। নানা কারণে একই পিতামাতার সন্তানের মধ্যে আকৃতিপ্রকৃতিতে বিভিন্নতা দেখা যায় কেন তাহার উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। তাহার বহু কারণ আছে, যেগুলির আলোচনা পরে প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু কিছু করা যাইবে।

পৃথিবী ও আদিপ্রাণীর জন্ম

জড় পৃথিবীর জন্ম হইয়াছিল প্রায় ৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে—একটা গাঢ় গ্যাস-বাষ্প-ধূম্রময় জ্বলন্ত গোলকরূপে। সদা ঘূর্ণায়মাণ এই অগ্নিময় গোলক-দেহের বিভিন্ন গ্যাসের মধ্য হইতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস পৃথক হইয়া পৃথিবীর চতুর্দিকে বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করিল; তারপর হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস ঊর্ধ্বে উঠিয়া একত্র মিলিয়া অজস্র জলবিন্দুর সৃষ্টি করিল এবং বৃষ্টিরূপে গ্যাসদেহী পৃথিবীর উপর লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পতিত হইতে লাগিল। উহার ফলে পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা ও খানিকটা কঠিন হইয়া, দুধের সরের মত পাতলা স্তর পড়িয়া গেল এবং উহার নানাস্থান চুপ্‌সাইয়া সংকুচিত হইয়া বিরাট বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি করিল। পৃথিবীর সমস্ত অবনমিত স্থানগুলির আগাগোড়া

জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই জগদ্ব্যাপী প্রলয়পয়োধিজলতলে পৃথিবীর কাঠিন্য-প্রাপ্তির প্রক্রিয়া বেশ সহজ ও দ্রুততর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ বালুকা, মৃত্তিকা ও প্রস্তর প্রভৃতি গঠিত হইতে ও উহাদের তলায় নানাবিধ ধাতু ক্রমশঃ অদৃশ্যভাবে দানা বাঁধিতে লাগিল।

প্রায় তিনশত কোটি বৎসর পূর্বে একদিন দ্রবময়ী পৃথিবীর মহৎ কুক্ষির একটি অজ্ঞাত কোণে একদল চক্ষুর অগ্রাহ্য এককোষদেহী উদ্ভিদাণুর সৃষ্টি হইল। ইহাই পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম আবির্ভাব। ইহারাই কিছুকালের মধ্যে আপনাদের দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া, অ্যাল্‌জি (Algae) নামক শৈবালরূপে জলপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। অ্যাল্‌জিরাই বৃক্ষসমাজের আদিপুরুষ। তারপর একে একে এককোষদেহী অ্যামিবা ও প্যারামেসিয়া নামক জীবাণুর উদ্ভব হইল। ইহারাই পৃথিবীর সমস্ত জলচর, খেচর ও ভূচর প্রাণীর প্রথম পিতা। এক-কোষযুক্ত হইলে কি হয়, অ্যামিবারা ক্রমাগত তাহাদের দেহের আকার বদলায় এবং হাত না থাকিলেও কোন বস্তু ধরিতে পারে, পা না থাকিলেও চলিতে পারে। ইহারা উভচর। মানুষের উদরদেশেও একপ্রকার অ্যামিবা দেখা যায় যাহারা এক শ্রেণীর আমাশা উৎপন্ন করে।

প্রায় চল্লিশ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে স্থলভাগের প্রথম সূচনা হয়। তাহার পূর্বেই কয়েকপ্রকার ছোট ছোট মাছের উদ্ভব হইয়াছে। এইবার ঘাস, লতা ও ছোট বড় বৃক্ষের জন্ম হইতে লাগিল। তারপর ব্যাঙাচি, ব্যাঙ, হাঁস, গোসাপ, শুশুক প্রভৃতি প্রাণী সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিরাণী লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া আপন খেয়ালে শত শত বিভিন্ন আকারের অতিকায় কিম্ভূতকিমাকার প্রাণী সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইহাদের অধিকাংশই ছিল সরীসৃপ শ্রেণীর। ইহারা দ্রুতবেগে স্থলভাগের গাছপালা ও ক্ষুদ্রতর প্রাণীসমূহ নিশ্চিন্ত মনে আপনাদের দুষ্পূরণীয় উদরগহ্বরে পুরিতে লাগিল।

যখন অতিকায়দের অত্যাচারে নিরামিষ ও আমিষ আহার্যসামগ্রী কালক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিল, তখন প্রকৃতিদেবীর চমক ভাঙিল। তখন অতিকায় প্রাণীরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে সুরু করিল ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির

হইয়া। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশেরই দেহের চর্ম লৌহবর্মের ন্যায় কঠিন ছিল —যাহার মধ্যে কেহ দাঁত বা নখ বসাইতে সমর্থ হইত না। তাহা ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণীই প্রায় সমান বলবান ছিল, কাজেই একটি অতিকায় আর একটি অতিকায়কে সহজে ঘায়েল করিতে পারিত না।

প্রকৃতি তাড়াতাড়ি অতিকায়দের নিঃশেষে ধ্বংস করিবার এক সহজ উপায় বাহির করিলেন। প্রায় দশ কোটি বৎসর পূর্বে তিনি পৃথিবীর জলস্থল কঠিন ও গভীর তুষারস্তরে আবৃত করিয়া দিলেন। এইভাবে তিনি শুধু বিরাটাকার সরীসৃপদিগকেই জগত হইতে ধুইয়া-মুছিয়া দিলেন না, অন্যান্য ক্ষুদ্রতর প্রাণীরাও এই অবর্ণনীয় শীতের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। অণুদেহী কোন কোন জীব আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের দেহ শক্ত খোলায় আবৃত করিয়া বরফের স্তূপের মধ্যে চুপচাপ পড়িয়া রহিল। আর কতকগুলি লোমশ ছোট ছোট উভচর জীব তাড়াতাড়ি বরফের মধ্যে গর্ত করিয়া অর্ধমৃত অবস্থায় বাঁচিয়া রহিল। তাহারা কি খাইয়া জীবন ধারণ করিত তাহা নির্ণীত হয় নাই। এই তুষারজয়ী ক্ষুদ্র জীবদের এক শ্রেণীর নাম "ডাকবিল্ প্লাটিপাস্"।

যাহা হউক, দীর্ঘকাল পরে তুষার গলিল। আবার ত্বরিৎগতিতে বৃক্ষলতা-পত্রকোরক শ্যামলতায় ক্ষিতিতল ঢাকিয়া দিল। তখন প্রকৃতিদেবী পূর্বাপেক্ষা অধিকতর চতুর ও বিবেচনাশীল হইয়াছেন। নূতন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি আবার বিভিন্ন আকার ও শ্রেণীর জলচর স্থলচর নভোচর প্রাণীর সৃষ্টিকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। অতঃপর তিনি নানা দিক দিয়া পূর্বের ন্যায় প্রচুর ভুলভ্রান্তি করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ কিলোগ্রাম ওজনের এক-একটি অতিকায় প্রাণী সৃজন করিবেন না বলিয়া ভীষ্মের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিলেন।

মানুষ কবে কি লইয়া আসিল

অতঃপর সৃজনের কুলালচক্র আবার সবেগে ঘুরিতে লাগিল, জীবজীবনের বিচিত্র ক্রমবিকাশধারা তর তর বেগে বহিয়া চলিল। আনুমানিক আট লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রকৃতিদেবী অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ভাঙচুর

করিয়া শেষে ক্রমবিবর্তনের সর্বোচ্চ ধাপে মানুষ রচনা করিয়া দীর্ঘকালের জন্য অবকাশ লইয়াছেন। এই আট লক্ষ বৎসরের মধ্যে তিনি বড় রকমের কোন নূতন জীব বা বৃক্ষ-লতা সৃজন করিয়াছেন কি না জানা যায় নাই। মনুষ্য সৃষ্টিই বোধ হয় প্রকৃতির swan-song। আট লক্ষ বৎসর ধরিয়া, মানুষের উন্নতির জন্য তিনি নিজে মাথা ঘামাইতেছেন না, তিনি কেবল তাহাকে উন্নত ধরনের মন ও মস্তিষ্ক দিয়া ও সভ্যতার প্রথম ধাপে দাঁড় করাইয়া দিয়া, শুধু তাহার কানে এই মন্ত্রটি দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন—'চরৈবেতি চরৈবেতি' (এগিয়ে চল, এগিয়ে চল)।

তাহার পর হইতে মানুষ আত্মোন্নতির ভার নিজে লইয়াছে। প্রকৃতির নিকট হইতে সে যেটুকু সাহায্য চায় তাহা পায়; প্রকৃতির শক্তিকে আপনার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবলে যতখানি গঠনভঞ্জনের কাজে লাগাইতে পারে—লাগায়; আপনার ধীশক্তি ও প্রতিভাবলে প্রকৃতির অন্তর্লোকের যতখানি রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারে—করে। প্রকৃতি তাঁহার দক্ষিণমুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করেন। তবে সৃষ্টি যত বড়ই হোক্, তাহা যে স্রষ্টার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হইতে পারে না—ইহার প্রমাণ দিবার জন্য, তাহার সীমাবদ্ধতাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, সময়ে সময়ে বহিঃপ্রকৃতিতে আমরা যেমন নিদারুণ ধ্বংসাত্মক দুর্যোগ দেখি, অন্তঃপ্রকৃতিতেও তেমনি দেখিতে পাই। তাহাতে মানুষ ভাঙে, তবু মচকায় না। প্রকৃতির সৃষ্টির শেষ আছে। মানুষের সৃষ্টির শেষ নাই। মানুষের দেহ সীমাবদ্ধ, কিন্তু মন অসীম।

মানুষ অপেক্ষা দেহে বড়, বলশালী ও সাহসী অনেক জীবজন্তু পৃথিবীতে আছে। কিন্তু মানুষ তাহাদিগকে বশীভূত করে ও প্রয়োজন হইলে বধ করে—কিসের জোরে? গায়ের জোরে নয়, বুদ্ধির জোরে। মনুষ্যেতর জীব তাহার ক্ষুধার উপযোগী আহার এবং নিদ্রা-বিশ্রামের জন্য একটুকরা নিরাপদ স্থান পাইলেই খুশী; এইজন্য তাহাদের জড়জগতের সহিত যা-কিছু সম্পর্ক। নিম্ন স্তরের মানুষও এককালে অনেকটা এইরূপই ছিল। তাহারা অল্প লইয়াই সুখী থাকিত। কিন্তু মানুষ যতই সভ্য হইতে লাগিল, ততই তাহার অভাবের বৈচিত্র্য ও তীব্রতা বাড়িতে লাগিল, ততই অতৃপ্তি তাহাকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত

করিতে লাগিল। এই অতৃপ্তি মানুষকে উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত দিয়াছে, আবিষ্কারের প্রেরণা দিয়াছে, উদ্ভাবনের প্রতিভা দিয়াছে। মানুষের মন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছে, গভীর হইয়াছে; সীমার মাঝে থাকিয়া তাহার নির্দিষ্ট পরিসীমা নাই, ব্যাপ্তি নাই, রূপ নাই। চৈতন্য ও আচরণের মধ্য দিয়াই তাহাকে ধরাছোঁয়া যায়। সে বস্তুজগৎ ও জীবজগৎ উভয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে এবং প্রবেশ করিয়াও তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে। সে জীবনকে প্রকৃতির সর্বপ্রকার বাধা হইতে মুক্ত হইবার শক্তি দেয়, জরা ও মৃত্যুকে জয় করিবার স্পর্ধা দেয়।

মানুষে মানুষে এত প্রভেদ কেন?

প্রত্যেক জাতি, শ্রেণী, বর্গ, গণের সমস্ত প্রাণীর আকৃতি-প্রকৃতি মূলতঃ প্রায়ই একই প্রকারের হয়। যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায় তাহা প্রধানতঃ পরিবেশ, বাসাহারের পরিবর্তন, বিশেষ ব্যাধি অথবা সাঙ্কর্যের ফলে সংঘটিত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে আকারে-প্রকারে পার্থক্য এত ব্যাপক, এত পরিস্ফুট ও এত সাধারণ যে, কেবল কতকগুলি জৈব কারণ-দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করা যায় না। শুধু পরিবেশ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বংশানুসারিতার প্রভাবের ফলে নহে, মনের বিভিন্নতায় অর্থাৎ কর্ম, চিন্তা, ইচ্ছা ও জ্ঞানের বিভিন্নতায় মানুষে মানুষে এত প্রভেদ দেখা যায়। এগুলিও অবশ্য আংশিক কারণ।

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার "দার্শনিকী" নামক পুস্তকের এক জায়গায় বলিতেছেন—"শুধু যে জৈব ও মনোব্যাপারের মধ্যে দান-প্রতিদান, উপযোগিতা ও বিরোধিতা চলেছে তা নয়, প্রতি কেন্দ্রে, প্রতি মানুষে যে মনোব্যাপার চলেছে, ভাষার মধ্য দিয়ে মুখ চোখ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে অনবরত তাদের পরস্পরের যে বিনিময় চলেছে, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র মনোরাজ্য গঠনে তার স্থান বড় কম নয়। বস্তুত জৈবরাজ্যের কবল থেকে মানুষের মধ্যে যে একটি স্বতন্ত্র মনোরাজ্য গ'ড়ে উঠতে পেরেছে, তার সর্বপ্রধান কারণই হচ্ছে মনে মনে আদানপ্রদান।...নানা মনের সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে প্রত্যেকটি মন তার নিজের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যলাভ করে এবং প্রত্যেক মনের এই বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতার

দ্বারা মনঃসমষ্টি ব'লে একটি স্বতন্ত্র মনোরাজ্যের সত্তা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, এবং এই মনোরাজ্যের বিশিষ্ট প্রকৃতির দ্বারা আবার প্রত্যেকটি মন অনুভাবিত হয়ে ওঠে।" (৪৫ পৃষ্ঠা)

মনের পরিচয় লইবার আগেই আমরা যেন এই কথাটি মনে রাখি যে, সর্বদেশের সর্বকালের সর্ব মানুষের দেহের মধ্যে যেমন কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে, তেমনি সর্ব মানুষের মনের মধ্যেও কতকগুলি সামান্য গুণ আছে; সেই সাধারণ গুণসম্পন্ন মনগুলিকে 'মনঃসমষ্টি' বা 'সমষ্টিগত মন' বলা যায়। আবার প্রত্যেক মানুষের মনের সাধারণ গুণ ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ গুণ দেখা যায়। তখন সেই মনকে 'ব্যষ্টিগত মন' বলিতে হইবে।

দেহের যে-কোন জায়গায় হাত দিই না কেন, সেই জায়গায়ই প্রাণ আছে বলা যায়, কারণ প্রাণ না থাকিলে স্পর্শের জ্ঞান হয় কি করিয়া? তথাপি প্রাণের কর্তা আছেন একটি জায়গায়, সেই জায়গাটি হইল মস্তিষ্ক। নিম্নতর ও নিম্নতম প্রাণীদের মধ্যে, বৃক্ষের মধ্যে মন নাই, মস্তিষ্ক নাই, তবু প্রাণ আছে। তাহাদের প্রাণ থাকে যেন প্রতিটি দেহকোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে। একটি এককোষযুক্ত প্রাণীর নিউক্লিয়াসটি যদি নষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তখনি তাহার মৃত্যু হয়। একটি গাছের শিকড়ের প্রতিটি দেহকোষের মধ্যে প্রাণ আছে; সেইজন্য শিকড়টি কাটিয়া দিলে গাছ বাঁচে না। আবার, তাহার ডালপালাপাতার মধ্যেও প্রাণ আছে বলা যায়, কারণ ঐগুলি কাটিয়া-ছাঁটিয়া নিঃশেষ করিলেও গাছের বাঁচা দুঃসাধ্য। গাছ যেমন মাটির রস হইতে শিকড়-সাহায্যে তাহার আহার্য তথা প্রাণশক্তি সংগ্রহ করে, সেইরূপ পাতার সাহায্যে আলো ও বাতাস হইতেও আহার্য তথা প্রাণশক্তি আহরণ করে। তাহার মস্তিষ্ক না থাকিলে কি হয়, সীমিতভাবে অনুভূতি আছে, আরাম-বেদনার বোধ আছে। হৃৎপিণ্ড না থাকিলেও হৃৎস্পন্দনের অনুরূপ একটা প্রাণস্পন্দের বিচ্ছুরণ আছে সর্বাঙ্গে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বৃক্ষ ও নিম্নস্তরের প্রাণীদের মন বলিয়া কোন বিভব নাই, চিন্তা ও কল্পনাশক্তির কণামাত্র তাহাদের অধিকারে নাই। তথাপি তাহাদের মনের যদি কিছুমাত্র কাজ থাকে, তাহা সাধন করে বিশ্বপ্রকৃতির

মন। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের মনের খানিকটা কাজ তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতি করে, খানিকটা করে বিশ্বপ্রকৃতি। তাহাদের মন অল্পবিস্তর পরাধীন। স্তন্যপায়ী উচ্চস্তরের কোনো কোনো প্রাণীর মন অবশ্য খানিকটা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। কিন্তু অসভ্য মানুষের মন ডমিনিয়ান্ স্টেটাস্ এবং সভ্য মানুষের মন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের অধিকার পাইয়াছে। তাই আট-নয় হাজার বৎসর পূর্বে আলোকসন্ধানী মানুষ অন্ধকার গুহা হইতে নিজের সন্ধিৎসু মন লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিল। জড়রাজ্য ও জীবরাজ্য সমেত শুধু কি পৃথিবীকে জয় করিয়াছে সে? গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রলোক ও মহাশূন্য আজ তাহার জ্ঞান-ঝটিকাবাহিনীর দর্পিত পদবিক্ষেপে থর থর কম্পিত।

এতগুলি কথা বলার পর এইবার আমরা মনের রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিব। এই গ্রন্থে আমরা মানুষেরই মনের পরিচয় লইতেছি, তাহা প্রধানতঃ সুস্থ মানুষের ও সমষ্টিগত মনের অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী জনসমাজের মনের সাধারণ ক্রিয়াকলাপের পরিচয়। তারপর অবশ্য আমরা ব্যষ্টিমন ও অসুস্থ মনেরও বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ লইয়া কিছু আলোচনা করিব, যদিও একখানি পুস্তকের মধ্যে উহার ব্যাপক আলোচনা সম্ভবপর নয়।

আসলে বইখানির প্রথমাংশে সাধারণ মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটামুটি রকমের অনুশীলন থাকিবে সুবোধ্য ভাষায়। পরবর্তী অংশে মনের গতি-প্রগতি, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, প্রবৃত্তি, প্রবণতা, শিক্ষা এবং ব্যক্তিবিশেষে ইহাদের ফল কি দাঁড়ায় তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা করিব, সঙ্গে সঙ্গে দুই-চারিটি দৃষ্টান্ত দিব যাহাতে পাঠকপাঠিকাগণ কিছু শিক্ষার মালমশলা সংগ্রহ করিতে পারেন। আর একটি কথা। এই পুস্তকে প্রধানতঃ সচেতন বা সজ্ঞান মনের কথাই অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে থাকিবে, যদিও আমরা মাঝে মাঝে প্রসঙ্গক্রমে অধিচেতন ও অচেতন মনের কথা উল্লেখ করিব; কারণ মনোবিজ্ঞানের কোনো কক্ষেই অচেতন মন সম্বন্ধে অজ্ঞতা লইয়া প্রবেশ করা যায় না।

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞার্থ

এখন মনোবিজ্ঞানের মোটামুটি একটা সংজ্ঞার্থ দিয়া আমরা মনের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া তাহার প্রাসাদকক্ষগুলি, দেওয়ান্-ই-খাস্, দেওয়ান্ ই-আম্, জেনানা-মহলগুলি দেখিয়া বেড়াইব। মনোবিজ্ঞান বা মনোবিদ্যার সংজ্ঞা লইয়া বহু মতভেদ আছে। আগেকার কালে কেবল ভারতবর্ষে নয়, প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও মনীষীরা আত্মা ও ঈশ্বর লইয়া মাথা ঘামাইতে ঘামাইতে মনকে ঘর-ঝাঁট্ দেওয়া জঞ্জালের মত একপাশে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা মনে করিতেন যে, আত্মাকে জানিলেই মনকে জানা হইল; আত্মাবস্তুর একটা ক্ষুদ্রাংশ মাত্র মন, তাহা ছাড়া আর কিছু নয়। বড় বড় পণ্ডরাও যে একটা ক্ষুদ্র মন লইয়া কারবার করে, তাহা তাঁহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

এখন অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে এই ধারণা একেবারে পাল্টাইয়া গিয়াছে। এই দ্রুতবর্ধিষ্ণু বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের যুগে মনকে আত্মার অনেক উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। মনীষীদিগের একটা বড় দল আত্মার অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা মজ্জাগত ঐতিহ্যকে আঘাত করিতে দ্বিধাবোধ করিয়াছেন তাঁহাদের একদল এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আত্মার মধ্যে মন নাই; যদি আত্মা বলিয়া কিছু থাকে তো তাহা মনের কোনো এক অনাবিষ্কৃত কোণে পড়িয়া আছে। মানুষকে আত্মা চালায় না, চালায় তাহার মন, অ-স্তন্যপায়ী পশুদের অধিকাংশকে যেমন চালায় তাহাদের অন্তর্নিহিত বংশগত সংস্কার, অবস্থাজাত বুদ্ধি ও অভ্যাস। আর একটি ক্ষুদ্র দল পণ্ডিত পাশ্চাত্ত্যে দেখা গিয়াছে যাঁহারা আত্মা ও মন দুইটিকেই উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা মস্তিষ্ককেই মানুষের একমাত্র পরিচালক বলিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং তাহারি বেদিমূলে পাদ্যার্ঘ প্রদান করিতেছেন।

যাহা হউক, হোমরা-চোমরাদের পরস্পরবিরোধী মতগুলি ঝাড়াই-বাছাই করিয়া এই নির্বচনটি দাঁড় করাইতে পারি যে, যে-বিদ্যা বিশেষভাবে মানুষের মনের স্বরূপ, প্রকৃতি, ক্রিয়াকলাপ, বিকাশ, পরিণতি, পরিবেশের সহিত সম্বন্ধ-

স্থাপনের রীতি, দেহের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও তাহার উপর প্রভাব প্রভৃতি নির্ণয় ও আলোচনা করে, তাহাকেই "মনোবিদ্যা" বা "মনোবিজ্ঞান" বলে। ইহাকে বিজ্ঞান বলাই অধিকতর সঙ্গত, কারণ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, প্রমাণ-সংগ্রহ ও বিচার ব্যতীত এ বিদ্যা সম্পূর্ণ অসহায়। মনের বিভিন্নরূপ অবস্থা, তাহার গোপন কথা ও তাহার নানারূপ অসুস্থতা নির্ণয় করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার জটিল ও শক্তিশালী যন্ত্রও সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। রকমারি মানসিক ব্যাধি-চিকিৎসার জন্য রকমারি ঔষধ ও পদ্ধতি বাহির হইয়াছে।

এইবার প্রশ্ন হইল—মন থাকে কোথায়? দেহের কোথায় কোন্ যন্ত্রটি থাকে তাহা আমরা শারীরস্থান-বিদ্যার সহিত শবব্যবচ্ছেদ-ক্রিয়া অধ্যয়ন করিলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারি। কিন্তু মন তো একটি বাস্তবিক পদার্থ নয়, উহার তো কোনো ভৌতিক সত্তা নাই, উহা প্রত্যক্ষগম্য নয়; উহাকে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়া ধরিতে-ছুঁইতে পারি না। উহা একটি বিমূর্ত প্রকল্প। তাহা হইলে কি করিয়া উহার বাসস্থান স্থির করা যায়?

এ কথা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মন দেহ-ছাড়া নহে, উহা দেহের কোন-একটা জায়গায় লুকাইয়া থাকে। প্রাণ যেমন দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে, উহার প্রতি সূক্ষ্মদেহী দেহকোষে পর্যন্ত প্রাণের খেলা চলিতেছে; কিন্তু শরীরের যে-কোন অংশে হাত দিয়া আমরা বলিতে পারি না, ওখানে মন বর্তমান। তবে এইটুকু পর্যন্ত বলা যায় যে, ওখানে মনের ক্রিয়া বা অনুভূতি-চেষ্টা চলিতেছে। মনের একটা নির্দিষ্ট বাসস্থান আছে, তথা হইতে সে শরীরের সকল অংশের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিতেছে, তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। সে স্থানটি হইল মস্তিষ্ক বা কেন্দ্রীয় নাড়ীতন্ত্র।

মন শুধু মস্তিষ্কের মধ্যে আছে, তাহা নহে, মস্তিষ্কের বাহিরেও আছে এবং সে মস্তিষ্ককে নিয়মিত করিতেছে ও প্রাণের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। মন গেলে প্রাণ যদি-বা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রাণ গেলে মন কিছুতেই থাকিতে পারে না। মৃত্যুর সহিত মন ও প্রাণ দুই-ই দেহ ছাড়িয়া যায়। এই নির্মম শোচনীয় সত্যকে এক অনির্বচনীয় আশা ও সান্ত্বনাময় মিথ্যা দিয়া মন ভুলাইবার জন্য বোধ হয় প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণ এককালে

অমর আত্মার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং মর্ত্যের বাহিরে স্বর্গ-নরকের এক মনোহর-ভয়াবহ ছবি আঁকিয়া দিয়াছিলেন।

মস্তিষ্ক হইল মনের সৌধও বটে, আবার কর্মসচিবও বটে। দেহের সহিত মনের যে সমস্ত কারবার, তাহা পরিচালিত হয় মস্তিষ্কের মাধ্যমে। সুতরাং মস্তিষ্ককে অধ্যয়ন করিলে আমরা মনের—বিশেষভাবে আমাদের সজ্ঞান মনের অন্ততঃ চৌদ্দ আনা পরিমাণ পরিচয় পাইব। কাজেই অতঃপর মস্তিষ্কের বিবরণে আমাদিগকে অনেকগুলি পৃষ্ঠা নিয়োজিত করিতে হইবে।

তৃতীয় প্রসঙ্গ

মনের সচিবালয়

পূর্বেই বলা হইয়াছে—মনের রাজ্য হইল দেহ, সে থাকে দেহাশ্রিত হইয়া, কিন্তু রক্তকরবীর রাজার মত থাকে জালের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া।...রাজা কায়াধারীই হউন বা নির্বাস্তবই হউন, তাঁহার এক (বা একাধিক) মন্ত্রী থাকিবেই—যাহাকে আমরা ধরিতে-ছুঁইতে পারি ও যাহার কাছে আমরা ইচ্ছামত আর্জি পেশ করিতে পারি। সচিবশূন্য রাজা বা রাজ্য কল্পনা করাই যায় না। কিন্তু মনের এই মন্ত্রীটি কে—যিনি রাজার আদেশানুজ্ঞা অনুযায়ী রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করেন? এক কথায় তাহার নাম মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কের পরিচয় আমাদিগকে বিশেষভাবে লইতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে আমরা সচেতন মনের কোনো হদিসই পাইব না।

অস্থি ও পেশীর কথা

কিন্তু মস্তিষ্ক ও উহার কার্যাবলী সম্বন্ধে একটু সবিস্তার আলোচনা করিবার পূর্বে এই দেহরাজ্যটি সম্বন্ধে বাদামের খোলার মধ্যে ধরে এরূপ সামান্য একটু জ্ঞান আমাদিগের লাভ করা দরকার, নতুবা মস্তিষ্ক-অধ্যয়ন ব্যাপারটি সুগম হইবে না।....

প্রথমেই আমরা মানুষের কঙ্কাল বা কাঠামোটির কথা বলি। কঙ্কাল আমাদের দেহটিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে এবং একটা নির্দিষ্ট আকার দিতে সাহায্য করে। গৃহের যেরূপ ইট, দেহের সেইরূপ অস্থি। একখানি বিরাট ইট-দ্বারা যেমন একটি বাড়ি তৈয়ারি হয় না, সেইরূপ একখানি অস্থি দিয়া মানুষের দেহ নির্মিত হয় না। শুধু মানুষেরই বা বলি কেন, ছোট-বড় কোনো জীবেরই দেহ গঠিত হইতে পারে না। কঙ্কাল অর্থ বিভিন্ন আকারের অস্থি বা হাড়ের সমষ্টি। টুক্‌রা টুক্‌রা হাড় এমনভাবে গাঁথা বা বাঁধা আছে যে, আমাদের

বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে স্বচ্ছন্দে নাড়ানো-চাড়ানো-গুটানো-বাড়ানো-উঠানো-নামানো যায়।

কঙ্কাল না থাকিলে আমরা প্রত্যেকেই মাংসপিণ্ডময় শিশু-ভগীরথ হইয়া এক জায়গায় পড়িয়া থাকিতাম; নতুবা কৃমি বা কেঁচোর মত মাটীতে শুইয়া বা হামা টানিয়া অতি কষ্টে কিছুটা চলাফেরা করিতে পারিতাম। অস্থিগুলি আমাদের দেহটিকে শুধু খাড়া রাখিতেই সাহায্য করে—এরূপ নহে। ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, পাকস্থলী, অন্ত্র, মস্তিষ্ক প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় সুকোমল যন্ত্রগুলিকে ঢাকিয়া রাখে এবং বাহিরের ছোটখাটো আঘাত হইতে রক্ষা করে। অস্থিগুলির বাহ্যাংশ অত্যন্ত কঠিন হইলেও অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা এবং তাহার মধ্যে মজ্জা নামক একপ্রকার কোমল বস্তু প্রস্তুত হইয়া সঞ্চিত থাকে। মজ্জা হইতেই রক্তের লোহিতকণিকাসমূহ নিত্য প্রস্তুত হইতেছে।

মনুষ্য-শরীরে ছোট বড় সরু মোটা গোল চ্যাপ্টা মোট ২০৭ খানি হাড় আছে। তন্মধ্যে মাথার বাইশখানি ও মেরুদণ্ডের তেত্রিশখানি হাড় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, মাথার হাড়গুলি আমাদের মনের মন্ত্রী মস্তিষ্কটিকে আবৃত করিয়া রাখে। তারপর, মেরুদণ্ডটির টুকরা হাড়গুলি উপর্যুপরি ঈষৎ-তরঙ্গায়িতভাবে সজ্জিত হইয়া মাথার পিছনের হাড় হইতে মলদ্বারের ঊর্ধ্বদেশ পর্যন্ত পৃষ্ঠদেশের মধ্যভাগ দিয়া প্রলম্বিত থাকে। মেরুদণ্ড আছে বলিয়াই আমরা খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে ও চলাফেরা করিতে পারি। ইহাকে ইচ্ছামত খানিকটা সোজা করা ও সামনে-পিছনে বাঁকানোও যায়। ইহার প্রত্যেক অস্থিখণ্ডের নাম কশেরুকা।

কশেরুকার দেহের এক প্রান্তে একটি চ্যাপ্টা নিরেট প্রায়-গোলাকার অংশ এবং উহার অন্য প্রান্তের তিন দিকে তিনটি প্রবর্ধিত সূচালো অংশ আছে; মাঝামাঝি জায়গায় একটি ছোট ছিদ্র আছে। কশেরুকাগুলি পর পর সাজানো থাকে বলিয়া উহার ছিদ্রগুলি একটি লম্বা নালী প্রস্তুত করে। এই নালীর মধ্য দিয়া একটি সরু দড়ির মত নার্ভগুচ্ছ নিতম্বপ্রান্ত পর্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। এই নার্ভগুচ্ছের নাম সুষুম্নাকাণ্ড। ইহার পরিচয় আপনারা যথাস্থানে পাইবেন।

আমাদের কঙ্কালের উপরে নানা আকারের পেশী স্তরে স্তরে সজ্জিত তাহা আপনারা জানেন। পেশীগুলির ভাঁজের মধ্য দিয়া, উপর দিয়া ও তলা দিয়া শিরা-ধমনী-নার্ভ অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দেহের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশটিতে পর্যন্ত বিসর্পিত রহিয়াছে। পেশীগুলির উপরে সামান্য পুরু একটা চর্বির স্তর ও সর্বোপরি দুইটি চর্মের পর্দা-দ্বারা আমাদের সারা দেহটি আবৃত থাকে।

এইখানে আপনাদিগকে মনে করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের দেহে দুই প্রকার পেশী আছে। এক প্রকার পেশী আমাদের আজ্ঞাধীন, যেগুলিকে আমরা

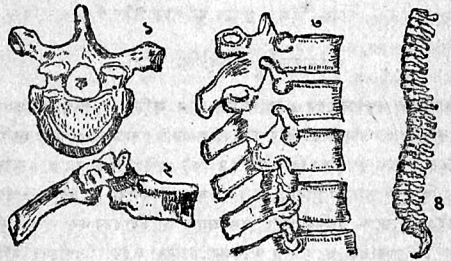

১। মানুষের মেরুদণ্ডের একখানি চিৎ-করা কশেরুকা। মাঝে শিঙের মত অংশটি পিঠের বাহিরে টিপিলে টের পাওয়া যায়। ক-চিহ্নিত ছিদ্রের মধ্য দিয়া সুষুম্নাকাণ্ড চলিয়া যায়। ২। পার্শ্ব হইতে একখানি কশেরুকা যেরূপ দেখায়। ৩। পর-পর বসানো পাঁচখানি কশেরুকা। ৪। পিঠ সোজা করিলে এক পাশ হইতে মেরুদণ্ডটি যেরূপ দেখায়।

ইচ্ছামত নাড়িতে-চাড়িতে, প্রসারিত করিতে, গুটাইতে, তুলিতে, নামাইতে পারি। চলাফেরা, উঠা-বসা, লাফানো, নাচা, দৌড়ানো, চিবানো, গেলা, হাসা, কাঁদা, চোষা, চোখ চাওয়া, চোখ বোজা, কথা বলা, গান গাওয়া, লেখাপড়া করা প্রভৃতি হাজার রকমের ক্রিয়া আমরা দুই শতাধিক আজ্ঞাধীন পেশীর দ্বারা সাধন করি। আবার আর এক প্রকার মসৃণ পেশী আছে যাহারা আমাদের আদেশের অপেক্ষা করে না, আপনা-আপনি কাজ করিয়া যায়।

এইরূপ স্বাধীন পেশীসমূহ-দ্বারা আমাদের যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতি সুকোমল ও অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলি গঠিত। এই সকল যন্ত্রের কাজ আমরা ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিয়া দিতে পারি না।

এখন, সমগ্র দেহের আজ্ঞাধীন ও স্বাধীন পেশীদের দ্বারা আমরা যে প্রতিনিয়ত রকমারি কাজ করিতেছি এবং এই সকল কাজের মধ্য দিয়া আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছি, এই কাজগুলি কোন্ শক্তিবলে সাধিত হয়? এগুলি করায় কে? আমাদের সব কাজই মন করায় সন্দেহ নাই। তাহার উপরে যদি আর এক ধাপ উঠিতে চান তো বলিতে পারেন—জীবন-দেবতা বা হৃষীকেশ করান। আমরা কিন্তু এ পুস্তকে মন পর্যন্ত উঠিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

আভ্যন্তরীণ্ যন্ত্রগুলির কথা

আমাদের বক্ষোগহ্বরের প্রায় সবটুকু স্থান জুড়িয়া পাশাপাশি প্রকাণ্ড দুইটি ফুসফুস ও তাহাদের প্রায় মাঝখানে একটি করমুষ্টির আকারের হৃৎপিণ্ড রহিয়াছে। বাম ফুসফুসের দিকে হৃৎপিণ্ড একটু বেশী হেলিয়া থাকে। ফুসফুস দুইটির কি কাজ তাহা আপনারা বোধ হয় সকলেই জানেন। ইহারা প্রশ্বাস-বায়ু হইতে অক্সিজেন টানিয়া লইয়া রক্তস্রোতে ছাড়িয়া দেয় এবং রক্ত হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য আবর্জনা টানিয়া লইয়া নিঃশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দেয়। প্রতি মিনিটে ১৮ বার এইভাবে শ্বাসক্রিয়া চলিতে থাকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত।

হৃৎপিণ্ডের মধ্যে চারটি ছোট ছোট কামরা আছে। ডান দিকের দুইটি কামরার মধ্যে অনবরত শরীরের ময়লা রক্ত আসিয়া পড়ে ও তথা হইতে অক্সিজেন দ্বারা সমৃদ্ধ হইবার জন্য ফুসফুস দুইটির অভ্যন্তরে চলিয়া যায়। সেখানে রক্তস্রোত ক্রমাগত ফুসফুস্ দুইটির কোটি কোটি সূক্ষ্ম বায়ুকোষ-গাত্রের সংস্পর্শে আসে। রক্তস্রোত অক্সিজেন গ্যাসে পরিপূর্ণ হইয়া হৃৎপিণ্ডের বাম-দিকের দুই কামরার মধ্যে ফিরিয়া আসে ও তথা হইতে বহু ধমনী-সাহায্যে শরীরের সর্বত্র প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ড মিনিটে অন্ততঃপক্ষে ৭২ বার সঙ্কুচিত ও স্পন্দিত হইয়া রক্ত-বিতরণের কার্য পরিচালনা করে।

উদর-গহ্বরে যে যে যন্ত্র আছে, তাহার অধিকাংশগুলির নাম আপনাদের নিকট নিশ্চয়ই অজানা নয়। প্রথমেই 'মধ্যচ্ছদা' নামক বক্ষঃপ্রাচীরের ঠিক নীচেই মাঝামাঝি স্থানে পাকস্থলীর নাম করা যাক্। আমাদের প্রতি গ্রাস চর্বিত খাদ্য গিলিত হইবার পর এই থলিটির মধ্যে পৌঁছায়। মাছ-মাংস, ছানাজাতীয় খাদ্য ও দুধ খানিকটা পরিমাণে এইখানে পরিপাকপ্রাপ্ত হয়। পাকস্থলীর বাঁ দিকে প্লীহা ও দক্ষিণ দিকে যকৃত। যকৃতের অধিকাংশ দেহ নীচেকার গুটি দুই-তিন পঞ্জরাস্থি-দ্বারা ঢাকা থাকে। প্রায় তের হাত লম্বা 'ক্ষুদ্রান্ত্র' নামক কুণ্ডলী-পাকানো সরু ও নরম একটি নলের সহিত পাকস্থলীর তলদেশের ছিদ্রমুখ সংযুক্ত। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশের ইংরাজী u য়ের মত বাঁকানো জায়গাটিতে কয়েক প্রকার রস ক্ষরিত হইয়া আমাদের খাদ্যগুলিকে প্রায় নিঃশেষে পরিপাক করিয়া ফেলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ প্রান্তের সহিত একটু বেশী চওড়া 'বৃহদন্ত্র' সংলগ্ন। এইস্থানে খাদ্যের অপরিপাকপ্রাপ্ত ও অসার অংশ খানিকটা জলবর্জিত ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া, ধীরে ধীরে মলকোষ্ঠের দিকে অগ্রসর হয়।

যকৃতের গায়ে থাকে ক্ষুদ্র পিত্তস্থলী, উহা হইতে পিত্ত ক্ষরিত হইয়া ঘৃততৈল-প্রধান খাদ্য-পরিপাকে সাহায্য করে। পাকস্থলীর তলায় থাকে অগ্ন্যাশয় বা ক্লোমযন্ত্র (Pancreas); ইহা হইতে তিন প্রকার জারক রস ক্ষরিত হইয়া সর্বজাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ করিয়া দেয়। আমাদের কোমরের মাঝখানে মেরুদণ্ডের যে অংশটি আছে, তাহার দুই পার্শ্বে বর্বটি বীজের মত আকৃতি-সম্পন্ন প্রায় চারি ইঞ্চি করিয়া লম্বা দুইটি প্রায় ফাঁপা যন্ত্র আছে; ইহাদের নাম 'বৃক্ক'। ইহাদের মধ্যে অসংখ্য সরু সরু নল ভাঁজ করা থাকে। ইহারা কতকটা ছাকনির কাজ করে। এইখানে অবিশ্রান্ত রক্তপ্রবাহ আসিয়া রক্তের ভিতর হইতে কিছু জলীয়াংশ, নানাবিধ লবণ, ইউরিক অ্যাসিড, ইউরিয়া প্রভৃতি দূষিত পদার্থ ছাঁকিয়া ফেলে; তাহা বিন্দু বিন্দু করিয়া দুইটি বক্র নল দিয়া গড়াইয়া মূত্রস্থলীতে আসিয়া জমা হয়। বেশী পরিমাণ জমা হইলেই মূত্রত্যাগের বেগ উপস্থিত হয়।

ধমনী, শিরা, জালক

এ কথাও বোধ হয় আপনাদের অনেকের নিকট জানা আছে যে, অক্সিজেন-বহুল পরিষ্কৃত রক্ত ধমনী নামক (artery) রক্তনালী ও কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি আবর্জনাপূর্ণ রক্ত শিরা (vein) নামক রক্তনালী বহন করে ; সেইজন্য শিরাগুলি বাহির হইতে কতকটা নীলাভ রঙের দেখায়। ধমনী ও শিরা পেন্সিল অপেক্ষা মোটা হইতে সূতার মত সরু নানা ব্যাসের আছে এবং উহাদের অসংখ্য শাখাপ্রশাখা শরীরের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। যেখানে একটি ধমনী ক্রমশঃ সরু হইয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে চুলের চেয়েও সরু সরু অতি ক্ষুদ্রাকারের এক-একটি জালের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐগুলিকে 'জালক' (capillaries) বলা হয়। এই অসংখ্য জালকগুলি রক্তের মধ্য হইতে অক্সিজেন ও পুষ্টি টানিয়া লইয়া আমাদের প্রত্যেক দেহকোষকে যোগায় এবং তাহাদের মধ্য হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি আবর্জনা সংগ্রহ করিয়া রক্তে মিশাইয়া দেয়। কাজেই একটি জালকের একাংশে থাকে পরিষ্কৃত রক্ত, অন্যাংশে থাকে অপরিষ্কৃত রক্ত। এই অংশের জালকই ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া একটি শাখা-শিরায় পরিণত হয় এবং শাখা-শিরাটি একটি বড় শিরার সহিত যুক্ত হয়।

সর্বাপেক্ষা বড় দুইটি শিরা—একটি তলার দিক্ হইতে, অন্যটি মাথার দিক্ হইতে বহুসংখ্যক শিরা হইতে অপরিষ্কৃত রক্ত সংগ্রহ করিয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিকের উপরকার কুঠুরির মধ্যে অবিশ্রান্ত পৌঁছাইয়া দিতেছে। এখানে আর একটা কথা বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, আমাদের সর্বজাতীয় খাদ্যের পরিপাক-প্রাপ্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ ও পান-করা জল—এমন কি সর্বপ্রকার ঔষধ শেষ পর্যন্ত রক্তের মধ্যেই মিশিয়া যায় ; রক্তই শরীরের যাহা কিছু পুষ্টি বহনাবহন করে। অক্সিজেন রক্তের মধ্যে থাকিয়া খাদ্যের সারাংশের কতকটা পরিমাণ ক্রমাগত মৃদুভাবে পুড়াইয়া শরীরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করিতেছে ; আবার ঐ তাপের কিয়দংশ কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। এই কর্মশক্তিকে কাজে লাগাইবার কর্তা হইল মন ও মস্তিষ্ক।

মনের মন্ত্রী হইল মস্তিষ্ক তাহা আপনাদিগকে আগেই বলিয়াছি। ভিতর-

বাহিরের হাজার রকমের কাজ কি একা মন্ত্রী মহাশয় করিতে পারেন? ভারতবর্ষ বা পশ্চিম-বাংলা কি লালবাহাদুর শাস্ত্রী বা প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের একার দ্বারা চালানো সম্ভবপর? ইঁহাদের সাহায্যের জন্য সহকারী মন্ত্রী আছেন, লোক-সভা, বিধান-সভা, বিচারপতিরা, শত শত ম্যাজিস্ট্রেট, দারোগা, পুলিশ, কেরানি, চৌকিদার, চাপরাশি, পেয়াদা, আর্দালি ইত্যাদি আছে ও আছেন। মস্তিষ্ক কাহাদের দিয়া এই বিরাট ও জটিল দেহরাষ্ট্র চালায়? এক কথায়, দুই শ্রেণীর নার্ভদের দিয়া।

নার্ভের স্বরূপ

বলা বাহুল্য 'নার্ভ' শব্দটি ইংরাজী। এক-একজন বিদ্যাদিগ্‌গজ ইহার এক-একরূপ প্রতিশব্দ বা পরিভাষা করিয়াছেন, কোনটাই কিন্তু নার্ভ শব্দটির মত অর্থব্যঞ্জক বা সঠিক ভাবদ্যোতক নহে। অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া একদল পণ্ডিত নার্ভ বুঝাইতে 'স্নায়ু' শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু তাহা যে অশুদ্ধপ্রয়োগ, প্রত্যেক নির্ভরযোগ্য বাংলা অভিধানে সে কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে। 'স্নায়ু' অর্থে ইংরাজী sinew বুঝায় ; উহা একপ্রকার মাংসময় পাতলা ফিতার মত পদার্থ, মাংসপেশীর এক-এক প্রান্ত অস্থির সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখে। স্নায়ুর সহিত নার্ভের আকৃতি বা প্রকৃতির কোন মিলই নাই, সম্পর্কও নাই ; তথাপি অদ্যাবধি কোনো কোনো জাঁদরেল মনস্তাত্ত্বিক গায়ের জোরে স্নায়ুর অপব্যবহার করিতেছেন এবং অবাধে পাঠ্য-পুস্তকে স্থান দিয়া ছাত্রছাত্রীদিগকে ভ্রান্তির পথে চালনা করিতেছেন। আমরা স্বল্পবুদ্ধি অতি-সাধারণ পর্যায়ের লেখক বলিয়া আগাগোড়া ইংরাজী নার্ভ শব্দটিই ব্যবহার করিয়া যাইব। একদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-সংস্থাও নার্ভকে সসম্মানে যথাবৎ তালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন।

এইবার নার্ভের পরিচয় একটু বিস্তৃতভাবে আপনাদের নিকট দিতে হইবে। তারপর মস্তিষ্ক লইয়া মাথা ঘামাইব। আমাদের দেহের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশে যেরূপ শিরা, ধমনী, তাহাদের শাখা-প্রশাখা ও জালক ছড়াইয়া রহিয়াছে, নার্ভসমূহও সেইরূপ বিস্তৃত রহিয়াছে। নার্ভগুলি স্থলবিশেষে সেলাইয়ের

সুতার ন্যায় সরু, আবার সুতালির ন্যায় মোটা; কতকগুলি সাদা, কতকগুলি হরিদ্রাভ। সাধারণতঃ একটি নার্ভ কয়েকটি নার্ভকোষের একত্র সমন্বয়ে তৈয়ারি। এখন নার্ভকোষের পরিচয় পাইলেই আমরা নার্ভের পরিচয় পাইব, কারণ একটি নার্ভকোষই হইল উহার ক্ষুদ্রতম একক (unit)।

আপনাদিগকে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের দেহটি অতি ক্ষুদ্র নানা আকারের অসংখ্য দেহকোষ (cell) দিয়া তৈয়ারি। দেহকোষের প্রত্যেকটির মধ্যে সূক্ষ্মতম এক বিন্দু 'প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম্' নামক আঠালো পদার্থ থাকে এবং উহার মধ্যস্থলে ততোধিক সূক্ষ্ম এক কণা প্রাণকেন্দ্র বা 'নিউক্লিয়াস্' থাকে। আপনারা এ কথাও জানেন যে, দেহকোষ একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া আপনা-আপনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। এইভাবে তাহারা বংশবিস্তার বা আপনাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি করে, কাজেই ভ্রূণ অবস্থায় একটি জীবের যতগুলি দেহকোষ থাকে, উহার শৈশবে তাহা অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বাড়িয়া যায়; আবার তদপেক্ষা আরো বহু গুণ বাড়ে যৌবনে।

একটি নার্ভকোষের মধ্যেও প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম্ ও নিউক্লিয়াস আছে সত্য, কিন্তু সকল শ্রেণীর দেহকোষ অপেক্ষা ইহাদের আকার ও প্রকার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রত্যেক দেহকোষের যেরূপ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়া স্বভাব, নার্ভকোষের কিন্তু সেরূপ স্বভাব নহে। মানুষের জন্মকাল হইতেই নার্ভকোষের সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং ইহারা আমরণ সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় না। তবে হ্যাঁ, বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহারা আকারে বড় হয়। একটি নার্ভকোষ যদি একেবারে অকেজো বা নিষ্প্রাণ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে সক্রিয় করা বা তাহার স্থান অন্যের দ্বারা পূরণ করা একেবারে অসাধ্য বলিলেই চলে। অবশ্য তাহার কাজ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য নার্ভকোষ স্বচ্ছন্দে চালাইয়া দিতে পারে।

নার্ভকোষের বিশেষ নাম হইল **নিউরন্** (Neuron)। শরীরে দুই জাতীয় নার্ভকোষ দেখা যায়। একজাতীয় নার্ভকোষের একদিকে সরু সুতার ন্যায় লম্বা একটি উদ্গত অংশ থাকে। ইহার কোনটা লম্বে এক ইঞ্চির কুড়ি ভাগের এক ভাগ, আবার কোনটা প্রায় সওয়া-দুই হাত। ইহার নাম **অ্যাক্সন্** (Axon)। প্রত্যেক অ্যাক্সনই পাতলা সাদা চর্বির আবরণ দিয়া মোড়া

থাকে। আসল নার্ভকোষটি কিন্তু দেখিতে ঈষৎ ধূসর রঙের। অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলি নিউরন্ ও অ্যাক্সন্ গায়ে গায়ে লাগিয়া একটি সুতালির মত আকার ধারণ করে। স্মরণ রাখিবেন প্রত্যেক অ্যাক্সনের শেষ প্রান্তটি কয়েকটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁকাবাঁকা শাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে।

একটি নিউরনের একদিকে থাকে একটি অ্যাক্সন্। উহার বিপরীত দিকে কয়েকটি সুতার আঁশের মত সরু বেঁটে বেঁটে উদ্গত অংশ থাকে; উহাদের নাম **ডেন্‌ড্রন্স্** বা **ডেন্‌ড্রাইট্‌স্** (Dendrons, Dendrites)। এগুলিও শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত হয়। এগুলিও দেখিতে ধূসর বর্ণের। একটি নিউরনের ডেন্‌ড্রাইট্‌গুলি পার্শ্বের অপর একটি নিউরনের অ্যাক্সন্-প্রান্তস্থ শাখাগুলির সহিত প্রায় বিজড়িত ও সংলগ্ন হইয়া থাকে। 'প্রায়' বলিতেছি এইজন্য যে, উহাদের উভয়ের সন্ধিস্থলে একটা দুর্নীরিক্ষ্য ব্যবধান থাকে। এই বিযুক্ত সন্ধিস্থলকে ইংরাজীতে বলা হয় **সিন্যাপ্স্** (Synapse)।

আর একপ্রকার নিউরন্ আছে যাহাদের কোনো ডেন্‌ড্রাইট্‌স্ নাই, কেবল দুই দিকে দুইটি অ্যাক্সন্ আছে।···নিউরনের কাজ কি? এক কথায় উত্তেজনা বা শক্তি পরিবহন করা। তারের মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি পরিবহনের সহিত ইহার কিছুটা তুলনা দেওয়া চলিতে পারে; কিন্তু নার্ভ-বাহিত উত্তেজনা বৈদ্যুতিক প্রবাহগতি অপেক্ষা বহু সহস্র গুণ মন্থর। নার্ভবাহিত উত্তেজনা দুই প্রকার আছে। একপ্রকার উত্তেজনা বাহির হইতে ভিতরে যায়; আর এক প্রকার উত্তেজনা ভিতর হইতে বাহিরের দিকে আসে। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়-দ্বারা বহির্জগৎ হইতে আমরা যে সকল জ্ঞান বা অনুভূতি লাভ করি তাহা এক শ্রেণীর নার্ভ দ্বারা মস্তিষ্কে ও সুষুম্নাকাণ্ডের দিকে পরিবাহিত হয়। ঐ শ্রেণীর নার্ভদিগকে **সংবেদনবাহী** বা **সংজ্ঞাবাহী** (sensory) **নার্ভ** বলে। এই সকল নার্ভের বা নিউরনের ডেনড্রাইট্‌স্ থাকে না, দুই দিকে দুইটি অ্যাক্সন্ মাত্র থাকে। মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ড হইতে যে সকল নার্ভ আমাদের স্বাধীন বা আজ্ঞাধীন পেশীসমূহে প্রয়োজনমত কর্মশক্তি পরিবহন করিয়া আনে, তাহাদিগকে **চেষ্টাবাহী** বা **কর্মশক্তিবাহী নার্ভ** (motor nerves) বলা হয়। এই তথ্যটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন।

এইখানে আর একটা কথা উল্লেখ করিয়া যাওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি। উপরে যে দুই প্রকার উত্তেজনার কথা বলা হইল, উহা পরস্পর গ্রথিত নার্ভতন্তু-গুলির দ্বারা একটানা সমান বেগে ও সমান শক্তি লইয়া বাহিত হইতে পারে না; ঐ বেগ ও শক্তি পূর্বকথিত সিন্যাপ্‌স্‌গুলিতে ঈষৎ বাধাপ্রাপ্ত ও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরের নিউরনে পৌঁছিয়া ঐ বেগ ও শক্তি আবার বাড়িয়া যায়। আবশ্যক হইলে নিউরন্ কোনো উত্তেজনাগত শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি করিতেও পারে, এমন কি কোনটির গতিবেগ একেবারে বন্ধ করিয়াও দিতে পারে। আর একটা কথা বলা বাহুল্য হইলেও বলিয়া রাখি যে, যে-কোনরূপ উত্তেজনা হউক না কেন, তাহার প্রাবল্য বা গভীরতা অনুসারে নার্ভতন্তুগুলির মধ্য দিয়া উহার প্রবাহ ও গতিচ্ছন্দ দ্রুত হয় অর্থাৎ অনুভূতি বা কর্মশক্তি অভীষ্টস্থলে অপেক্ষাকৃত ত্বরায় পৌঁছে।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, একই রকমের কাজ একটানা ক্রমাগত করিয়া গেলে সুস্থ মানুষেরও শ্রান্তি ও অবসাদ আসে। কাজের গতি ক্রমশঃ কমিয়া যায়, ক্রমাগত ভুল হইতে থাকে, সমস্ত শরীর যেন এলাইয়া পড়ে। ইহার আসল কারণ হইল—অ্যাক্সন্‌গুলি ক্রমাগত খাটিতে খাটিতে পূর্বের ন্যায় তাড়াতাড়ি কর্মশক্তি বহন করিতে পারে না; তদুপরি সন্ধিস্থলগুলিতে সামান্য মাত্রায় বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়—যাহার ফলে উত্তেজনার গতি বেগ শুধু হ্রাস পায় না, যেখানে উত্তেজনা পৌঁছে (অর্থাৎ পেশীগুলিতে) সেখানেও জড়তা আসে।

চতুর্থ প্রসঙ্গ

সচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তর

এইবার **কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র** (Central Nervous system) সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু জানিতে হইবে। ইহাই হইল মনের প্রধানমন্ত্রী। যে সকল যন্ত্রদ্বারা অসংখ্য নার্ভতন্তুর সহায়তায় আমাদের শরীরের সকল প্রকার কার্য চালিত হয় এবং দেহমনের সর্বপ্রকার অনুভূতি ও ক্রিয়াশক্তি গৃহীত, বিতরিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই সকল যন্ত্রকেই একত্রে "কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র" নামে অভিহিত করা হয়। এই তন্ত্রটিকে দুইটি পৃথক সেরেস্তায় ভাগ করা যায়। একটি সেরেস্তার অন্তর্ভুক্ত আছে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড (Cerebro-spinal nervous system); আর একটি সেরেস্তার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্র (Autonomous nervous system)। আসুন, এইবার একে একে প্রত্যেক সেরেস্তার ক্রিয়াকর্তব্যের একটা মোটামুটি সন্ধান লই।

গুরুমস্তিষ্ক ও তাহার প্রধান অংশসমূহ

আমরা উপরোক্ত যন্ত্রগুলির ঠিক ততটুকুই পরিচয় লইব—যতটুকু একজন সাধারণ লোকের মনস্তত্ত্বের প্রথম ভাগ পড়িবার, বুঝিবার ও মনে রাখিবার পক্ষে অত্যাবশ্যক। পূর্বেই বলিয়াছি, মস্তিষ্ক হইল আমাদের মনের প্রধান সচিবালয়। সমগ্র মস্তিষ্কটি যেন একটি অমূল্য অলংকারের মত হাড়ের ফলক-নির্মিত পেটিকার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত। ঐ পেটিকার উপরিতল ও তিন পার্শ্বের অস্থিময় প্রাচীরকে আমরা কথ্য ভাষায় 'মাথার খুলি' বলি; সাধু ভাষায় উহাকে **করোটি** (Cranium) বলা হয়।

মস্তিষ্ক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা পিণ্ডাকারে ও তরঙ্গায়িতভাবে ভাঁজ-করা অসংখ্য ধূসর রঙের নার্ভকোষের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। মাথার খুলিটি অপসৃত করিলে সমগ্র মস্তিষ্কটি একটি মোটা ডাঁটিওয়ালা ফুলের তোড়ার মত দেখায়। কপালের হাড়ের পিছন হইতে সমস্ত মাথার চাঁদির তলদেশ জুড়িয়া মস্তিষ্কের যে অংশটি অবস্থিত, তাহার নাম **গুরুমস্তিষ্ক**

(Cerebrum)। এইটিকে প্রধানমন্ত্রীর খাস দপ্তর বলা যাইতে পারে। ইহা দেখিতে প্রায় গোলাকার, কিন্তু দুইটি সমান গোলার্ধে বিভক্ত হইয়া পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে। প্রত্যেক গোলার্ধেই আবার দুইটি করিয়া গভীর ও তীর্যক ছেদরেখা দেখা যায়। ইহাদের একটির নাম "ফিসার্ অব্ রোল্যাণ্ডো" (Fissure of Rolando), অন্যটির নাম "ফিসার্ অব্ সিলভিয়াস" (Fissure of Sylvius)।

যাহা হউক, গুরুমস্তিষ্কের মধ্যে যে ধূসর নিউরন্‌বহুল পদার্থ জোট পাকাইয়া, আকুঞ্চিত হইয়া ও বহুসংখ্যক ভাঁজ বা খাঁজের সৃষ্টি করিয়া ঠাসা রহিয়াছে, তাহার উপরিতল (Cortex) হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যে জীবের শরীরের ওজনের তুলনায় গুরুমস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত ভারী হইবে, তাহার বুদ্ধি তত প্রখর হইবে, এইরূপ একটি ধারণা এখনো কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের মনে বদ্ধমূল রহিয়াছে; কিন্তু আধুনিকতম শারীরবিদ্‌গণ এ ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। গুরুমস্তিষ্কের চারিটি পিণ্ডাকার অঞ্চল রহিয়াছে। কপালের পিছনকার অঞ্চলটিকে বলে "ফ্রণ্টাল্ লোব্," দুই কানের ও রগের পিছনের অঞ্চলটির নাম "টেম্পোর‍্যাল্ লোব্"; চাঁদির তলাকার অঞ্চলটির নাম "প্যারাইএট্যাল্ লোব্" এবং মাথার পশ্চাদ্দেশের উপরিভাগের অঞ্চলটিকে বলে "অক্সিপিটাল্ লোব্"।

এক-একদিকের এই চারিটি পিণ্ডাকার অঞ্চলের উপরিতলে ও অন্তস্তলে বিভিন্ন কেন্দ্র বিভিন্নরূপ অনুভূতি গ্রহণ করে এবং শরীরের বিভিন্ন পেশী, গ্রন্থি ও যন্ত্রগুলিতে ক্রিয়াশক্তি প্রেরণ করে। গুরুমস্তিষ্কের দুই গোলার্ধে এক জোড়া করিয়া দৃষ্টি-কেন্দ্র, স্পর্শানুভূতি-কেন্দ্র, শ্রুতি-কেন্দ্র, স্বাদ-কেন্দ্র ও ঘ্রাণ-কেন্দ্র রহিয়াছে। তাহা ছাড়া নানা স্থানের পেশী-উদ্দীপক কয়েকটি কেন্দ্র আছে। দেহের সর্বাংশ হইতে, সর্ব ইন্দ্রিয় হইতে প্রলম্বিত অসংখ্য নার্ভতন্তু গুরু-মস্তিষ্কের এক-একটি কেন্দ্রে আসিয়া সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। আবার এখানকার কতকগুলি কেন্দ্র হইতে অসংখ্য নার্ভতন্তুগুচ্ছ বাহির হইয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতে করিতে শরীরের প্রত্যেক পেশীতন্তুর মধ্যে ও চর্মের নিম্নদেশে গিয়া নিঃশেষিত হইয়াছে।

গুরুমস্তিষ্কের এক এক জোড়া কেন্দ্রে বহির্জগৎ হইতে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের অনুভূতি শৈত্যাতপ-আনন্দ-বেদনার বোধ যেরূপ আসিয়া পৌছিতেছে, আবার নিকটবর্তী এক-একটি কেন্দ্র হইতে তেমনি নানা অংশের পেশীসমূহে কর্মশক্তি প্রেরিত হইতেছে। দুইটি চক্ষু দেখে না, গুরুমস্তিষ্কের দুইটি দৃষ্টি-কেন্দ্রই দেখে; কর্ণ শোনে না, গুরুমস্তিষ্কের দুইটি শ্রুতি-কেন্দ্রই শোনে। সুন্দর সুস্থ একজোড়া চক্ষু থাকিলেও গুরুমস্তিষ্কের দৃষ্টি-কেন্দ্রদ্বয় যদি রুগ্ন বা অকর্মণ্য থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ চক্ষুধারী ব্যক্তিটি কোন জিনিসই দেখিতে পাইবে না; ফলতঃ সে অন্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার আপনাদিগকে জানাইয়া রাখি। বদনমণ্ডল ব্যতীত সারা দেহের দক্ষিণ অর্ধাংশের পেশীগুলির মধ্যে ও চর্মের তলায় যে-সকল সংবেদনবাহী ও চেষ্টাবাহী নার্ভ্ বিতত রহিয়াছে, সেগুলির তন্তুগুচ্ছ মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া বাম দিকে বেঁকিয়া ঐ দিক্‌কার এক-একটি উদ্দিষ্ট সংবেদন- ও চেষ্টা-কেন্দ্রে গিয়া শেষ হইয়াছে। আবার দেহের বাম অর্ধাংশের নার্ভ-তন্তুগুলি ঠিক এইভাবে মস্তিষ্কের দক্ষিণ দিকের কেন্দ্রগুলিতে আসিয়া শেষ হইয়াছে। মস্তিষ্কের পশ্চাদ্দেশের থ্যালামাস নামক একটা জায়গায় শরীরের দক্ষিণ ও বাম দিকের নার্ভতন্তুগুচ্ছগুলি পরস্পর পরস্পরকে প্রায় ছুঁইয়া তারপর বিপরীত দিকে অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে বেঁকিয়া গিয়াছে—যেরূপ করিয়া রেলের লাইন বা টেলিফোনের তারগুলি পাশাপাশি আসিতে আসিতে এক জায়গায় তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই দিকে বাঁকিয়া যায়। এইবার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাপারটা আপনাদের নিকট আরো খানিকটা স্পষ্ট করি।

প্রথমেই ধরা যাক, আমাদের দৃষ্টির কথা। ইহা একটি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত বলিয়া আগেই চক্ষুর কথাটা বলিয়া লই। একসঙ্গে আমাদের দক্ষিণ ও বাম চক্ষু কোনো ছবি আলোকের সহায়তায় দেখে; মাঝখানের দৃষ্টিক্ষেত্রটুকু স্পষ্টতর কেন হয় বুঝিতে পারিতেছেন? কারণ ঐ স্থানের উপর দুই চক্ষেরই দৃষ্টি একসঙ্গে পড়ে। আচ্ছা, আমাদের দুই চক্ষুর অভ্যন্তরে 'রেটিনা' নামক রূপগ্রাহী নার্ভজালের উপর বাহিরের যে ছবিটি আসিয়া যুগপৎ প্রতিফলিত হইল, তাহার অনুভূতি নার্ভতন্তু তৎক্ষণাৎ বহন করিয়া লইয়া গেল কোথায়?

—নিশ্চয়ই গুরুমস্তিষ্কের দৃষ্টি-কেন্দ্রে। দক্ষিণ চক্ষুর দক্ষিণার্ধের ও বাম চক্ষুর দক্ষিণার্ধের রেটিনা-জাল কর্তৃক গৃহীত রূপের অনুভূতি গুরুমস্তিষ্কের দক্ষিণ দিকের দৃষ্টি-কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার, যুগপৎ দক্ষিণ চক্ষুর বামার্ধের ও বাম চক্ষুর বামার্ধের রেটিনা-জাল কর্তৃক গৃহীত রূপের অনুভূতি বাম দিকের দৃষ্টিকেন্দ্রে পৌছে। তখনি আমাদের দর্শনের পূর্ণ বোধ জন্মে। তাহা হইলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, দক্ষিণ দিকের দৃষ্টিকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হইলে দক্ষিণ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি পুরাপুরি নষ্ট হয় না, দক্ষিণ ও বাম চক্ষু উভয়েরই দক্ষিণ অর্ধাংশের অন্ধতা দেখা দেয়, কিন্তু দুই চক্ষুরই বাম দিকের অর্ধাংশ সুস্থ সমর্থ থাকে। কিন্তু কর্ণরন্ধ্র, নাসারন্ধ্র প্রভৃতির যেদিকে সংবেদন প্রবেশ করে, সেই দিকেরই একটি অনুভূতি-কেন্দ্রে উহা গিয়া পৌছায়।

আবার অন্যান্য ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। ধরুন, কেহ আপনার বাম করতল নিষ্পেষণ করিল। এই স্পর্শবোধ চর্মনিম্নে স্থানীয় স্পর্শবাহী নার্ভতন্তু কর্তৃক নিমেষে বাহিত হইয়া গুরুমস্তিষ্কের দক্ষিণ দিকের স্পর্শকেন্দ্রে গিয়া ধাক্কা মারিল। তখনই আমাদের সত্যকার স্পর্শবোধ জন্মিল। কিন্তু অনুরূপভাবে কেহ যদি আমাকে দক্ষিণ গালে একটি সজোরে চড় কষাইয়া দেয়, তাহা হইলে ঐ স্থানের বেদনাবোধ বাহিত হইয়া এক লহমায় পৌছিবে গুরুমস্তিষ্কের দক্ষিণ দিকেরই বেদনা-কেন্দ্রে। বেদনা-বোধের সঙ্গে সঙ্গে আমার 'উঃ' বলিয়া গালে হাত বুলাইতে নিশ্চয়ই ইচ্ছা হইবে। তৎক্ষণাৎ গুরুমস্তিষ্কের ঐ দিকেরই একটি চেষ্টাকেন্দ্র হইতে নার্ভতন্তুর সহায়তায় কণ্ঠযন্ত্র ও জিহ্বার পেশীগুলিকে সক্রিয় হইয়া 'উঃ' শব্দ উচ্চারণ করিবার শক্তি এবং বাম দিকের একটি চেষ্টা-কেন্দ্র হইতে দক্ষিণ হস্তের কতকগুলি পেশীকে গুটাইয়া ও কতকগুলিকে বিস্তারিত করিয়া বাম গণ্ডে সজোরে হাত বুলাইবার শক্তি প্রেরিত হইবে।

'থ্রম্বসিস্' নামক মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া, কাহারো কাহারো একদিকের একটি বা একাধিক অঙ্গ সংবেদনশূন্য বা অসাড় হইয়া যায়। কেন হয় বলুন তো? যে দিকটি অসাড় হইয়া যায়, সেই দিকের অনুভূতি ও চেষ্টাবাহী নার্ভগুলি অকেজো হইয়া যায় বলিয়া ও/বা তাহার বিপরীত দিকের

গুরুমস্তিষ্কের গোলার্ধে অবস্থিত এক বা একাধিক সংবেদনকেন্দ্র ও চেষ্টাকেন্দ্র নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় বলিয়া।

এই স্থলে আর একটা কথা উল্লেখ করিয়া যাই যে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পেশী ও চর্মে কর্মশক্তি দানের এক-একটি পৃথক কেন্দ্র আছে। যেমন, পায়ের আঙুলগুলিতে, পায়ের পাতায়, পাকস্থলীতে, বক্ষস্থলে, বাহুদ্বয়ে, হাতের অঙ্গুলিগুলিতে, পৃষ্ঠে, কাঁধে, কনুই দুইটিতে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে, মুখমণ্ডলে, জিহ্বায়, শ্বাসনালীতে ও অন্যান্য যন্ত্রে চেষ্টা বহন করিবার জন্য গুরুমস্তিষ্কের মাঝামাঝি জায়গায় অর্থাৎ প্যারাইএটাল লোবে ফিসার অব্ রোল্যাণ্ডো ও ফিসার অব্ সিলভিয়ার মধ্যবর্তী স্থানের উপরিতল দিয়া এক-একটি কেন্দ্র পর পর বিন্যস্ত রহিয়াছে।

গুরুমস্তিষ্কের সম্মুখের অংশের অর্থাৎ কপালের পশ্চাদ্‌ভাগস্থ অংশের ক্রিয়াশীলতা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা এতকাল অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। বহু সভ্য দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত রহিয়াছে যে, এই অঞ্চলটি মানুষের চিন্তা, বুদ্ধি, বিদ্যা, স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতির কেন্দ্র। বর্তমানে কোনো কোনো পণ্ডিত ইহা কতকাংশে সমর্থন করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই অঞ্চল মানুষের চরিত্রের প্রধান কেন্দ্র। এই অঞ্চলের ধূসরবস্তু যত অধিক পরিমাণে থাকিবে ও তরঙ্গায়িত হইবে, ততই তাহা মানুষকে শুধু চিন্তাশীল করিবে না, বিবেকবান ও উন্নতচেত দৃঢ়-চরিত্রবান্ করিবে। দেশ-বিদেশের বহু মনীষী ও উদ্ভাবকদের উচ্চ ও প্রশস্ত ললাট দেখিতে পাওয়া যায়।

কপালের বিষাক্ত টিউমারে, কল-কারখানায় বা রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি-গোলার আঘাতে যাহাদের গুরুমস্তিষ্কের সম্মুখভাগের খানিকটা উড়িয়া বা নষ্ট হইয়া যায়, তাহারা আরোগ্যলাভের পর একেবারে ভিন্ন চরিত্রের মানুষে পরিণত হইয়া যায়। অতি সৎ অধ্যবসায়ী লোকও অতঃপর শঠ, মিথ্যাবাদী, অমিতব্যয়ী, অলস, অশ্লীলভাষী ও ভ্রমপ্রবণ হইয়া পড়ে।

গুরুমস্তিষ্কেরই এক-একটি অনাবিষ্কৃত ও অনুমিত কেন্দ্রে মনের বিভিন্নরূপ ক্রিয়া সাধিত হয়। আত্মসংবিৎ, অহংভাব, ইচ্ছা, ভাবনা, অধ্যবসায়, বিচার-বুদ্ধি, বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে আসক্তি ও অনাসক্তি, সঙ্কল্প, অনুভূতি-গ্রহণ ও শক্তি-প্রেরণের মধ্যে সমন্বয়-সাধন, গৃহীত জ্ঞানের সংরক্ষণ, শিক্ষাসাপেক্ষ আচরণ ও

অভ্যাসের ছাপ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগের সামর্থ্য, ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি ব্যাপার এই সকল কেন্দ্রের সক্রিয়তার ফলে সম্ভবপর হয়। তাহা ছাড়া, গুরুমস্তিষ্কে এমন একটি বা একাধিক অঞ্চল আছে যাহা দেহের সকল প্রকার ক্রিয়া সুরু করিবার, চালাইয়া যাইবার ও শেষ করিবার প্রেরণা দেয়। সর্বোপরি ইহা লঘুমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক, সুষুম্নাশীর্ষক ও সুষুম্না-কাণ্ডের উপর কর্তৃত্ব করে।

একটা আবশ্যকীয় তথ্য আপনাদিগকে এই স্থানে জানাইয়া রাখি। গুরু-মস্তিষ্কের অভ্যন্তর হইতে—অর্থাৎ দুই গোলার্ধ হইতে বারো জোড়া **করোটি**

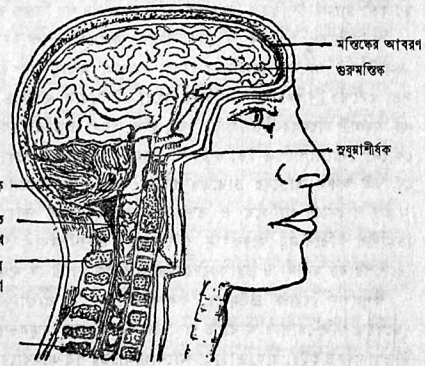

নার্ভ (Cranial nerves) বাহির হইয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে আস্তৃত রহিয়াছে। ইহাদের কয়েক জোড়া আমাদের চক্ষু ও নাসিকায় শাখাপ্রশাখা-সমেত বিস্তৃত। কয়েক জোড়া মস্তিষ্কের পেশী ও উপরকার চর্মে, মুখবিবরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীমধ্যে বিসারিত। ইহাদের মধ্যে এক জোড়ার নাম **ভেগাস্ নার্ভ**। ইহারা প্রচুর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া ফুসফুস দুইটির ও পাকস্থলীর সারা গাত্রে ছড়াইয়া রহিয়াছে। 'ভেগাস্' অর্থ ভ্রাম্যমাণ, ভবঘুরে।

গুরুমস্তিষ্কের পিছনের অংশে ও উহার নিম্নভাগ ছুঁইয়া **লঘুমস্তিষ্ক** বা **অনুমস্তিষ্ক** (Cerebellum) অবস্থান করে। ইহাও দুইটি প্রায়-গোলার্ধে বিভক্ত হইয়া সুষুম্নাশীর্ষক নামক যন্ত্রের পশ্চাদ্‌ভাগে লাগিয়া রহিয়াছে। গুরু-মস্তিষ্কের ন্যায় ইহাও অসংখ্য ধূসরবর্ণ নিউরন্-দ্বারা গঠিত এবং উহারই ন্যায় ঢেউ-খেলানো ও প্রচুর খাঁজবিশিষ্ট। ইহা অবশ্য গুরুমস্তিষ্কের তুলনায় অনেক ছোট, কিন্তু শরীর-রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। শরীরের প্রায় সমস্ত প্রধান নার্ভতন্তু এই লঘুমস্তিষ্ক ভেদ করিয়া গুরুমস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে। এই মস্তিষ্কটির প্রধান কাজ হইল যাবতীয় আজ্ঞাধীন পেশীগুলিকে দেহধারীর প্রয়োজনের অনুপাতে সক্রিয় করা এবং যে-সকল কাজে নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনেকগুলি পেশী একসঙ্গে সক্রিয় হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে পেশীগুলির ক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা।

সাইকেল চালানো, মোটরগাড়ি চালানো, ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা, টেনিস খেলা, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, নৌকা চালানো, ঘোড়া ছুটানো, তাঁত চালানো, ব্যায়াম ও জিম্‌ন্যাস্টিক করা, নৃত্য ও অভিনয় করা প্রভৃতি ব্যাপারে নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনেকগুলি পেশীকে একসাথে নতুবা দ্রুত-ক্রমে সঙ্কুচিত-প্রসারিত হইতে হয়। লঘুমস্তিষ্কের নানা কেন্দ্র এই সকল পেশীর সমকালীন্ ও পারস্পরিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে; কোনো পেশীকে মাত্রায় কম বা বেশী কাজ করিতে দেয় না। ইহাকে একটি বহু-তারযুক্ত বীণার নিপুণ বাদ্যকর বলিয়া কল্পনা করিতে যদি আপনাদের কাহারো ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি তাহার হন্তারক হইতে চাহি না।

লঘুমস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হইল—চলিবার সময় মানুষকে তালে তালে ক্রমান্বয়ে সুষ্ঠুভাবে পা ফেলিবার প্রেরণা দেওয়া ও তাহার ভারসাম্য বজায় রাখা। যাহারা কুচকাওয়াজ করে, তাহাদের লঘুমস্তিষ্ক অভ্যাসের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সুপুষ্ট, শাণিত ও সজাগ হইয়া গঠিত হয়। যাহারা তারের উপর ছাতা, লাঠি প্রভৃতি লইয়া ও সাইকেল্ চালাইয়া ব্যাল্যান্সের খেলা দেখায়, তাহাদের সর্বতোভাবে সহায়তা করে এই লঘুমস্তিষ্ক। মাথার পিছনের অংশ আহত হইলে মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, চলিতে গেলে

টলিতে থাকে, পদদ্বয় এলোমেলোভাবে ফেলে। বেশী মাত্রায় সুরাপান করিলেও অনুমস্তিষ্কের পেশীনিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য-নিয়ামক কেন্দ্রগুলি সাময়িক-ভাবে অসাড় হইয়া যায় বলিয়া মানুষের চলচ্ছক্তি ব্যাহত হয়। তাই পানোন্মাদ ব্যক্তির চলার গতি যেরূপ মন্থর, চলার ভঙ্গীও সেইরূপ ছন্দোহীন হয়। *Locomotor ataxia* নামক ব্যাধিতেও লঘুমস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই রোগী মাতাল না হইয়াও টলিতে থাকে।

অনুমস্তিষ্কের মাথার দিকে একটি বাঁকা-বোঁটাযুক্ত কুঁড়ির মত আকারের **মধ্যমস্তিষ্ক** (Midbrain) নামক ক্ষুদ্র যন্ত্রটি অবস্থিত ; ইংরাজীতে ইহার চলিত নাম "brain stem"। ইহা সুষুম্নাশীর্ষক ও গুরুমস্তিষ্ককে ছুঁইয়া রহিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে অনেকটা সেতুর কাজ করিতেছে। ইহাকে গুরুমস্তিষ্ক ও লঘুমস্তিষ্কের একটা ছোট, কতকটা অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট প্রতিরূপ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কারণ নিম্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডী পশুদের মস্তিষ্কের পরিণতি এইখানে আসিয়াই শেষ হইয়াছে। তাই তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি, ইন্দ্রিয়বোধ ও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশীর যুগপৎ সক্রিয় হওয়ার সামর্থ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যাহা হউক, উচ্চতর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যমস্তিষ্ক অপেক্ষা মানুষের মধ্যমস্তিষ্ক আরো অনেকখানি উন্নত ও জটিল।

মধ্যমস্তিষ্কের অতি-সন্নিকটে এবং উহাকে প্রায় ছুঁইয়া উপরে **থ্যালামাস** নামক একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র ও নীচে **হাইপোথ্যালামাস** নামক আর একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র রহিয়াছে। এই দুইটি যন্ত্রকেও মধ্যমস্তিষ্কের সংসারভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। শরীরের নানা স্থানের চর্ম ও পেশীসমূহ হইতে সংবেদন বহন করিয়া যে সকল নার্ভতন্তু গুরুমস্তিষ্কের উপরিতলস্থ অনুভূতি-কেন্দ্রগুলিতে যায়, তাহাদিগের সবগুলিকেই থ্যালামাসের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। পেশীগুলিকে দরকার-মত টান্-টান্ করিবার অথবা প্রসারিত করিবার ক্ষমতা মানুষ মধ্যমস্তিষ্ক হইতেই পায়। জাগ্রত অবস্থায় সমগ্র দেহের অবস্থিতি ও তাহার গতি সম্বন্ধে একটা জ্ঞানও আমরা এই মস্তিষ্কটি হইতে পাই।

তাহা ছাড়া কোন একটা বড় কাজ করিবার সময় তাহার সহিত আনুষঙ্গিক কতকগুলি ছোট ছোট কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য ইহার সহযোগিতা বিশেষ

প্রয়োজন। যেরূপ ধরুন, চলিবার সময় দুইটি হাত দুলাইবার, ঘাড় সোজা ও দৃষ্টি সম্মুখভাগে নিবদ্ধ রাখিবার প্রয়োজন হয়। আবার, গান গাহিবার সময় দুইটি হাত ও তাহার আঙুলগুলি নানাভাবে নাড়াইতে হয়, চোখে-মুখে নানারূপ ভাব প্রকাশ করিতে হয়। আবার কথা বলিবার সময় শুধু ঠোঁট দুইটি ও জিহ্বাটিই নড়ে না, সঙ্গে সঙ্গে মুখের কতকগুলি ছোট ছোট পেশী নড়াচড়া করে, চোখের তারা দুইটিও নড়ে, মাথা, ঘাড় ও হাত দুইটিও নানাভাবে সঞ্চালিত হয়।

এখন শেষোক্ত ক্ষেত্রে মধ্যমস্তিষ্ক যদি নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহা হইলে কথা বলার কাজ চলিতে থাকিবে বটে, কিন্তু অন্য আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলি বন্ধ থাকিবে। তখন মনে হইবে যেন একটা শবদেহ জাগাইয়া তাহাকে দিয়া অথবা একটা প্ল্যাস্টিকের পুতুলকে দিয়া কোনরূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রকৌশলে গান গাওয়ানো বা কথা বলানো হইতেছে। আবার মধ্যমস্তিষ্ক যদি বেঁকিয়া বসে, তাহা হইলে এমন ব্যাপারও হইতে পারে যাহাতে কথা বলিবার সময় দেহধারীর মুখের পেশীগুলি বেমানান্‌ভাবে সঙ্কুচিত-প্রসারিত হইয়া একটা হাস্যকর ভঙ্গীর সৃষ্টি করিবে। এক-একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটি বা ততোধিক পেশীকে অসমঞ্জস ও অনাবশ্যকভাবে দৃঢ় ও শ্লথ করা বা তাহাদিগকে বিরক্তিকরভাবে নাচানো ও নাড়ানোকেই আমরা মুদ্রাদোষ বলি।

হাইপোথ্যালামাসের ধূসর বস্তুপিণ্ডের উপরিতলে ও অভ্যন্তরভাগে যে সকল কেন্দ্র আছে, তাহারা সাধারণভাবে শরীরের প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলির স্বাধীন পেশীতন্তুসমূহের উপর এবং বিশেষভাবে পরিপাকযন্ত্রগুলির ক্রিয়ার উপর কর্তৃত্ব করে।

সুষুম্নাশীর্ষক (Medulla Oblongata) দেখিতে সাপের ফণার মত। ইহার পিছনে লঘুমস্তিষ্ক ; ভিতর দিকে সম্মুখভাগে 'পন্স ভ্যারোলিয়াই' (Pons Varolii) নামক বৃহৎ নলাকৃতি তন্তুময় স্ফীতি উষ্ণীষের আকারে কপালের দিকে গুরুমস্তিষ্কের তলদেশকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। ইহা যেন সুষুম্নাশীর্ষক হইতে গুরুমস্তিষ্কে যাইবার সেতু-বিশেষ। সুষুম্নাশীর্ষক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। এইস্থানে যে সকল কেন্দ্র রহিয়াছে, তাহা আমাদের শ্বাসক্রিয়া, হৃৎপিণ্ডে

রক্ত-সঞ্চলন-ক্রিয়া, চর্বণ, গলাধঃকরণ, মুখের ভাব-প্রকাশক পেশীগুলির সঙ্কোচন-প্রসারণ, বমন, হাঁচি, কাশি, লালা-নিঃসরণ, পরিপাক-ক্রিয়া প্রভৃতি বহুসংখ্যক চেষ্টাবাহী নার্ভ-মাধ্যমে পরিচালিত করে, অর্থাৎ তথায় প্রয়োজনানুরূপ কর্মশক্তি সরবরাহ করে। উচ্চ শ্রেণীর কয়েকটি স্তন্যপায়ী জন্তু ও মানুষের সুষুম্নাশীর্ষক ও পন্স ভ্যারোলিয়াই অপসৃত করিলে বা গুরুতরভাবে আহত হইলে, শ্বাসক্রিয়া ও পরিপাকক্রিয়া অচল হইয়া তাহাদের মৃত্যু ঘটায়।

সুষুম্নাকাণ্ড

এইবার আমরা মাথা হইতে ঘাড়ে, পৃষ্ঠদেশে ও কোমরে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া, **সুষুম্নাকাণ্ড** নামক যন্ত্রটির পরিচয় লইব। মস্তিষ্কের এলাকাভুক্ত না হইয়াও ইহা মস্তিষ্কের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সুষুম্নাশীর্ষকের তলদেশ হইতে উদ্ভূত মোটা-হইতে-ক্রমশঃ-সরু-হইয়া-যাওয়া নার্ভগুচ্ছের নামই সুষুম্নাকাণ্ড বা সুষুম্নারজ্জু (Spinal chord)। সুষুম্নাকাণ্ডটি যেন প্রায় দেড় হাত লম্বা একটি দুধে-গোখরোর বাচ্চা এবং সুষুম্নাশীর্ষকটি যেন তাহার মাথা। পৃষ্ঠদেশের মাঝখান দিয়া মেরুদণ্ড নামক যে ঈষৎ-তরঙ্গিত হাড়ের মালাটি ঝুলানো রহিয়াছে, তাহার উৎপত্তি হইয়াছে পশ্চাদ্‌মস্তিষ্কের মূলদেশে ও শেষ হইয়াছে উভয় নিতম্বের মধ্যবর্তী খাঁজের মাথায়।

ইতঃপূর্বেই আপনাদিগের নিকট মেরুদণ্ডের কিছু সংস্থান-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আপনারা জানিতে পারিয়াছেন যে, উহার এক-একখানি টুকরা হাড়কে 'কশেরুকা' বলে। পর-পর-সজ্জিত কশেরুকাগুলির মধ্যস্থল দিয়া যে একটি সরু সুড়ঙ্গপথ নির্মিত হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াই সুষুম্নাকাণ্ড নামিয়া গিয়াছে কোমরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত।

মেরুদণ্ডটিকে ভূমিতলের সহিত লম্ব করিয়া স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করার ও দৌড়িবার অধিকার মানুষ যতখানি পাইয়াছে, এতখানি আর কোনো স্তন্যপায়ী জীবই পায় নাই। প্রাণিজীবন-বিবর্তনে ইহা তাহার প্রকৃতিপ্রদত্ত একটি বিশেষ অধিকার বলা যাইতে পারে। ওরাং উটাং, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি কয়েক জাতীয় নিষ্পুচ্ছ বানর মাটির উপর দিয়া খাড়া হইয়া চলিতে পারে

বটে, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য পারে না এবং মানুষের মত অবলীলাক্রমে পারে না। তাহার প্রধান কারণ তাহাদের হাতের দৈর্ঘ্য এত বেশী যে করাঙ্গুলির অগ্রভাগ বা চেটো মাটিতে ঠেকিয়া যায় এবং পায়ের চেয়ে তাহাদের হাতের জোর বেশী। সেইজন্য কিছুদূর পর্যন্ত চলিয়া বা দৌড়িয়া তাহারা হয় বসিয়া পড়ে, নতুবা কিছুদূর চারি হাতে-পায়ে ভর দিয়া চলে। তারপর হয়তো লাফ দিয়া গাছে উঠিয়া দুই হাত দিয়া ডাল ধরিয়া ঝোলে ও দুলিতে দুলিতে এক গাছ হইতে অন্য গাছে ঝাঁপাইয়া পড়ে। যাহা হউক, মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দুই-পায়ে চলা ও চিৎ হইয়া শয়ন করা মানুষের দেহগত শ্রেষ্ঠত্বের দুইটি অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

দুইটি কশেরুকাকে একটার উপর আর একটা রাখিলে, তাহাদের মধ্যস্থলে যেরূপ একটি অপেক্ষাকৃত বড় ব্যাসের নালীর সৃষ্টি হয়, তেমনি দুই পাশে সমান্তরালভাবে দুইটি ক্ষুদ্র ব্যাসের ছিদ্রও দেখা দেয়। কাজেই সমস্ত কশেরুকা-গুলি যখন একটার পর একটা করিয়া বিন্যস্ত হয়, তখন তাহাদের বামে এক-ত্রিশটি ও দক্ষিণে একত্রিশটি ক্ষুদ্র ফুটার উদ্ভব হয়। সুষুম্নাকাণ্ড হইতে এই একত্রিশ জোড়া ফুটার মধ্য দিয়া একত্রিশ জোড়া নার্ভসূত্র নির্গত হইয়া শরীরের সর্বাংশে বিস্তৃত হইয়াছে।

এইস্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সুষুম্নাকাণ্ডের ভিতরাংশে থাকে ধূসর পদার্থ ও তাহার চতুর্দিকে গোল হইয়া ঘিরিয়া রহিয়াছে শ্বেত পদার্থ। এই শ্বেত পদার্থ দিয়াই নিউরনের অ্যাক্সনগুলি তৈয়ারি হয় তাহা সম্ভবতঃ আপনাদিগকে আগেই বলিয়াছি।

সুষুম্নাকাণ্ডের সম্মুখভাগ দিয়া সজ্জিত থাকে চেষ্টাবাহী নার্ভকেন্দ্রগুলি ও পশ্চাদ্‌ভাগে সজ্জিত থাকে সংবেদনবাহী নার্ভকেন্দ্রগুলি। যে একত্রিশ জোড়া নার্ভ সুষুম্নাকাণ্ড হইতে বাহির হইয়াছে, তাহারা মিশ্র নার্ভ অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই কতকগুলি সংবেদনবাহী তন্তু ও কতকগুলি চেষ্টাবাহী তন্তু থাকে। সুতরাং এখানকার প্রত্যেক নার্ভেরই একটি মূল সুষুম্নাকাণ্ডের সম্মুখভাগের সহিত আর একটি মূল উহার পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সংযুক্ত থাকে। তারপর বাহিরে আসিয়া ইহারা একটা গাঁটছড়া (ganglion) বাঁধে এবং

তারপর পৃথক্ হইয়া যে যাহার উদ্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে টেলিফোন বা টেলিগ্রাফের তারের ন্যায় চলিয়া যায়।

গলার পশ্চাদ্দিকের সুষুম্নাকাণ্ড হইতে যে পাঁচ জোড়া নার্ভসূত্র বাহির হইয়াছে, তাহারা শাখাপ্রশাখা দিয়া ফুসফুস, প্লীহা প্রভৃতির পেশীসমূহকে জড়াইয়া থাকে। এখানকার আর এক জোড়া নার্ভ অত্যন্ত গুরুতর রকমের একটি উপকার করে। একটি অগভীর শরার মত মাংসময় যন্ত্র আমাদের বক্ষোগহ্বর ও উদরদেশকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, একদিক হইতে অন্যদিকে একটি সূচ গলাইবার মত ছিদ্র নাই। এই শরার মত প্রাচীরের নাম মধ্যচ্ছদা (Diaphragm)। উপরোক্ত নার্ভ-যুগলের নাম 'ফ্রেনিক নার্ভস্'। এই নার্ভ দুইটি বক্ষোদেশের দুই পার্শ্ব হইতে মধ্যচ্ছদার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উহার মধ্যে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। মিনিটে ১৮ বার করিয়া ফ্রেনিক নার্ভ দুইটির ক্রিয়াশক্তিবশে মধ্যচ্ছদা ঈষৎ সঙ্কুচিত ও অবনত হইয়া নাসা-পথ দিয়া উভয় ফুসফুসের মধ্যে বায়ুপ্রবেশের সুবিধা করিয়া দেয়।

সুষুম্নাকাণ্ড হইতে খাস পৃষ্ঠদেশীয় এলাকায় বারো জোড়া ও কোমরের এলাকায় সাত জোড়া নার্ভসূত্র বহির্গত হইয়াছে। ইহারা অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখা সমেত সর্ব-শরীরের শিরা-উপশিরা-ধমনী-উপধমনী-জালকসমূহের গাত্রে, স্বেদনিঃস্রাবী গ্রন্থি (sweat glands) ও রোমরাজির মূলদেশে, এড্রেনাল গ্রন্থি, পাকস্থলীর স্বাধীন পেশীতন্তুসমূহের মধ্যে এবং আরো বহু যন্ত্রে ও চর্মনিম্নে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

কোমরের এলাকার সর্বনিম্নের চারি জোড়া মিশ্র নার্ভ লিঙ্গ বা যোনি, মূত্রাশয়, মলদ্বার প্রভৃতির উপর আধিপত্য করে। পুরুষের যখন কামাবেগ সঞ্জাত হয়, তখন এইস্থানের লিঙ্গ-নিয়ামক কেন্দ্রটি মস্তিষ্ক হইতে প্রচুর উত্তেজনা লাভ করে; তাহার ফলে লিঙ্গ মধ্যে প্রচুর রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া লিঙ্গটিকে দৃঢ় করে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কামাবেগের নিরসন বা প্রসাদন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত লিঙ্গের মধ্য হইতে অতিরিক্ত উষ্ণ রক্তস্রোতকে ফিরিয়া যাইতে দেয় না। নারীদের ক্ষেত্রে তাহাদের ভাগাঙ্কুর নামক অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রটি কঠিন হইয়া দ্রুত

স্পন্দিত হইতে এবং যোনি-বহির্ভাগের খাঁজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন স্কীন ও বার্থোলিন নামক গ্রন্থিত্রয়ের মুখ হইত প্রচুর পাতলা রস ক্ষরিত হইতে থাকে।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া

সুষুম্নাকাণ্ড হইল মন্ত্রীদের সত্যকার সেক্রেটেরিয়েট। মস্তিষ্কের মধ্যে মন্ত্রীদের ও উপমন্ত্রীদের খাসকামরা। সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে একত্রিশ জন সেক্রেটারী বাষট্টি দপ্তর পরিচালন করিতেছে এবং মন্ত্রীদের সহিতও যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। দুই-চারিটি অতি প্রয়োজনীয় ও কতকগুলি সামান্য প্রয়োজনীয় কর্তব্যের ভার এই সকল সেক্রেটারীদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া প্রধান মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চিন্ত থাকেন। অবশ্য ইহাদের সব কাজের উপরই তাঁহার কড়া নজর থাকে। কেবল এক জাতীয় রুটিন্ ওয়ার্ক সম্পাদন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সেক্রেটারীদের উপর ন্যস্ত। এই কাজগুলির ভালোমন্দের নিমিত্ত উপর-ওয়ালাদের নিকট মেরুদণ্ডকে বড়-একটা জবাবদিহি করিতে হয় না বটে, তবে কাজ বিশেষে তাহাদের সাহায্য লইতে হয়। এই কাজগুলির নাম **প্রতিবর্তী** বা **প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া** (Reflex action)।

প্রথমেই আপনাদিগকে জানাইয়া রাখি যে, আমাদের চর্মনিম্নে, প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রের স্বাধীন ও আজ্ঞাধীন পেশীতন্তু-গাত্রে সংবেদনবাহী ও চেষ্টাবাহী দুই প্রকার নার্ভতন্তুর শেষপ্রান্ত বিন্যস্ত। প্রত্যেকটি প্রান্ত একটু বাঁকা বা প্যাঁচানো। সংবেদনবাহী নার্ভগুলির প্রান্তসমূহ "গ্রাহক নার্ভপ্রান্ত" (receptive nerve-endings অথবা receptors) বলিয়া কথিত হয়। বলা বাহুল্য, এই প্রান্তটি অবশ্যই একটি সংবেদনবাহী নার্ভের সহিত অর্থাৎ একটি নিউরনের ও একটি অ্যাক্সনের সহিত যুক্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি অ্যাক্সন আর একটি বা ততোধিক নিউরনের অ্যাক্সনের সহিত যুক্ত হইয়া থাকিতে পারে।

অবশেষে শেষের অ্যাক্সনটি সুষুম্নাকাণ্ডের একটি সংবেদনগ্রাহী কেন্দ্রে আসিয়া পৌঁছে। অবশ্য কতকগুলি জরুরী সংবেদন এই স্থান হইতে 'রিলে' করিয়া

মস্তিষ্কে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, বাকিগুলি বিভাগীয় সেক্রেটারী নিজে গ্রহণ করিয়া তাহার সমুচিত ব্যবস্থা করেন তন্মুহূর্তেই। ভারতীয় সেক্রেটেরিয়েটের মত সুষুম্নাকাণ্ডের দপ্তরে red-tapismয়ের ঠাঁই নাই। শেষোক্ত পর্যায়ের একটি সংবেদন সুষুম্নাকাণ্ডের যে কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই কেন্দ্রেরই পার্শ্বে আর একটি কেন্দ্র থাকে। একটি অতি ক্ষুদ্র সংযোজক নার্ভতন্তু এই দুইটি কেন্দ্রকে সংযুক্ত করে। দ্বিতীয় কেন্দ্র হইতে একটি চেষ্টাবাহী নার্ভ অর্থাৎ একটি নিউরন তাহার অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটস্ লইয়া নির্গত হয়; এই নার্ভের সহিত আর একটি বা ততোধিক নার্ভের যোগাযোগ থাকিতে পারে। এবং শেষ চেষ্টাবাহী নার্ভটির শেষপ্রান্ত উপরোক্ত সংবেদন-গ্রহণকারী নার্ভপ্রান্তের কাছেই আসিয়া অথবা অন্য কোথাও গিয়া শেষ হইতে পারে।

এখন প্রতিবর্তী বা প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া কাহাকে বলে তাহা এক কথায় বলি। অনিচ্ছাক্রমে বা আকস্মিকভাবে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানলাভের ফলে অতি ত্বরিৎগতিতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাহাকেই প্রতিবর্তী বা প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া বলে। এই ক্রিয়া সাধারণতঃ সুষুম্নাকাণ্ডের কয়েকটি কেন্দ্রের দ্বারাই সাধিত হয়। এইবার কয়েকটি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দিই।

ধরুন, আপনি একমনে কোন বই পড়িতেছেন, এমন সময় আপনার নাতিনী চুপি চুপি পিছনে আসিয়া আপনার বাহুতে আস্তে একটি আলপিন্ ফুটাইয়া দিল। ঐ বেদনার অনুভূতি আহত স্থানের চর্মনিম্নে যে গ্রাহক নার্ভপ্রান্ত থাকে সে গ্রহণ করিয়া সংবেদনবাহী নার্ভের সাহায্যে সুষুম্নাকাণ্ডের একটি বোধ-কেন্দ্রে লইয়া গেল। লইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেদনা-বোধ হইল এবং বেদনা-বোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বোধ বিদ্যুৎগতিতে সংযোজক নার্ভের একটি সিন্যাপ্স্ ডিঙ্গাইয়া নিকটস্থ একটি চেষ্টা-কেন্দ্রে গেল। তথা হইতে তাহা কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া দ্বিতীয় সিন্যাপ্স্ ডিঙ্গাইয়া একটি চেষ্টাবাহী নার্ভের সাহায্যে বাহুর কয়েকটি পেশী-মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার ফলে পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া গেল এবং আপনি বাহুটি তাড়াতাড়ি সরাইয়া লইলেন। হয়তো 'উঃ' বলিয়া একটি কাতর শব্দও উচ্চারণ করিলেন। অবশ্য এই 'উঃ' উচ্চারণ করিতে মুখের ভিতরকার কয়েকটি পেশীর সংকোচন-প্রসারণের

প্রয়োজন হয়; এই পেশীগুলিকে যে চেষ্টাবাহী নার্ভ সক্রিয় করে, তাহারা কিন্তু খাস মস্তিষ্কের দপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট।

মিতার বড় পিসি সেদিন একটা খুন্তির অগ্রভাগ দিয়া উনানের তলা খুঁচাইয়া সন্ত রাখিয়া দিয়াছেন, এমন সময় মিতা রান্নাঘরে ঢুকিয়া কি কাজের জন্য সেই খুন্তিটি তুলিতে গেল। ডান হাতের আঙুলগুলিতে ছ্যাঁকা লাগিতেই সে সঙ্গে সঙ্গে "উঃ" বলিয়া খুন্তিটি ফেলিয়া দিল। এখন আপনাদিগকে বোধ হয় বুঝিতে কষ্ট পাইতে হইবে না যে, ইহা একটি প্রতিবর্তী ক্রিয়া। আঙুলে উত্তাপের অনুভূতি স্থানীয় সংবেদনবাহী নার্ভতন্তু সুষুম্নাকাণ্ডের একটি নিকটস্থ কেন্দ্রে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী চেষ্টা-কেন্দ্র হইতে প্রেরণা ছুটিয়া গেল তৎসংলগ্ন চেষ্টাবহ নার্ভ মারফৎ—কোথায়? ঐ আঙুলগুলিতে—যাহাতে মিতা আঙুলগুলির পেশীসমূহকে শ্লথ করিয়া গরম খুন্তিটি অবিলম্বে ছাড়িয়া দেয়।

হাঁচি, কাশি, কেহ মাথা লক্ষ্য করিয়া কিছু ছুড়িলে তৎক্ষণাৎ মাথা নীচু করা, চোখের দিকে অঙ্গুলি বা অন্য কিছু আগাইয়া আনিলে চক্ষের পাতা বন্ধ করা, চোখের মধ্যে ধূলিকণা পড়িলে অনুরূপ করা ও চোখের কোলে জল আসা, শরীরের কোনো স্থানে হঠাৎ অতিরিক্ত শৈত্য বা উত্তাপ বা বেদনা বোধ হইলে সঙ্গে সঙ্গে সেইস্থান অথবা সমগ্র অঙ্গটি সরাইয়া লওয়া, লজ্জাবোধে মুখ রাঙা হওয়া, সুখাদ্য মুখবিবরে গেলে জিহ্বায় লালা-নিষেক হওয়া, কোনো কথা শুনিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও বোকার মত খিল্ খিল্ করিয়া হাসা, জোর আলোতে চক্ষু মিট্‌মিট করা বা চক্ষু বোজা, অত্যন্ত উচ্চনাদ শুনিয়া কানে আঙুল দেওয়া, সম্মুখে একটা কাঁকড়া বিছা বা সাপ দেখিলে সভয়ে দুই-পা পিছাইয়া আসা, কোণাকারে হাঁটু-ভাঙা ঝোলানো পায়ের জানু-কপালের পশ্চাদ্‌ভাগস্থ কণ্ডরায় (tendon) একটু জোরে আঘাত করিবামাত্র পাখানি সোজা টান্-টান্ হইয়া যাওয়া (knee jerk) প্রভৃতি ব্যাপারগুলি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

ইহার কতকগুলিতে অবশ্য মস্তিষ্কের এক বা একাধিক কেন্দ্রের সাহায্যের প্রয়োজন হয়; সে ক্ষেত্রে সিনেমার চলন্ত ফিল্মের মত কতকগুলি প্রতিবর্তী

ক্রিয়ার একটি শৃঙ্খল বা মালা সৃষ্ট হয়। তখন ঐ ক্রিয়াটিকে "জটিল প্রতিবর্তী ক্রিয়া" বলা হয়। হঠাৎ অদূরে কোনো দিকে একটা অস্বাভাবিক রকমের শব্দ হইলে বা একটা মিঠা সুরের বাদ্য বাজিয়া উঠিলে, আমরা সেই দিকে তখনই মুখ ফিরাইয়া কান খাড়া করি। আবার অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা আলোক-রশ্মি কোনো দিক হইতে ছুটিয়া আসিলে আমরা অবিলম্বে সেই দিকে ঘাড় ফিরাইয়া কোথা হইতে আলো আসিতেছে তাহা দেখিবার চেষ্টা করি। এগুলি জটিল প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উদাহরণ। এগুলি প্রধানতঃ গুরুমস্তিষ্কের "কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা" নামক এলাকা হইতে পরিচালিত হয়। এইগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রতিবর্তী ক্রিয়া আমরা জন্ম হইতেই শিক্ষা করিয়া আসি।

একটি সরল প্রতিবর্তী ক্রিয়ার প্রতিবর্তন-পথটি অতি সোজা ও সংক্ষিপ্ত। ব্যাপারটা কি রকম—তাহা একটা মামুলি তুলনা দিয়া আপনাদিগের নিকট সুবোধ্য করিবার চেষ্টা করি।...অফিসের বড়বাবু তাঁহার কামরার মধ্যে বসিয়া কাজ করিতেছেন। কামরার বাহিরে একখানা টুলে তাঁহার খাস বেয়ারা বসিয়া বিড়ি টানিতেছে। এমন সময় একটি ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন যে, তিনি বিশেষ প্রয়োজনে বড়বাবুর সহিত এখনি একবার সাক্ষাৎ করিতে চান্। তিনি তাঁহার নামের একটি কার্ড বেয়ারার হাতে দিলেন এবং দুই-চারি কথায় তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জানাইয়া দিলেন। বড়বাবুর নিকট বেয়ারা সেই কার্ডখানি দেখাইবামাত্র তিনি বিষয়টি জরুরি বুঝিয়া তাঁহার ঘরে যে কেরানিবাবু ছিলেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিলেন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার কাজটি উদ্ধার করিয়া দিতে।...এই ঘটনাটিতে আমরা চারিজন কার্যকারকের সন্ধান পাইতেছি। আগন্তুক ভদ্রলোকটি যেন বহির্জগৎ হইতে আগত একটি জ্ঞানের উদ্দীপক (stimulus)। বেয়ারাটি হইল সেই উদ্দীপনার গ্রাহক ও বাহক। বড়বাবু হইলেন একাধারে সুষুম্নাকাণ্ডমধ্যস্থ একটি সংবেদন- ও একটি চেষ্টাকেন্দ্র। কেরানিবাবু হইতেছেন একটি চেষ্টাবাহী নার্ভতন্তু। এইভাবে প্রায় চক্রাকারে প্রতিবর্তী ক্রিয়াটি নিমেষে সম্পন্ন হইয়া যায়। এইরূপ এক-একটি পারম্পরীন্ ক্রিয়াশৃঙ্খলকে বলে **প্রতিবর্ত বৃত্তচাপ** (Reflex arc)।

অবস্থানিবদ্ধ প্রতিবর্তী ক্রিয়া

আপনারা সরল প্রতিবর্তী ক্রিয়া ও জটিল প্রতিবর্তী ক্রিয়া কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করিলেন। এখন আর একপ্রকার প্রতিবর্তী ক্রিয়ার কথা আপনাদিগকে বলিব, তাহার নাম **অবস্থানিবদ্ধ প্রতিবর্তী ক্রিয়া** (Conditioned reflex)। আমরা ক্ষুধার সময় যখন কোনো রুচিকর খাদ্য মুখে তুলি, তখন মুখবিবরস্থ তিন জোড়া লালাগ্রন্থি (Salivary glands) হইতে প্রচুর লালা-নিঃসরণ হইতে থাকে। এই লালা আপনা-আপনি ক্ষরিত হয়। ইহার জন্য আমাদের কোনো প্রয়াস করিতে হয় না। ইহা যে একপ্রকার সহজ প্রতিবর্তী ক্রিয়া, তাহা আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। অবশ্য এই ক্রিয়া সম্পূর্ণ মস্তিষ্কের কার্যকারিতায় ও সুষুম্না-কাণ্ডের বিনা সহযোগিতায় সংঘটিত হয় বলিয়া উহাকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলিতে একদল পণ্ডিত দ্বিধাপ্রকাশ করিয়াছেন। খাদ্য মুখমধ্যে না লইয়াও কেবল তাহার গন্ধমাত্র-প্রাপ্তিতে অথবা অতি-নিকটে তাহার দর্শন-প্রাপ্তিতে জিহ্বা রসাক্ত হইয়া উঠে—এ অভিজ্ঞতা বোধ হয় আমাদের সকলেরই আছে। ইহাও একপ্রকার প্রতিবর্তী ক্রিয়া। গৃহপালিত পশুদের বেলায় অনুরূপ ক্রিয়া হইতে দেখা যায়। অদূর হইতে খাদ্য-দর্শনে, এমন কি যে লোকটি নিত্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগকে খাদ্য খাইতে দেয় তাহাকে দেখিয়াও গরু, মহিষ, ঘোড়া, গাধা, কুকুর, ভেড়া, ছাগল, খরগোস্, উট প্রভৃতি জন্তুদের মুখে লালাক্ষরণ হইতে থাকে।

এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া, রাশিয়ান্ মনোবিজ্ঞানী প্যাব্লব (Pavlov) ব্যাপক পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের পর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনিই "অবস্থানিবদ্ধ প্রতিবর্তী ক্রিয়া" নামটি প্রথম ব্যবহার করেন। এই ব্যাপারটি কি তাহা উপরের অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এক্ষণে তিনি প্রথম কিভাবে এই বিশেষ ধরণের প্রতিক্রিয়াটি লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন, তাহা আপনাদিগকে একটু খুলিয়া বলি। আপনারা স্মরণ করিবেন, বাহির হইতে উদ্দীপনা আসিলে তবে চর্মনিম্নস্থ বা পেশীগাত্রস্থ একটি বা একাধিক সংবেদনবাহী নার্ভ্ তাহা হয় সরাসরি সুষুম্নাকাণ্ডে নতুবা সুষুম্নাকাণ্ডের

মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায় এবং তথাকার একটি চেষ্টাকেন্দ্র হইতে ভিন্ন পথে একটি বা একাধিক চেষ্টাবাহী নার্ভ এক বা ততোধিক পেশীতে অথবা গ্রন্থিতে কর্মশক্তি লইয়া আসে।

এই সূত্রে আপনাদিগকে আর একটি কথা বলিয়া দিই যাহা আগেই আপনাদিগকে শোনানো উচিত ছিল। তাহা হইল এই—যে নার্ভগুলি সংবেদনবাহী, তাহাদিগের আর একটি নাম অন্তর্মুখী নার্ভ (Afferent nerves)। কারণ তাহারা বাহিরের সংবাদ দেহাভ্যন্তরে সুষুম্নাকাণ্ডে ও মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া যায়। চেষ্টাবাহী নার্ভগুলির আর একটি নাম হইল বহির্মুখী নার্ভ (Efferent nerves), কারণ তাহারা সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্ক হইতে চেষ্টা বা কর্মশক্তি বহন করিয়া শরীরের পেশীসমূহে, গ্রন্থিসমূহে বা চর্মের তলদেশে লইয়া আসে।

প্যাব্‌লব ১৯০০ সালে কয়েকটি কুলীন জাতীয় শিক্ষিত কুকুর যোগাড় করিয়া তাহাদের লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ একটি কুকুরের গালে ছোট্ট একটি ছিদ্র করিয়া ও ইহার সোজাসুজি জিহ্বার তলদেশস্থ একটি লালাগ্রন্থিতে আর একটি ছিদ্র করিয়া, একটি ক্ষুদ্র রবারের নল গাল হইতে লালাগ্রন্থির মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। তারপর বাহিরে নলের অন্য মুক্ত প্রান্তটি একটি পরিমাপ-চিহ্নিত কাচের গ্লাসের ভিতর দিকে তিনি ঝুলাইয়া দিলেন। এই কাণ্ডটি করা হইল কেন জানেন? তাহা হইলে খাদ্য বা তাহার কোন প্রতিকল্প বা খাদ্যসম্পৃক্ত অন্য কোনো বস্তু আস্বাদ করিয়া বা তাহা দেখিয়া অথবা খাদ্যদানকারী ব্যক্তিকে দেখিয়া কুকুরটির কতখানি লালা ক্ষরিত হয়, তাহা প্রফেসর সাহেব লক্ষ্য করিতে ও মাপিতে পারিবেন। উদ্দীপনার মাত্রা যত বেশী হইবে লালা তত শীঘ্র ও তত বেশী পতিত হইবে,—ইহা তিনি পূর্ব হইতেই স্থির করিলেন।

এইবার তিনি একে একে তাঁহার পরিকল্পিত পরীক্ষণ সুরু করিলেন। প্রথমেই তিনি একটি ডিশে করিয়া কুকুরের প্রিয় খাদ্য দিয়া, পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ঐ একটি সচ্ছিদ্র লালাগ্রন্থি হইতে কি পরিমাণে লালা নিঃসৃত হয়। খাদ্যচর্বণের সূত্রপাত হইতে কতখানি লালা ক্ষরিত হয় এবং সেকেণ্ডে কয়

ফোঁটা করিয়া পড়ে, তাহা তিনি পর পর কিছুদিন লক্ষ্য করিলেন ও তাহার হিসাব রাখিলেন। অতঃপর তিনি দেখিলেন, যে-ডিশে কুকুরটিকে প্রত্যহ খাদ্য পরিবেশন করা হয়, সেই ডিশটি খাদ্যশূন্য অবস্থায় দেখিলেও তাহার প্রচুর লালাক্ষরণ সুরু হইয়া যায়। এমন কি, যে লোকটি নিত্য তাহাকে নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য পৌছাইয়া দেয়, তাহাকে দেখিয়াও কুকুরটির লালানিঃস্রাব ঘটে।

অতঃপর তিনি একটি ঘণ্টা বাজাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরটিকে খাদ্য দিতে সুরু করিলেন। পর পর কিছুদিন এইরূপ করিবার পর তিনি খাদ্য না দিয়া শুধু ঘণ্টা বাজাইয়া দেখিলেন, তাহাতেও কুকুরটির লালা ঝরে। কিন্তু কিছুদিন শুধু ঘণ্টা বাজাইয়া খাদ্য না হাজির করিলে, তাহার লালাক্ষরণ কমিতে কমিতে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তারপর প্যাব্‌লব্‌ কিছুদিন ধরিয়া ঘণ্টা বাজাইবার দশ মিনিট পরে তাহার সম্মুখে খাদ্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। এবার ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া সারমেয়-পুঙ্গবের লালা পড়িল না। সে দশ মিনিট চুপচাপ পড়িয়া থাকে, কখনো বা ঝিমাইতে থাকে এবং দশ মিনিট অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে খাবারের প্রত্যাশায় লালা ঝরাইতে থাকে।

এই যে খাবারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, খাবারের থালা ও খাবার-প্রদানকারী ব্যক্তিকে দেখিয়া অথবা ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া লালাক্ষরণ—এইগুলি হইল অবস্থানিবদ্ধ প্রতিবর্তী ক্রিয়া। খাবারের থালা, খাদ্যদানকারী ব্যক্তি ও ঘণ্টা—এগুলি হইল খাদ্যের পরিবর্ত, কৃত্রিম উদ্দীপক (Conditioned stimulus)। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা প্যাব্‌লবের দেওয়া পরিভাষা Conditioned reflex ব্যবহার না করিয়া তৎপরিবর্তে *Conditioned response* (অবস্থানিবদ্ধ প্রতিক্রিয়া) নামে অভিহিত করিতেছেন। মনস্তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ভাষায় ইহাকে C. R. বলা হয়। তাঁহাদের মতে, খাদ্য মুখে পাইয়া অথবা না পাইয়া এই-যে লালা-নিঃসরণ, ইহাকে সঠিকভাবে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলা চলে না যেহেতু এই ব্যাপারে আগাগোড়া মস্তিষ্কের কার্যকারিতা প্রযুক্ত হইতেছে। স্বাভাবিক উদ্দীপনা-প্রাপ্তির (খাদ্যচর্বণের) ফলে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (লালা-নিঃসরণ) হয়, তাহাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Unconditioned response অথবা সংক্ষেপে U. R.

যাহা হউক, তারপর প্যাব্‌লব্‌ একটি বৃত্তাকার সাদা আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরকে খাদ্য দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে লালা-নিঃস্রাবের কোনো ব্যাঘাত হইল না; বরং আলো জ্বালার পর খাদ্য আসিতে খানিকটা বিলম্ব হইলেও আলো দেখিয়াই তাহার লালা ক্ষরিত হইতে থাকিত। অতঃপর তিনি গোল আলো দেখাইয়া যেরূপ খাদ্য দিতে থাকিলেন, তেমনি একটা ডিম্বাকার আলো দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা মৃদু রকমের তাড়িৎ অভিঘাত কুকুরের গাত্রে স্পর্শ করাইতে লাগিলেন; ইহাতে কুকুরটি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার শরীর কোঁক্‌ড়াইয়া ফেলিত। সুতরাং দিন কয়েক পর হইতে ডিম্বাকার আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটি ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিত। তারপর ডিম্বাকার আলোটি একটু একটু করিয়া গোলাকার করা হইতে লাগিল। তখনো গোলাকৃতি ও ডিম্বাকৃতির পার্থক্য বিচার করিতে পারিয়া, কুকুরটি তদনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন যখন গোলাকৃতি ও ডিম্বাকৃতিতে পার্থক্য সূক্ষ্মতর করিয়া দেওয়া হইল, তখন কুকুরটি ভীষণ উত্তেজিত হইয়া তারস্বরে চীৎকার ও পাগলের মত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

প্যাব্‌লবের মতে, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ও চর্চার দ্বারা স্বাভাবিক উদ্দীপনাজাত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে কতকটা সংযত এবং কৃত্রিম উদ্দীপনাজাত অবস্থা-নিবদ্ধ প্রতিক্রিয়াকে একেবারে নিরুদ্ধ করা যায়। আমাদের সমস্ত জীবনটাই অবস্থানিবদ্ধ প্রতিক্রিয়া অথবা তাহা হইতে মুক্তিলাভের (Conditioning and de-conditioningয়ের) সমষ্টি বলা যায়। যে দেশে রাস্তার বাঁ দিক্‌ দিয়া গাড়ি চালাইবার নিয়ম, সে দেশের গাড়ির চালকগণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতে হয় না যে, গাড়ি রাস্তার বাঁ দিকে চালাইতে হইবে। অনেকটা অভ্যাস-বসে আপনা-আপনি তাহারা চলমান গাড়িকে বাম পার্শ্ব ঘেঁষিয়া রাখে। অদূরে রাস্তার স্তম্ভে লাল আলো দেখিলেই তাহারা যান্ত্রিকভাবে গাড়িতে ব্রেক কষে, আবার সবুজ আলো দেখিলেই গাড়ি চালাইতে আরম্ভ করে। গাড়ি চালাইতে চালাইতে কোন কোন চালক পার্শ্বে উপবিষ্ট একটি বন্ধুর সহিত অনর্গল ঘরসংসারের কথা কহিতে থাকে, আমরা দেখিয়া ভয়ে মরি; কিন্তু তাহাদের নিপুণ হাত স্টীয়ারিং হুইলটিকে ঠিকমত ডাইনে-বাঁয়ে

ঘুরাইতে থাকে, প্রয়োজনমত অ্যাক্সিলারেটরের উপর পায়ের চাপ কম-বেশী করিতে থাকে।

স্কুলে ক্লাস বসিবার ঘণ্টা বাজিলে ছাত্র বা ছাত্রীগণ হুড়্‌মুড় করিয়া অবিলম্বে যে-যাহার ক্লাসে গিয়া বসে, ক্লাসে শিক্ষক প্রবেশ করিলে সকলে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং জলযোগের ঘণ্টা বাজিলে সকলে উল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে ক্লাসের বাহিরে ছুটিয়া আসে। সকাল পঁউনে আটটায় ভোঁ বাজিলে শ্রমিকগণ নিজেদের কারখানার গেটের দিকে প্রাণপণে ছোটে। বেলা নয়টার সময় অফিসে সময়মত পৌছিবার জন্য কেরানিদল ট্রাম-বাস-ট্রেনে গুঁতাগুঁতি করিয়া উঠে এবং কেহ কেহ হাতল ধরিয়া ভীতিকরভাবে ঝুলিতে থাকে। অন্ধকারের মধ্যে যাইতে বা থাকিতে শিশু ভয় পায়, ইহা তাহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু শিক্ষার দ্বারা তাহার এই ভয় ভাঙিয়া দেওয়া যায়।

প্যাব্‌লবের মতে, আমাদের জীবনে শিক্ষা ও নিয়মনিষ্ঠার মধ্য দিয়া যে-সকল বিভিন্ন অভ্যাস অর্জিত হইয়াছে, সেগুলি অবস্থানিবদ্ধ প্রতিবর্তী ক্রিয়া-সমূহের একটি প্রকাণ্ড শৃঙ্খল ব্যতীত আর কিছুই নহে। ত্রিশ বৎসর কাল একাদিক্রমে গবেষণা করিয়া প্যাব্‌লব যে সকল তত্ত্ব ও সূত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সকলগুলির সহিত আধুনিক মনোবিজ্ঞানিগণ একমত নহেন। তিনি আজীবন মনের পটভূমিকা ও তাহার কর্তৃত্বকে একপ্রকার অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের কর্মজীবনে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডেরই প্রাধান্যকে সর্বোচ্চ পাদপীঠ দান করিয়াছেন এবং বিভিন্ন উদ্দীপনায় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ও তাহার নিয়ন্ত্রণ লইয়া সর্বাপেক্ষা বেশী মাথা ঘামাইয়াছেন। তথাপি তাঁহার গবেষণা কতকগুলি কারণে আধুনিক শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞান-ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্র

কতকটা স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত একটা পৃথক নার্ভতন্ত্র আমাদের পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে একটা গ্রন্থিবদ্ধ দড়ির সিঁড়ির মত আকারে বিন্যস্ত। আসলে ইহাদের কতকগুলি বাহির হইয়াছে মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগস্থ সুষুম্নাশীর্ষক

ও মধ্যমস্তিষ্ক হইতে এবং কতকগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের সম্মুখের অংশ হইতে। এই নার্ভসূত্রগুলি সাধারণতঃ দুইটি নিউরন্ দ্বারা গঠিত হয়। একটি নিউরন্ তাহার অ্যাক্সন্ লইয়া মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের বাহিরে থাকে এবং শাখাপ্রশাখা দিয়া একটি গাঁটছড়া (ganglion) বাঁধে ; এই গাঁটছড়াটি অতিক্রম করিলে আর একটি নিউরনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—যাহা বহু শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া শরীরের এক-একটি অংশে ও যন্ত্রে গিয়া শেষ হয়। ঐ গাঁটছড়াগুলি যেন কোনো ব্যাংক বা ইন্সরিওরেন্স্ কোম্পানির এক-একটি শাখা-অফিস। যাহারা কতকটা স্বাধীনভাবে কাজ করিলেও হিসাবপত্র ও কার্য-বিবরণী নিয়মিতভাবে কেন্দ্রীয় অফিসকে সরবরাহ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে ঐ অফিসের সাহায্য ও পরামর্শ লয়। অথবা, ইহাদিগকে একটা ফেডারাল গবর্নমেন্টের এক-একটি স্বয়ংতন্ত্র সংশ্লিষ্ট রাজ্য বলিয়াও অভিহিত করা যায়।

সমগ্র শারীরবিধানে এই স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের যে অতি-গুরুতর কৃত্য রহিয়াছে, তাহার সহিত আপনাদের পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। এই নার্ভতন্ত্রটির দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। একটি বিভাগের নাম **সমব্যথী তন্ত্র** (Sympathetic system), আর একটির নাম **পরা-সমব্যথী তন্ত্র** (Para-sympathetic system)। সুষুম্নাকাণ্ডের যে-অংশ পৃষ্ঠদেশে ও ঊর্ধ্বকটিদেশে অবস্থিত, তথা হইতে সমব্যথী নার্ভগুলির উদ্ভব হইয়াছে এবং সুষুম্নাশীর্ষক, মধ্যমস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের সর্ব নিম্নাংশ হইতে পরা-সমব্যথী নার্ভগুলি বহির্গত হইয়াছে।

সমব্যথী নার্ভগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের উভয় পার্শ্ব হইতে সমান্তরালভাবে উদ্গত হইয়া তাহার অনতিদূরেই গাঁটছড়া বাঁধিয়া বটগাছের ঝুরির মত একটি লম্বা কাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সেই গাঁটছড়াগুলির বাহিরে এক-একটি নূতন নিউরন্ তাহার অ্যাক্সন্-সমেত এক-একটি আভ্যন্তরীন্ যন্ত্রের স্বাধীন পেশীমালার গায়ে গিয়া সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। এ-কথা আপনাদিগকে একটু আগেই বলিয়াছি।

কয়েকটি সমব্যথী নার্ভ্ এক জায়গায় জড়ো হইয়া শাখা-প্রশাখা দিয়া একটি এলোমেলো জট-পাকানো গোলাকার জাল তৈয়ারি করে।

উহাকে **নাড়ীচক্রজাল** (Plexus) বলা যায়। বিভিন্ন আকারের এইরূপ কয়েকটি চক্র আমাদের দেহকাণ্ডের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা বড় নাড়ীচক্রটির নাম **সৌর নাড়ীচক্রজাল** (Solar plexus)। আমাদের উদরগহ্বরে পাকস্থলীর একটু নীচের দিকে যেখানে নিম্নগ মহাধমনী (Descending aorta) সোজাসুজি নামিয়া যাইতেছে, এই সৌর নাড়ীচক্রজাল সেইখানে অবস্থান করে। এই নাড়ীচক্রজালে একটু বেশী আঘাত লাগিলেই আমাদের চৈতন্য লোপ পায়। সৌর নাড়ীচক্রজাল হইতে সমব্যথী নার্ভতন্তুগুলি পাকস্থলীতে, ক্ষুদ্রান্ত্রে, যকৃতে, প্লীহায়, বৃক্কদ্বয়ে, ঘর্মগ্রন্থিসমূহে, ধমনীসমূহে, কেশসমূহের মূলে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা মেলিয়া বিজড়িত থাকে। প্রাচীন বৈদ্যকগণ মনে করিতেন, ইহা আমাদের ভাবময় ও আবেগময় জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। আধুনিক মনোবিজ্ঞানিগণ তাঁহাদের এই ধারণাকে প্রায় সমর্থন করিয়াছেন।

জানিয়া রাখুন, দেহাভ্যন্তরে যে-সকল যন্ত্রে সমব্যথী নার্ভতন্তু আছে, সেই সকল যন্ত্রে পরা-সমব্যথী নার্ভতন্তুও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একপ্রকার নার্ভতন্তু কোন যন্ত্রের ক্রিয়া পরিবর্ধন (acceleration) করে, অন্য প্রকার নার্ভতন্তু সেই ক্রিয়া প্রতিরোধন (inhibition) করে ; অর্থাৎ একটিতে কাজ বাড়ায়, অন্যটিতে কাজ কমায়। সাধারণতঃ সমব্যথী নার্ভতন্ত্র দাপাদাপি, ছুটাছুটি, ঝগড়াঝাঁটি, অতিশয় উত্তেজনা, ভয়, কর্মচাঞ্চল্য, উদ্বেগ, ক্রোধ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ আবেগজনিত জরুরী অবস্থায় রীতিমত সক্রিয় হইয়া উঠে। আবার পরা-সমব্যথী নার্ভতন্ত্র শান্তি, তৃপ্তি, নীরব প্রসন্নতা, বিমূর্ত চিন্তা, বিশ্রাম প্রভৃতি অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সক্রিয় হয়। পুনরায় বলা বাহুল্য, আমাদের আবেগ, অনুভূতি, দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা ও সাম্যভাবের সহিত স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের কিছু প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে।

সমব্যথী ও পরা-সমব্যথী নার্ভতন্তুগুলি কোন্ যন্ত্রে কি কি কাজ করে, তাহা নিম্নের তালিকাটি অধ্যয়ন করিলে সুস্পষ্ট জানা যাইবে।—

পরা-সমব্যথী নার্ভ	সমব্যথী নার্ভ
(১) প্রখর আলোকে তারারন্ধ্রদ্বয়কে (pupils) সঙ্কুচিত করে।	(১) স্বল্পালোকে তারারন্ধ্রদ্বয়কে প্রসারিত করে।

পরা-সমব্যথী নার্ভ	সমব্যথী নার্ভ
(২) হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের হার কমাইয়া দেয়।	(২) হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের হার বাড়াইয়া দেয়।
(৩) শ্বাসক্রিয়ার গতি ও ছন্দকে শাসন করে।	(৩) শ্বাসক্রিয়ার গতি ও ছন্দকে সহজ স্বচ্ছন্দ করে।
(৪) লালা-নিঃসরণ বৃদ্ধি করে।	(৪) লালা-নিঃসরণ প্রতিরোধ করে।
(৫) পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র-মধ্যস্থ সর্বপ্রকার পাচক রস-নিঃসরণ ও অন্ত্রের ক্রমসংকোচগতি (peristalsis) বৃদ্ধি করে।	(৫) পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র-মধ্যস্থ সর্বপ্রকার পাচক রস-নিঃসরণ ও অন্ত্রের ক্রমসংকোচগতি সংযত করে।
(৬) শরীরের উপরিভাগের যাবতীয় ধমনীগুলির গাত্র প্রশস্ত করিয়া দেয়।	(৬) শরীরের উপরিভাগের যাবতীয় ধমনীগুলির গাত্র সঙ্কুচিত করিয়া দেয়।
(৭) রক্তচাপ কমাইয়া দেয়।	(৭) রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।
(৮) মলদ্বার ও মূত্রস্থলীর মুখ সঙ্কুচিত করিয়া রাখে।	(৮) মলদ্বার ও মূত্রস্থলীর মুখ বিস্তারিত করিয়া দেয়।
(৯) জননেন্দ্রিয়সমূহের উত্তেজনা জাগায়।	(৯) জননেন্দ্রিয়সমূহের উত্তেজনা রোধ করে।
	(১০) স্বেদগ্রন্থিগুলিকে উদ্দীপিত করে।
	(১১) গাত্রের রোমরাজীকে খাড়া করে অর্থাৎ গাত্র রোমাঞ্চিত করে।
	(১২) যকৃতের মধ্যে গ্লাইকোজেন নামক যে শর্করা সঞ্চিত থাকে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে রক্তে মিশ্রিত করিয়া দিতে যকৃতকে উদ্যোগী করে। রক্তকে গাঢ় করিবার ও জমাট বাঁধিবার একটি বিশেষ উপাদানকে কার্যোপযোগী করে।
	(১৩) অ্যাড্রেন্যাল্ গ্রন্থি হইতে এপ্রিনেফ্রিন্ নামক রস—যাহা সমব্যথী নার্ভগুলিকে সতেজ করে—তাহা ক্ষরণের সহায়তা করে।

এতক্ষণে আপনাদের বোধহয় বুঝিতে বাকি নাই যে, আমাদের কোনো ছোটবড় দেহ-ক্রিয়াই মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের সহায়তা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। আমরা পাপ-ই করি বা পুণ্যই করি, তাহা যেরূপ মনের অগোচরে হইতে পারে না, সেইরূপ কাজই করি বা বিশ্রামই করি, তাহা কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের অসহযোগে ঘটা সম্ভবপর নহে।

পরিবেশের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

আবার বলি, আমাদের চেতনগত প্রত্যেক কর্মের পশ্চাতে আছে পরিবেশ-প্রদত্ত উদ্দীপনা ও তাহার প্রতিক্রিয়া। সুতরাং উদ্দীপনাটা (stimulus) প্রায়ই বাহির হইতে দেহধারীর ভিতরে আসে এবং উহার প্রতিক্রিয়াটা (response বা reaction) আসে দেহধারীর ভিতর হইতে বাহিরের দিকে। প্রত্যেক জীবেরই আমরণ আপন পরিবেশের সহিত হয় মানাইয়া চলিতে নতুবা লড়াই করিতে হয়।

পরিবেশ যখন অনুকূল, তখন ব্যক্তির কাজ সরল ও সহজ, তাহার সহিত তখন ব্যক্তির খুব মাখামাখি ভাব। শরৎ ও বসন্তের প্রথমার্ধে আমাদের দেশের আবহাওয়া মেদুর, সুখাবহ। তখন খালি গায়ে চলা-ফেরা করিতে আমাদের ভালই লাগে। আমরা ঐ সময়কার নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় উৎসব-উল্লাসে মাতিয়া উঠি, অলস কল্পনা-বিলাস প্রণয়চিন্তা প্রিয়প্রীণন ও নৃত্যগীত-বাদ্যের নির্ঝরিণী-ধারায় স্নান করিয়া যেন নবজন্ম লাভ করি।

যেই বর্ষা নামিল, অমনি চাষীর মুখে হাসি ফুটিল। কিন্তু আমাদের মত মসীজীবী শহুরে ভদ্রলোকদের রুষ্ট ভ্রূযুগ ললাটোর্ধে উঠিল। প্রাবৃটের ধারাবাহিক অত্যাচারে মণীন্দ্র রোডে, কলেজ স্ট্রীটে, বিধান সরণীতে, বন্দেলে, আশুতোষ মুখার্জী রোডে, বিপিন গাঙ্গুলি রোডে, সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউতে, উল্টাডিঙ্গিতে ও মাণিকতলায় হাঁটু হইতে কোমর-ডোবা জলরাশি থৈ-থৈ করে। ট্রাম-বাস বন্ধ। অবিশ্রান্ত বারিপাত, বাজারে মৎস্য-আনাজ দুর্লভ। হয় রবারের জুতা কিনিতে হইতেছে, নতুবা এক হস্তে চামড়ার জুতাজোড়া ঊর্ধ্বে তুলিয়া এবং অন্য হস্তে শিরোর্ধে ছত্র ধরিয়া, জল ভাঙিয়া, বিধাতাপুরুষকে

অজস্র গালি পাড়িতে পাড়িতে, অতি-মন্থর সন্তর্পিত পদে আফিসে যাইতে ও তথা হইতে গৃহে ফিরিতে হইতেছে। এই ঋতুতে পরিবেশের সঙ্গে আমাদের বিবাদ। তাহার উপদ্রব রুখিবার জন্য আমাদের প্রচুর অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় করিতে হয়।

দণ্ডকারণ্যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য হাজার হাজার গাছপালা কাটিয়া, জীবজন্তু মারিয়া ও তাড়াইয়া, রাস্তাঘাট তৈয়ারি, কূপ-পুষ্করিণী খনন করিয়া নূতন নূতন বসতি স্থাপন করা হইতেছে,—এখানেও পরিবেশের সহিত লড়াই চলিতেছে। শীতকালে অবস্থাপন্ন লোকেরা পরিবেশের প্রতিকূল আচরণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য গায়ে কোট-ওভারকোট-কার্ডিগান্-শাল-দোশালা চড়ান্, গরিবেরা আগুনের মালসার ধারে বসিয়া হাত-পা সেঁকে। শিশুকেও ৩।৪ বৎসর বয়স হইতে শুধু লেখাপড়া শিখিতে হয় না, শালীনতা শিক্ষা করিতে হয়। মৈত্রী-প্রেম-শ্রদ্ধার অনুশীলন করিতে হয়। কি জন্য? ঐ পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইবার জন্য।

পরিবেশ শুধু আলো-বায়ু-জল-ঋতু-প্রকৃতি-বাসস্থান দিয়া গঠিত হয় না, তাহার প্রধান উপাদান হইল—পরিবার ও সমাজ। ইহাদের নিকট হইতে মানুষ অহরহ যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা সংবেদন লাভ করে, তাহা অহরহ তাহার শরীরের অসংখ্য সংবেদনবাহী নার্ভ মস্তিষ্ক-সুষুম্নাকাণ্ডীয় নাড়ীতন্ত্রের বিভিন্ন অনুভূতি-কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দিতেছে। নিমেষে সেই সংবেদনগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংযোজক নার্ভের উভয়প্রান্তস্থ দুইটি সিন্যাপ্স্ ডিঙ্গাইয়া বিভিন্ন চেষ্টাকেন্দ্রগুলিতে উপস্থিত হইতেছে এবং চেষ্টাবাহী নার্ভসমূহ-দ্বারা কর্মশক্তিরূপে নানাবিধ পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে আসিয়া রকমারি ক্রিয়া করিতেছে। এই সকল ক্রিয়ার প্রকাশ সর্বদা বাহিরের দিকে। ইহারা পরিবেশের বিশেষ বিশেষ প্রভাবের বিশেষ বিশেষ উত্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলির ক্রিয়া বাহিরে বড় একটা দেখা যায় না। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, বৃক্ক, পাকস্থলী, অন্ত্রদ্বয়, অগ্ন্যাশয়, নানাপ্রকার রসগ্রন্থি-সমূহ, রক্তসঞ্চলন, রস-সংবহন প্রভৃতি ক্রিয়া আপনা-আপনি নিভৃতে কাজ করিয়া যাইতেছে। আমরা তাহাদের কাজের তত্ত্ব লই না, হিসাব রাখি না।

ইহারা সকলেই স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের পরিচালনাধীনে থাকে, ইহা আপনাদের অজ্ঞাত নয়। আমাদের অনেকেই দেহমধ্যে পাকস্থলী বা বৃক্কদ্বয় সঠিক কোথায় অবস্থান করে, তাহার খোঁজ রাখেন না। তাহার উপর, আমরা কেহই হৃৎপিণ্ড মিনিটে কয়বার স্পন্দিত হইতেছে এবং ফুসফুস মিনিটে কয়বার বায়ু গ্রহণ ও বর্জন করিতেছে, তাহা গণিয়া দেখিতে উৎসুক হই না। অবশ্য গুরুতর পীড়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসক মহাশয়কে এই উভয় প্রকার তত্ত্ব সম্বন্ধে সকারণেই অনুসন্ধিৎসু হইতে হয়।

ক্ষেত্রবিশেষে বাহিরের সংবেদন ও ভিতরের চেষ্টাশক্তি আমাদের আভ্যন্তরীন্ যন্ত্রগুলির উপর সাময়িকভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। ধরুন্, হঠাৎ ভয় পাইলে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়, ললাটদেশে ঘর্মবিন্দু উৎসারিত হয়, লালাগ্রন্থির রসক্ষরণ বন্ধ হইয়া যায়, শ্বাসের গতি কমিয়া যায়। ভয় পাইয়া দৌড় আরম্ভ করিলে শ্বাসের গতি অবশ্য বাড়ে।

যাহা হউক, আমরা প্রতিনিয়ত যে সকল সাধারণ ধরনের সংবেদন গ্রহণ করি ও গুটি কয়েক পেশীর ক্রিয়া-মারফৎ তাহার যে সকল উত্তর (response) দিই, সেগুলির প্রত্যেকটি হয়তো দুই-তিন-চারিটি নির্দিষ্ট নার্ভতন্ত্র ও দুইটি ধূসর নার্ভকেন্দ্র-দ্বারা সাধিত হয়। এই সকল কাজের জন্য মস্তিষ্কে ও সুষুম্নাকাণ্ডে নির্ধারিত নার্ভকেন্দ্র আছে। কিন্তু যেগুলিকে মানসিক ক্রিয়া বা বুদ্ধিবিবেচনা-প্রসূত কর্ম বলা হয়—যেমন মনোযোগ, স্মৃতি, চিন্তা, রচনা, বাক্য, বক্তৃতা—সেগুলির প্রত্যেকটি দুইটি নার্ভকেন্দ্রের সাহায্যে সম্ভবপর হয় না এবং তাহাদের কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্কের তরঙ্গিত ধূসর বস্তুর কোথায় কোন্ এলাকায় অবস্থিত, তাহা অদ্যাবধি ভালো করিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে এই সকল কার্যে অনেকগুলি নার্ভকেন্দ্র যে সহায়তা করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ললাটদেশে গুরুমস্তিষ্কের এলাকাভুক্ত যে ধূসর বস্তুপিণ্ড আছে, তাহারই তলভাগে বামদিকে "ব্রোকার এলাকা" (Broca's area) নামক একটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত স্থান আছে—যে স্থান হইতে শব্দ উচ্চারণ করিবার প্রেরণা ও সামর্থ্য পায় কণ্ঠ ও মুখমধ্যস্থ কয়েকটি পেশী। কিন্তু অর্থসঙ্গতি বজায় রাখিয়া কথা বলিয়া যাওয়া-ব্যাপারে কেবল যে এই ব্রোকার এলাকা একা সচেষ্ট হয়,

বিজ্ঞানীরা তাহা মনে করেন না। একটি প্রশ্ন শুনিয়া তাহার যথাযথ উত্তর দেওয়া—আমাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু ইহাতে দেহ-বিধানে পর পর পাঁচটি ক্রিয়া পলকে সংঘটিত হয়।—(ক) বাক্যের ধ্বনিগুলি শ্রবণ, (খ) সেগুলির অর্থবোধ, (গ) ধারণাগুলিকে একত্র জড়ো করা, (ঘ) উত্তরে যে ধারণাগুলিকে রূপান্তরিত করিতে হইবে সেগুলির নির্বাচন ও (ঙ) শব্দগুলি সাজাইয়া কণ্ঠ ও মুখের পেশীগুলির দ্বারা উত্তরদান। এই ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিতে মস্তিষ্কের যে যে কেন্দ্র কাজে লাগে, সেগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির এক বা একাধিক সংযোজক নার্ভতন্তুর দ্বারা যোগাযোগ রহিয়াছে এবং জানা ও অজানা বহু নার্ভসূত্র অঙ্গুলিপিষ্ট হার্মোনিয়ামের রিডের মত পরম্পরধারায় উদ্যোগী হইয়া উঠে।

নার্ভকেন্দ্র, নিউরন্ ও তৎসংলগ্ন অ্যাক্সন্—ইহারা অন্যান্য দেহকোষের ন্যায় বয়োবৃদ্ধির সহিত আপনাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে না, তাহা আপনাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। ইহারা পুষ্টিকর আহার্য, ব্যায়াম প্রভৃতি ও বয়োবৃদ্ধির সহিত হৃষ্টপুষ্ট ও সতেজ হয়। আবার রোগে শোকে শ্রমে জরাভারে ক্লান্ত হয়, রুগ্ণ হয় ও কোনো-কোনোটি চিরতরে অকর্মণ্য হয়। একটি নার্ভের ক্রিয়াশক্তি ব্যাহত হইলে, নিকটস্থ অন্য নার্ভ তাহার কাজ চালাইয়া দিতে পারে—এরূপ ব্যবস্থা আমাদের প্রত্যেকের দেহমধ্যে বর্তমান।

পঞ্চম প্রসঙ্গ

আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়

আপনাদের নিকট উল্লেখ করা বাহুল্য যে, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নের দিক্ দিয়া নাসিকা ও জিহ্বার গুরুত্ব খুব বেশী নয়। তথাপি এই অধ্যায়ের শেষভাগে এই দুইটি যন্ত্র সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু তথ্য দেওয়া হইবে। দৈহিক ও মানসিক ক্ষেত্রে চক্ষুর সার্থকতা সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া আমরা প্রথমেই চক্ষুর সংস্থান ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

নেত্রযুগল

দুইটি সুকোমল অক্ষিগোলক দুইটি খোসা-ছাড়ানো লিচুর মত দেখিতে। উহাদের বেশীর ভাগই অবশ্য পাতলা অস্থিনির্মিত চক্ষুকোটরের মধ্যে বসানো থাকে। প্রতি অক্ষিগোলকের দুই পার্শ্বে ও পশ্চাদ্ভাগে সংযুক্ত তিন জোড়া পেশীর ছোট ছোট ফিঁতা বা লাগাম উহার সহিত আল্গাভাবে সংলগ্ন থাকে—যাহাতে উহাকে ডাইনে-বাঁয়ে-উপরে-নীচে ঘুরাইতে ফিরাইতে এবং কোটরের মাঝখানে স্থিরভাবে নিবদ্ধ রাখা যায়। অক্ষিগোলক দুইটি যাহাতে স্বচ্ছন্দে নড়া-চড়া করিতে পারে এবং নড়া-চড়া করিতে গিয়া ব্যথাহত না হয়, সেইজন্য কোটরের সারা গাত্রে একপ্রকার পাতলা চর্বি লাগানো থাকে; ইহা অনেকটা মবিল্ অয়েলের কাজ করে। তাহা ছাড়া, সেলোফেন্ কাগজের মত পাতলা ও স্বচ্ছ একটি ঝিল্লী চক্ষুগোলকের সম্মুখভাগকে ঢাকিয়া রাখে। ইহার নাম **নেত্রকলা** (Conjunctiva)। এই পদার্থটি একপ্রকার পাতলা রসে সর্বদা নরম ও ভিজা থাকে। বাহিরের সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা অন্যবিধ ময়লা চক্ষে পড়িলে এই রসে আট্কাইয়া যায় এবং খানিকক্ষণ পরে ময়লা মিশ্রিত রস এক কোণে গিয়া জমে।

সর্বোপরি আর প্রকার ব্যবস্থা আছে, যাহাতে চক্ষু দুইটিতে বাহিরের ময়লা লাগিয়া উহাদের কোনো ক্ষতিসাধন করিতে না পারে। প্রতি চক্ষুর

বহিঃপ্রান্তে উপরের দিকে রগের হাড়ের তলায় একটি করিয়া **অশ্রুগ্রন্থি** (Lachrymal gland) আছে। এই থলি দুইটির মধ্যে ঈষৎ লবণাক্ত ও পরিশোধক অশ্রু প্রস্তুত ও রক্ষিত হয়। অশ্রুগ্রন্থিদ্বয় হইতে আলপিনের মত সরু ছয়-সাতটি নল দুই চক্ষুর উপরের কোণ পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। চক্ষুর উপর কোনো ধূলি বা বালুকণা অথবা পোকামাকড় উড়িয়া পড়িলে, তৎক্ষণাৎ দুইটি অশ্রুগ্রন্থি হইতে প্রচুর জল গড়াইয়া পড়িয়া ঐগুলিকে ধুইয়া বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে। নাসিকার ঊর্ধ্বভাগে দুই কোণে দুইটি সরু ছিদ্র চক্ষুর্দ্বয়ের ভিতর দিকের দুই কোণের সহিত সংযুক্ত; তাই চক্ষুর জল অতিরিক্ত হইলে নাসারন্ধ্র দিয়া গড়াইয়া পড়ে। তারপর চক্ষুদুইটিকে অতিশয় প্রখর আলোক বা সম্ভাব্য আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপর ও নীচে এক জোড়া করিয়া লোমযুক্ত অক্ষিপত্র রহিয়াছে। ভয়াবহ দৃশ্যে, লজ্জায়, প্রচণ্ড শব্দে, প্রগাঢ় চিন্তায়, অতিরিক্ত ক্লান্তিতে ও নিদ্রায় দুই চক্ষুর চারিটি পত্র মুদিত হইয়া যায়।

নেত্রকলার নীচে একটু পুরু ও রীতিমত শক্ত একটি শ্বেতবর্ণের আবরণী রহিয়াছে। ইহার ইংরাজী নাম Sclerotic coat। এই আবরণীর ঠিক মাঝামাঝি একটি গোলাকার উত্তল অংশ কাচের মত স্বচ্ছ; উহার নাম **অচ্ছোদপটল** (Cornea)। ইহার পশ্চাতে পাতলা রস-ভরা ছোট একটি স্বচ্ছ থলি বসানো আছে; ঐ রসের নাম aqueous humour। ঐ স্বচ্ছ রসপূর্ণ থলিটির পশ্চাদ্‌ভাগে—ব্যক্তিবিশেষে কালো, নীল, খয়েরী বা ঘন বেগ্‌নি রঙের একটি গোলাকার সংকোচন-প্রসারণক্ষম পাতলা পেশীময় পর্দা ঝোলানো রহিয়াছে। এই গোল পর্দাটির নাম **কনীনিকা** বা **অক্ষিতারকা** (Iris)। কনীনিকার মধ্যস্থলে একটি অন্ধকারময় ছোট ছিদ্র রহিয়াছে; ইহার নাম **তারারন্ধ্র** (Pupil)। জোরালো আলোয় কনীনিকা আপনা-আপনি কুঁচকাইয়া তারারন্ধ্রকে সরু করিয়া দেয়, আবার কম আলোয় উহা বিস্তারিত হইয়া তারারন্ধ্রকে চওড়া করিয়া দেয়—যাহাতে বেশী আলো ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখার সুবিধা করিয়া দিতে পারে। এই দুইটিই প্রতিবর্তী ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। এবং এই দুইটি ক্রিয়ার কর্তা হইল সমব্যথী ও পরা-সমব্যথী নার্ভ, তাহা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে।

কনীনিকা ও তারারন্ধ্রের পিছনেই ঝুলিয়া আছে **অক্ষিমুকুর** বা **অক্ষি-কাচ** (Lens)। অক্ষিমুকুর হইল কাচের মত স্বচ্ছ, দুইদিকে উত্তল (double convex) একটি ক্ষুদ্র স্থিতিস্থাপক চাকৃতি বিশেষ। ইহার আকার অনেকটা ছেলেদের খেলার পিস্তলের ক্যাপের মত। অক্ষিমুকুরের উপরের প্রান্তে একটি ও নীচের প্রান্তে একটি পেশীসূত্র সংলগ্ন রহিয়াছে। এই দুইটি পেশীসূত্র টান্‌টান্ বা শ্লথ হইয়া অক্ষিমুকুরের উত্তলতা বাড়াইয়া ও কমাইয়া দেয়। অক্ষি-মুকুরটির একমাত্র কাজ হইল—আলোর জগৎ হইতে আগত প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তির রূপটি ইহার উপর প্রতিফলিত হইলে, তাহাকে যথাসাধ্য সুস্পষ্ট করিয়া (focus) চক্ষুর পশ্চাদংশে পাঠাইয়া দেওয়া। এই অক্ষিমুকুরটিকেই প্রাকৃত জনেরা 'চোখের মণি' বা 'নয়নমণি' বলিয়া থাকে।

প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যবয়সে এমন একটি সময় আসে যখন অক্ষিমুকুর তাহার স্থিতিস্থাপকতা-গুণ কিয়ৎপরিমাণে হারায়। তখন সে আর স্পষ্ট করিয়া কোন ছবি চক্ষু-অভ্যন্তরে পাঠাইতে পারে না। সেইজন্য ঐ সময় চশমা লওয়ার প্রয়োজন হয়।

অক্ষিমুকুরের পশ্চাতে আর একটি অপেক্ষাকৃত বড় থলি আছে যাহার মধ্যে একটু গাঢ় অনচ্ছ রস ভর্তি করা থাকে। এই থলিটি অক্ষিগোলকের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্থানই অধিকার করিয়া আছে। এই থলির ভিতরকার রসকে বলা হয় vitreous humour. থলির পশ্চাতে অক্ষিগোলকের অভ্যন্তর-ভাগের দেওয়ালের দুই-তৃতীয়াংশ একটি কালো আস্তরণ দিয়া আবৃত। ইহার নাম **কৃষ্ণচ্ছদ** (Choroid coat)। ইহার মধ্যে কুয়েকটি চুলের মত সরু সরু শিরা, ধমনী ও কয়েকটি জালক বিছানো রহিয়াছে।

প্রত্যেক চক্ষুর পশ্চাদংশে একটু নীচের দিকে একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়া অপেক্ষাকৃত মোটা একটি **অক্ষিনার্ভ** (Optic nerve) ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রবেশ করিয়াই উহা পাতলা, চ্যাপ্টা ও ঠাস্-বোনা জালের মত হইয়া চক্ষুর ভিতরকার দেওয়ালের পূর্বোক্ত কালো পর্দার উপর দিয়া নিজেকে বিছাইয়া রাখিয়াছে। তখন ইহার নাম হয় **অক্ষিপট** (Retina)।

স্বচ্ছ অক্ষিমুকুর ও রসপূর্ণ বৃহত্তর থলিটি ভেদ করিয়া রূপবাহী আলোকরশ্মি

পরিশেষে ঐ অক্ষিপটের একটি বিন্দুতে আসিয়া পতিত হয়। পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপের সংবেদনটি অক্ষিনার্ভ তৎক্ষণাৎ মধ্যমস্তিষ্কের এক স্থানে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং তথা হইতে আর এক প্রস্থ নার্ভতন্তুর সাহায্যে গুরু-মস্তিষ্কের পশ্চাদংশে দৃষ্টিকেন্দ্রে নীত হয়। এই কেন্দ্রে রূপের সংবেদনটি আসিয়া পৌছিলে, তবে আমাদের তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। রূপের প্রতিচ্ছবি চক্ষে পড়িবার এক সেকেণ্ডের শতাংশের এক ভাগেরও কম সময়ের মধ্যে দর্শনজ্ঞানটি জন্মে। অক্ষিপটে স্তরে-স্তরে গায়ে-গায়ে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঠি (rods) ও শঙ্কুবৎ (cones) পদার্থ লাগিয়া থাকে। বস্তুতঃ এইগুলিই কোনো বস্তুর সঠিক আকার, ঘনত্ব, দূরত্ব, রঙ্, দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিত প্রভৃতির বোধ-গ্রহণে আমাদিগকে সহায়তা করে।

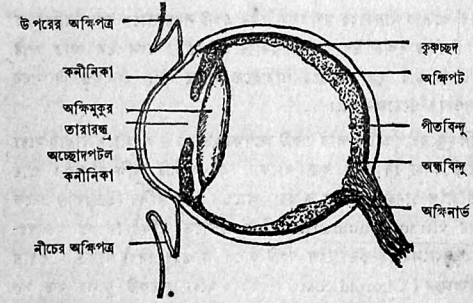

একটি অক্ষিগোলকের লম্বালম্বি-চেরা অর্ধাংশ পার্শ্ব হইতে যেরূপ দেখায়।

অক্ষিপটের সব জায়গাটুকুতে কাঠি ও শঙ্কুসমূহ সমভাবে সন্নিবিষ্ট নহে; কোন স্থানে অত্যন্ত বেশী সংখ্যক, কোন স্থানে কম আছে, কোন স্থানে একেবারেই নাই। অক্ষিপটের ঠিক মাঝামাঝি একটি বিন্দুকে **পীতবিন্দু** (yellow spot) বলে। এই স্থানটিতে কাঠি ও শঙ্কুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া, এই স্থানে রূপের ছবি পতিত হইলে, তাহা সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দেখায়; আলোক-রশ্মিও এই স্থানটিতে সর্বাপেক্ষা বেশী পতিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের

প্রত্যেক ছবির প্রতিফলন পীতবিন্দুতেই পতিত হয়, অর্থাৎ যাহাতে ঐ স্থানে পতিত হয় তজ্জন্য দ্রষ্টব্য বস্তুর সোজাসুজি আমরা মুখমণ্ডল ও অক্ষিগোলককে স্থাপন করি। অক্ষিনার্ভটি যে স্থানে অক্ষিগোলকের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থানে ও তাহার ঠিক উপরের দিকে অক্ষিপটের একটি ক্ষুদ্র স্থানে কাঠি ও শঙ্কু একেবারেই নাই। ঐ স্থানটি **অন্ধবিন্দু** (blind spot) নামে পরিচিত। এই স্থানে কোনো ক্ষুদ্র বস্তুর রূপের প্রতিফলন হইলে, তাহার কোন বোধই গুরুমস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে নীত হয় না। এক কথায়, ঐ ক্ষুদ্র বস্তুটি আমরা দেখিতে পাই না।

দৃষ্টিশক্তির হ্রস্বতাকে ইংরাজী চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বলা হয় *Myopia*। যাহারা এই উপসর্গে ভোগে, তাহারা ছোট ছোট জিনিস ও লেখার হরফ প্রভৃতি চক্ষের খুব নিকটে না আনিলে স্পষ্ট দেখিতে পায় না। এক্ষেত্রে চক্ষুগোলক সম্মুখে ও পশ্চাতে অস্বাভাবিকভাবে প্রলম্বিত হইয়া যায় বলিয়া কেন্দ্রিত আলোর ফোকাস্ অক্ষিমুকুরের মধ্য দিয়া আসিয়া অক্ষিপটের উপরে পতিত না হইয়া আল্‌গাভাবে উহার সম্মুখে পতিত হয়। অল্প আলোয় পড়াশুনা করিলে, চক্ষুশ্রান্তিকর সূক্ষ্ম কাজ অতিরিক্ত মাত্রায় করিলে এবং খাদ্যে ক্রমাগত পুষ্টির—বিশেষভাবে স্নেহজাতীয় পদার্থের—অভাব হইলে, দৃষ্টি-শক্তির এইরূপ হ্রস্বতা ঘটে। তখন রোগীকে চশমা ব্যবহার করিতে হয়, কারণ বহু ক্ষেত্রেই প্রলম্বিত অক্ষিগোলককে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায় না। চশমায় যে কাচ লাগানো হয়, তাহা সম্মুখের দিকে অল্পবিস্তর অবতল (concave) থাকে—যাহাতে অক্ষিমুকুরের প্রতিসরণ-ক্ষমতা কমিয়া যায়।

আবার অক্ষিগোলক সম্মুখে-পশ্চাতে একটু চ্যাপ্টা হইয়া গেলে, দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু একটু নিকটের জিনিস অস্পষ্ট দেখায়। ইংরাজী চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহাকে *Hypermetropia* বলে। এ ক্ষেত্রে রূপবাহী আলোক-রশ্মি অক্ষিপট অতিক্রম করিয়া বিশদতম হয় তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে। ইহাতেও চশমা লওয়ার প্রয়োজন হয়। ঐ চশমার কাচ অল্পবিস্তর উত্তল করা হয়।

বার্ধক্যে অনেকের চক্ষে ছানি পড়ে, তাহা আপনারা জানেন। ছানি আর কিছুই নয়, অক্ষিমুকুরের ক্রমশঃ স্বচ্ছতা-হ্রাস অর্থাৎ অনচ্ছ (opaque)

হইয়া যাওয়া। তদুপরি যে দুইটি স্থিতিস্থাপক পেশীসূত্র উহাকে মোটামুটিভাবে টান্ টান্ করিয়া ঝুলাইয়া রাখে, তাহাদের স্থিতিস্থাপকতা-গুণ নষ্ট হইয়া যায়। দরকারমত ইহারা আরো সঙ্কুচিত হইয়া অক্ষিমুকুরকে টান্‌টান করিতে পারে না অথবা শ্লথ হইয়া উহাকে আরো উত্তল করিতে পারে না। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, রূপবাহী আলোকরশ্মি অক্ষিমুকুরের মধ্য দিয়া অতি অস্পষ্টভাবে অক্ষিপটে গিয়া পতিত হয় এবং সেই অস্ফুট ছবি গুরুমস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে গিয়া পৌছায়। অক্ষিমুকুর শেষ পর্যন্ত ধূসর রঙের হইয়া, আলোকরশ্মিকে প্রায় সম্পূর্ণ প্রতিরুদ্ধ করিয়া দেয়। এই ত্রুটি কোনো ঔষধ দিয়াই দূর করা সম্ভবপর হয় না। তখন অক্ষিমুকুরকে উহার পৈশিক বন্ধনসূত্র হইতে কাটিয়া তারারন্ধ্র দিয়া বাহির করিয়া আনিতে হয়। কিছুদিন পরে অক্ষিমুকুরবঞ্চিত ব্যক্তি চশমা গ্রহণ করেন। ঐ চশমার কাচ অক্ষিমুকুরের মত দুইদিকে উত্তল থাকে; উহা বাহিরে থাকিয়া কৃত্রিম অক্ষিমুকুরের কাজ করে।

কর্ণযুগল

কর্ণের গঠনপ্রণালী চক্ষুর গঠনপ্রণালী অপেক্ষা কম জটিল নয়। প্রতি কর্ণের তিনটি পৃথক বিভাগ বা মহল আছে। (১) **বহিষ্কর্ণ**, (২) **মধ্যকর্ণ** ও (৩) **অন্তঃকর্ণ**।

বহিষ্কর্ণের তিনটি অংশ আছে।—(১) কর্ণপত্র (Pinna) বা কানের পাতা। ইহার নিম্ন প্রান্তের মুক্ত অংশকে আমরা 'কানের লতি' বলি। কর্ণপত্রের একমাত্র কৃত্য হইল—বাহির হইতে শব্দতরঙ্গ ধরিয়া কানের ফুটার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া।

(২) **কর্ণকুহর** বা কানের ফুটা (Auditory meatus)। এই ছিদ্র এক ইঞ্চির কিছু বেশী লম্বা, ক্রমশঃ সরু হইয়া ভিতর দিকে অল্প বাঁকিয়া গিয়াছে।

(৩) **কর্ণপটহ** বা কানের পর্দা (Tympanic membrane)। ইহা পাতলা হইলেও বেশ ঘাতসহ প্রায় গোল একটি চামড়ার পর্দা বিশেষ, কর্ণকুহরের শেষ প্রান্তকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে যেরূপ একটি গোল চামড়া ঢোলক

বা তব্‌লার মুখ মুড়িয়া রাখে। কর্ণপটহটি কর্ণকুহরের শেষাংশের দেয়ালে একটু অসমানভাবে সংলগ্ন থাকে। ইহার কোনো অংশ একটু বেশী পুরু, কোনো অংশ একটু পাতলা, কোনো অংশ একটু একটু শ্লথ, কোনো অংশ একটু বেশী

কর্ণপটহ ও তাহার গাত্রলগ্ন তিনটি অস্থিখণ্ড।

টান্‌টান্। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন গ্রাম ও পর্দার ধ্বনিতরঙ্গ আসিয়া কর্ণপটহে লাগিলে, তাহা সঠিকভাবে পটহ দ্বারা গৃহীত হইয়া মধ্যকর্ণে সঞ্চালিত হয়। কাহারো কাহারো মতে সাত অক্টেভের চেয়ে উচ্চতর গ্রামের স্বরও কর্ণপটহ যথাযথ ধরিতে পারে। অবশ্য সকলের কর্ণপটহ সমান শক্তিশালী নয়। আবার কাহারো কাহারো দুইটি কর্ণপটহ সমানভাবে ক্ষমতাশালী নয়। কেহ কেহ উচ্চতর গ্রামের বজ্রনাদ বা বাদুড়ের তীক্ষ্ণতম চীৎকার শুনিতে পান না।

মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ উভয়ই আমাদের রগের অস্থির ভিতরদিকে অবস্থিত। মধ্যকর্ণটি দেখিতে তিন-দিক-আবৃত প্রায় মৎস্যাকার ক্ষুদ্র গিরিগহ্বরের মত। মধ্যকর্ণের তলদেশ হইতে একটি সুড়ঙ্গ উদ্গত ও নিম্নাভিমুখী হইয়া গলবিলের (Pharynx) সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। এই সুড়ঙ্গটিকে ইংরাজীতে *Eustachian tube* বলে। প্রবল সর্দিকাশিতে গলবিলে শ্লেষ্মা জমিলে, অনেক সময় এই ইউস্ট্যাচিয়ান্ টিউবটি ফুলিয়া বেদনা হয় এবং কানের ভিতর কট্ কট্ করে। কোনো কোনো সময় মধ্যকর্ণ ও কর্ণপটহ ফুলিয়া সাময়িক বধিরতাও আনয়ন করে। মধ্যকর্ণের মধ্যে কর্ণপটহের বিপরীত গাত্র ছুঁইয়া অতি ক্ষুদ্র তিনটি অস্থিখণ্ড গায়ে-গায়ে লাগিয়া আছে। উহাদের

একটিকে দেখিতে হাতুড়ির মত (hammer), অন্যটিকে কামারের নেহাইয়ের মত (anvil) এবং তৃতীয়টিকে দেখিতে ঘোড়ার রেকাব বা পাদানের মত (stirrup)। শব্দতরঙ্গগুলি কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হইয়া পর-পর এই তিনটি হাড়ের টুক্‌রায় পরিচালিত হয়। তারপর ঐ শব্দতরঙ্গগুলি অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে।

অন্তঃকর্ণটি যেন একটি আকা-বাঁকা ঘুরপাক-খাওয়া অস্থিময় সুড়ঙ্গ, দেখিতে কতকটা গুগ্‌লির মত (Inner ear বা Cochlea)। অন্তঃকর্ণের গায়ে একটি ছোট ডিম্বাকৃতি ছিদ্র আছে এবং শেষপ্রান্তে জিলাপির প্যাঁচের মত তিনটি বিভিন্ন বেধের বৃত্তার্ধের আকারে বাঁকা নল সংযুক্ত রহিয়াছে। এগুলি এরূপভাবে সংবদ্ধ যে, পরস্পর পরস্পরের সহিত সমকোণ রচনা করিয়াছে। এই নলগুলি জলে ভরা থাকে। নল তিনটির মধ্যে এস্রাজের তারের মত সরু সরু ঝিল্লীনির্মিত বহুসংখ্যক তার আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে। মধ্যকর্ণের তিনটি ক্ষুদ্র অস্থিবাহিত শব্দতরঙ্গগুলি অন্তঃকর্ণের ডিম্বাকৃতি গবাক্ষের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং উপরিকথিত তিনটি নলের ভিতরকার বিভিন্ন পর্দার তারের গায়ে আঘাত করিয়া ধ্বনি-স্পন্দন তোলে। অন্তঃকর্ণের গায়ে বহুসংখ্যক শব্দগ্রাহী নার্ভের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রান্ত সংলগ্ন রহিয়াছে। সংবেদনবাহী নার্ভ ধ্বনি-স্পন্দনগুলি চকিতে গুরুমস্তিষ্কের শব্দগ্রাহী কেন্দ্রে বহন করিয়া লইয়া যায়। এখানে পৌছিলে তবে আমাদের শব্দের অনুভূতি জন্মে।

চর্ম

আমাদের গাত্রচর্ম সাত প্রকার বিভিন্ন অনুভূতি গ্রহণ করিতে সমর্থ ;— (ক) উত্তাপ, (খ) শৈত্য, (গ) সঞ্চাপ, (ঘ) বেদনা, (ঙ) সুখাবহ উষ্ণতা, (চ) সুখাবহ শীতলতা ও (ছ) মৃদু স্পর্শ। এই সাত প্রকার বিভিন্ন অনুভূতি সাত প্রকার বিভিন্ন নার্ভতন্তু গ্রহণ ও বহন করে। চর্মের তলায় এই সাত প্রকার সংবেদনবাহী নার্ভতন্তুর লক্ষ লক্ষ গ্রাহকপ্রান্তসমূহ আশেপাশে চতুর্দিকে কতকটা এলোমেলোভাবে ছড়ানো রহিয়াছে।

একটি শক্ত-রোমওয়ালা বুরুশ লইয়া আপনারা কেহ যদি হাতের বা পায়ের

উপর দিয়া ধীরে ধীরে বুলাইতে থাকেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, এমন একটি একপয়সা বা তদধিক পরিমাণ জায়গার উপর দিয়া উহা যাইতেছে যেখানে রোমগুলির প্রান্তের কোনো স্পর্শবোধই জাগাইতেছে না। একটি ইস্পাতের তৈয়ারি মসৃণ সরু কাঠি অল্প গরম করিয়া কোনো অঙ্গের নানাস্থানে পর পর ঠাসিয়া ধরিতে থাকুন ; এইরূপ করিতে করিতে এমন একটি জায়গায় ঐ কাঠিটি আসিয়া লাগিবে যেখানে আপনি কোনো উত্তাপ-বোধই পাইবেন না। ঠিক ঐ ভাবে একটি আলপিন লইয়া শরীরের নানাস্থানে অল্প অল্প বিঁধাইতে থাকুন, দেখিবেন এক-একটি বিন্দুতে আলপিন্ বিঁধাইলে কোনো ব্যথাবোধই হইতেছে না। কানের লতির মধ্যবর্তী স্থানে কোনো বেদনাবাহী নার্ভের গ্রাহকপ্রান্ত নাই। তাই এদেশের ছোট ছোট মেয়েদের ঐ স্থানটি বিঁধাইয়া একটি সরু কাঠি অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা অদূর-ভবিষ্যতে কানে আঁকড়ি-দেওয়া গহনা ঝুলাইতে পারে।

অতিক্ষুদ্র এক টুক্‌রা চর্ম লম্বালম্বি চিরিয়া বহুগুণ বড় করিয়া প্রদর্শিত। সকলের উপরে বহিস্ত্বক্, মাঝখানে সাদা স্থানটি ম্যালপিঝিয়ান্ স্তর, নীচে অন্তস্ত্বক্। একটি ঘর্মগ্রন্থির প্যাঁচালো নল বহিস্ত্বকের একটি ছিদ্রের সহিত সংযুক্ত।

স্তন্যপায়ী সকল শ্রেণীর জীবের ও মানুষের গাত্রচর্মের দুইটি স্তর আছে। বাহিরের চর্মকে বলে **বহিস্ত্বক** (Epidermis) ও তাহার নীচেকার চর্মকে বলে **অন্তস্ত্বক** (Dermis)। বহিস্ত্বকটি অতিশয় পাতলা ও বহুল পরিমাণে স্বচ্ছ। ঘর্মবিন্দু, কিছু দূষিত বায়ু ও একপ্রকার তরল চর্বি বাহির হইবার জন্য ইহার উপর দিয়া অসংখ্য লোমকূপ বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের অনেকগুলির মধ্য দিয়া লোম বাহির হইয়াছে। বহিস্ত্বক ও অন্তস্ত্বকের

মাঝখান দিয়া সমানভাবে "ম্যাল্‌পিঝিয়ান্ স্তর" নামে একটি অতি পাতলা স্তর লাগিয়া রহিয়াছে। এই স্তরটির গায়ে বিভিন্ন রঙের রঞ্জক পদার্থ লাগানো থাকে বলিয়া বিভিন্ন মানুষের গাত্রবর্ণ রকমারি হয়। যাহার গাত্রচর্ম যত বেশী কালো, তাহার ম্যালপিঝিয়ান্ স্তরটি তত বেশী পুরু হয়।

অন্তস্ত্বকের উপর দিয়া ও মধ্য দিয়া পূর্বোক্ত সাত প্রকার সংবেদনবাহী নার্ভের গ্রাহকপ্রান্তগুলি সাজানো আছে। সাধারণ মানুষের চর্মে অন্যান্য নার্ভের তুলনায় স্পর্শবোধবাহী নার্ভের গ্রাহকপ্রান্ত একটু বেশী সংখ্যক থাকে। এই নার্ভের গ্রাহকপ্রান্তগুলিও কয়েক আকারের হইতে দেখা যায়। *Paccinian corpuscles* নামক একপ্রকার স্পর্শবোধবাহী গ্রাহকপ্রান্ত অন্তস্ত্বকের একটু তলার দিকে সন্নিবদ্ধ থাকে। ইহাদের মাথাগুলি দেখিতে একটি প্রদীপের শিখার মত অথবা চিত্রকরের তুলির মত। হাতের আঙুলের ডগায়—বিশেষভাবে তর্জনীর অগ্রভাগে ঘন ঘন স্পর্শবোধবাহী গ্রাহকপ্রান্ত থাকে। এই জায়গায় দুইটি গ্রাহকপ্রান্তের মধ্যে সওয়া মিলিমিটার এক মিলিমিটারের বেশী ব্যবধান থাকে না; করতলে ঐ ব্যবধান প্রায় আট মিলিমিটার; আবার কাঁধে দুইটির মধ্যে প্রায় ৬৭ মিলিমিটার ব্যবধান থাকে।

জিহ্বা ও নাসিকা

জিহ্বা ও নাসিকায় বড় বেশী রকমের মাখামাখি ভাব বলিয়া আমরা একসঙ্গে এই দুইটির পরিচয় দিব। চক্ষু ও কর্ণের মধ্যে নার্ভসমূহের গ্রাহক-প্রান্তগুলির দ্বারা যে উদ্দীপনা গৃহীত হয়, সেগুলি আলোক ও শব্দের স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু নাসিকা ও স্বাদযন্ত্রের মধ্যে যে সকল গ্রাহক-প্রান্ত আছে, তাহারা প্রধানতঃ উদ্দীপিত হয় রাসায়নিক পরিবর্তনের দ্বারা। সেইজন্য কোনো কোনো দেহবিজ্ঞানী এই দুইটি ইন্দ্রিয়কে "রাসায়নিক ইন্দ্রিয়" বলিতে ভালবাসেন। জিহ্বার আগাগোড়া যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দিয়া মোড়া, সেই ঝিল্লীর মধ্যেই—কোথাও ঘন-ঘনভাবে, কোথাও ফাঁক-ফাঁক-ভাবে বহুসংখ্যক **স্বাদকোরক** (taste buds) অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সত্যই স্বাদগ্রাহী নার্ভের গ্রাহকপ্রান্তগুলি দেখিতে সদ্যোজাত অতি ক্ষুদ্র ফুলের কুঁড়ির

মত; অথবা ইহাদের আকৃতির সহিত সুতা জড়াইবার টাকুরও তুলনা করা যায়। এই স্বাদকোরকগুলির সমন্বয় সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে জিহ্বার অগ্রভাগে, দুই ধারের কিয়দংশে ও প্রায় শেষের দিকে মাঝামাঝি জায়গায়। কোন বস্তুর পূর্ণস্বাদ লাভ করিতে গেলে, তাহাকে যথাসাধ্য তরল করিয়া লইতে হয়। কঠিন খাদ্যও রীতিমত চর্বণ করিতে করিতে প্রচুর মুখলালার সহিত মিশাইয়া লইলে, তবে খাদ্যের স্বাদবোধ অনেকখানি সম্পূর্ণতা লাভ করে। খড়ি সহজে মুখলালার সহিত মিশিতে চাহে না; একখণ্ড খড়িকে দাঁতে গুড়াইবার সময় উহার কোনো আস্বাদই পাওয়া যায় না।

জিহ্বার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রসের স্বাদ গ্রহণ করিতে অপেক্ষাকৃত বেশী পটু। অন্য জায়গার চেয়ে মিষ্ট দ্রব্যের স্বাদ জিহ্বার অগ্রভাগে ও তিক্ত দ্রব্যের স্বাদ জিহ্বার শেষের দিকে বেশী পাওয়া যায়। সেইজন্য তিক্ত ঔষধ ঘাড় পিছন দিকে হেলাইয়া একেবারে গলবিলে ঢালিয়া দিলে বেশী তিক্ততা-বোধের দায় হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। আপনারা কেহ কেহ বোধ হয় জানেন যে, চায়ের স্বাদ-ধুরন্ধরগণ বিভিন্ন মিশ্রণের চা-পাতার লিকার শুধু একবার দুইবার, তিনবার করিয়া চুমুকই দেন না, জিহ্বার প্রত্যেক অংশে চায়ের দ্রব ঈষৎ স্পর্শ করিয়া করিয়া চাখিয়া দেখেন।

এই সূত্রে একটি আবশ্যকীয় তথ্য দয়া করিয়া মনে রাখিবেন। খাদ্যসমূহের স্বাদের তীব্রতা বা নিবিড়তা বাড়ায় উহাদের সুগন্ধ। পলান্ন-ব্যঞ্জন-পিষ্টকাদি যদি গন্ধবর্জিত হইত, তাহা হইলে আমাদের খাওয়ার আগ্রহ অর্ধেক কমিয়া যাইত; জিহ্বাও স্বাদ-গ্রহণের উৎসাহ হারাইত। বিশেষ করিয়া এই গন্ধের জন্যই রন্ধিত দ্রব্যে রকমারি মশলা দেওয়ার প্রথা প্রত্যেক সভ্য ও অর্ধসভ্য দেশে প্রচলিত আছে। রন্ধিত খাদ্যপদগুলি গরম-গরম খাইতে কেন এত ভালো লাগে জানেন? কারণ ঐগুলি হইতে যে সুগন্ধের ভাপ উত্থিত হইয়া আমাদের নাসিকায় প্রবেশ করে, তাহাই একদিকে যেমন আমাদের স্বাদবোধ শাণিত করে, অন্যদিকে তেমনি আমাদের খাওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি করে। সেইজন্য আমরা ঠাণ্ডা খাদ্য যে পরিমাণে খাই, গরম খাদ্য তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে খাইতে পারি।

একজন পণ্ডিত জনকয়েক বিভিন্নবয়সী ব্যক্তির চোখ বাঁধিয়া ও কয়েক সেকেণ্ড কাল তাহাদের নাক বন্ধ করিয়া রাখিয়া, এক টুকরা পিঁয়াজ তাহাদের মুখে দিয়া চিবাইয়া বস্তুটির স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উহা যে পিঁয়াজ তাহা বলিতে পারে নাই। কেহ উহাকে ট্যাপারি, কেহ-বা উহাকে জাম বলিয়াছিল।

গন্ধেন্দ্রিয়টি হইল আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রহস্যমণ্ডিত, সেইজন্য পণ্ডিতগণ ইহার ক্রিয়াকলাপের সম্পূর্ণ তত্ত্ব আজ পর্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। নাসিকার অভ্যন্তরভাগের আগাগোড়া লোহিতাভ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর যে আস্তরণ আছে, তাহার মধ্যেই গন্ধগ্রাহী নার্ভগুলির গ্রাহকপ্রান্তসমূহ প্রোথিত রহিয়াছে। মজা হইল এই যে, একই রকমের গন্ধ একাদিক্রমে একটু বেশীক্ষণের জন্য গন্ধবাহী নার্ভগুলি গ্রহণ করিলে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, সেইজন্য দেহধারীর মস্তিষ্কে একইরূপ গন্ধের তীব্রতা-বোধ ক্রমশঃ কমিয়া আসে। কিন্তু নার্ভগুলি যেই অন্যরূপ গন্ধ পায়, অমনি তাহারা পূর্ববৎ সতেজ হইয়া উঠে। গন্ধ বলিয়া আমরা যাহা কিছু পাই, তাহার উদ্দীপক নানাপ্রকার সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ গ্যাস, ভাপ্ বা বস্তুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু ছাড়া আর কিছুই নহে। নাসিকার মধ্যে যদি শ্লেষ্মা জমে, তাহা হইলে গন্ধগ্রাহী গ্রাহকপ্রান্তগুলি গন্ধসংবেদনসমূহ ধরিতে পারে না, কারণ তাহারা শ্লেষ্মার তলায় চাপা পড়িয়া থাকে। সমস্ত জাগতিক দ্রব্যের মধ্যে মৃগনাভির গন্ধ-গ্যাস বিতরণের ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা অধিক। কুকুরের তুলনায় মানুষের গন্ধবোধ শক্তি অনেক কম, যদিও অনেক বেশী সূক্ষ্ম।

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ—স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক

এইবার আমরা সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে কিছু তুলনামূলক আলোচনা করিব। 'সংবেদন' ব্যাপারটি কি সে সম্বন্ধে আপনাদের নিশ্চয়ই এতক্ষণ একটা সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। তথাপি প্রাসঙ্গিকভাবে সংক্ষেপে পুনরনুশীলন করিলে ও নূতন কিছু বলিলে, বোধহয় আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিব না।

এই সমগ্র জগৎটাই আমাদের বৃহত্তর পরিবেশ। আমাদের অব্যবহিত ক্ষুদ্রতর পরিবেশ হইল আমাদের পরিবার। তাহার বাহিরে আরো কিছু বড় পরিবেশ হইল আমাদের পাড়া, আমাদের স্কুল, কলেজ, অফিস, ক্লাব, সমাজ। আরো বড় হইল আকাশ-আলো-বায়ু-জল-ঋতু-খাল-বিল-নদী-পুষ্করিণী-বাগান প্রভৃতি যাহাদের প্রভাব আমাদের উপর প্রতিনিয়ত কিছু-না-কিছু পড়িতেছে এবং আমরাও যাহাদের উপর অতি ক্ষীণ হইলেও কিছু প্রভাব বিস্তার করি।

পরিবেশ কি করে? আমাদের প্রত্যেক গতিতে-স্থিতিতে, কর্মে-বিরামে, নিদ্রায়-জাগরণে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে অবিরত রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, শৈত্য, উত্তাপ ও বেদনার উদ্দীপনা পাঠাইতেছে সে। সেগুলি গ্রহণ করিতেছে কে? পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়-সংলগ্ন নার্ভসমূহ। ইহারা উদ্দীপনাসমূহ গ্রহণ করিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের পার্শ্ববর্তী অন্য একপ্রকার কেন্দ্র হইতে চেষ্টা বা ক্রিয়াশক্তিরূপে উদ্দীপনাগুলির উত্তর আসিতেছে আমাদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। ঐ উত্তরগুলিকে আপনারা প্রতিক্রিয়াও বলিতে পারেন। এই সকল বহিরাগত উদ্দীপনা আপন সত্তার মধ্যে অনুভব করাই হইল সংবেদন (sensation)। আপনাদিগকে বোধ হয় বার বার মনে করাইয়া দিতে হইবে না যে, প্রত্যেক উদ্দীপনা ও তাহার প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ ও উৎপাদন করে মস্তিষ্ক-সুষুম্নাকাণ্ডীয় নার্ভতন্ত্র।

এ কথা যেমন সত্য, তেমনি ইহার উপর আমাদের বিমূর্ত মন রহিয়াছে তাহাও সত্য। মনই মস্তিষ্ক-সুষুম্নাকাণ্ডীয় নার্ভতন্ত্রের নিয়ামক, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। যে-কোন উদ্দীপনা ও তজ্জনিত ইন্দ্রিয়জ্ঞানই আমাদের হউক না কেন, তাহার ফলে আমাদের মনে কিছু-না-কিছু আবেগ বা প্রক্ষোভ উপস্থিত হয়—এ কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি কি? যে-কোন ইন্দ্রিয়জ্ঞান আমাদিগকে হয় আনন্দ নতুবা নিরানন্দ দেয়, হয় সুখ নতুবা দুঃখ দেয়, হয় স্বাচ্ছন্দ্য নতুবা অস্বস্তি দেয়। মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ড এই সকল ভোগ করিতে পারে না, ইহা যান্ত্রিক অনুভূতিরও উচ্চতরের জিনিস—যাহা ভোগ করিবার কর্তা হইল মন। মনস্তত্ত্বের বইয়ে আমরা আত্মাকে লইয়া টানাটানি করিব না, তাহা আপনাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি।

এই সকল উদ্দীপনার পরিশেষ গ্রাহক যে মন, তাহার আরো প্রমাণ আপনাদিগকে দিতে পারি। দুই-একটি এখানে দিই। প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির একই আকার-প্রকারের মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড আছে, এ কথাটা আপনারা নিশ্চয়ই মানিবেন; তথাপি বিভিন্ন মানুষের দ্বারা যে-কোন একটি সংবেদন নিক্তির ওজনে ঠিক সমানভাবে গৃহীত হয় না, তাহার প্রতিক্রিয়াও সমান হয় না। তাহা ছাড়া এক-একপ্রকার সংবেদন এক-একজন বেশী-কম পছন্দ করেন, আর একজন আদৌ পছন্দ করেন না। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ নিশ্চয়ই আছেন যাঁহারা মুর্গীর মাংস খাইতে ভালবাসেন, গরম গরম মুর্গীর স্টু আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, জিহ্বায় প্রচুর লালা-নিঃসরণ হয়। আবার কেহ কেহ আছেন যাঁহারা মুর্গীর মাংস খাওয়া দূরের কথা, উহার নাম শুনিলেই ওয়াক্ তুলিতে থাকেন। আবার কেহ কেহ হিং-দেওয়া তরকারি ও খাবার যতখানি পছন্দ করেন, পিঁয়াজ-দেওয়া তরকারি ও খাবার ততখানি পছন্দ করেন না, হয়তো মোটেই পছন্দ করেন না। কেহ কেহ রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে কোনো গৃহ হইতে হিংয়ের ফোড়নের গন্ধ পাইলে, তাড়াতাড়ি নাকে রুমাল ঠাসিয়া ধরেন।

একটি ফুটন্ত গোলাপ বোধ হয় সকলেরই নয়নানন্দদায়ক। কিন্তু যদি আপনাদের মধ্যে দশজনকে জিজ্ঞাসা করা যায়—তাঁহারা গোলাপ বেশী পছন্দ

করেন না ডালিয়া বেশী পছন্দ করেন, তাহা হইলে কেহ বলিবেন 'গোলাপ', কেহ বলিবেন 'ডালিয়া'। আবার একটি ডালায় করিয়া দশ রকমের সুগন্ধ পুষ্প আনিয়া বলা হইল, 'যে ফুলের গন্ধ আপনাদের প্রত্যেককে সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করে, সেই ফুলটি তুলে নিন্।' দেখিবেন—দুই জনে গোলাপ, তিন জনে জুঁই, দুই জনে বেলা, দুই জন রজনীগন্ধা এবং একজনে চন্দ্রমল্লিকা তুলিয়া লইবেন। দেখুন, প্রত্যেক ফুলের গন্ধের উদ্দীপনা সমানভাবে সকলের নাসিকামধ্যস্থ গন্ধগ্রাহী নার্ভ বহন করিয়া মস্তিষ্কের গন্ধগ্রাহী কেন্দ্রে লইয়া যাইতেছে। প্রত্যেকের মস্তিষ্কের একটি চেষ্টাকেন্দ্র হইতে ফুল তুলিবার প্রেরণা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলির পেশীমধ্যে পৌছিতেছে, তথাপি কেহ গোলাপ, কেহ জুঁই ইত্যাদি তুলিয়া লইতেছেন কেন? ইহা কি মস্তিষ্ক করিতেছে না মন করিতেছে?

তারপর ধরুন রঙের কথা। কেহ লাল রঙ্ ভালবাসেন; সেইজন্য লাল ফুল, লাল কাপড়, লাল পর্দা, লাল শালুর লেপ পছন্দ করেন। আবার কেহ লাল রঙ্ দেখিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তিনি ভালবাসেন নীল। তাই তিনি নীল ফুল, নীল আকাশ, নীল পর্দা ও নীল রঙের ঘরের দেওয়াল পছন্দ করেন। এমন কি, বিভিন্ন দুগ্ধপোষ্য শিশুরও ভিন্ন ভিন্ন রঙের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়। এইভাবে একই তীব্রতার আলোর বোধ, শব্দের বোধ, স্বাদের বোধ, শৈত্যাতপ-বোধ প্রভৃতি সকলের কাছে সমান অনুপাতে পৌছিলেও অনুভূত হয় না, এবং তাহা সমান প্রতিক্রিয়াও জাগায় না। ইহার জন্য নিশ্চয়ই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মন দায়ী। নয় কি?

সংবেদনের স্বভাববৈশিষ্ট্য

এইবার আপনাদিগকে সংবেদনের কতকগুলি স্বভাববৈশিষ্ট্যের সহিত পরিচিত করিতে চাই। একটি সংবেদনকে অন্য একটি সংবেদন হইতে পৃথক বলিয়া কি করিয়া ধরা যাইতে পারে?

(১) প্রথমতঃ, **গুণের** (quality) দ্বারা একটি সংবেদনকে অন্য সংবেদন হইতে পৃথক করা যায়। পলাশ ফুলের রঙ্ লাল, শিরীষ ফুলের রঙ্ নীল।

এই দুইটি ফুলের বর্ণ-সংবেদন পৃথক। একটি সুস্থ ব্যক্তির গায়ে হাত দিলে যে তাপের বোধ হয়, একটি টাইফয়েড্ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গায়ে হাত দিলে তদপেক্ষা বেশী তাপের অনুভূতি পাওয়া যায়। এই দুই তাপের বোধে গুণগত পার্থক্য রহিয়াছে। তারপর বরফের শৈত্য, চায়ের উত্তাপ···ইত্যাদি।

গুণগত পার্থক্য হয় দুইটি কারণে:—(ক) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও সংবেদনস্থানের পার্থক্য-দ্বারা। দেখার ইন্দ্রিয় হইল চক্ষু, শোনার ইন্দ্রিয় হইল কর্ণ। ইহাদের সংবেদন গৃহীত হইতেছে মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে। আবার চর্ম বা ত্বকের উপর জোরে চাপ দিলে যে সংবেদনের সৃষ্টি হয়, তাহা এক শ্রেণীর স্পর্শবাহী নার্ভ-দ্বারা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কের আর একটি সংবেদন-কেন্দ্রে যায়। (খ) উদ্দীপকের পার্থক্য-দ্বারা। ইথারের ভিতর দিয়া যে আলোকরশ্মির তরঙ্গ আমাদের নয়নকে আঘাত করে, তদ্দ্বারা আমরা দেখিতে পাই; বায়ুর মধ্য দিয়া যে শব্দতরঙ্গ ভাসিয়া আসিয়া আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করে, তদ্দ্বারা আমরা শুনিতে পাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, দৃষ্টিবোধের উদ্দীপক ইথার-তরঙ্গ আর শ্রুতিবোধের উদ্দীপক বায়ুতরঙ্গ। আবার স্বাদবোধের উদ্দীপক বিভিন্ন রসের খাদ্যবস্তু। গন্ধবোধের উদ্দীপক নানা জাতীয় গ্যাস, পচনশীল দ্রব্যের বায়ু-বাহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা, ফুলের রেণু ইত্যাদি।

(২) দ্বিতীয়তঃ, **কালব্যাপ্তির** (protensity) দ্বারা। প্রত্যেক সংবেদনের একটা স্থায়িত্ব আছে; গুরুমস্তিষ্কের একটি কেন্দ্রে সময় সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান জন্মে। তিন দিন আগে ডি. সি. প্রবাহের বিজলীর তাজা তারে হাতের ছোঁয়া লাগিতেই আমি চেঁচট খাইয়া সভয়ে তাড়াতাড়ি পিছাইয়া আসিয়াছিলাম। এই বেদনার স্থায়িত্ব বোধ হয় অর্ধ সেকেণ্ড্। আজ দুপুরে ল্যাবরেটরিতে কাজ করিবার সময় একটা আঙুলে খানিকটা সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড্ লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। তাহার জ্বলুনি আমি বহুক্ষণ ধরিয়া ভোগ করিয়াছি; এখনো দপ্ দপ্ করিতেছে।

(৩) তৃতীয়তঃ, **পরিমাণ ও প্রাখর্য্যের** (quantity and intensity) দ্বারা। এক কিলো ওজনের জিনিস আধ কিলো ওজনের জিনিসের চেয়ে ভারী এ বোধ আমরা সহজেই পাই। একটি কুড়ি-ওয়াট্ বাল্বের চেয়ে ষাট

ওয়াট বাল্বের আলোর তীব্রতা অধিক—এ অনুভূতি আমাদের পাইতে বিলম্ব হয় না।

(৪) চতুর্থতঃ, সংবেদনের **স্থানব্যাপ্তির** (extensity) দ্বারা। এক চাংড়া বরফের উপর আমরা বাম হস্তের একটি আঙুলের ডগা কয়েক সেকেণ্ড রাখিয়াই বুঝিতে পারি শীতলতা-বোধ আমার শরীরের কতটুকু স্থান জুড়িয়া হইল, আবার পুরা হাতের চেটোটা বরফের উপর কয়েক সেকেণ্ড রাখিয়াই বুঝিতে পারি যে, পূর্বাপেক্ষা আরো খানিকটা বেশী জায়গায় শীতলতার অনুভূতি পাইলাম।

(৫) পঞ্চমতঃ, **অনুভবের গমকের** (feeling tone) দ্বারা। প্রত্যেক সংবেদনের অনুভূতি আমাদিগকে অল্পক্ষণের জন্যও কিছুটা খুশি বা অখুশি, অনুরাগ বা বিরাগ, কিছুটা শান্তি বা উদ্বেগের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে। কোনো কোনো সংবেদনের ছাপ আমাদের মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে গিয়া সঞ্চিত হয় এবং আমাদিগের মনকে দোলা দেয়। ঐ সকল কেন্দ্রকে স্মৃতির মধুচক্র বলিতে পারেন।

সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ

আমাদের দ্বারা গৃহীত ও অনুভূত সর্বপ্রকার সংবেদনকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(১) **পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারা লব্ধ সংবেদন**। ইহাদের কথা খানিকটা বিশদভাবে আপনাদিগকে পূর্বেই বলা হইয়াছে।

(২-৩) **সঞ্চালনজনিত সংবেদন** (kinaesthetic sensations)। আমাদের মস্তিষ্কে নানাবিধ সংবেদনজ্ঞান নীত ও গৃহীত হইলে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্র একাধিক পেশী ও গ্রন্থিমধ্যে যে চেষ্টা পাঠায়, তাহার ফলে আমরা নানাবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করি। হাঁটা, দৌড়ানো, লাফানো, চলা, বলা, মারা, ধরা, হাসা, কাঁদা, লেখা, পড়া, নাচা, গান করা, খেলা করা, খাওয়া, পরা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া, মোটর চালানো, পূজা করা, নমাজ পড়া ইত্যাদি ক্রিয়াগুলিতে একসঙ্গে বহু পেশী সক্রিয় হয়। সকল

ক্ষেত্রে যে এই কাজগুলি বাহ্য উদ্দীপনের উত্তররূপে বা প্রতিক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়—তাহা নহে। কোনোরূপ আন্তরিক প্রেরণা-বশে, কোনো জৈব প্রয়োজনের খাতিরে, কোনো ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার তাগিদে এই পেশীগুলি বিভিন্নভাবে সঙ্কুচিত-প্রসারিত হয়। পেশীগুলির সহিত সন্ধিস্থলগুলি, সন্ধিবন্ধনীগুলি, কণ্ডরা প্রভৃতিও একযোগে নড়াচড়া করে। এই সকল পেশী, গ্রন্থি, সন্ধিবন্ধনী প্রভৃতির সঞ্চালন সম্বন্ধে অবিরত আমাদের মস্তিষ্কে একটা সংবেদন পরিবাহিত হয়, যে সংবেদনকে বলা হয় 'সঞ্চালনজনিত সংবেদন'। এমন কি, বিশ্রামকালে ও সমস্ত পেশীর নিষ্ক্রিয় অবস্থানের কালেও একটা অনুভূতি মস্তিষ্ক তথা মন কর্তৃক উপলব্ধ হয়, তাহাকে **নিশ্চেষ্টতাজনিত সংবেদন** (somaesthetic sensation) বলা হয়।

(৩) **জৈব সংবেদন** (Organic sensation)। এমন কতকগুলি সংবেদন আছে যাহারা কোনো জ্ঞানেন্দ্রিয় মারফৎ মস্তিষ্কে নীত হয় না, তাহারা আমাদের শারীরবৃত্তিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিভিন্ন আভ্যন্তরিক যন্ত্র হইতে তৎসংলগ্ন সংবেদন-নার্ভতন্তুর দ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়; অথবা তাহারা সমগ্র শরীরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা তদ্বিপরীত অবস্থার সংবেদন উৎপন্ন করে। কোনো কোনো সংবেদন শরীরের কোন একটা নির্দিষ্ট স্থান বা যন্ত্রের মধ্য হইতে উত্থিত হয় না, ভাসাভাসাভাবে শরীরের সর্বাংশ হইতে উদ্ভূত হয়, অথচ বাহির হইতে কোনো উদ্দীপনাই পায় না। এইগুলিকে "জৈব সংবেদন" বলা হয়। কখনো এই সংবেদনগুলি স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট। ক্ষুধাবোধ, তৃষ্ণাবোধ, স্নান না করিয়া বা রৌদ্রে ঘুরিয়া সমস্ত শরীরে উত্তাপবোধ, গা ম্যাজ-ম্যাজ করা, গা-বমি-বমি করা, গিলিবার সময় ও খাদ্যমণ্ড অন্ননালীর ভিতর দিয়া নীচে নামিবার সময় টের পাওয়া, বুক বা পেটের মধ্যে অস্বস্তিবোধ, পেটের অন্ত্র-মধ্যে ভুটভাট করা বা গ্যাসের চাপ অনুভব করা, অতিরিক্ত ঘর্মস্রাবে অস্বাচ্ছন্দ্য, দেহের উপরিভাগে বিন্যস্ত র‍্যাডিয়াল্ আর্টারি প্রভৃতির মধ্য দিয়া শোণিতপ্রবাহের গতিবেগবোধ প্রভৃতি এই জাতীয় সংবেদনের দৃষ্টান্ত। তদুপরি প্রিয়জনের সাক্ষাৎ বা সঙ্গলাভের অথবা আসঙ্গলিপ্সাজনিত উদগ্র চাঞ্চল্য, সন্তোষজনক আহারের পর সমগ্র দেহবিসারী তৃপ্তির জড়িমা, সহবাসের পর

একটা লঘু স্বাচ্ছন্দ্যের মধুময় আবেশ···প্রভৃতিকেও জৈব সংবেদন নামে অভিহিত করা যায়, যদিও এই সকল সংবেদনে মন একটা গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করে।

অসংবেদন ও আসংবেদন

এখন আমরা সংবেদনের অভাব ও অল্পতা লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করিতে চাই।

আপনাদিগকে বোধ হয় না বলিলেও চলিবে যে, কোনো জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কিংবা সমস্ত দেহের বা তাহার অংশবিশেষের চর্মের বা তাহার তলদেশের পেশীসমূহের সংবেদন-গ্রহণের পূর্ণ অক্ষমতাকেই বলে **অসংবেদন** (Anaesthesia)। ঐরূপ সংবেদন গ্রহণের অল্প ক্ষমতাকে বলে **আসংবেদন** (Hypesthesia)। সাধারণতঃ আমরা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে ত্বক্‌ঘটিত অসংবেদনের কেস বেশী দেখিতে পাই। এইরূপ অসংবেদন সমস্ত দেহ জুড়িয়া হইতে পারে, একটি অঙ্গের সমস্ত অংশে বা কতকাংশে হইতে পারে; সাময়িক হইতে পারে, দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে, বাহ্য কারণে হইতে পারে, আন্তরিক কারণে হইতে পারে। আন্তরিক কারণের আর একটি নাম 'জৈব কারণ'।

কোন একটি অঙ্গের এক বা একাধিক নার্ভতন্তুতে আঘাত, নার্ভের অনুভূতি বহন-পথে কোনো বাধার সৃষ্টি, মস্তিষ্কের উপরিতলে ত্বাচিক্ অনুভূতির কেন্দ্রে কোনো ক্ষত বা বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি কারণে অসংবেদন দেখা দিতে পারে। এমন এক-এক প্রকার ত্বাচিক্ অসংবেদন ঘটিতে দেখা যায়, যে ক্ষেত্রে শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে বেদনার অনুভূতি চলিয়া যায় এবং তাপশূন্যতা দেখা দেয়, কিন্তু মৃদুস্পর্শের অনুভূতি অব্যাহত থাকে। কোনো স্থানে কোকেন-দ্রব প্রয়োগ করিলে, কিছুক্ষণ তথাকার যন্ত্রণার অনুভূতি থাকে না বটে, কিন্তু তাপ ও স্পর্শানুভূতি বজায় থাকে।

আবার এমন ত্বাচিক্ অসংবেদন প্রকটিত হইতে পারে—যেখানে ত্বকের যে সাতটি অনুভূতিঘটিত ক্রিয়া আছে, শরীরের খানিকটা স্থান ব্যাপিয়া সেই

সাতটি সংবেদনই বন্ধ হইয়া যায়। ইহার অর্থ হইল যে, ওই আক্রান্ত স্থানটিতে যে সাত প্রকার অনুভূতিবহনকারী নার্ভ আছে, তাহাদের শাখাপ্রশাখা ও সিন্যাপ্সগুলিতে কোনো গুরুতর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে ; অথবা কোনো দৈহিক বা মানসিক কারণে ওখানকার সিন্যাপ্সগুলি এই অনুভূতি বহনে বাধা দিতেছে অথবা তাহাদের সংশ্লিষ্ট অ্যাক্সনগুলির সহিত তাহারা সংযোগ হারাইয়াছে। এমন রোগী আমরা দেখিতে পাই যাহার একটি হাতের কব্জি পর্যন্ত অসাড় হইয়াছে ; অথবা পায়ের পাতা হইতে গোড়ালি পর্যন্ত অসংবেদনশীল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ হাতের ও ঐ পায়ের বাকি অংশটুকুতে সর্বপ্রকার সংবেদন-ক্ষমতা বজায় রহিয়াছে। অনেক সময় সংবেশনজনিত অভিভাব (hypnotic suggestions) দ্বারা শরীরের এক-একটি স্থানে অথবা শরীরের সমগ্র ত্বকে অসাড়তা অথবা সর্বপ্রকার সংবেদনশূন্যতা অস্থায়িভাবে আনয়ন করা যায়। পরে সংবেশক বিপরীত অভিভাব-দ্বারা আবার সংবেশিতের এই অসামর্থ্য দূর করিয়া দিতে পারেন।

বেদনাঘটিত অসংবেদন (analgesia) বা আসংবেদন কৃত্রিমভাবে ঔষধ-প্রয়োগের দ্বারা হইতে পারে। বিনা ঔষধেও স্বাভাবিকভাবে অথবা বিশেষ বিশেষ রোগেও হইতে পারে। প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির একই প্রকার একই সংখ্যক বেদনাবাহী নার্ভতন্তু বিন্যস্ত রহিয়াছে চর্মনিম্নে ও পেশীতন্তুগুলির মধ্যে। অথচ যন্ত্রণাবোধ সকলের সমান নহে, তাহা আপনারা জানেন। এমন এক-একটা স্বাভাবিক লোক দেখা যায়, যাহারা শরীরের উপর সাবলীলভাবে যে যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে, তাহার অর্ধেক যন্ত্রণা পাইলে অন্য লোক কাঁদিয়া গগন ফাটায়। কোনো কোনো ব্যক্তির শিশুকাল হইতেই বেদনার অনুভূতি-গ্রহণের শক্তি কম বলিয়া তাহাদিগকে দৈহিক শাস্তির মাধ্যমে সুশিক্ষা দেওয়া কষ্টকর। এই সকল শিশুদের কেহ কেহ গুপ্ত বিপ্লবী হইতে পারে, কেহ কেহ সৈন্যদলভুক্ত হইতে পারে ; আবার কেহ কেহ অসংশোধনীয় গুণ্ডাও হইতে পারে। পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়া প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত লোকেরা হাজার রকমের দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করিলেও কিছুতেই উহারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে না অথবা সহযোগীদের নাম প্রকাশ করে না।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে চড়কের সময় চড়কতলার মাঠে কতকগুলি লোক আগুনঝাঁপ কাঁটাঝাঁপ বঁটিঝাঁপের খেলা দেখাইত। ইহারা বাবা বিশ্বনাথের বিশেষানুগৃহীত ভক্ত নয়, বাল্য হইতেই প্রায় বেদনা-সংবেদনশূন্য। কোনো কোনো বুজরুগ্ সন্ন্যাসী ও দরবেশ লোহার মোটা-মোটা কাঁটাযুক্ত পাটার উপর ছাই মাখিয়া খালি গায়ে শুইয়া থাকে, আপনারা অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বোধ হয় কিছু খয়রাৎও করিয়াছেন।

আমাদের ও অন্যান্য দেশে হাজারে হাজারে এরূপ স্ত্রীপুরুষ দেখা যায় যাহারা প্রচুর বেত্রাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত প্রভৃতি রকমারি দৈহিক যন্ত্রণা না পাইলে কামোত্তেজিত হয় না। এরূপ উদাহরণ আমরা বিশ্বস্তসূত্রে সংগ্রহ করিয়াছি যে, কোন স্বামী এক-একদিন তাঁহার পত্নীকে তাঁহার পৃষ্ঠে কোমরে ও নিতম্বে সজোরে ক্রমাগত কিল, চড় ও লাথি মারিতে বলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ করিলেই তাঁহার প্রবল ধ্বজোত্থান ঘটে এবং তিনি উন্মত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পত্নীকে শয্যাশায়িনী করিয়া তাঁহাতে উপগত হন। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এরূপ পত্নীও দেখা যায়, যাহারা পানোন্মত্ত বা স্বাভাবিক অবস্থায় পতিপ্রবর তাহাদিগকে নখাঘাত, দংশন বা চাবুক-প্রহারে জর্জরিত ও রক্তাপ্লুত না করিলে, আসঙ্গলিপ্সু হইতে ও রমণের পূর্ণস্বাদ উপলব্ধি করিতে পারে না।

এইবার আমরা দৃষ্টিজনিত অসংবেদন ও আসংবেদনের কথা কিছু বলিব। আলোকের প্রতিসরণের দোষে যে দৃষ্টিশক্তির অল্পতা সমুপস্থিত হয়, তাহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই চশমা লইলে সারিয়া যায়। চক্ষের অচ্ছোদপটল, নেত্রকলা, কনীনিকা প্রভৃতির কোন ব্যাধি হইলে তাহার ঔষধ আছে। চোখে ছানি পড়িয়া দৃষ্টি ব্যাহত হইলে, অক্ষিমুকুর অপসারিত করাইয়া চশমা গ্রহণ করিলে, প্রায় স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কতকগুলি দৃষ্টির বিশৃঙ্খলা ঘটিতে দেখা যায় যেগুলির জন্য অক্ষিপট, রূপগ্রাহী নার্ভ বা দৃষ্টিকেন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তা বা অপক্রিয়তা দায়ী।

বর্ণান্ধতা শব্দটি আপনারা বোধহয় শুনিয়াছেন, কিন্তু কোনো বর্ণান্ধ ব্যক্তির সহিত আপনাদের কাহারো পরিচয় আছে কি ? যাহাদের আংশিক

বর্ণান্ধতা দোষ আছে, তাহারা লাল রঙ্ ও সবুজ রঙ্ চিনিতেই পারে না। যাহাদের পুরাপুরি মাত্রায় বর্ণান্ধতা-রোগ দেখা দিয়াছে, তাহারা হলদে ও নীল রঙও বুঝিতে পারে না। তাহারা দুনিয়ার যাবতীয় সামগ্রীই বিভিন্ন গাঢ়ত্বের ধূসর বর্ণরঞ্জিত বলিয়া জ্ঞান করে। এইরূপ বর্ণান্ধতা কাহারো কাহারো শৈশব হইতে জন্মে। কাহারো কাহারো চক্ষে কোনো প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করার ফলেও এইরূপ হয়। আবার হিস্টিরিয়াগ্রস্তেরা মূর্ছাভঙ্গের পর কিছুক্ষণের জন্য এইরূপ উপসর্গের দ্বারা আক্রান্ত হয়। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইহা হইল অক্ষিপটের স্থায়ী বা অস্থায়ী বিচ্যুতি।

দুই চক্ষু যখন কোনো একটি বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তখন তাহা হইতে ৯০° ডিগ্রী দূর পর্যন্ত তাহার দৃষ্টিক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া থাকে। কাহারো কাহারো দৃষ্টিক্ষেত্রের প্রসর ৮০°, ৭০°, ৬০°, ৫০° পর্যন্ত, ক্বচিৎ তাহারো নীচে নামিয়া যায়; অর্থাৎ দুই পার্শ্বের দৃষ্টিসীমা সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। ইহাও অক্ষিপটের দোষে ঘটিয়া থাকে।

আর একপ্রকার মজার দর্শনজাত অন্ধতার ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়। এক-এক ব্যক্তি কোন স্থানে জড়ো-করা পাঁচটি জিনিসের মধ্যে একটি জিনিস দেখিতে পায় না। চোখের সম্মুখেই ফাউণ্টেন পেনটি পড়িয়া রহিয়াছে, একজন তাহা দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু তাহার আশে-পাশে একটি পেন্সিল, একটি কালির দোয়াত, একখানা খাতা, একখানি বই পড়িয়া আছে, তাহা সে স্পষ্ট দেখিতেছে। এইরূপ অন্ধতা বহু ক্ষেত্রে অল্পস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। আমরা এরূপ কেস দেখিয়াছি যে, কোনো মহিলার হিস্টিরিয়াজনিত মূর্ছা হইয়াছে। তাঁহার স্বামী, দেবর, দুই জা, বাড়ির দাসী ও অন্যান্য কয়টি ছেলেমেয়ে ছুটিয়া আসিয়া চারিদিকে ভিড় করিয়াছে। তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিবার পর তিনি ঘরের চতুর্দিকে ঘাড় ফিরাইয়া সকলকে দেখিয়া, অত্যন্ত শ্রান্ত হতাশ নিম্ন স্বরে বড় জাকে প্রশ্ন করিলেন, "দিদি, উনি কই?"....এইরূপ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুবিষয়ক অন্ধতাকে "Negative hallucination" বলে। সংবেশন দ্বারাও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা যায়। আর এক প্রকার অন্ধতার কথা আপনাদিগকে চক্ষুর সংস্থান-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি, মনে আছে তো?

বিভিন্ন মাত্রার আংশিক বধিরতা অথবা সম্পূর্ণ বধিরতা সকল বয়সের লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে দেখা যায়। কর্ণের তিনটি বিভাগের যে-কোন একটির কোন অংশে ক্ষতির ফলে এরূপ ঘটিতে পারে। কর্ণপটহ ফাটিয়া বা ছিঁড়িয়া গেলে, মধ্যকর্ণের তিনটি হাড়ের একটি নষ্ট হইলে বা উহার প্রাচীর স্ফীত হইলে অথবা মধ্যকর্ণে কোনরূপ আঘাত লাগিলে, বধিরতা দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। এমন এক-একজন লোক খুঁজিয়া পাইবেন যাহারা যে কথাগুলি তাহাদের ভালো লাগে সেইগুলিই শুনিতে পায়, বাকিগুলি শুনিতে পায় না। আবার, কোনো কোনো অর্ধ-বধির একই পর্দায় কোনো প্রয়োজনীয় কাজের আদেশ করিলে শুনিতে পায় না, কিন্তু গালাগালি দিলে বেশ শুনিতে পায়।

জিহ্বারও স্বাদগত অসংবেদন ও আসংবেদন কোনো কোনো লোকের মধ্যে পাওয়া যায়। যত কড়া রকমের টক্ বা তিক্ত খাদ্য তাহারা মুখে লউক্ না কেন, তাহা টক্ বা তিক্ত বলিয়া তাহাদের মনেই হয় না। তাহারা শুধু নিমপাতা-ভাজা টাক্না দিয়া এক থালা ভাত উজাড় করিতে পারে।

অতি-সংবেদন ও অপ-সংবেদন

অনুভূতির স্বভাবনির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলেই তাহাকে বলে অতি সংবেদন (*Hyperesthesia*)। সংবেদনবাহী নার্ভের অতিরিক্ত উত্তেজনা বা কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিলে অথবা সিন্যাপ্স্‌গুলির বাধাদানের শক্তি অতিমাত্রায় হ্রাস পাইলে, এরূপ অস্বাভাবিকতা ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। বেদনার অতি-সংবেদন বহু লোকের মধ্যে দেখা যায়। ইঞ্জেকশনের সূচ বিদ্ধ করিলে অনেক শিশুই প্রথমটা একটু ছটফট্ করিয়া পরে চুপ করিয়া যায়। কিন্তু এমন অনেক বুড়ো খোকা বা খুকী দেখা যায় যাহারা টিকা দেওয়ার ছুরি বা ইঞ্জেকশনের সূচ ছোঁয়াইলেই দাপাইতে থাকেন, কেহ কেহ সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলেন। অন্ধকারে শিশু ও বর্ষীয়ানগণ অল্পবিস্তর ভয় পায়, কিন্তু কোনো কোনো লোক একটু প্রখর আলোকে রীতিমত অস্বস্তি বোধ করে, এমন কি সশঙ্ক চাঞ্চল্য প্রকাশ করে। ইহাকে ইংরাজী বৈদ্যকশাস্ত্র বলে *Photophobia*। অত্যন্ত

দুর্বল দেহে, দীর্ঘ রোগভোগের বা একটানা কঠোর পরিশ্রমের পর অতি-সংবেদনজনিত উপসর্গ সহজে দেখা দেয়।

মিথ্যা-সংবেদন অর্থাৎ উদ্দীপক ব্যতিরেকেও ইন্দ্রিয়জনিত অনুভূতিকে বলে অপ-সংবেদন (*Paresthesia*)। ত্বকঘটিত অতি-সংবেদনে কোনো কোনো লোক বিনা উদ্দীপনায়ই কেহ যেন গায়ে আলপিন ফুটাইয়া দিতেছে, কেহ যেন সুড়সুড়ি দিতেছে, পোকামাকড়ের মত কিছু যেন শরীরের উপর দিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে, সমস্ত শরীরে কেহ যেন লঙ্কা বাটা মাখাইয়া দিয়াছে··· এই ধরনের অনুযোগ করেন। এগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই মানসিক ব্যাধির অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে হজমের গোলমাল ও ভয়কাতরতাও দেখা দেয়। এক-প্রকার উন্মাদাবস্থায় যেরূপ আসংবেদন বা অসংবেদন দেখা যায়, আর একপ্রকার উন্মাদাবস্থায় সেইরূপ অতি-সংবেদন বা অপ-সংবেদন প্রকাশ পায়।

কোনো কোনো লোকের সুস্থ অবস্থায়ও দৃষ্টিজনিত অপ-সংবেদন ঘটিয়া থাকে। কোনো বস্তুগত উদ্দীপনা ব্যতিরেকে ঐ সকল ব্যক্তি চোখের সম্মুখে দূর হইতে একটা আলোকপিণ্ড ছুটিয়া আসিতেছে দেখিতে পান, অন্ধকার ঘরে যেন একটা তারা আসিয়া পড়িল, যেন কতকগুলি নানা বর্ণের স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইয়া মিলাইয়া গেল···ইত্যাদি দেখিয়া চমৎকৃত হন্ এবং কোনো কোনো ভগবদ্ভক্ত এইরূপ দৃশ্যের সহিত ভগবানের বিশেষ করুণাকে সংশ্লিষ্ট করেন।

শ্রুতিজনিত অপ-সংবেদনের কেস ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। মনোবিকারের ক্ষেত্রেই যে এরূপ ঘটে তাহা নহে, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষও উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতেও বাহির হইতে কোনো চেনা বা অচেনা লোকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পায়; কেহ কেহ মনে করে একজন যেন তাহার কানের কাছে কতকগুলি অস্পষ্ট কথা বলিয়া গেল। কেহ কেহ বলে—মধ্যরাত্রিতে কানের কাছে বহুদিন-আগে-শোনা একটা গানের সুর শুনিয়া তিনি জাগিয়া উঠিয়াছিলেন।

সাম্প্রতিক কালের একটা ঘটনার কথা আপনারা নিশ্চয়ই সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন। স্পেনের কোনো দূর গ্রামের একটি ষোলো-সতেরো বৎসর বয়স্কা তরুণী তাহার গৃহসম্মুখের একটি মাঠে একটা নির্দিষ্ট পর্বদিনে একটা নির্দিষ্ট সময়ে দাঁড়াইলে, স্বর্গদূত সেন্ট্ মাইকেল তাহার সন্নিকটে আসিয়া

উপস্থিত হন্ এবং তাহার সহিত কিছুক্ষণ কথা বলিয়া অন্তর্হিত হন্। তরুণীটি ডানাওয়ালা দেবদূতটিকে স্পষ্ট দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু তাঁহার সুমধুর বাণী সে সুস্পষ্ট শুনিতে পায়—যদিও সমস্ত কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যেদিন সেন্ট্ মাইকেল স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া ঐ মেয়েটির সহিত কথা বলেন, সেদিন তাহার গৃহসম্মুখের ময়দান লোকে-লোকারণ্য হইয়া যায়। মেয়েটির ২।৩ হাত দূরে কেবল একজন যাজক দাঁড়াইয়া থাকিবার অধিকার পান্।

হাজার হাজার স্তব্ধবাক্ দর্শক দিনের আলোয় বিশদভাবে লক্ষ্য করে যে, মেয়েটি শুভ্র পোষাক পরিয়া মাঠের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়ায় এবং সেন্ট্ মাইকেলের আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তারপর সেন্ট্ মাইকেলের নীরব ও অদৃশ্য আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ও যুক্তপাণি হইয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শুনিবার জন্য মুদিতচক্ষে ঊর্ধ্ব চিবুকে নিশ্চল হইয়া দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে তাহার অধরযুগল অপার্থিব স্মিত ভঙ্গীতে স্ফুরিত হয় এবং সে নিজেও দুই-চারিটি কথা অস্ফুটভাবে বলে। তারপর সে মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে শুইয়া পড়ে। গত বৎসর হইতে যাজক ভদ্রলোক তাহার চৈতন্যলোপের উপক্রম দেখিলেই তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া, তাহাকে দুই বাহু মেলিয়া ধরিয়া ফেলিতেছেন।

এই ব্যাপারটিও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের গৈরিকে ছোপানো শ্রুতিঘটিত অপ-সংবেদনের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। দেবমন্দিরে হত্যা দিয়া প্রত্যাদেশ পাওয়া, দৈববাণী শোনা, দেবীমূর্তির সম্মুখে বসিয়া জপ করিতে করিতে কর্ণকুহরে অশ্রুতপূর্ব বাণী শোনা, প্রাচীন গ্রীসে ডেল্‌ফির অর‍্যাক্‌ প্রভৃতি এই শ্রুতিঘটিত অপ-সংবেদনের পরিশুদ্ধ সংস্করণ। আমাদের দেশে প্রায় ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের, ক্বচিৎ কোনো ক্ষেত্রে পুরুষদের উপর 'ভর' হয়। ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালী দেবী নাকি আবিষ্টের দেহমধ্যে আসিয়া আবির্ভূতা হন্। ভরগ্রস্ত ব্যক্তিগণ বাহ্য উদ্দীপনা ব্যতীত নানারূপ ধ্বনি এবং অর্থগর্ভ কথা শুনিতে পায়। ক্ষেত্রবিশেষে চক্ষু মুদিয়া রক্তমাংসময় শিব বা কালী-মূর্তিও দেখিতে পায়। আচ্ছন্ন বা অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় নানারূপ অনর্থপূর্ণ অঙ্গ-

বিক্ষেপ করে। এই অবস্থায় আবিষ্টগণ ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং রোগীদের জন্য ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী ও ব্যবস্থাপিত ঔষধপথ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফলদায়ক হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোটেই হয় না।

রোম্যান্ ক্যাথলিক বা গ্রীক ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস যে সমাজে প্রচলিত, সেখানে আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের অনুরূপ কোন কোন সরলবিশ্বাসী পল্লীনারীর উপর অকলঙ্কিনী কুমারী মেরী, কখনো বা সেণ্ট পল বা পিটার, কখনো বা সেণ্ট্ কলম্বা, কখনো বা সেণ্ট্ আগষ্টিনের আত্মা আসিয়া ভর্ করেন এবং কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী ও উপদেশ বিতরণ করেন। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, প্রোটেস্ট্যাণ্ট্ খৃষ্টান সমাজে, মুসলমান, শিখ বা পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারো উপর এইরূপ ভর হইতে ক্বচিৎ দেখা যায়। তবে জীন, হুরী, দানো, প্রেতাত্মা, মাম্‌দো প্রভৃতি ভর্ করে বটে।

আসল ব্যাপারটা হইল এই যে, যে ধর্মসম্প্রদায় মূর্তিপূজক নহে, দেবদেবীতে যাহাদের আস্থা নাই, তাহাদের মধ্যে এই ব্যাপার ঘটা সচরাচর সম্ভবপর হয় না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ দেবদেবী ও অবতারবাদে বিশ্বাস রাখিলেও ভারতীয় বৌদ্ধদের মধ্যে ক্বচিৎ এইরূপ ভরের সংঘটন হইতে দেখা যায়। আসলে এই ভর ব্যাপারটা হইল অংশতঃ আত্মাভিভবের দ্বারা আত্ম-সংবেশন ও অংশতঃ এক জাতীয় হিস্টিরিয়ার আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো কোনো রোগী একটা নির্দিষ্ট দিনে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই তথাকথিত দেব বা দেবীর ভর্ নিজের উপর আনয়ন করিতে পারে। অনেক সময় তাহারা অনুপস্থিত রোগীর রোগের নাম ও তাহার কতকটা-ফলপ্রদ ভেষজ বাতলাইয়া দিতে এবং উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মনের কথাও বলিয়া দিতে পারে কেন এবং কোন্ অন্তর্নিহিত শক্তির বলে, তাহার আলোচনা এখানে বিশদ করিয়া করা সম্ভবপর নয়।

দৃষ্টিগত আর এক প্রকার অপ-সংবেদন ঘটিতে দেখা যায় যাহাতে কোনো কোনো ব্যক্তি কোনো কোনো সময়ে প্রত্যেক দৃষ্ট বস্তু ও প্রাণী দুইটি করিয়া দেখে। ইহাকে ইংরাজীতে *Diplopia* বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূরের কোনো একটি জিনিসের উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, অবশ্য সেই জিনিসটি

একটিই দেখায়, কিন্তু তাহার সম্মুখে এক ফুট দেড় ফুট দুই ফুটের মধ্যে আশে-পাশে যত জিনিস থাকে তাহাদের প্রত্যেকটিকেই দুইটি করিয়া দেখায়। কাজেই আক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টির প্রসর খানিকটা বাড়িয়া যায়। এইরূপ কেন হয় জানেন? আমাদের প্রতি অক্ষিগোলকে যে তিন জোড়া করিয়া ছোট ছোট পেশীময় ফিতা আছে, সেইগুলি অল্পবিস্তর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ায় নিকটের জিনিস এইরূপ দুইটি করিয়া দেখায়; কারণ কাছের জিনিস সঠিক দেখিবার জন্য দুই চক্ষের অক্ষি-পেশীগুলির একযোগে সমভাবে সঙ্কোচন-প্রসারণ করার বেশী দরকার হয়—যাহাতে এক চোখের দৃষ্টি আর একটি চোখের দৃষ্টির উপর আপতিত হইয়া দৃষ্ট জিনিসটিকে স্পষ্টতর পরিদৃশ্যমান ও একটি বলিয়া প্রতীয়মান করে। কোনো কোনো মানসিক ব্যায়রামে এবং সাময়িকভাবে মাতালদের এই ধরনের অপ-সংবেদন হইতে দেখা যায়।

আর একপ্রকার স্পর্শঘটিত অপ-সংবেদন কাহারো গাত্রে উদ্ভূত হইতে দেখা যায়। ইহাকে ইংরাজীতে *Dyschiria* (ডিস্‌কাইরিয়া)। আপনারা এরূপ লোক দেখিয়াছেন কিনা জানি না—যিনি তাঁহার পৃষ্ঠদেশের বা পশ্চাদ্-উরুর কোনো স্থানে কণ্ডুয়নের ইচ্ছা হইলে, বেশ কিছুক্ষণ সেই স্থানটি বাহির করিতে হাতড়াইতে থাকেন। এমন কি, এক-একটি এমন লোকও আছে, যাহারা যেখানে সত্য চুলকানো দরকার, সে জায়গায় না চুলকাইয়া অন্য জায়গায় চুলকাইতে থাকে এবং তাহাতে তৃপ্তি না পাইয়া দারুণ অস্থিরতা প্রকাশ করে; আক্রান্ত জায়গাটি সে কিছুতেই বাহির করিতে পারে না।

আমি এমন একটি ভদ্রলোককে জানিতাম যিনি বহুকাল পূর্বে ইংরাজ-শাসনের আমলে কয়েক বৎসর নিয়মিতভাবে প্রত্যেক নামজাদা টীমের খেলা দেখিতে গড়ের মাঠে যাইতেন। লীগের এ-টীমের চ্যারিটি ম্যাচে ও শীল্ডের খেলায় গ্যালারিগুলি এমনভাবে দর্শকমণ্ডলীর দ্বারা ভর্তি হইয়া যাইত যে, প্রত্যেককে অত্যন্ত ঠাসাঠাসি করিয়া বসিতে হইত। যখনি তাঁহার প্রিয় দলের কেহ বিপক্ষদলকে একটি গোল দিত, তখনি তিনি উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিয়া তাঁহার দুই উরুদেশের উপরিভাগ সশব্দে ও সজোরে চাপড়াইতেন। প্রায় দিনই দারুণ উত্তেজনা বশে তাঁহার নিজের দক্ষিণ দিকের উরু না চাপড়াইয়া তিনি

তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটির উরুদেশ বেপরোয়াভাবে চাপড়াইতেন। অনেকেই রাগিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া তাঁহার উরুর উপর সবেগে বসাইয়া দিতেন; কেহ কেহ তাঁহার কব্জিটি মৃদুভাবে মুচ্‌ড়াইয়া দিয়া কড়া রকমের মন্তব্য করিতেন; কেহ কেহ-বা এই উদ্‌ভ্রান্ত চপেটাঘাত খুব বেদনাদায়ক না হইলে খুশিমনে গ্রহণ করিতেন।

কোনো কোনো সুস্থ লোককেও দেখিবেন, দেহের যে অ-দৃষ্ট স্থানে মশা বা কোনো পোকা কামড়াইতেছে, ঠিক সেই স্থানটিতে চপেটাঘাত করিয়া তাহারা মশা বা কীটটিকে কিছুতেই মারিতে বা ধরিতে পারে না। এই অসামর্থ্যের একটা স্বাভাবিক কারণ থাকিতে পারে। যাঁহারা ইতঃপূর্বে চর্মের সংস্থান ও ক্রিয়াতত্ত্ব একটু মন দিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারিয়াছেন যে, আমাদের চর্মের নিম্নে সাত প্রকারের স্পর্শবাহী নার্ভের গ্রাহকপ্রান্ত সমভাবে সম-ব্যবধানে সজ্জিত নাই। শরীরের কোনো স্থলে ঐগুলি বেশ ঘন ঘন, কোথাও কিছুটা ফাঁক্-ফাঁক্, কোথাও খুব বেশী ফাঁক্-ফাঁক্‌ভাবে বসানো থাকে। সেইজন্য এইরূপ বিপত্তি ঘটা অসম্ভব নয়। কিন্তু তথাপি উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলিকে এক-একটি ছোটখাটো ব্যাধিরূপেও গণ্য করা যায়। এই সকল স্পর্শ বা সঞ্চাপবাহী যে নার্ভগুলি কোনো স্থান হইতে সংবেদন-বহনে পূর্ব হইতে অভ্যস্ত, সেগুলির মধ্যে যোগসূত্র কোনো কারণে ছিন্ন হইয়া যায়; কাজেই ঐ স্থানের নিকটের কোনো স্থান হইতে কয়েকটি নার্ভ এই সংবেদনকে মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া যায়; তাহার ফলে সঠিক স্থানের স্পর্শসংবেদন জন্মে না।

এই সূত্রে আর একপ্রকার আশ্চর্যজনক অপ-সংবেদনের কথা বলিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের প্রথমাংশ শেষ করিব। এই অস্বাভাবিকতার ইংরাজী নাম *synesthesia* (সাইনেস্‌থেসিয়া)। এই ব্যাধিতে একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে উদ্দীপনা প্রযুক্ত হইলে সেই উদ্দীপনার সংবেদনটি যখন মস্তিষ্কের সংবেদন-কেন্দ্রে গেল, তখনি সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপনা ব্যতিরেকেই অন্য একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংবেদন-কেন্দ্রে আপনা-আপনি আর একটি সংবেদনের অনুভূতি হইল। ধরুন, কোনো পল্লীর এক নির্জন পথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ দূরের গাছতলা হইতে একটি রাখাল-বালকের সুমিষ্ট চড়া-গলায়-গাওয়া কোনো গানের একটি কলি

আপনার কানে ভাসিয়া আসিল—'বনের ফল মিষ্টি বড়, ও ভাই কানাই, একটু খা'না।' গানটি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার চক্ষের সম্মুখে একটি নীল আলোর চক্র বন্ বন্ করিয়া সেকেণ্ড কয়েকের জন্য ঘুরিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। এই আলোর চক্র সত্যকারের একটা উদ্দীপনাজাত নয়; ইহাকে স্বচ্ছন্দে আপনি 'অপ-সংবেদন' নামে অভিহিত করিতে পারেন।

এরূপ ব্যাপার ঘটে কেন জানেন? মস্তিষ্কে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়লব্ধ সংবেদন-কেন্দ্রগুলি পর পর ও কাছাকাছি সাজানো থাকে। যখন রাখালের গানের কলি শ্রুতিবাহী নার্ভ-দ্বারা বাহিত হইয়া শ্রুতিকেন্দ্রে পৌছিতে যাইতেছে, তখন নিকটস্থ দৃষ্টিবাহী দুই-একটি নার্ভতন্তুর ঐ শ্রুতি-সংবেদনের খানিকটা নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়া দৃষ্টিকেন্দ্রে হাজির করিল। এখানে তো শোনার কারবার চলে না, দেখার কারবার। যখন খানিকটা সংবেদন আসিয়া পড়িয়াছে, তখন দৃষ্টিকেন্দ্র কি করিবে, তাহাকে একটা রঙের সংবেদনে পরিণত করিয়া লইল!

আপনারা বোধ হয় জানেন যে, সেকালের পারস্য ও ভারতের কোনো সুরকার পণ্ডিতের এই ধারণা ছিল যে, প্রত্যেক সুরের একটি করিয়া বিশেষ রঙ আছে। চক্ষু মুদিয়া বা চাহিয়া গাহিবার সময় বড় বড় ওস্তাদের নয়নপথে সেই রঙগুলি অবিশ্রান্ত ঘুরপাক খাইয়া নৃত্য করিতে থাকিত। ভারতীয় আদি সঙ্গীতস্রষ্টাগণ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনীর এক-একটি পৃথক রূপ কল্পনা করিয়া, চিত্রকরদিগের দ্বারা সেগুলি অঙ্কিত করাইয়াছিলেন।

প্রত্যক্ষণ কাহাকে বলে

সংবেদন সম্বন্ধে আমরা অল্প পরিসরের মধ্যে অনেক কিছুই জানিতে পারিলাম। এইবার আমরা প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে কিছু জানিতে ও শিখিতে চাই। সংবেদনে মনের কাজ নামমাত্র, মস্তিষ্কের কাজই বেশী, কিন্তু প্রত্যক্ষণে মস্তিষ্ক তাহার যাহা-কিছু জ্ঞান তাহা মনের পাদপ্রান্তে রাখিয়া তাহার কর্তব্য শেষ করে এবং বাকি কাজ করিবার ভার মনের উপরই সমর্পণ করে।

সাধারণতঃ একটি সংবেদন বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদের পাঁচটি

ইন্দ্রিয়ের যে-কোন একটির সম্মুখে কোনো উদ্দীপক অর্থাৎ বাহ্য বস্তু উপস্থিত হইলে, সেই ইন্দ্রিয়সংলগ্ন কতকগুলি নার্ভ ঐ উদ্দীপনাকে আমাদের সংবেদন-কেন্দ্রে নিমেষে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। ইহা প্রত্যক্ষ বা সরাসরি-প্রাপ্ত জ্ঞান, তথাপি ইহা প্রত্যক্ষণ নহে। **প্রত্যক্ষণ** (Perception) হইল—স্থান ও কালের পটভূমিকায় একটি পাত্রের (বস্তুর) উপস্থিতি সম্বন্ধে অপরিহার্য জ্ঞানলাভ এবং তাহার অর্থবোধের বা স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা। এই অর্থবোধের জন্য বিষয়ীর মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইতে পারে, সমস্ত জ্ঞানগুলিকে একত্র করিতে পারে এবং অতীত অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে ঘষিয়া বস্তু সম্বন্ধে একটা ধারণা গঠন করিতে ও তাহার একটা নাম দিতে পারে।

আমার টেবিলের উপর মঞ্জু একটি গেলাসে পানীয় জল ভর্তি করিয়া নীরবে কখন রাখিয়া গিয়াছে। আমি লিখিতে লিখিতে হঠাৎ মাথা তুলিয়া গেলাসটি দেখিলাম, তারপর মাথা নীচু করিয়া আবার লিখিতে আরম্ভ করিলাম। ঐ গেলাসটি দেখাটাকে নিশ্চয়ই আপনারা দর্শনজনিত সংবেদন ছাড়া আর কিছুই বলিবেন না।

আমার একটি ছাত্র বিলাত হইতে আমার জন্য একটি সুন্দর কব্জিঘড়ি কিনিয়া আনিয়া আমাকে উপহার দিল। ঘড়িটি আমার হাতে দেওয়া মাত্র তৎসম্বন্ধে আমার দর্শন-সংবেদন হইল। ঘড়িটিতে দম দেওয়া ছিল, উহা তখন চলিতেছিল, সুতরাং উহার টিক্ টিক্ শব্দ আমার কানে গেল; তাহাতে আমার শ্রুতি-সংবেদন হইল। ঘড়িটির স্পর্শবোধটি সর্বপ্রথম পাইয়াছিলাম—তাহাতে আমার স্পর্শ-সংবেদন জন্মিয়াছিল। তারপর উহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলাম, কানের কাছে আনিলাম এবং শেষে উহাকে সযত্নে কেসের মধ্যে পুরিয়া রাখিলাম। তাহাতে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সঞ্চালন-জনিত সংবেদনও লাভ হইল। আমি এতগুলি সংবেদনকে একত্র করিলাম। ঘড়ি সম্বন্ধে আমার আগেই মোটামুটি জ্ঞান ছিল, তাই উহাকে ঘড়ি বলিয়া চিনিলাম এবং উহা যে সুন্দর ও সাধারণ ঘড়ির চেয়ে মূল্যবান তাহা বুঝিতে পারিলাম। এতগুলি ক্রিয়ার সমন্বয় হইল প্রত্যক্ষণ।

আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, একটি সংবেদন উৎপন্ন করিতে একটি বাহিরের বস্তুই যথেষ্ট, কিন্তু প্রত্যক্ষণ লাভ করিতে আমাদিগকে ভিতরের কিছুরও সহায়তা লইতে হয়, অর্থাৎ অতীতের অভিজ্ঞতা, বর্তমানের ধারণা বা বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রভৃতিকে কাজে লাগাইতে হয়। সুতরাং সংবেদন উৎপাদনের জন্য মস্তিষ্কে যেরূপ একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র বা এলাকা আছে, প্রত্যক্ষণ-সৃজনের সেরূপ কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকা নাই। হয়তো এজন্য কয়টি এলাকা একসঙ্গে কাজ করে এবং এমন কয়েকটি এলাকার সাহায্য লইতে হয় যাহাদের স্থান ও সীমা নির্ধারণ করিতে এখনো মনোবিজ্ঞানিগণ সমর্থ হন্ নাই, অর্থাৎ সেগুলি মনের খাস সেরেস্তার অন্তর্গত।

এই অধ্যায়গুলি লিখিতেছি আষাঢ় মাসে। আমি চিরকালই বোম্বাই, হিমসাগর ও ন্যাংড়া এই তিন জাতীয় আম খাইতে ভালবাসি। প্রফেসর শোভনা সেন আমাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করে এবং তাহাদের গৃহে গেলে সে কিছু-না-কিছু আমার প্রিয় খাদ্যবস্তু আমাকে খাইতে দেয়। সেদিন তাহার বাড়িতে বেড়াইতে গেলে, সে একটি ন্যাংড়া আম আমার হাতে দিয়া বলিল, "বাবু, কাল সকালে এটি চায়ের সঙ্গে খাবেন।"...আমটি হাতে করিয়া তাহার আকার, ওজন, বর্ণ প্রভৃতি দেখিলাম, নাসিকার কাছে আনিয়া তাহার গন্ধ শুঁকিলাম এবং আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে তাহা যে ন্যাংড়া আম তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। ইহাকে প্রত্যক্ষণ ছাড়া আর কি বলিব?

চূড়ান্ত প্রত্যক্ষণ তখনি হইল যখন আমি শোভনাকে বলিলাম, "এই লোভনীয় বস্তুটি আর কালকের জন্যে তুলে রাখতে চাই না। তুমি এটি এখনি কেটে দাও, আমি খেয়ে যাই। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।" শোভনা সংস্কৃতের অধ্যাপিকা, সে হাসিয়া তৎক্ষণাৎ বঁটি ও একটি ডিশ লইয়া আমটি ছাড়াইতে বসিল। তারপর কি ঘটিল তাহা না বলিলেও চলিবে। এখন দেখুন এই প্রত্যক্ষণ ব্যাপারে কয়টি সংবেদনের সমন্বয় ঘটিল। প্রথমে আমটি হাতে পাইয়া উহার স্পর্শ-সংবেদন লাভ হইল, উহার গুরুত্ব বোধ হইল; উহাকে আমরূপে দেখার সংবেদন জন্মিল; উহার বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইল; উহার ঘ্রাণ লইয়া গন্ধ-সংবেদন পাইলাম; উহাকে ন্যাংড়া আম বলিয়া ধারণা হইল

এবং পরিশেষে উহার স্বাদ-সংবেদন পাইয়া রসনা তৃপ্ত করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষণ-চক্রটিও সম্পূর্ণ হইল।

একটি প্রত্যক্ষণে আমরা কি কি প্রধান কার্যকারকের সাক্ষাৎ পাই, তাহা এখন বিবেচনা করিয়া দেখা যাক্। এইস্থলে আপনাদিগকে মনে করাইয়া দিই যে, প্রত্যক্ষণ এমন একটি সহজ মানসিক ক্রিয়া যাহার মধ্যে মস্তিষ্কের ক্রিয়া গৌণ বা অপ্রত্যক্ষ।

(১) **প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর বাস্তবতায় বিশ্বাস।** প্রত্যক্ষণকারী যে বস্তুটি প্রত্যক্ষণ করিতেছে, তাহা যে বাস্তবিক একটা কিছু এবং তাহার উদ্দীপনা সত্য সত্যই এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিতেছে—এই বিশ্বাসে বলীয়ান্ থাকে। তাহার মনে দৃঢ় ধারণা থাকে যে, সে ঐ বস্তুটিকে কল্পনা করিতেছে না বা উহা স্বপ্নে দেখিতেছে না, এবং উহাকে সে ইচ্ছামত এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়-দ্বারা বোধ করিতে ও নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে পারে।

(২) **পৃথক করিয়া তুলিত করণ।** যখনই প্রত্যক্ষণকারী কোনো বস্তুকে দেখে, তখনই সে তাহার নাম মনে করিয়া, ঐ জাতীয় বা শ্রেণীর অথবা ভিন্ন জাতীয় বা শ্রেণীর অন্যান্য বস্তু হইতে তাহাকে পৃথক করে এবং তাহাদের তুলনায় প্রত্যক্ষকৃত বস্তুটি ভাল কি মন্দ, ছোট কি বড়, সুন্দর কি অসুন্দর—এই বিচারগুলি সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ফেলে। একটি ছোট্ট সজ্জিত বাগানে প্রবেশ করিয়া আমরা কোনো গাছে একটি ফুল দেখি এবং দেখিয়াই উহা যে একটি ডালিয়া ফুল তাহা বুঝিতে পারি এবং পার্শ্ববর্তী নীল জবা, মর্নি গ্লোরি, কস্‌মস্, গ্ল্যাডিওলাস্, সূর্যমুখী, গোলাপ প্রভৃতি ফুল হইতে উহা সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া বিবেচনা করি। তারপর আমরা নিজেদের রুচি অনুসারে অন্যান্য জাতীয় ফুলের তুলনায় ডালিয়া কতখানি ভালো তাহা ধারণা করি, অথবা হয়তো পূর্বদৃষ্ট অন্যান্য ডালিয়ার চেয়ে এই ফুলটি অনেক বড় ও সুশোভন বলিয়া মত প্রকাশ করি।

(৩) **অন্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহিত সংযোগ ও পূর্বস্মৃতির পুনরুজ্জীবন।** যখনই একটি লাল গোলাপ ফুল দেখিলাম, তখনি ইহার গন্ধটি যে অত্যন্ত সুমিষ্ট সেই ধারণা উপস্থিত হয় এবং তাহা শুঁকিবার ইচ্ছা

হয়। লাল গোলাপ ফুল সম্রাট্ আকবর ও জওয়াহরলাল নেহরু অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং গোলাপ হইতে সুবাসিত জল ও আতর প্রস্তুত হয়, তাহাও মনে পড়িতে পারে। বরফ দেখিয়াই এবং তাহা স্পর্শ না করিয়াই আমরা যেন তাহার শীতলতা অনুভব করি। এই বরফ দিয়া কুলপি বরফ ও আইস্‌ক্রীম তৈয়ারি হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া যায়। তেঁতুল দেখিয়াই যেন টকের স্বাদ পাইয়া আমাদের জিহ্বায় লালা-সঞ্চার হয়। তখন যেন আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়—"তেঁতুল দেখিতে ভারী টক্।"

(৪) **আকার, স্থান, কাল, দূরত্ব, ছন্দ, গতি, স্থিতি, দিক, পরিপার্শ্ব প্রভৃতির বোধ।** কোনো বস্তু বা বিষয় দেখিলে তাহা প্রত্যক্ষণকারী হইতে কত দূরে কোন্ দিকে আছে, তাহার আয়তন কতখানি বা তাহা কতখানি স্থান জুড়িয়া আছে, তাহা কোন্ কাল জ্ঞাপন করিতেছে, কতখানি সময় লইতেছে, তাহার আশেপাশে অন্য কিছু আছে কি না ইত্যাদি প্রত্যক্ষণের এলাকাভুক্ত। যখনি ঘুমজড়িত চক্ষে লেপের তলায় শুইয়া শুনিতে পাই যে, ঝাড়ুদারগণ রাস্তা ঝাঁট দিতেছে এবং তাহাদের ময়লাবাহী হাতগাড়িগুলি ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, তখনি বুঝিতে পারি ভোর হইতে আর দেরি নাই। যখনই সংবাদ-পত্রওয়ালাকে এক রাশ কাগজ সাইকেলে বাঁধিয়া দৌড়িতে দেখি, তখনি বুঝিতে পারি যে, সকাল হইয়াছে। বাড়ির ছাদ হইতে যখনি স্টীমারের ভোঁ বাজিতে শুনি, তখনি বুঝি তাহা পশ্চিম দিকের গঙ্গা হইতে আসিতেছে। একটা পিয়াল গাছের মাথায় পাতার আড়ালে একটা ডাকপাখি বসিয়া আছে। আমি একটা হাওয়া-বন্দুক হাতে লইয়া ঐ গাছের কাছাকাছি ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আন্দাজ করিয়া দেখিলাম পাখিটি আমার নিকট হইতে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাত দূরে আছে। ছর্‌রা উহার গায়ে লাগিবে না ধারণা করিলাম এবং পাখিটিকে মারিতে নিরস্ত হইলাম।

একটি শিশু জন্মিবার পর যখন সে তাহার পরিপার্শ্বের সংস্পর্শে আসে, তখন তাহার নিকট যে-সকল নানা প্রকারের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের উদ্দীপনা আসে, মস্তিষ্কের সংবেদন-কেন্দ্রে সেগুলির কোনো-কোনোটা পৌঁছে—কোনোটা হয়তো প্রবলভাবে, কোনোটা হয়তো ক্ষীণভাবে, কোনো-কোনোটা হয়তো

ঠিকমত পৌছেই না। জন্মিবার পরমুহূর্ত হইতে বেশ কিছুদিন পর পর্যন্ত সাত রকমের স্পর্শবাহী নার্ভগুলি আশানুরূপ সতেজ সক্রিয় হয় না। দৃষ্টিশক্তিও তাহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও দুর্বল থাকে ; দূরের জিনিস দেখিতে তাহার বেশ কয়েক মাস সময় লাগে। প্রথমে সে পরিবেশ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করিতে পারে না। প্রথম কিছুকাল তাহার সবই সংবেদন, কিছুই প্রত্যক্ষণ নয়।

আদিতে সে চেনে শুধু মাতৃস্তন, স্বাদ পায় শুধু মাতৃস্তন্যের। প্রথমটা সে মাতৃস্তনকে নিজেরই দেহের অংশীভূত বলিয়া মনে করে। হাত-পা নাড়িতে শিখিলে সে আংশিকভাবে শুধু নিজেকে চেনে। তারপর মাতার মুখ চেনে, মোটামুটি তাঁহারা দেহ চেনে, শয়নকক্ষের বড় বড় জিনিসগুলি চেনে, দুধের বোতল বা ঝিনুক-বাটি চেনে। তারপর সে অনেক আত্মীয়ের মুখ বার বার দেখিয়া, জন কয়েককে মনে রাখিবার চেষ্টা করে। গন্ধের অনুভূতি তাহার নাম-মাত্র থাকে। কিন্তু জীবজন্তুদের সামান্য দৃষ্টিশক্তি জন্মিবার পূর্বেই গন্ধগ্রহণের শক্তি মোটামুটি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। নরশিশু স্বাদের তারতম্য কতকটা বুঝিতে পারে ছয় মাস বয়সে। গন্ধের তারতম্য মোটামুটি বুঝিতে পারে এক বৎসর বয়সের আগে নয়, তথাপি তাহার সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের অনুভূতি-লাভের ক্ষমতা চারি-পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত কার্যকরীভাবে শাণিত হয় না। মোট কথা, শিশুর জন্মের পর প্রথম তিন মাস কাল রকমারি সংবেদনগুলি তাহার মস্তিষ্কে একটা তুমুল হট্টগোল তোলে, যাহাকে মনোবিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন "big blooming buzzing confusion"··· ।

শিশুকে ধীরে ধীরে যেমন বিভিন্ন জাতীয় সংবেদনগুলির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য স্থির করিতে বেশ কিছুকাল সময় লাগে, তেমনি যে সকল ব্যক্তি বা বস্তু সে ক্রমাগত দেখে তাহাদের ছবি মনে রাখিতেও তাহাকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হইতে হয়। প্রত্যক্ষণ-শক্তি আয়ত্ত করিতেও তাহার বেশ-কিছু বিলম্ব হয়। তাহাকে সহজ প্রত্যক্ষণ-ক্রিয়াগুলি নিজে নিজে শিক্ষা করিতে হয়, অভ্যাসের দ্বারা চিনিতে হয়, অভিজ্ঞতা-লাভের দ্বারা মনে রাখিতে হয়। মাতার সহিত যে স্তন্যদানের সম্পর্ক আছে, তাহা সে অন্ততঃ পূর্ণ তিন মাস বয়ঃক্রমে বুঝিতে শিখে। তাই মাতার কোলে যাইবার জন্য সে ছট্‌ফট করে, কাঁদে।

তারপর মাতার কোলে গিয়া সে হাত বাড়াইয়া তাঁহার স্তন খোঁজে। খোঁজ পাইলে সে করাঙ্গুলি দিয়া ধরে এবং হাঁ করিয়া স্তনবৃন্ত মুখে পুরিবার চেষ্টা করে। প্রথমটা সে বুঝিতেই পারে না যে, মাতার বক্ষে দুইটি পয়োধর বিরাজমান। যখন বোঝে, তখন সে একটি চোষণ করে, অন্যটিকে তাহার কোমল করপল্লব দিয়া ধরিয়া থাকে।

একটি ছয়মাস বয়স্ক শিশুর সম্মুখে বার কয়েক একটা ঝুম্‌ঝুমি বাজাইলে সে প্রথমে বস্তুটিকে চিনিয়া লয়, তারপর তাহা হাত বাড়াইয়া ধরে এবং এলোমেলোভাবে হাত নাড়াইয়া খানিকটা বাজাইয়া খুশি হয়। ঝুম্‌ঝুমিটিকে ধরিয়া সে স্পর্শ-সংবেদন পাইল, তাহাকে নাড়াইয়া সঞ্চালন-সংবেদন পাইল, তাহার আওয়াজ শুনিয়া শ্রুতি-সংবেদন পাইল। এই তিনটি সংবেদন মিশাইয়া সে এক ফোঁটা আনন্দও পাইল। শিশু তাহার প্রতিনিয়ত গৃহীত সংবেদন বা অনুভূতিগুলিকে একটু একটু করিয়া একত্র গাঁথিতে শিখে, তাহার মধ্য হইতে একটা অর্থ বাহির করিতে অথবা একটা অস্ফুট ধারণা করিতে শিখে।

দাঁড়াইতে ও কথা কহিতে শিখিবার আগে হইতেই শিশু নিজের দেহের নানা অংশ, চারিদিকের নানা বস্তু, বিষয়, ঘটনা, ব্যক্তি প্রভৃতি যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করে ও যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে, সেগুলি সম্বন্ধে তাহার সদ্যোজায়মান্ সহজপ্রবৃত্তি-সম্পীড়িত অসংস্কৃত মন এক-একটা অনর্থক অর্থ বাহির করে, এক-একটা আজগুবি জ্ঞানের ছবি আঁকে, এক-একটা অন্ধ সংস্কারের ছাপ নিজের মধ্যে গ্রহণ ও পোষণ করে। এইগুলি হইল তাহার আদ্য অভিজ্ঞা বা first impressions। বিভিন্ন পরিবারে বিভিন্ন বয়সে জাত বিভিন্ন শিশুর এই অভিজ্ঞতাগুলি স্বতঃই বিভিন্ন হয়। তারপর বাল্যকালে প্রশস্ততর প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে সে প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই ঐ বিস্মৃত আদ্য অভিজ্ঞাগুলির উপর রশ্মিপাত করে। পিতামাতা ঠাকুর্দা-ঠাকুর্মা-শিক্ষক-গুরু ও মহাপুরুষদের জীবনাদর্শ তাহাকে পরবর্তীকালে যাহা-কিছু সুশিক্ষা দিক্ না কেন, তাহার তলায় লাগিয়া যায় ঐ অভিজ্ঞাগুলির ছোপ।

সুরুতে অর্থাৎ দশ-এগারো-বারো মাস বয়সের সময় শিশুর নিকট কথিত বাক্যসমূহের কোনো অর্থ নাই, মূল্য নাই। মা, বাবা, তাতা, কাকা, দাদা,

দিদি প্রভৃতি শব্দগুলি স্ফুট বা অস্ফুটভাবে সে হয়তো একটু আগেই বলিতে শিখিয়াছে; কিন্তু কাহাকে সম্বোধন করিয়া কোন্ শব্দটি উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহা রপ্ত করিতে তাহার দিন কয়েক সময় লাগে। বাবার সহিত বা দাদার সহিত মায়ের কি সম্পর্ক তাহা সে দেড়-দুই বৎসরেও জানে না, কেবল বুঝিতে পারে যে, তাহারা মাতার এক শয্যার বা এক কামরার অংশীদার। এজন্য তাহার মনে যে খানিকটা ক্রোধ বা হিংসা ধূমায়িত হইতে থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, ক্রমশঃ সে বারংবার-শোনা শব্দের অর্থ বুঝিতে শিখে অর্থাৎ এক-একটি শব্দের সহিত পূর্বলব্ধ কতকগুলি সংবেদন, একটি প্রত্যক্ষণ বা একটি ধারণাকে সংশ্লিষ্ট করিতে শিখে। 'বাবা' শব্দটি শুনিলেই তাঁহার ছবিটি তাহার মনের পর্দায় ভাসিয়া উঠে, যে বাবা তাহাকে মাঝে মাঝে কোলে করেন, চুমা খান, আবার রাত্রিকালে সে কাঁদিলে তাড়া দেন। শব্দের সহিত ক্রিয়া যোগ করিতে শেখা শিশুর পক্ষে প্রথম প্রথম বেশ কষ্টকর হয়; এবং সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রি, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের মোটামুটি ধারণা তাহার তিন বৎসর বয়সের আগে ভালোভাবে হয় না।...

প্রত্যক্ষণে অস্বাভাবিকতা

সংবেদনজনিত কয়েক প্রকার অস্বাভাবিকতার কথা আপনাদিগকে আগেই বলিয়াছি; এইবার প্রত্যক্ষণঘটিত কয়েকপ্রকার অস্বাভাবিকতার পরিচয় দিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের ইতি করিব।

অপ্রত্যক্ষণ বা আপ্রত্যক্ষণ (Agnosia)। এইরূপ অস্বাভাবিকতায় ব্যক্তিবিশেষ প্রত্যক্ষণযোগ্য বস্তু বা বিষয় স্বভাবসঙ্গতভাবে প্রত্যক্ষণ করিতে পারে না; কেহ কেহ একেবারেই প্রত্যক্ষণ করিতে পারে না। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের কোন একটি উদ্দীপক ইন্দ্রিয়-সম্মুখে উপস্থিত হইলেও কোন সংবেদনের অনুভূতি তাহারা পায় না অথবা এত অল্প পায় যাহা তাহাদের মনে কোনো সাড়া জাগায় না, কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না এবং ঐ সংবেদন তাহাদের নিকট অর্থহীন বলিয়া মনে হয়।

অপ্রত্যক্ষণ বা আপ্রত্যক্ষণ উপসর্গে হয় একটি বা দুইটি ইন্দ্রিয় নতুবা পাঁচটি ইন্দ্রিয়েরই কাজ বন্ধ হইয়া যায়। প্রায় ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়গুলি কর্মঠ, সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু যে সকল নার্ভ তাহাদের সংবেদন-গ্রহণে ও বহনে আজীবন অভ্যস্ত সেগুলির শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যায়; অথবা বিষয়ী তাহার শৈশবের অসম্পূর্ণ ও অসঙ্গতিপূর্ণ আদ্য প্রত্যক্ষণ-প্রণালীতে প্রতিসরণ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু একটি ইন্দ্রিয়েরই অপ্রত্যক্ষণ-উপসর্গ জন্মিতে দেখা যায়। মানসিক অন্ধতা, মানসিক বধিরতা প্রভৃতি উপসর্গ এই অপ্রত্যক্ষণ-উপসর্গের ফল।

মানসিক অন্ধতায় একটি বস্তু বিষয়ীর চক্ষুর সম্মুখে ধরিলে সে দর্শনজাত সংবেদন ঠিকই অনুভব করে, কিন্তু সে পরিদৃষ্ট বস্তুটির নাম খুঁজিয়া পায় না, তাহার আবশ্যকতা বোঝে না এবং তাহা দেখিয়া কোনোরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না। রাস্তায় চলিতে চলিতে সে একটি ছোট ছেলেকে গাড়ি চাপা পড়িতে দেখিল—অন্য পাঁচজন যেমন করিয়া দেখিল সে-ও তেমনি করিয়া দেখিল, কিন্তু ব্যাপারটা যে কি মর্মন্তুদ এবং আহত বালকটির জন্য তাহার কিছু করা উচিত কিনা তাহা সে ভাবিয়া দেখিল না। তারপর বাড়ি পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দৃশ্য তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল। সে একটি শিশুর মত দৃষ্ট ঘটনার গুরুত্ব কতখানি তাহা বুঝিল না এবং শিশুর একটি পুরাতন ভাঙ্গা পুতুলের মতই আহত ছেলেটিকে ভুলিয়া গেল।

Alexia নামক আর একপ্রকার প্রত্যক্ষণজনিত অন্ধতা আছে, যাহাতে রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বই বা সংবাদপত্রের লেখা পড়িতে পারে না অথচ সে লেখাপড়া জানে। শিশুর মত সে লেখাগুলিকে কালি-জ্যাবড়ানো কতকগুলি অর্থহীন চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান করে অথবা একজন পল্লীগ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত রাশিয়ান্ বা সুইডিশ্ ভাষায় লেখা বই দেখিয়া যেরূপ তাহা পড়িবার কোনো চেষ্টাই করেন না, সেইরূপ করে।

মানসিক বধিরতায় একটু বৈচিত্র্য আছে। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি শব্দ বা কথা শুনিতে পান্, কিন্তু শব্দের বা কথার অর্থ ধরিতে পারেন না এবং তাহার মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকিলে উহার জবাব দিতেও পারেন না। যদি ঐ ভদ্রলোকটির

দুই চোখ বাঁধিয়া তাহার কানের কাছে একটি চাবির গোছা নাচানো হয় অথবা একটি পেয়ালার মধ্যে চামচ নাড়ানো হয়, তাহা হইলে যথাযথ ধ্বনি দুইটির সংবেদন তিনি ঠিকই লাভ করেন, কিন্তু ধ্বনি দুইটি কিভাবে উৎপন্ন হইতেছে তাহা বলিতে পারেন না। ট্রামে বা বাসে তাঁহারই পার্শ্বে উপবিষ্ট দুইজন ভদ্রলোক বাংলা ভাষাতেই বেশ জোরে জোরে কথা বলিতেছেন, তাঁহার কানে কথাগুলি প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু কোনো অর্থবোধই হইতেছে না, মনে হইতেছে যেন তাহারা গ্রীক ভাষায় কথা বলিতেছে। প্রত্যেক মানুষেরই বাল্যের প্রথমাবস্থায় অনুরূপ কাণ্ড ঘটে।

আর একপ্রকার অপ্রত্যক্ষণের ইংরাজী নাম *Asteriognosis*। এই উৎপাতে ব্যাপারটা কি হয় জানেন? এই উপসর্গগ্রস্ত লোকের চোখ দুইটি বাঁধিয়া তাহার এক হাতে যদি একটা পয়সা, অন্য হাতে যদি একটা সিকি দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে বলিতেই পারে না কোন্‌টি পয়সা কোন্‌টি সিকি। এমন কি, একটা আঙুলি দিলেও তাহা ঠিকমত ধরিতে পারে না। অথবা, এক হাতে একটা দেশলাইয়ের বাক্স ও অন্য হাতে একটা সিগারেটের বাক্স দিয়া তাহাকে দুইটি জিনিসই নাড়িয়া-চাড়িয়া ও ভালো করিয়া স্পর্শ করিয়া দেখিতে বলা হয়। সে দুই-চারি মিনিট ধরিয়া জিনিস দুইটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়াও কোন্‌টি কি বলিতে পারে না।

ধরুন, স্নান করিবার সময় তাহার পিঠে সাবান মাখাইয়া একবার তোয়ালে দিয়া, আর একবার গামছা দিয়া পিঠ ঘষিয়া দেওয়া হইল। কোন্‌টি তোয়ালে কোন্‌টি গামছা তাহা সে নির্ভুলভাবে বলিতে পারিল না। এইরূপ উৎপাত-গ্রস্ত আর একটি লোককে বলা হইল পাশের অন্ধকার ঘরের খাটের উপর হইতে খোকার একটা মাথার বালিশ আনিয়া দিতে। লোকটি পাশের ঘরের খাটের উপর রক্ষিত স্তূপীকৃত নানা আকারের বালিশ হাতড়াইয়া মিনিট দুই পরে খোকার একটা পাশবালিশ আনিয়া হাজির করিল। এইগুলি হইল স্পর্শবোধ ও পেশী সঞ্চালন-বোধের অসম্পূর্ণতা বা অপারগতা; এই দুইটি বোধ তাহার ঠিকই জন্মায় কিন্তু অর্থবোধ জন্মায় না। স্পর্শের দ্বারা কোন্‌টি কি বস্তু তাহা সে চিনিতে বা বলিতে পারে না। স্বাদ

ও গন্ধজনিত অপ্রত্যক্ষণ বা আপ্রত্যক্ষণের দৃষ্টান্ত আমরা একটু চেষ্টা করিলেই দুই-চারিটি সংগ্রহ করিতে পারি। এই সকল ক্ষেত্রে উদ্দীপনাগুলি ঠিকই বোধকেন্দ্রে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে উপস্থিত হয় কিন্তু প্রত্যক্ষিত হয় না, অর্থাৎ তাহাদিগের স্বরূপ-নির্ধারণে ও অর্থবোধে অসামর্থ্য ঘটে।

অতিপ্রত্যক্ষণ (superperception)। এই ব্যাপারটিকে একটি রোগের উপসর্গ বা নিছক রোগ বলিয়া অভিহিত করা কিছুতেই চলে না। ইহা মানুষের একটি অস্বাভাবিক রকমের গুণ বলাই সঙ্গত। এক-একজন পণ্ডিত বা গবেষকের মধ্যে তাহার অধীত বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অতিপ্রত্যক্ষণ-ক্ষমতা আশ্চর্য রকমের সমৃদ্ধ হইতে দেখা যায়। বস্তুসমূহ দেখিয়াই তিনি তাঁহাদের অন্তর্লোকের সমস্ত রহস্য যেন এক লহমায় বুঝিতে পারেন, তাহাদের নাম-ধাম-বিশেষগুণ তাঁহার চক্ষের সম্মুখে নিমেষে প্রতিভাসিত হইয়া উঠে। একজন ভূতত্ত্ববিদ্ একটা অজ্ঞাত অ-পদার্পিতপূর্ব অঞ্চলের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে একস্থানের কালো মাটি, একস্থানের লাল মাটির নমুনা খানিকটা করিয়া সংগ্রহ করেন; এক জায়গার কয়েকটি পাথরের টুকরা আর এক জায়গার কতকগুলি নুড়ি, আবার আর এক জায়গা হইতে কয়েক মুষ্টি বালুকা তুলিয়া লন। তারপর সেগুলি অল্পক্ষণ নাড়াচাড়া ও অতিরঞ্জন কাচের সহায়তায় নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের ভিতরে কোনো মূল্যবান ধাতু বা খনিজ পদার্থ আছে কিনা মোটামুটি বলিয়া দিতে পারেন।

একজন উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী সবান্ধবে এক দূর পল্লীর মেঠো পথে গরুর গাড়ি চড়িয়া যাইতে যাইতে অদূর হইতে বন্ধুদের দেখান্ কোন্‌টি কুচিলার ঝোপ, কোন্‌টি বেলাডোনা, কোন্‌টি বনচাড়ালের গাছ; বলেন—এই জাতীয় মাটিতে কোন্ কোন্ দুষ্প্রাপ্য ভেষজ ও উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে এবং বনের ভিতর গিয়া খুঁজিলে নিশ্চয়ই অন্য কি কি ভেষজের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। একজন সাপুড়ে একটি গৃহের চতুর্দিকে দুই-চারিবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতীয়মানতঃ কোনো প্রমাণলক্ষণ না দেখিয়াও বলিয়া দিতে পারে ঐ গৃহে কোনো সাপ লুকাইয়া আছে কিনা।

দুই বন্ধু একদিন সন্ধ্যার পর একসঙ্গে গল্প করিতে করিতে শহরের একটি বড় রাস্তা দিয়া বেড়াইতেছেন। একজন ভদ্রলোক গোয়েন্দা-বিভাগের ইন্সপেক্টর,

অন্যজন প্রত্নতাত্ত্বিক। তাঁহাদের আশপাশ দিয়া নানা বয়সের নানা পোষাক-পরিহিত শত শত স্ত্রী-পুরুষ সরবে ও নীরবে উভমুখী স্রোতের মত সবেগে বহিয়া চলিয়াছে। একটি বাদাম-ডালমুটের দোকানে দুই-তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, একটি সুবেশা মহিলা, একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ও একজন ২৮।২৯ বৎসর বয়স্ক ফুল-প্যাণ্ট ও গ্যাবার্ডিন কোট-পরা চশমাধারী শ্যামবর্ণ ভদ্রলোক ডালমুট কিনিবার আশায় দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। ডিটেকটিভ বন্ধুটি বলিলেন "ওহে, চল কিছু ডালমুট কেনা যাক।" এই বলিয়া তিনি সাহেবী পোষাক-পরা যুবকটির পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন।

মিনিট খানেক অপেক্ষা করিয়া ডালমুট না কিনিয়াই তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধুটির হাত ধরিয়া টানিয়া কয়েক পদ আগাইয়া আসিলেন। তারপর ফিস্‌ফিস্ করিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ভাই, ওই সাহেবী পোষাকধারী লোকটা একজন খুনী আসামী বলে মনে হচ্ছে। ওর গায়ে বারুদের গন্ধ পেয়েছি। নিশ্চয়ই ওর কাছে একটা রিবলবার আছে। ও বোধহয় আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে কাউকে গুলি করেছে। আমি ওকে ফলো করছি, তুমি বাড়ি ফিরে যাও।" সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিটি ততক্ষণে ডালমুট কিনিয়া ঠোঙা হইতে অল্প অল্প ডালমুট বাহির করিয়া চিবাইতে চিবাইতে অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চাশ হাত আগাইয়া গিয়াছে। গোয়েন্দা বন্ধুটি তাহার উপর শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাহাকে অনুসরণ করিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধুটি কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে একটি পুরাতন পুস্তকের দোকানে প্রবেশ করিলেন।...

উপরের দৃষ্টান্তগুলি অতিপ্রত্যক্ষণ-ঘটিত, তাহা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ক্ষমতাটিকে ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের কাজ বলিয়া ভুল করা হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়, তৎসংলগ্ন গ্রাহকপ্রান্তসমূহ ও সংবেদনবাহী নার্ভমণ্ডলী যেমন অতিরিক্ত রকমের সজাগ থাকে, তেমনি তৎসংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কের অনুভূতিকেন্দ্র ও চেষ্টাকেন্দ্রও অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া গঠিত হয়। সাধারণতঃ এই বিশেষ গুণগুলি শিশুকাল হইতেই পরিস্ফুট হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত বুদ্ধি-সহযোগে পরিশীলিত হইলে, আশ্চর্য রকমের ফলদায়ক হইতে দেখা যায়।

বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, যাহার একটি বা দুইটি ইন্দ্রিয় অকর্মণ্য, তাহার বাকি ইন্দ্রিয়গুলি অতিশয় শক্তিশালী করিয়া দিয়া বিশ্বপ্রকৃতি তাহার প্রচুর ক্ষতি-পূরণ ও তাহাকে অমোঘ সান্ত্বনা প্রদান করে। আপনারা সকলেই বোধহয় মিস্ হেলেন কেলার-এর নাম জানেন এবং তিনি যে একাধারে অন্ধ ও বধির তাহাও অবগত আছেন। সাধারণতঃ জন্মবধিরগণই বোবা হয়, কারণ শৈশব হইতে তাহারা শুনিয়া শুনিয়া ভাষা শিখিতে পারে না। অন্যথায় তাহাদের স্বরযন্ত্র ও শব্দোচ্চারণের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাহাদিগকে মোটামুটি রকমের ভাষাশিক্ষা দেওয়া, তাহাদিগকে দিয়া কিছু কথা বলানো ও বোঝানো, ব্রেল পদ্ধতি-দ্বারা খানিকটা স্পষ্টভাবে পড়িতে ও লিখিতে শেখানো সম্ভবপর হইয়াছে, যদিও তাহারা নিজেদের গলার স্বর নিজেরা শুনিতে পায় না। মিস্ কেলার অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও চর্চার দ্বারা তাঁহার অন্যান্য সুস্থ ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াশক্তিকে এতদূর বাড়াইয়া তুলিয়াছেন যে, তাঁহার ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্না বলিয়া মনে করে। গন্ধ ও স্পর্শ দ্বারা তিনি সাধারণ জিনিসগুলির স্বরূপ বলিয়া দিতে ও নাম করিতে পারেন।

একবার বিলাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া তাঁহার শরীরের ঊর্ধ্বাংশ সর্বতোভাবে স্পর্শ ও মৃদু পেষণ করিয়া, তাঁহার সর্ব অবয়বের একটি প্রায় নির্ভুল প্রতিরূপ মনের মধ্যে আঁকিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনতিপরে তিনি একটি কাঠকয়লার পেন্সিল দিয়া কবির একটি প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়াছিলেন, যাহা কবি নিজে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

অধ্যাস (Illusion)। এই শব্দটি সংস্কৃত ভাষা হইতে আহৃত। ইহার অর্থ হইল—এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান। অধ্যাস বুঝাইতে প্রাচীন মায়াবাদী দার্শনিকগণ এই দুইটি দৃষ্টান্ত বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন—রজ্জুতে সর্প-ভ্রম ও শুক্তিতে রজত-ভ্রম। অনেকেরই জীবনে বোধহয় অন্ততঃ একবার স্বল্পালোকে এক টুক্‌রা দড়ি দেখিয়া তাহা সর্প বলিয়া ভুল হইয়াছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত কোনো দেশে কোনো কালেই অধিক সংখ্যক ঘটিতে দেখা যায় নাই।

আপনারা কেহ কেহ কবি নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল নাটকখানি অবশ্যই পড়িয়া অথবা উহার অভিনয় দেখিয়া থাকিবেন। অতুল ঐশ্বর্যবান বিল্বমঙ্গল যুবাবয়সে চিন্তামণি নাম্নী এক রূপবতী বারনারীর প্রণয়মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার বিষয়সম্পত্তি, পরিবার, বান্ধব, সমাজ ও ধর্মোচিত কর্তব্যসমূহ ভুলিতে বসিয়াছিলেন। এমন কি, বহুদিন বহুবার চিন্তামণির অকরুণ আচার-ব্যবহারও তাঁহাকে পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই।

একদিন ভীষণ দুর্যোগ, সারাক্ষণ মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। রাস্তাঘাটে লোক-চলাচল ও খেয়া-পারাপার বন্ধ ছিল। সেদিন বিল্বমঙ্গলের পিতৃশ্রাদ্ধ ছিল। ঐ পুণ্যদিনে স্বভাবতঃ সে সংযম-পালন করিয়া নিশ্চয়ই নিজগৃহে অবস্থান করিবে—ইহা ভাবিয়া চিন্তামণি রাত্রিকালে সকাল সকাল আহার করিয়া শয়ন করিতে গেল। কিন্তু দুশ্চরিত্র মোহান্ধ বিল্বমঙ্গল মধ্যরাত্রে ক্রিয়াকর্ম মিটিলে ও নিমন্ত্রিতগণ চলিয়া গেলে, চিন্তামণিকে দেখিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। নদীর ওপারে থাকে চিন্তামণি। সারাদিন নদীতে একখানিও নৌকা ওপার হইতে এপারে আসে নাই। তখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। বিল্বমঙ্গল মুণ্ডিত-মস্তকে শ্বেতোত্তরীয় গায়ে জড়াইয়া সেই অন্ধকার রাত্রিতে সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

নদীর মসীময় জলরাশি তরঙ্গবিক্ষুব্ধ, ফুলিয়া ফুঁসিয়া ভীম গর্জনে দুই তীরে ফেনিল উচ্ছ্বাসে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বাতাসে সহস্র শিঙ্গা বাজিতেছে। অদূরের শ্মশান হইতে শৃগালকুকুরগুলি পলায়ন করিয়াছে। গতকল্য সন্ধ্যা হইতে দুরন্ত বর্ষণ সুরু হওয়ার ফলে দূরের কোনো শ্মশানের চিতা পুনঃ পুনঃ নির্বাপিত হওয়ায় গতরাত্রে শ্মশানবন্ধুগণ বিরক্ত ও হতাশ হইয়া একটি অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ ফেলিয়া রাখিয়া গৃহে ফিরিয়াছিল। বিল্বমঙ্গল ও-পারে যাইতে বদ্ধপরিকর; দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি উন্মত্ত নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। যেমন বলশালী, তেমনি সন্তরণপটু ছিলেন তিনি। তথাপি পুনঃ পুনঃ তরঙ্গের আঘাতে নির্জিত অবসন্ন হইয়া ডুবিবার উপক্রম করিলেন। ঠিক ঐ মুহূর্তেই সেই অর্ধদগ্ধ মৃতদেহটি গলিত অবস্থায় তাঁহার সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তিনি মুহূর্তের বিজলীচমকে তাহা দেখিতে পাইয়া, দুই বাহু দিয়া তাহা

জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি ঐ শবদেহকে অর্ধদগ্ধ একটা কাঠের গুঁড়ি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

বিল্বমঙ্গল অতি কষ্টে ওপারের তীরে গিয়া উঠিলেন এবং শবদেহটিকে ছাড়িয়া দিলেন। সেই সময় পুনরায় একবার বিদ্যুৎ ঝলকিত হইলে তিনি সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন—তাঁহার জীবনোদ্ধারকারী দ্রব্যটি একটি গলিত মৃতদেহ, কাঠের গুঁড়ি নয়। কিন্তু তখন ঘৃণা ও অনুশোচনা করিবার সময় নয়। চিন্তাকে বারেকের জন্য আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। ধূলিকর্দমাক্ত সিক্তবসনে তিনি চিন্তার গৃহের উদ্দেশ্যে ছুটিলেন। গৃহের দ্বার ভিতর হইতে অর্গলাবদ্ধ দেখিয়া 'চিন্তা' 'চিন্তা' করিয়া তারস্বরে ডাকিতে লাগিলেন; বহুবার দাসদাসীদেরও নাম ধরিয়া ডাকিলেন। কিন্তু কাহারো সাড়া মিলিল না। চিন্তামণি দোতলায় রাস্তার দিকের একটি বড় ঘরে শয়ন করিত। হঠাৎ বিল্বমঙ্গল দেখিতে পাইলেন চিন্তামণির দোতলার ঘরের উন্মুক্ত বাতায়নের ঠিক নিম্ন হইতে মাটি পর্যন্ত একটি মোটা দড়ি ঝুলিয়া আছে। বিল্বমঙ্গল এই কথা ভাবিয়া খুশি হইলেন যে, তাহার আসিতে বিলম্ব হইবে বুঝিয়া চিন্তামণি তাঁহার জন্য এইভাবে রজ্জু টানাইয়া রাখিয়া দিয়াছে যাহাতে তিনি উহা ধরিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিতে পারেন। তিনি সেই রজ্জুর সাহায্যেই বাতায়ন দিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে জাগরিত করিলেন।

সেই দুর্যোগময়ী রজনীতে তিনি নদী পার হইয়া কিভাবে এতদূর আসিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিল্বমঙ্গলের নিকট শুনিয়াই চিন্তামণি চমকিয়া উঠিল। অবশেষে সে যখন জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু দোতলায় উঠ্‌লে কি করে?" বিল্বমঙ্গল তাহার মুখের দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া বলিলেন, "কেন, তুমি তো আমার জন্যে তোমার ঘরের জান্‌লা থেকে দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছিলে!" চিন্তামণি হতভম্ব হইয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে—তাহা দড়ি নয়, একটা লম্বা অজগর সাপ। তাহারই জানালার নীচে একটা ফোকরে ইঁদুর কিংবা পাখি খাইতে মুখ ঢুকাইয়াছে।...

তাহা হইলে বিল্বমঙ্গলের এই কাহিনীর মধ্যে আপনারা দুইটি অধ্যাসের

উদাহরণ পাইতেছেন। একটি হইল অর্ধদগ্ধ গলিত মৃতদেহে অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ-ভ্রম; আর একটি হইল—সর্পে রজ্জু-ভ্রম।...

ছোটোখাটো রকমের দৃষ্টিভ্রম আমাদের সকলেরই জীবনে দুই-চারি বা বহুবার সংঘটিত হয় এবং সকল ক্ষেত্রে ইহা খুব পীড়াদায়ক বা দোষাবহ হয় না। এই সকল ভ্রম অল্পক্ষণের মধ্যেই ভ্রমকারী বুঝিতে পারে এবং নিজের ধারণাকে তখনি সংশোধন করিয়া লয়। অনেক সময় স্বল্প-জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে অদূরের একটি ছোট্ট ঝোপকে একটি গুড়ি-মারিয়া উপবিষ্ট মানুষ বলিয়া অথবা একটি বায়ুতে দোদুল্যমান বৃক্ষশাখাকে একটা প্রেতাত্মার হাতের মত কিছু বলিয়া ভুল হয়।

জীবজন্তুদেরও এইরূপ দৃষ্টিভ্রম হইতে পারে। বহুকাল পূর্বে আমার এক বাল্যসুহৃৎ ঘোড়ায় চড়িয়া মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় পচেটগড় হইতে সাতমাইল নামক গ্রামে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার আহারাদি সমাধা করিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। তিনি রাত্রি সাড়ে-দশটা লাগাৎ পচেটগড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কাঁচা রাস্তা, কিন্তু কিছুটা চওড়া। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, ছোট ছোট জঙ্গল, আবার তাহার পরই দুই পার্শ্বে বহুদূর-বিস্তৃত ধানের ক্ষেত।

তখন বোধ হয় অগ্রহায়ণের শেষ। কতক কতক ধান কাটা হইয়া গিয়াছে। সেদিন দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী তিথি, আকাশে চাঁদ ছিল এবং মোটামুটি রকমের ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না ছিল। চতুর্দিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল। কয়েক মাইল অতিক্রম করিয়া আসিবার পর তিনি ও তাঁহার ঘোটক একটি গ্রামের নিকটবর্তী হইলেন। দুই পার্শ্বেই কৃষকদের ছোট ছোট কুটির, ধানের মরাই, ছোট বড় মাঝারি শাকসব্জির ক্ষেত, ফলের বাগান। হঠাৎ অদূরে একটা বেড়ার ধারে একটা কলাগাছের দিকে তাঁহার নজর গেল। খুব সম্ভবতঃ বাতাসে চাষীর স্ত্রীর একটা পাড়ওয়ালা শাড়ির ছোট্ট একটা টুক্‌রা ঐ কলাগাছের একটা অবনতমুখী শাখার প্রান্তে উড়িয়া পড়িয়াছিল, এবং অল্প অল্প বাতাসে সেই পত্রযুক্ত ডালটি দুলিতেছিল। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন কোনো অবগুণ্ঠনবতী বধূ দাঁড়াইয়া ঘাড় নাড়াইয়া কাহাকে ডাকিতেছে।

অল্প-ব্যবধানে এই দৃশ্য দেখিবামাত্র আমার বন্ধুটির গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। পরক্ষণেই তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু ঘোড়াটি ইতোমধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে ও সম্মুখের দুইটি পা অল্প অল্প মাটিতে ঠুকিয়া অস্থিরতা প্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছে। বন্ধুবর লাগাম ঢিলা করিয়া পাদানি দিয়া তাহার উদরে ঠোক্কর মারিতেই সে সম্মুখের দুই পা উঁচু করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং পাক খাইয়া পিছনে ঘুরিয়া, রাস্তা ছাড়িয়া একদিকের ধানক্ষেতের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। রাশ টানিয়া ধরিয়াও তাহার গতিবেগ সংযত করা গেল না। একেবারে পচেট্‌গড়ের সীমান্তবর্তী পথে উঠিয়া তবে সে গতিবেগ শ্লথ করিল।...

অধ্যাস ব্যাপারটি পুরাপুরি মনের খেলা বলিয়া মনে হয়। ইহাতে এক প্রকারের উদ্দীপনা মস্তিষ্কের সংবেদন-কেন্দ্রে যথাযথ বাহিত হইতেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষণের সময় মস্তিষ্ক তো বটেই, তৎসহিত মনও তাহার অন্যপ্রকার অর্থ করিতেছে অর্থাৎ উদ্দীপকের ছবিটিকে কতকগুলি অযোগ্য আনুষঙ্গিক ভাব বা স্মৃতি দিয়া ঢাকিয়া দিতেছে।

অন্ধকারের সহিত অথবা রাত্রির সহিত দৈত্যদানব বা একটা ভৌতিক কিছু, কোনো হিংস্র জন্তুজানোয়ার অথবা চোর-ডাকাত-বদমায়েসের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে—ইহা আমরা শিশুকাল হইতে ঠাকুর্দা-ঠাকুর্মা-পিসিমা-মাসিমা-মা-বাবার নিকট নানা রূপকথা ও সত্য ঘটনার বর্ণনা-মাধ্যমে শুনিয়াছি। বড় হইয়া কেহ হয়তো কোনো রাত্রিতে ভূতপ্রেত না দেখুন, চোর-ডাকাতের হাতে পড়িয়া নির্যাতিত হইয়াছেন, কেহ হয়তো এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে বনপথের ধারে একটা ঝোপের মধ্য হইতে একটা শিশু-ভল্লুক বা একটা হায়েনা ছুটিয়া পলাইতে দেখিয়াছেন। সেই সকল শোনা বা দেখা বা পড়া ঘটনার স্মৃতি মনের দপ্তরে ধূলিধূসরিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। পূর্বানুরূপ নকল উদ্দীপকের সম্মুখীন হওয়ামাত্র আনুষঙ্গিক পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে ও এই উদ্দীপক-ঘটিত সংবেদনের সহিত মিশিয়া যায়।

অধ্যাস বা মিথ্যা-প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বাহিরের একটি উদ্দীপক নিশ্চয়ই থাকিবে। কিন্তু ভিতরেও আর একটি তথাকথিত উদ্দীপক থাকে—তাহা অবশ্য

অবিমিশ্রভাবে মানসিক। তাহা হয়তো একটা পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতি, কাহারো নিকট শোনা গল্প, কোনো বইয়ে পড়া কাহিনী, কোনো সংবাদপত্রে পড়া বা চলচ্চিত্রে দেখা ঘটনা, সংকেত, অভিভাব (suggestion), প্রত্যাশা, অনুভব, কল্পনা, অভ্যস্ত চিন্তা ইত্যাদি। ইহার সহিত প্রায় ক্ষেত্রেই থাকে দেহের ঘোর অবসাদ বা মনের বিক্ষোভচাঞ্চল্য বা শঙ্কাকুল অবস্থা।

যে ব্যক্তি কখনো সাপ দেখে নাই, সাপের ছবি পর্যন্ত দেখে নাই, সাপ দেখিতে কিরূপ তাহার বিবরণ শোনে নাই, সে কখনো রজ্জুতে সর্প-ভ্রম করে না। আবার, যে কখনো রৌপ্য চোখে দেখে নাই বা তাহার কথা কানে শোনে নাই, সে কখনো ঝিনুক দেখিয়া রূপা বলিয়া ভুল করে না। যে গরু একদিন গোহালে আগুন লাগায় প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইয়াছিল, সে ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন মাঠ হইতে গৃহে ফেরার পথে পশ্চিম আকাশে সিঁদুরে মেঘের সন্নিবেশ দেখে, তাহা হইলে সে ভাবে তাহারই গোহালে বুঝি আগুন লাগিয়াছে, ভয়ে আর সে অগ্রসর হইতে চাহে না।

অধ্যাস-গঠনের মূলে ভয় অনেক সময় সহায়তা করে—এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই ভয় জন্মাইবার মূলে থাকে অবশ্য এক বা একাধিক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, জনশ্রুতি, শৈশবে-শোনা রূপকথা, সদ্যশ্রুত বা পঠিত কোনো ঘটনা প্রভৃতি। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সেক্সপীয়ার লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা হয়তো *Midsummer Night's Dream* নাট্যের পঞ্চমাংক প্রথম দৃশ্যে থিসিয়ুসের উক্তির মধ্য হইতে দুইটি ছত্র মনে করিতে পারিবেন—

Or in the night imagining some fear,
How easy is a bush suppos'd a bear !

কিন্তু এই ভয় যে একেবারে অমূলক নয় এবং সত্যকার ভল্লুক সম্বন্ধে কোনো ধারণা-লাভ না করিয়া ঝোপেঝাড়ে একটা ভল্লুককে কল্পনা করা যায় না, ইহা বিশ্বাস করিতে এখন বোধ হয় আপনাদের কোনো কষ্ট নাই।

এই প্রসঙ্গে আপনাদিগকে আর একটা কথা শুনাইতে চাই। অধ্যাস ব্যাপারটি শুধু যে দৃষ্টির ক্ষেত্রেই ঘটে—এরূপ নহে, উহা স্পর্শ ও শ্রুতি-সংবেদন-জনিতও হইতে পারে। নির্জন পল্লীপথ দিয়া মধ্যরাত্রে একাকী আসিতে

আসিতে একটি বাগানের কাছে কে যেন কানে কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিয়া গেল, কে-যেন গাছের আড়ালে চাপা স্বরে নাক-কান্না কাঁদিতেছে, অথবা কে যেন তাহার অস্থিচর্মময় শীতল হাতের স্পর্শ কাঁধের উপর ক্ষণিকের জন্য বুলাইয়া দিয়া চলিয়া গেল—এই ধরণের একটা কিছু অভিজ্ঞতা বোধ হয় আপনাদের কাহারো কাহারো হইয়াছে। কিন্তু এগুলি কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়। হয় ইহা এক টুক্‌রা স্যাঁৎসেঁতে জমি হইতে উত্থিত বাতাসের খেলা, নহেতো ইহা ভোঁদড়ের ছানা, বাদুড়-ছানা বা কাঠবিড়ালীর ছানার ক্ষুধার বায়না নতুবা নিদ্রাবিজড়িত পক্ষীশাবকদের অস্ফুট কাকলি।

মায়া বা **অমূলপ্রত্যক্ষণ** (Hallucination)। অধ্যাসের মূলে বাহিরের একটি উদ্দীপক থাকিবেই, কিন্তু মায়ার মূলে বাহ্যদৃষ্ট কোন উদ্দীপকই নাই। অধ্যাসের চরম বিকাশকে প্রায়ক্ষেত্রে মায়া বলা যায়। সুস্থ ব্যক্তি কদাচ-কখনো মায়ার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ দৈহিক ও মানসিকভাবে ঘোর অসুস্থ ব্যক্তিগণ—বিশেষতঃ উন্মাদ ও বিকারগ্রস্ত রোগিগণ—মায়া প্রত্যক্ষণ করে। আধো-ঘুম-আধো-জাগরণের অবস্থায় অথবা সংবেশিত (hypnotised) অবস্থায় স্বাভাবিক ব্যক্তিকেও অমূলপ্রত্যক্ষণের অধীন হইতে দেখা যায়।

মায়া দৃষ্টিজাত, শ্রুতিজাত, স্পর্শজাত ও গন্ধজাত হইতে পারে। দৃষ্টিজাত মায়া সর্বাপেক্ষা অধিক হইতে দেখা যায়। তন্মিম্নে শ্রুতিজাত মায়ার সংখ্যা বেশী। এক-একটি কেসে একটি ইন্দ্রিয়ঘটিত মায়ার সৃষ্টি হয়, আবার কতকগুলি কেসে একসঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয়ঘটিত মায়া দেখা দিতে পারে।

ধরুন, কোনো দূর পল্লীগৃহে একটি তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালকের দুইটি ফুস্‌ফুসে নিউমনিয়া ব্যাধি আক্রমণ করিয়াছে। দিন কয়েক ধরিয়া প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে তাহার ১০৪°-১০৫° ফারেন্‌হাইট্ উত্তাপ চলিতেছে; মাঝে মাঝে বিকারের ঘোরে ভুল বকিতেছে। গৃহের আত্মীয়স্বজনগণের আহার-নিদ্রা বন্ধ। গ্রাম্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কিছু করিতে পারিতেছেন না। একদিন শেষরাত্রে খানিকটা ঘুমাইবার পর ভোর বেলা রোগী জাগিয়া জল পান করিতে চাহিল। জলপানের পর খানিকটা তৃপ্তিবোধ করিয়া, সে তাহার

মাতার হাতের উপর তাহার বিশীর্ণ একখানা হাত রাখিয়া ক্ষীণশ্রান্তকণ্ঠে কহিল, "মা, আমি আর বাঁচব না।" মা শুনিয়া তাড়াতাড়ি "বালাই বালাই, ষাট্ ষাট্" উচ্চারণ করিয়া ও কোনমতে অশ্রুরোধ করিয়া, তাহার মাথায় কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনাপ্রদ স্বরে কহিলেন, "কে বলেছে তোমায় এ সব্বনেশে কথা? তার মুখে বাসি উনুনের ছাই—শ্মশানের পোড়া কাঠ পড়ুক।"

তখন ছেলেটির তাপ বোধ হয় কিছু কম ছিল। সকাল বেলায় প্রত্যেক রোগীর মত সে কতকটা স্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করিতেছিল। সে ধীরে ধীরে ক্ষীণস্বরে কহিতে লাগিল, "খুব ভোরে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তুমি তখন চেয়ারে বসে আমার বিছানার উপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছ। হঠাৎ সুমুখের ঐ জানালা দিয়ে কালো পোষাক-পরা একমুখ চাপদাড়ি আর ঝাঁক্ড়া-চুলওয়ালা একটা লোক, কি করে জানি না, জান্‌লার গরাদের ফাঁক্ দিয়ে গলে আমার তক্তাপোষের কাছে এসে দাঁড়াল। বোধ হয় পাঁচ হাত লম্বা হবে, মুখখানা বাঘের মত বড়, লম্বা গোঁফজোড়া ওপর দিকে পাকানো, চোখ দুটো যেন দপ্ দপ্ করে জল্‌ছে। হাতে একটা বড় বড় কাঁটাওয়ালা গদা, সেটা কাঁধের ওপর রেখেছে। আমি ওকে দেখ্‌বামাত্র তোমার হাতখানা ধরে' চোখ বুজে ফেল্‌লুম; তোমায় ডাকতে গেলুম—পাল্লুম না, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তারপর লোকটা বল্লে, 'যা খাবার ইচ্ছে হয় খেয়ে নে, যাকে দেখার ইচ্ছে হয় দেখে নে, তোর পরমায়ু আর দু'দিন। পর্শু দিন আবার আমার দেখা পাবি।' খানিক পরে চোখের পাতা অল্প খুলে দেখি লোকটা চলে গেছে। বেশ বুঝতে পেরেছি ও যমদূত।"

ছয় মাইল দূর হইতে ছেলেটির পিতা একজন এম-বি-বি-এস্ পাস-করা ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। তিনি রোগী দেখিয়া কেস্ গুরুতর বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন একটি মূল্যবান ঔষধ জেলা-সদর হইতে কিনিয়া আনিতে হইবে, সেখানে না পাওয়া গেলে কলিকাতা হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। তখনকার মত তিনি একটি ঔষধ ইঞ্জেকশন্ করিলেন, ঔষধটি তাঁহার ব্যাগেই ছিল। আর দুইটি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিলেন—যে দুইটি তাঁহার

ডাক্তারখানায় পাওয়া যাইবে। কলিকাতা হইতে ঔষধ আনিবার জন্য একজন লোক পরদিন ট্রেনে করিয়া রওনা হইল। কিন্তু তৃতীয় দিন বেলা দশটা লাগাৎ ছেলেটি মারা গেল।

গাঢ়তম পৌরাণিক শাস্ত্রবিশ্বাসী, রূঢ়তম সংস্কারবিরোধীদের জন্য আমার এই বই নয়, আমি যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন মনস্তত্ত্বের পাঠকপাঠিকা-দিগকে উদ্দেশ করিয়াই বলিতেছি—ঐ যমদূতের আবির্ভাব ও কথা বলাটা অবিমিশ্রা মায়া—দর্শনঘটিত ও শ্রবণঘটিত মায়া।

ছেলেটি ক্রমাগত প্রবল তাপ ভোগ ও অন্যান্য কষ্টকর উপসর্গ ভোগ করিয়া ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার নার্ভগুলিও সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। সে যমরাজ ও যমদূতের ছবি বহু গৃহে দেখিয়াছে। তাহাদের গৃহের একটি কক্ষের দেওয়ালে সাবিত্রীর কোলে মৃত সত্যবান ও নিকটে দণ্ডায়মান যমদূতের একখানা ফ্রেমে-বাঁধানো ছবিও টানানো ছিল। যাত্রায় সে যমদূতের চেহারা দেখিয়াছে। ঠাকুর্মার মুখে গল্প শুনিয়াছে যে, মানুষের মৃত্যু হওয়ামাত্র একজন যমদূত গদা-হস্তে তাহার শবের নিকটে আসিয়া দাঁড়ায় এবং শ্মশান পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যায়। তারপর মৃতদেহ পুড়িয়া গেলে তাহার আত্মা-সমেত সূক্ষ্মদেহটি কাঁধে করিয়া যমলোকে লইয়া যায়। অতিশয় পুণ্যাত্মা সাধু পুরুষকে শিবলোকে বা বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য শিবদূত কিংবা বিষ্ণুদূত আসে···ইত্যাদি।

এই সব শ্রুতি ও স্মৃতিগুলি ছেলেটিকে বিকারের ঘোরে নিশ্চয়ই দুই-একবার যমদূতের ছায়ামূর্তি দেখাইয়াছে। সেদিন ভগ্ননিদ্র নয়নসম্মুখে তাহারই বিলম্বিত প্রতিফলন দেখিয়াছিল সে। যমদূত যে বলিয়া গিয়াছিল তাহার পরমায়ু আর দুইদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা বাহিরের কোনো অলৌকিক পুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী নয়; তাহারই মনের অজ্ঞাত স্তর হইতে উহা অবস্থাগতিকে তাহারই কণ্ঠ দিয়া মৃদুস্বরে বাহির হইয়া আসিয়াছে, সে শ্রোতা সাজিয়া নিজেরই উচ্চারিত বাণী নিজে শুনিয়াছে; কেবল সমস্ত উত্তমপুরুষকে দ্বিতীয় পুরুষে পরিণত করিয়াছে। তথাকথিত বিবেকের বাণীও মানুষ এইভাবে মাঝে মাঝে শুনিতে পায়; কিন্তু তাহার মধ্যে নার্ভ বা মস্তিষ্কের কোন কেন্দ্রেরই

কোন সক্রিয়তা থাকে না। বিবেকের কণ্ঠস্বর অশ্রুতিগম্য, তাহা অনুভূতিগর্ভ চিন্তা মাত্র (feelingful thought)।...তাহারই অন্তরোত্থিত ভবিষ্যদ্বাণীটি দৈবাৎ ফলিয়া গিয়াছিল। সেকালে কোনো কোনো বৃদ্ধবৃদ্ধা নিজেদের মৃত্যুর সঠিক দিনক্ষণ বলিয়া দিতেন। কেহ কেহ এখনো বলিতে পারেন। এইভাবে আমাদের মত সাধারণ লোকের অনেক কথাই আশ্চর্যভাবে কার্যে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়।

এই ধরুন না কেন, আপনি বলিলেন, "আজকের লীগের চ্যারিটি ম্যাচে নিশ্চয়ই মোহনবাগান জিতবে।" আপনার বন্ধুটি বলিলেন, "আমি বল্লুম ঈস্ট্ বেঙ্গল জিতবে। বাজি রাখ্। যে হারবে সে একখানা ব্রেস্ট্ কাটলেট্, একটা ফিশ্ চপ আর এক কাপ চা খাওয়াবে।" শেষ পর্যন্ত আপনারই দৈববাক্য সত্যে পরিণত হইল, মোহনবাগান ইস্ট্বেঙ্গলকে এক গোলে হারাইয়া দিল।...

আমার চারি বৎসর বয়স্কা নাতিনী ইলোরা সেদিন বলিল, "ও ঠাকুমা, তুমি কেন ভাবছ? চাইবাসা থেকে কাল সকালেই কাকুর চিঠি আসবে।" আশ্চর্য, দশদিন উদ্বিগ্ন প্রত্যাশার পর পরদিন বেলা দশটার ডাকে আমার কনিষ্ঠ পুত্রের একখানা চিঠি আসিয়া উপস্থিত।

আপনাদের মধ্যে এমন এক-একজন আছেন যাঁহারা ভালো হাত দেখিতে পারেন বলিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন। আসলে হয়তো তিনি উঁচুদরের করেরেখাবিদ নহেন, বহু বৎসর পূর্বে একবার কিরোর বইখানি ভালো করিয়া মন দিয়া পড়িয়াছিলেন এবং 'হস্তরেখা বিচার', 'সামুদ্রিক শিক্ষা' প্রভৃতি কয়েকখানি করেরেখাপাঠ সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। আসলে তিনি হস্তরেখা-বিচার করিতে যতটা না জানেন, লোকের মনের ভাব বুঝিতে ও আন্দাজে দুই চারিটি ভাবী-সংকেত করিতে পারেন, যেগুলির শতকরা চল্লিশ-পঞ্চাশটি এক-এক কেসে মিলিয়া যায় এবং তাহাতেই লোকে ধন্য-ধন্য করে।

আমিও অবস্থাবিপাকে বা উপরোধের পাকযন্ত্রে পড়িয়া বহুবার এইরূপ সখের 'পামিস্ট' বনিয়া গিয়াছি। অকপটে আপনাদের নিকট স্বীকার করিতেছি, পঁয়তাল্লিশ হইতে চল্লিশ বৎসর পূর্বে হিপ্নটিজ্ম্ শিক্ষা ও চর্চার সময় করেরেখা সম্বন্ধীয় দুই-চারিখানি ইংরাজী-বাংলা বই সযত্নে পড়িয়া অনেকগুলি হাত লইয়া

আমার শিক্ষার সার্থকতা পরখ্ করিয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, এই শাস্ত্রের উপর এখন আর আমার অবিমিশ্রা শ্রদ্ধা নাই; কথিত সময়ে অবশ্য শ্রদ্ধার চেয়ে কৌতূহল ছিল অধিকতর গভীর। তথাপি তখন আমার করেরেখাপাঠ ক্ষেত্রবিশেষে শতকরা ষাট হইতে পঁচাত্তর ভাগ মিলিয়া যাইত দেখিয়া আমি নিজেই বিস্ময়াভিভূত হইতাম।

কিন্তু আমি মনে মনে জানি যে, এতকাল ধরিয়া লোকচরিত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে, বহু শত স্ত্রীপুরুষের ঘটনাবৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনকাহিনী শুনিতে শুনিতে ও পুঁথিপত্র মাধ্যমে পড়িতে পড়িতে, লোকের গোপন চিন্তা ও মতলব বুঝিবার কয়েকটি সাধারণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিতে করিতে—সাধারণের চেয়ে আমার কিছু বেশী অভিজ্ঞতা ও স্বজ্ঞা (intuition) লাভ হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাই আমাকে একজন কুশলী গণৎকারের খ্যাতিলাভে মূলতঃ সাহায্য করিয়াছিল।

আমার সুদীর্ঘ জীবনে বহু বাধ্যতাজনিত কৌতুকপ্রদ কেরামতির মধ্যে প্রাসঙ্গিক বোধে এখানে একটির উল্লেখ করিতেছি—শুধু আমরা সকলেই যে অল্পবিস্তর ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে পারি সেই আপ্তবাক্যটিকে আরো উদাহরণান্বিত করিবার জন্য। শ্রীমান্ বিনয় আমার স্বগ্রামবাসী, সম্পর্কে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। উহারা তিন ভাইই আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে এবং আমি যে এক বিরাট ভাগ্যগণনাকারী এই কিংবদন্তীতে প্রচুর বিশ্বাস রাখে। উহাদের বাটীতে আমি কালেভদ্রে যাই। সাড়ে-তিন বৎসর পূর্বে উহাদের কোনো ছেলে বা মেয়ের অসুখ শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যার পর একদিন উহাদের গৃহে উপস্থিত হই।

উহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মঞ্জু বোধহয় তখন স্কুল ফাইন্যাল পাস করিয়া প্রি-ইউনিভার্সিটি পড়িতে সবে সুরু করিয়াছে। আদর-আপ্যায়ন, কুশল-জিজ্ঞাসা ও অন্যান্য সাংসারিক কথাবার্তার পর বিনয়ের মাতা বলিলেন, 'ঠাকুরপো, একবার মঞ্জুর হাতখানা দেখ তো—ওর লেখাপড়া কতদূর হবে আর বিয়েটা হচ্ছে কবে!" বিনয়ও তাহার মাতার কথায় সায় দিল। তাহার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ মঞ্জুকে ধরিয়া আনিয়া আমার সম্মুখে বসাইয়া দিলেন। আমি সত্যসত্যই হাত-দেখা অভ্যাসটি বহুকাল পূর্বে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। তারপর ইহারা

নিকট-আত্মীয়, একটি মেয়ের নিকট-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কথা কহিতে হইবে; যদি কথা সত্যে পরিণত না হয় তো অত্যন্ত অপ্রতিভ হইব। তাই বলিলাম, "হাত দেখা সত্যিই আমি ছেড়ে দিইছি অনেক কাল। ওতে প্রচুর শক্তিক্ষয় হয়, বহুক্ষণ মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাই। নিতান্ত কেউ না ছাড়লে এখন কপাল দেখে দু' একটা কথা বলে দিই; কোনোটা ফলে, কোনোটা ফলে না। এ বিদ্যেটায় আমি কিন্তু খুব পোক্ত নই।"

মঞ্জুর কপাল দেখিয়া যাহা বলিলাম, কপাল না দেখিয়াও তাহাই বলিতাম। —বি-এ পার্ট্ ওয়ান পরীক্ষা দিবার ঠিক পূর্বেই তাহার বিবাহ হইবে। পাত্রটি কলকারখানাযন্ত্রপাতি বিষয়ে অভিজ্ঞ হইবে—বোধ হয় ছোটখাটো ইঞ্জিনিয়ার। তাহার স্বাস্থ্য ভালো, রং বেশ-একটু কালোই হইবে। বিবাহের পূর্বে একটু গোলোযোগ হইবে, তাহাতে বিবাহের কোনো ক্ষতি হইবে না···ইত্যাদি।

আপনারা এই সকল বুজরুগির কাহিনী শুনিয়া হয়তো কেহ হাসিবেন। হয়তো কেহ সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "যাহোক, আপনার ভবিষ্যদুক্তির কত পার্সেণ্ট মিল্ল্ সেইটা বলুন।" আমি যদি বলি পঁচানব্বই পার্সেণ্ট, তাহা হইলে কেহ অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন না অথবা দয়া করিয়া আমার নিকট কপাল দেখাইতে আসার প্রলোভনে অধীর হইয়া উঠিবেন না। আমার শূন্য-গর্ভ গণনা-বিদ্যার কথা জীবনে প্রথম আপনাদের নিকট বেফাঁস করিলাম।····

যাহা হউক, বহুপ্রকার দর্শনজাত মায়ার উদ্ভব হইতে দেখা যায়। যথা, কোনো মৃত আত্মীয় বা অনাত্মীয়, মৃত বা বহুদিন-না-দেখা কোনো প্রেমিকা বা বন্ধু, কোনো জানোয়ার, দৈত্য, সাপ, বেজী, ব্যাঙ, আর্শুলা, ছুঁচা, ইঁদুর, প্রজাপতি, কেন্নো, কেঁচো, কৃমি, নানারূপ কীটপতঙ্গ ইত্যাদি। কোনো কোনো উন্মাদ বিষধর সাপ, বড় বড় বিছা ও কীটপতঙ্গই বেশী দেখে। কেহ সেগুলিকে একস্থানে স্থিতিবান দেখে, কেহ নড়িতে-চড়িতে অথবা তাহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাহারা ভয়ে চোখ ঢাকিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটাছুটি করে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনী উন্মাদাবস্থায় এইরূপ অমূলপ্রত্যক্ষণের অধীন হইয়া, দিনের পর দিন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়াছিল।

এক-একজন উন্মাদ অথবা নেশাগ্রস্ত লোক তাহার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত স্থির বস্তুকেই অস্থির দেখে। এমন কি, ঘরের মেঝে পর্যন্ত ভূমিকম্পে নড়িতেছে অথবা সাগরের মত তরঙ্গ-হিল্লোলিত হইতেছে বলিয়া মনে করে। এই ধারণার বশে তাহারা নিজেদের স্থির রাখিবার জন্য টেবিলের কোণ, চেয়ারের হাতা বা ঘরের দেওয়াল ধরে। উপরোক্ত শ্রেণীর লোক আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজে মেঝে হইতে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, ডানায় ভর দিয়া শূন্যে উড়িতেছে বা জলে পড়িয়া প্রাণপণে সাঁতার কাটিতেছে বলিয়া মনে করে এবং তৎসুলভ অঙ্গভঙ্গী করে।

এক-একটা স্পর্শজাত মায়া বড় অদ্ভুত রকমের হয়। কোনো কোনো সবল সুস্থ মানুষ এক-এক সময় অনিদ্রা-রোগে ভোগে। অনিদ্রার কারণ বলে যে, যখনই তাহারা ঘুমের ঘোরে চোখ বুজিয়াছে, তখনি তাহাদের পাশে কে যেন আসিয়া বসে এবং আল্‌তোভাবে তাহাদের কপালে হাত রাখে, নচেৎ ধীরে ধীরে গায়ে হাত বুলায়। স্পর্শ পাওয়ামাত্র তাহারা ধড়্‌ফড় করিয়া জাগিয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে সেই অদেখা জীবটিও হাওয়ায় মিলাইয়া যায়।

একবার একটি রোগী কিছুদিন ধরিয়া কেবলি অভিযোগ করিতেছিল যে, তাহার পাকস্থলীর মধ্যে গুটি কয়েক মৌমাছি ঢুকিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে এবং মাঝে মাঝে পেটে দংশন করিতেছে। চিকিৎসক তাহার মাথার গণ্ডগোল বুঝিতে পারিয়া তাহাকে একটি হজমের মিক্সচার লিখিয়া দিলেন। কিছুদিন চুপ করিয়া থাকিয়া, সে আত্মীয়স্বজনের নিকট অভিযোগ করিল যে, তাহার ক্ষুধা চলিয়া গিয়াছে, পেটের মধ্যে দারুণ অস্বস্তি ঠেকিতেছে এবং এবার এক ঝাঁক নূতন মৌমাছি তাহার ঘুমের সময় পেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৌচাক্ তৈয়ারি করিতে সুরু করিয়াছে। সেইজন্য মাঝে মাঝে সে পেটে জ্বালাযন্ত্রণা বোধ করিতেছে। মৌচাকটি ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিলে, সে নিশ্চয় পেট ফাটিয়া মারা পড়িবে।

তাহাকে তাহার এই ভ্রান্ত বিশ্বাস হইতে কিছুতেই টলানো গেল না এবং কোনো ঔষধপত্র দিয়াও তাহার খাদ্যে রুচি ফিরানো গেল না। সে ক্রমাগত উপবাস করিয়া একদিন শয্যাশায়ী হইল। ডাক্তার তাহাকে গ্লুকোজ্ দ্রবের ইঞ্জেক্‌শন দিতে আসিলে, সে বিছানা হইতে উঠিয়া অন্য ঘরে ঢুকিয়া খিল

আঁটিয়া দিত। শেষে অস্থিচর্মসার হইয়া সে একদিন 'জ্বলে গেল, জ্বলে গেল' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার রোগ সম্বন্ধে ডাক্তারদের একটা যুক্তিযুক্ত কৌতূহল ছিল। তাহার মৃতদেহ তাঁহারা হাসপাতালে লইয়া গিয়া ব্যবচ্ছেদ করিলেন। পাকস্থলী চিরিয়া দেখা গেল তাহার মধ্যে একটি মৌমাছির ডিম পর্যন্ত নাই, কেবল ভিতরকার গাত্রের একাংশ আল্‌সারে ফুটা-ফুটা হইয়া গিয়াছে।...

আর একবার একটি মহিলা তাঁহার গৃহচিকিৎসকের নিকট আসিয়া পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পেটের মধ্যে এক জোড়া সাপ আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে। বমি বা বিষ্ঠার সহিত তাহারা কিছুতেই বাহির হইতেছে না। বহুবার গলায় আঙুল দিয়া অথবা গরম নুন-জল খাইয়া বমি করিয়াছেন, বহুবার জোলাপ লইয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই সাপ দুইটিকে তাড়ানো যাইতেছে না। তাহাদের জ্বালায় তিনি কিছু খাইতে পারেন না, রাত্রিকালে ঘুমাইয়াও তিনি শান্তি পান না। সাপ দুইটি পেটের মধ্যে নড়াচড়া করে, মাঝে মাঝে দুইজনে ঝগড়া-মারামারি করে। ইহাদিগকে বহিষ্কৃত করিবার একটা উপায় বাহির করিবার জন্য মহিলাটি চিকিৎসক মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

চিকিৎসক মহাশয় মহা ফাঁপরে পড়িলেন। ইহা যে মহিলাটির প্রকাণ্ড রকমের বাতিক তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। উহা তাঁহার হজমের গোলমাল ও পেটে গ্যাসের উপদ্রব ছাড়া অন্য কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। একটু বেশী কিছু খাইলেই কিছুক্ষণ পরে গ্যাস জন্মিয়া পাকস্থলীর এক-এক জায়গা দড়ির মত পাকাইয়া শক্ত হইয়া উঠিত ও ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্রমসংকোচগতি (peristalsis) অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইত—যাহাকে সাধারণ কথায় বলে পেট ভুটভাট্ করা। নানাপ্রকার হজমের ঔষধ দিয়া তাঁহার সত্যকার ব্যাধি বহু পরিমাণে প্রশমিত হইল, তথাপি সেই সর্পঘটিত ভ্রান্ত বিশ্বাস কিছুতেই তাঁহার মন হইতে তাড়ানো গেল না।

কিছুদিন চুপ করিয়া থাকিবার পর মহিলাটি পুনরায় চিকিৎসকের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "সাপ দুটো আপনার ওষুধে এতদিন আধমরা হয়েছিল,

ক'দিন ধরে দেখছি আবার তারা সতেজ হয়ে উঠেছে। আমার স্পষ্ট ধারণা হয়েছে মেয়ে-সাপটা এক গাদা ডিম পেড়েছে। শিগ্‌গির আপনি পেট কেটে সাপ দুটো ও ডিমগুলো বার করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। নইলে যখন ডজন ডজন সাপের বাচ্ছা আমার শরীরের মধ্যে কিল্‌বিল্ করবে, তখন কি একদণ্ড সোয়াস্তি পাব, না, বেশীদিন বেঁচে থাকতে পারব?"

রোগিণীর নির্বন্ধাতিশয্যে সদাশয় গৃহ-চিকিৎসক ভদ্রলোকটি হাসপাতালে এক সার্জেন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন। দিন কয়েক পরে মহিলাটির পেটে অস্ত্রোপচার করাই সাব্যস্ত হইল, তৎপূর্বে তাহার পাকস্থলীর একটি এক্স্-রে চিত্র লওয়া হইল এবং রোগিণীকে জানানো হইল যে, সত্যই তাঁহার পেটে একটি মরা ও একটি জ্যান্ত সাপের ছবি উঠিয়াছে। ডিমগুলি এক জায়গায় অস্পষ্টভাবে দলা পাকাইয়া আছে।

যেদিন সকালে রোগিনীর পেটে অস্ত্রোপচার করিবার কথা, তাহার পূর্ব দিনে হাসপাতালের ভৃত্যদিগকে দিয়া অদূরের পল্লীতে দুইটি হাতখানেক করিয়া লম্বা নিরীহ প্রকৃতির সাপ মারিয়া ও কয়েকটি গিরগিটির ডিম যোগাড় করিয়া আনা হইয়াছিল এবং সেগুলি একটি পাত্রে করিয়া ঠাণ্ডা-সিন্দুকে সংরক্ষিত করা হইয়াছিল। যথাসময়ে রোগিণীর উপর সংজ্ঞাপহারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, সত্য-সত্যই সার্জেন তাঁহার পেরিটোনিয়ামের খানিকটা অংশ ল্যান্সেট্ দিয়া চিরিয়া ফেলিয়া সেলাই করিয়া দিলেন। অপারেশান্-থিএটারে শুইয়া থাকিতে থাকিতে রোগিণীর যখন চৈতন্য প্রায় ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন একটি প্লেটের উপর রক্ষিত রক্ত-পুঁজমাখা সাপ দুইটি ও ডিমগুলি আনিয়া তাঁহার নজরের কাছে ধরা হইল। রোগিণী সেগুলির প্রতি সাগ্রহে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিলেন। অতঃপর তাঁহার এই আজগুবি ধরনের স্পর্শবোধ-জনিত অমূলপ্রত্যক্ষণ দূরীভূত হইল।

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমাদের নিকট সত্যবস্তুর প্রত্যক্ষণ যতখানি সত্য বলিয়া বোধ হয়, মায়াও প্রত্যক্ষণকারীর নিকট ঠিক ততখানি সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কোনো কোনো মায়া-প্রত্যক্ষণকারী যদি সুস্থমস্তিষ্কে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কোনো শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি বুঝাইয়া

দিলে সে বুঝিতে পারে যে, তাহা সত্য নয়, মায়া। এই সকল অমূলপ্রত্যক্ষণের সহিত মানসিক আবেগ ও কাল্পনিক অনুভূতি অনেক সময় বিজড়িত থাকে। অনেক সময় শোকাকুলা জননী তাহার সদ্যোমৃত পুত্রের মূর্তি মাঝে মাঝে অমূলপ্রত্যক্ষণ করেন, এমন কি কদাচিৎ তাহার মুখের কথাও শুনিতে পান।

এক-এক সময় এই উপসর্গ ক্রমাগত মূর্তি ধরিয়া ও মুখর হইয়া কোনো লোককে কোনো সৎ বা অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত হইতে উত্তেজিত করে। বলা বাহুল্য, এই প্রক্ষিপ্ত মায়ামূর্তি ও তাহার কথাগুলি বিষয়ীর আপন অন্তরের গোপন কন্দরে গ্রথিত। ভক্তগণ গভীর নিদিধ্যাসন করিতে করিতে এক-এক সময় তাঁহাদের ইষ্টদেবতার মায়ামূর্তি দেখিতে এবং দুই-চারিটি কথাও শুনিতে পান্। এক-এক সময় ওই মায়ামূর্তির সহিত তাঁহাদের কিছুক্ষণ কথোপকথন পর্যন্ত হয়। তখন আত্মসম্মোহিত ভক্তগণ নিজেদেরই গলা হইতে স্বরানুকার-কুশলীর (ventriloquist) মত ভিন্নস্বরে কথা বলিয়া নয়নসম্মুখে-প্রকটিত মায়াদেবতার মুখে চালান করেন।

মায়াসৃষ্টি কেন হয়, তাহার নানা কারণ নানা পণ্ডিতে বাহির করিয়াছেন এবং ঐ কারণগুলির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করিতে পর্যাপ্ত টীকাভাষ্য সংযোজন করিয়াছেন। গত ১৮৮৮ সালে দুইজন ফরাসী মনোবিজ্ঞানী বিনে ও ফ্যারা, একটি মতবাদ * প্রচার করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহারা অধ্যাস ও মায়ার মধ্যে আকাশপাতাল ব্যবধানকে অনেকখানি খাটো করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, অধ্যাসে যেরূপ সংবেদনজনিত ভ্রম সংঘটিত হয়, মায়াতেও সেইরূপ হয়। প্রথম ব্যাপারে একটি জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া ভ্রম হয় এইজন্য যে, ওই দুইটি জিনিসের মধ্যে আকারে-প্রকারে কিছু-না-কিছু সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু মায়া বা অমূলপ্রত্যক্ষণের মধ্যে কোনো বস্তুরই যে অস্তিত্ব থাকে না অথচ একটা বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যয় জন্মে—এ কথাটা বিনে ও ফ্যারা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না।

তাঁহারা অনেকগুলি মায়া-সংঘটনের কেস্ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, প্রতি ক্ষেত্রেই একটা অতি ক্ষুদ্র বা নগণ্য বস্তুকে প্রত্যক্ষণ করিতে গিয়া বিষয়ী

* Alfred Binet and Charles Fere, *Animal Magnetism* (Appleton) pp. 211-276.

তাহা অপেক্ষা অনেক বড় একটা অন্য বস্তু বলিয়া জ্ঞান করে; সত্য ও মিথ্যা বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকে নামমাত্র অথবা মোটেই থাকে না। মায়া-প্রত্যক্ষণকারী একটা বিন্দুকে সিন্ধু করিয়া অথবা একটা তিলকে তাল বলিয়া, অথবা একটা বট-বীজকে মহীরুহ-রূপে আপন সংবেদন-কেন্দ্রগুলিতে গ্রহণ করে, কিন্তু একটা airy nothingকে একটা local habitation ও একটা নাম দেয় না। উহারা ওই ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষণ-সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম উদ্দীপকের নাম দিলেন *point de repire*। উহাদের মতে এই বিন্দুসম উদ্দীপক হইতেই সংবেদনবাহী নার্ভ-তন্তুগুলি উদ্দীপনা লাভ করিয়া, তাহাকে পথিমধ্যে বহুগুণ বাড়াইয়া মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কেন্দ্রে হাজির করে; সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কও তাহাকে আরো স্ফুটতর ও বৃহত্তর রূপ দিয়া গ্রহণ করে।

কিন্তু আজকালকার মনোবিজ্ঞানীদের নিকট বিনে ও ফ্যারার এই থিওরি ধোপে টিকিতেছে না। তাঁহারা বলেন যে, মায়াসৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি অকিঞ্চিৎকর বস্তু উদ্দীপক হিসাবে থাকিতেও পারে, না-ও থাকিতে পারে। অধিকাংশ হোমরা-চোমরারা বলেন যে, মায়ার ব্যাপারে ইন্দ্রিয়মধ্যস্থ গ্রাহকপ্রান্তগুলি ইন্দ্রিয় হইতেই ঐ মিথ্যা প্রত্যক্ষণের রশদ পায়, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে সম্পৃক্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সাময়িকভাবে কিছু বৈকল্য বা বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হওয়ার ফলে এইরূপ মায়ার সৃজন হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, নিয়ত সত্যপ্রত্যক্ষণ-বহনে অভ্যস্ত নার্ভতন্তুগুলি উদ্দীপনা বা ইন্দ্রিয়ের কোনো সহায়তা না লইয়াই নিজেরাই একটা মিথ্যা প্রত্যক্ষণের সৃষ্টি করে। আবার কোনো কোনো বিশারদ বলেন যে, মায়ার সূত্রপাতটা হয় অবশ্য সংবেদনবাহী নার্ভতন্তুসমূহে, কিন্তু মস্তিষ্কের উপরিতলস্থ কেন্দ্র তাহাকে সত্য বলিয়া ও বড় করিয়া গ্রহণ করে বলিয়াই মায়ার অনুভূতিটি জন্মে। অধ্যাস ও মায়া—উভয়ের মধ্যেই সংবেদনবাহী নার্ভের কিছু কারচুপি আছে, তারপর বাকিটা সংবেদন-কেন্দ্রের জ্যোঠামি।

কেহ কেহ বলেন, সুস্থ ব্যক্তিই হোক আর অসুস্থ ব্যক্তিই হোক্, যে ইন্দ্রিয়ঘটিত মায়ার সম্মুখীন হউক না কেন তাহারা, সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ও নিত্যাভ্যস্ত সংবেদনবাহী নার্ভতন্তুগুলি ইহাতে ক্রিয়াশীল হয় না,—সম্ভবতঃ তাহারা কোনো কারণে অসংলগ্ন থাকে, অন্য একদল অনভ্যস্ত নার্ভতন্তু মায়া

সৃজনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে; এই নার্ততন্তুগুলির গমনপথের সিন্যাপ্স-গুলি কোনো বাধার সৃষ্টি করে না বলিয়া ঐ মিথ্যা প্রত্যক্ষণের বোধ যথেষ্ট প্রশ্রয় পায়। অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত অবস্থা, আবেগজনিত সম্পীড়ন ও ঝিমুনির ভাব ব্যতীত অন্য সময় মানসিক সুস্থ ব্যক্তিগণ বড়-একটা অমূলপ্রত্যক্ষণের সোনার হরিণ দেখিতে পায় না।

মনোবীক্ষণিকদিগের মতে মায়া হইল দেহধারীর অপূরিত বা প্রদমিত বহুপোষিত কামনার সমূর্ত প্রকাশ। জ্ঞানে ও অজ্ঞানে দুই বিপরীতধর্মী ইচ্ছা বা আবেগের মধ্যে কিছুদিন ধরিয়া ঘোর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতে চলিতে একদিন একটি আবেগ বা ইচ্ছা প্রবল হইয়া অন্যটিকে পরাস্ত করে এবং বিজয়ী আবেগটি তাহার পরিপূরণের পাত্র অথবা পন্থাকে সম্মুখে না পাইয়া ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় তাহার একটা জীবিতবৎ প্রতীক বা প্রতিরূপ সৃষ্টি করে। আপনারা সর্ব দেশের ধর্মসাধনার ইতিহাসে ও পুরাণে অবশ্যই পাঠ করিয়া থাকিবেন যে, বড় বড় মুনিঋষিসাধকগণ লোকালয় হইতে দূরে নির্জন গুহায় ধ্যান করিতে করিতে শুধু যে ধ্যাননেত্রে লীলাবিভঙ্গময়ী সুন্দরী মূর্তি সন্দর্শন করিয়াছেন তাহা নহে, স্থূলনেত্র উন্মীলিত করিয়া সম্মুখে উহার জীবন্ত মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এমন কি তাহাদের প্রলোভনময় বচন বা রসচটুল প্রেমসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়াছেন অথবা তাহাদের চম্পকাঙ্গুলির মৃদু স্পর্শলাভ করিয়া কামাবেগে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন; ইহার ফলে তাঁহাদের কাহারো কাহারো রেতঃস্খলন পর্যন্ত হইয়াছে।

আপনারা পুরাণে যে পড়িয়াছেন, কঠোর তপোব্রতীদিগের তপস্যা নষ্ট করিয়া দিবার জন্য ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতা তাহাদের নিকট উর্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী প্রভৃতি স্বর্বেশ্যাদিগকে পাঠাইয়া দিতেন, ইহার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য সত্য বস্তু যদি কিছু থাকে তো তাহা হইল—পূর্ব-হইতে-শ্রুত ও স্মৃতিভাণ্ডারে গোপনে পোষিত কবিকুলকল্পনামথিত স্বর্বেশ্যাদের অলোক-সামান্য রূপের ধারণা ও তাহার সাংবেদিক বাহ্য অভিক্ষেপ (projection)। তাহাদের নিকরুণ রুদ্র বৈরাগ্যের তলদেশে যে অবদমিত কাম তিলে তিলে শক্তিসঞ্চয় করিয়া স্পার্টাকাসের মত সদল-বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল,

সে এক-একদিন বিষয়ীর একটা মানসিক বা দৈহিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ঐ দেবভোগ্যাদের যে-কোনো একটিকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিত ও ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে এক বা একাধিক উদ্দীপনার ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিত।

মায়ামূর্তি মানুষকে সময়-সময় এরূপভাবে অভিভূত করে যে, উহাকে প্রতীয়মানতঃ দেখিয়া, উহার কথা শুনিয়া ও উহার সহিত কথা বলিয়া বা উহাকে স্পর্শ করিয়া সে নিজে শুধু উহার ভৌতিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, অপরকেও বিশ্বাস করাইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করে। পাশ্চাত্যদেশে এমন এক-একটি তরুণীর কথা শোনা যায় যাহারা বাল-যীশুর ভাবে এমনই তদ্গতচিত্ত হইয়া যায় যে, তাহারা তাঁহার বালমূর্তির ক্ষণিকের আবির্ভাবই শুধু প্রত্যক্ষ করে না, তাঁহাকে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া সহাস্যে দুইখানি কচি কচি সুডৌল হাত বাড়াইতে দেখে। তাহারা তাহাকে কিছুক্ষণ কোলে করিয়া বেড়ায়, তাহার মুখচুম্বন করে, তাহার মুখের আধ-আধ ভাষ শুনিয়া পুলক-বিহ্বল হয়। তারপর তাহাদের কোল শূন্য করিয়া বাল-যীশু এক সময় উড়িয়া পলায়। আমাদের দেশেও মীরাবাই বৃন্দাবনে তাঁহার বৈরাগ্য-সাধনের চরম অবস্থায় গিরিধারী গোপালের মূর্তি সন্দর্শন করিতেন, তাহাকে স্পর্শ করিতেন এবং অঙ্কে ধারণ করিতেন। এ সমস্তই তাঁহার ইচ্ছা-সম্পূরণ-চিন্তার সমূর্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিক্ষেপ ও তাহার প্রতিক্রিয়া!

অধ্যাসের ন্যায় এইরূপ মায়াসৃজন আত্মাভিভবের দ্বারা অথবা সংবেশকের অভিভব-দ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে। একজন পাকা সংবেশক দুই-তিন হাজার দর্শককে একযোগে পাইকারীভাবে সংবেশিত করিয়া, তাহাদের উৎসুক নয়ন-সম্মুখে যে-কোন ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবীর মায়ামূর্তির আবির্ভাব করাইতে পারেন।

সপ্তম প্রসঙ্গ

বহিঃস্রাবী ও অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিনিচয়

'গ্রন্থি' শব্দটি আপনাদের মনে যে অর্থ জাগায়, আমি সে অর্থটি অন্ততঃপক্ষে এই গ্রন্থপাঠকালে আপনাদিগকে ভুলিয়া যাইতে বলি। তাহার কারণ হইল এই যে, গ্রন্থি বলিতে গাঁট, গেরো, ফাঁস, সন্ধি প্রভৃতি যে সকল অর্থ আপনাদের মনে আসে, বর্তমান গ্রন্থের আগাগোড়া গ্রন্থি শব্দটি তাহার কোনটিকেই জ্ঞাপন করিতেছে না। শারীরবিজ্ঞানে 'গ্রন্থি' অর্থ রসস্রাবী ছোট-বড় থলি। এই থলিগুলি অবশ্যই মাংসপেশী ও ঝিল্লী দিয়া তৈয়ারি, খুব পাতলা ও চোপষানো নয়। অধিকাংশ গ্রন্থিই বেশ পুরু শক্ত, উপরের গাত্র অল্পবিস্তর মসৃণ। উহাদের প্রায়গুলিকেই বাহির হইতে টিপিলে ভিতরের দিকে বসিয়া যায় না। একটি গ্রন্থি একটি পায়রা-মটরের মত ছোট হইতে এবং একটা পায়রার ডিমের চেয়েও অনেক বড় হইতে পারে।

এই গ্রন্থিগুলির কাজ কি? ইহারা শরীরের রক্ত হইতে রকমারি উপাদান সংগ্রহ করিয়া, নিজেদের মধ্যে এক-একপ্রকার রস প্রস্তুত করে। ঐ সমস্ত বিভিন্ন-গুণান্বিত রস আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্ষরিত হইয়া স্থানীয়ভাবে অথবা সার্বত্রিকভাবে নানারূপ হিতসাধন করে। ইহাদিগকে শরীরের এক-একটি রাসায়নিক ল্যাবরেটরি বলা যায় এবং শুধু 'গ্রন্থি' না বলিয়া 'রসগ্রন্থি' বলিলে ভালো মানায়। এখন আপনাদের পরিচিত ও অপরিচিত কতকগুলি গ্রন্থির বিবরণ দেওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।

বহিঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির কথা

আমাদের জিহ্বার আশেপাশে তিন জোড়া লালাস্রাবী গ্রন্থি আছে—তাহা আপনারা আগেই জানিতে পারিয়াছেন। খাদ্যগ্রাস মুখে পৌঁছিলে অথবা খাদ্যের সুঘ্রাণ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে, লালাগ্রন্থি হইতে আপনা-আপনি রস-নিঃস্রাব হইতে থাকে, তাহাও আপনাদের অবিদিত নাই। আপনারা নিশ্চয় চট্ করিয়া বলিয়া দিতে পারেন যে, এই লালানিঃসরণ ব্যাপারটি একটি

প্রতিবর্তী ক্রিয়া। যাহা হউক, লালার সার্থকতা হইল—উহা খাদ্যবস্তুকে কোমল ও কতকটা তরল করিয়া চিবাইবার সুবিধা করিয়া দেয়, তদুপরি জিহ্বাকে নানারূপ স্বাদগ্রহণে অধিকতর সামর্থ্য দান করে এবং ভাত, মুড়ি, চিড়া, আলু, কলা, কচু, লুচি, রুটি, বিস্কুট, কেক্ প্রভৃতি খাদ্যমধ্যস্থ শ্বেতসার (starch) উপাদানকে আংশিকভাবে পরিপাক বা শর্করায় পরিণত করিয়া দেয়।

ইতঃপূর্বে চর্মের পরিচয়-প্রসঙ্গে আপনারা জানিতে পারিয়াছেন যে, অন্তস্ত্বকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ঘর্মস্রাবী গ্রন্থি ও তদপেক্ষা কিছু কম সংখ্যক বসাস্রাবী (sebacious) গ্রন্থি আছে। শুধু দারুণ গ্রীষ্মে নয়, শীতকালেও ঘর্মস্রাবী গ্রন্থগুলি সক্রিয় থাকিয়া ঘর্মনিঃস্রাব করে। গ্রীষ্মকালে বেশী পরিমাণে ঘর্ম-নিঃসারণ করে এবং তাহা চোখে দেখা যায়। শীতকালে কম নিঃসারণ করে এবং তাহা অদৃশ্য থাকে। বসাস্রাবী গ্রন্থিসমূহ হইতে বসা (একপ্রকার পাতলা চর্বি বা তৈলাক্ত পদার্থ) নিয়ত নিঃসৃত হইতেছে। এই বসা পদার্থটি আমাদের ত্বকের তলভাগ ও উপরিভাগকে খানিকটা মসৃণ করিয়া রাখে। এরূপ কোনো কোনো লোক আপনারা দেখিতে পাইবেন—যাহারা সাতজন্মে গাত্রে তৈল মাখে না, অথচ তাহাদের গাত্র বেশ চক্-চক্ করে। এই সকল লোকের বসাগ্রন্থিগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক সক্রিয়। পক্ষীদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন—তাহারা ডালে বসিয়া বিশ্রাম করিবার সময় পালকগুলির মূলদেশ চঞ্চু দিয়া খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া কি যেন বাহির করিয়া পালকগুলির গায়ে মাখাইয়া দিতেছে। ঐ বস্তুটি আর কিছুই নয়, বসা। বৃষ্টির আগে ও পরে উহাদের ঐ বসা-মাখানো কাজটি আরো বাড়িয়া যায়।

যকৃত নামক অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রটি আমাদের দেহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গ্রন্থি। উহার মধ্যে অন্ততঃ তিন প্রকার রস প্রস্তুত হয়। তাহা ছাড়া ইহা আমাদের শারীরবিধানে চিনির ভাণ্ডারী-রূপে কাজ করে ও রক্তকে কতকটা পরিশুদ্ধ করিতেও সাহায্য করে। যকৃতের গায়ে পিত্তস্থলী বলিয়া যে ক্ষুদ্র যন্ত্রটি সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহার মধ্যে যকৃত কর্তৃক প্রস্তুত পিত্তরস আসিয়া সঞ্চিত হয়। পিত্তস্থলীর মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টায় একটু-একটু করিয়া প্রায় তিন পোয়া আন্দাজ পিত্তরস জমে। এই নীলাভ হরিদ্বর্ণের পিত্ত আমাদের শরীরের কি

কি উপকার করে? প্রথমতঃ, আমাদের খাদ্যমধ্যস্থ স্নেহ বা তৈল জাতীয় উপাদানগুলিকে কতকাংশে পরিপাক করে; দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যদ্রব্যকে যথাসাধ্য নির্বীজিত (disinfected) করে; তৃতীয়তঃ, খাদ্যের পরিপাকাবশিষ্ট অসার পদার্থগুলি যাহাতে বৃহদন্ত্রের মধ্যে মলে পরিণত হইয়া সহজে শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করে।

তারপর, আমাদের পাকস্থলীর তলার দিকে অগ্ন্যাশয় বা ক্লোমযন্ত্র (Pancreas) নামক যে যন্ত্রটি অবস্থিত, তাহার মধ্য হইতেও তিন প্রকার রস বাহির হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে গড়াইয়া আসিয়া, আমিষ, স্নেহ ও শর্করা জাতীয় খাদ্যোপাদানসমূহ প্রায় নিঃশেষে পরিপাক করিতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, আর একপ্রকার রসও ইহার মধ্যে প্রস্তুত হয়; উহার কথা পরে বলিব।

উপরে যে-সকল গ্রন্থির কথা উল্লেখ করা হইল, উহাদের প্রত্যেকটিরই নিজ দেহের একাংশে এক বা একাধিক সরু নল সংলগ্ন থাকে। ঐ নলগুলির মধ্য দিয়া রস গড়াইয়া এক-একটি নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া নির্দিষ্ট কর্তব্য করিয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। এই শ্রেণীর প্রত্যেকের রসনিঃস্রাবী নল বা নালী থাকে বলিয়া এগুলি **সনালী গ্রন্থিনিচয়** (Duct glands) নামে পরিচিত। ইহাদের আর এক অভিধা হইল **বহিঃস্রাবী গ্রন্থি** (glands of external secretion)। ইহাদের স্রাব একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাহির হইয়া আসে এবং একটু চেষ্টা করিলে, তাহাদিগকে দেখা, চেনা ও পৃথক করা যায়।

নির্নালী বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির পরিচয়

কিন্তু আর এক শ্রেণীর রসগ্রন্থি আছে যাহাদের গাত্রে কোনো নালী সংলগ্ন নাই। ইহাদের নালী থাকে না বলিয়া ইহাদিগকে **নির্নালী গ্রন্থিনিচয়** (Ductless glands) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহাদের আকার ও কার্য বহিঃস্রাবী গ্রন্থগুলি হইতে একটু স্বতন্ত্র রকমের। ইহাদের মধ্যে যে বিশিষ্ট রস প্রস্তুত হয়, তাহা শরীরের কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের কল্যাণ সাধন করিয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যায় না। ইহাদের বিশিষ্ট রস

আপন আপন গাত্র চুঁয়াইয়া প্রতিনিয়ত অনুভূতভাবে নিস্যন্দিত হয় এবং সমগ্র দেহের রক্তস্রোতের মধ্যে মিশিয়া গিয়া, বিশেষ-বিশেষভাবে দেহকে প্রভাবান্বিত করে। ইংরাজী বৈদ্যক শাস্ত্রে তাই ইহাদের আর এক নাম হইয়াছে Endocrines বা Glands of internal secretion। বাংলায় আমরা ইহাদের নাম দিয়াছি **অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিমালা**। সনালী গ্রন্থিগুলি অপেক্ষা নির্নালী গ্রন্থিগুলির মূল্য অনেক বেশী এই কারণে যে, আমাদের মনুষ্যত্ব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, প্রবৃত্তি, প্রবণতা, বেগ, আবেগ, দেহমনোগত বৃদ্ধি ও সময়োচিত বা অসময়োচিত পরিবর্তন প্রভৃতির মূলে রহিয়াছে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির অন্তঃস্রাব। এই গ্রন্থিগুলির পরিচয় আমাদিগকে একটু ভালো করিয়া লইতে হইবে, কারণ দেহের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা মানুষের মন ও স্বভাবকে প্রভাবান্বিত করে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে। সর্বপ্রকার অন্তঃস্রাবকেই ইংরাজীতে বলে **হরমোন্** বা ইন্‌ক্রিশন্ (Hormone or Incretion)।

উভস্রাবী তিনটি গ্রন্থি

আমাদের দেহে অন্ততঃ এমন তিনটি রসগ্রন্থি আছে যাহারা অন্তঃস্রাব ও বহিঃস্রাব দুই-ই প্রস্তুত করে। এই তিনটি হইল—**অগ্ন্যাশয়, যকৃত ও মুষ্ক**। অগ্ন্যাশয়ের দ্বারা প্রস্তুত তিন প্রকার বহিঃস্রাব আমাদের খাদ্য-পরিপাকে সহায়তা করে, তাহা আপনাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। এই যন্ত্রটি আর এক প্রকার অন্তঃস্রাব রক্তস্রোতে মিশাইয়া দেয় যাহার নাম "ইন্‌সিউলিন্"। এই ইনসিউলিন্ কি করে জানেন? আমাদের পরিপাকপ্রাপ্ত খাদ্য হইতে সংগৃহীত যে শর্করা 'গ্লাইকোজেন' নামে অদ্রবণীয় অবস্থায় যকৃতের মধ্যে সঞ্চিত থাকে, তাহা পরিমিত মাত্রায় ও প্রয়োজনানুযায়ী রক্তের মধ্যে মিশ্রিত হইতে উহা সাহায্য করে। রক্তে যদি অগ্ন্যাশয়-নিঃসৃত ইন্‌সিউলিনের পরিমাণ কমিয়া যায়, তাহা হইলে প্রয়োজনারিক্ত মাত্রায় গ্লাইকোজেন দ্রবীভূত হইয়া শোণিতপ্রবাহে মিশিতে থাকে। তাহার ফলে একদিকে প্রস্রাবে যেরূপ চিনির পরিমাণ বাড়ে, তেমনি বাড়ে রক্তস্রোতের মধ্যেও। তখন 'ডায়াবিটিজ' নামক কঠিন ব্যাধি প্রকাশ পায়। ইহার কি প্রতিবিধান করিতে হয়? কৃত্রিম 'ইন্‌সিউলিন্'

ইঞ্জেকশন্ করিয়া রক্তে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় এবং শ্বেতসার-শর্করাপ্রধান খাদ্যের প্রতি লালসা যথাসাধ্য সংযত করিতে হয়।

আর একটি উভস্রাবী গ্রন্থি হইল যকৃত। ইহা পিত্তরস প্রস্তুত করে তাহা আপনারা ইতঃপূর্বে জানিতে পারিয়াছেন। তদ্ব্যতীত, ইহার অভ্যন্তরে আরো দুই প্রকার অন্তঃস্রাব প্রস্তুত হয়—যাহা সরাসরি রক্তস্রোতে মিশিয়া যায়। একটি অন্তঃস্রাবের নাম 'হেপারিন্'। এই জিনিসটি রক্তে মিশ্রিত থাকার জন্য রক্ত তরল অবস্থায় নিয়ত শিরাধমনীগুলির মধ্য দিয়া প্রবহমাণ থাকে। দ্বিতীয় অন্তঃস্রাবটির নাম 'ফাইব্রিনোজেন্'। এই পদার্থটির গুণ হইল—শরীরের কোথাও অল্পস্বল্প রক্তস্রাব হইলে তাহা অবিলম্বে জমাট বাঁধিয়া তাহার উপর দিয়া একটা জালী পর্দা তৈয়ারি করিতে সাহায্য করে।

তৃতীয়টি হইল পুরুষের দুইটি মুষ্ক। চল্‌তি কথায় ইহাদিগকে 'অণ্ডকোষ' বা 'বিচি' (বীজের অপভ্রংশ) বলে। ইহাদিগের পরিচয় কয়েক পৃষ্ঠা পরেই দেওয়া হইতেছে। এক্ষণে আমরা একে একে প্রধান কয়টি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি; এবং একটু বিস্তারিত পরিচয় সেই গ্রন্থিগুলিরই দিব যেগুলির সহিত আমাদের কাম ও প্রেম-জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

থাইরএড্ বা অবটু গ্রন্থি (Thyroid glands)

গ্রীবাদেশের সম্মুখভাগ দিয়া শ্বাসনালীটি নীচের দিকে নামিয়া ও দুইটি তীর্যক্ শাখায় বিভক্ত হইয়া বক্ষোগহ্বরে ফুস্‌ফুসদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—এ সংবাদটি আপনারা বোধহয় অনেকেই রাখেন। এখন, গলদেশের একেবারে ঊর্ধ্বাংশে উঠিয়া, জিহ্বামূলের তলদেশে হাইঅয়েড্ অস্থি নামে একটি পাতলা হাড়ের টুকরা আছে—টিপিয়া দেখুন। উহার তলদেশে বেশ মজবুত প্রায়-অর্ধচন্দ্রাকার একটি তরুণাস্থিময় ঢাকনি আছে, উহার নাম থাইরএড্ কার্টিলেজ্। ইহার পশ্চাতে উপরাংশে থাকে আমাদের স্বরযন্ত্র (voice box) এবং নীচের দিকে রহিয়াছে পরস্পর-সংলগ্ন দুইটি বৈঁচি ফলের ন্যায় পিঙ্গলাভ রক্তবর্ণের বস্তুপিণ্ড; এই দুইটিকে একত্রে বলে **থাইরএড্ গ্ল্যাণ্ডস্** বা **অবটু গ্রন্থি**।

থাইরএড্ গ্ল্যাণ্ডের অর্ধকঠিন থলির ভিতর জমাট শ্লেষ্মার মত আঠালো পদার্থ থাকে, তাহা হইতে একপ্রকার তরল রস চুঁয়াইয়া রক্তস্রোতে নিয়ত মিশ্রিত হইতেছে। এই রসের নাম "থাইরক্সিন্" বা "অবটিমা"। আমাদের দেহের খাদ্য-পরিপাক, সর্বপ্রকার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য, সর্বোপরি কয়েকপ্রকার রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য থাইরক্সিন্ পরিমিত মাত্রায় নিঃসরণ অত্যাবশ্যক।

যাহাদের থাইরক্সিন্ স্বভাবতঃ প্রচুর নির্গত হয় না, তাহাদের চুলগুলি পাতলা হয় অথবা রুক্ষ ও খাড়া-খাড়া হয়, অকালে টাক্ পড়ে; দাঁতগুলি অসম ও ফাঁক্-ফাঁক্ হয়, গাত্রচর্ম পুরু ও খস্‌খসে হয়। এই লোকগুলি জাতির সাধারণ দৈহিক দৈর্ঘ্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত হ্রস্বকায় হয়, তাহাদের হাতের আঙুলগুলি বেশ মোটা-মোটা বা থ্যাবড়া-থ্যাবড়া হয়। ইহাদের মোটা বুদ্ধি, চট্ করিয়া কোন কিছু বিবেচনা করিবার অসামর্থ্য, সর্বকার্যে জড়তা বা গড়িমসি-ভাব, উদ্ভাবনশক্তির অভাব, প্রেমের ব্যাপারে উৎসাহহীনতা, নিদ্রাকাতরতা প্রভৃতি দোষগুলি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। এইরূপ স্বল্প-থাইরক্সিন্‌নিঃস্রাবী মেয়েদের বেশ বিলম্বে আদ্য ঋতুস্রাব দেখা দেয়। কাহারো কাহারো দেহে ঋতুস্রাবকালীন কষ্টকর উপসর্গসমূহের আবির্ভাব হইতে থাকে।

যাহাদের থাইরক্সিন্ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী পরিমাণে নিঃসৃত হয়, তাহাদের প্রচুর পরিমাণে চিক্কণ কেশরাজীর উদ্গম, চর্ম কোমল ও মসৃণ দন্তরাজী সুবিন্যস্ত ও দুগ্ধধবল এবং দেহ সহজে ঘর্মস্রাবপ্রবণ হয়। এই শ্রেণীর লোকগুলিকে একটু ভাববিলাসী, অভিমানী, ব্যথাকাতর, সহজে উদ্বেগচঞ্চল, চকিতে কর্মতৎপর ও চকিতে নিরুৎসাহিত হইতে দেখা যায়। ইহারা আকারে লম্বা ছিপছিপে ও লঘুভার হয়; মাঝে মাঝে অনিদ্রা, অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে কষ্ট পায়।

কোনো কোনো লোকের এই গ্রন্থিটি অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া, অতিরিক্ত পরিমাণে অবটিমা রস রক্তস্রোতে মিশাইতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে "বেস্‌ডাওজ্ ডিজিজ্ (Basedow's disease) নামক একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাধির আবির্ভাব হয়। ইহাতে রোগীর ক্ষুধা যেরূপ বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ পরিপাকশক্তিও প্রচণ্ডভাবে বাড়ে। সে ঘন-ঘন ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া জোরে

জোরে শ্বাসগ্রহণ করে, কারণ তাহার অক্সিজেনের প্রয়োজন বাড়িয়া যায়। তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনও দ্রুততর হয়। সে সর্বদাই উত্তেজিত অবস্থায় থাকে, সামান্য কারণে চটিয়া যায় এবং সকল ব্যাপারে ওপর-পড়া হইয়া মাথা গলায়। সাধারণতঃ সে অনিদ্রায় কষ্ট পায় বলিয়া তাহার চক্ষু দুইটি সকল সময়েই খানিকটা লাল দেখায় এবং বাহিরের দিকে অল্পবিস্তর যেন ঠেলিয়া বাহির হয়। তাহার পেশীগুলি ক্রমাগত উত্তেজনা ভোগ করিয়া শেষে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং দেহের ওজন দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে।

থাইরএড্ গ্রন্থিনিঃসৃত অন্তঃস্রাবের মধ্যে একটি উপাদান থাকে আইওডিন্। এই দ্রব্যটি যথারীতি পরিমাণে থাকিলে তবে থাইরএড্ গ্রন্থি পরিমিত মাত্রায় অন্তঃস্রাব প্রস্তুত করিতে পারে। বহু স্থানের নদী ও কূয়ার জলে এবং আদা, রশুন, লবঙ্গ, গোলমরিচ, সামুদ্রিক ও নদীমোহানার ছোট ও মাঝারি মৎস্য-সমূহের মধ্যে যৎসামান্য মাত্রায় আইওডিন্ পাওয়া যায়; তাহাতেই আমাদের দেহের আইওডিনের অভাব মিটিয়া যায়। আইওডিনের অভাবে থাইরএড্ গ্রন্থির কর্মক্ষমতা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। উহার ভিতরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগুলি ফুলিয়া ফাঁপিয়া শ্লেষ্মার মত অর্ধকঠিন পদার্থে পূর্ণ হইয়া যায় এবং গ্রন্থিটি ক্রমশঃ একটি গোল পিণ্ডবৎ হইয়া গলার সম্মুখভাগে বাহির হইয়া পড়ে। উহাকে গলগণ্ড (Ex-ophthalmic goitre) বলে। ইহার পর হইতে থাইরক্সিন্ উৎপাদনের হার অত্যন্ত কমিয়া যায়।

সুস্থ স্বাভাবিক লোকের দেহমধ্যে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় অবটিমা রস যদি নিয়মিতভাবে নিঃসৃত হইয়া রক্তস্রোতে মিশিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রেমজীবনে তৃপ্তিবোধ ও স্বল্পে তুষ্টি আসে, কাম-উপভোগের আগ্রহ ও ক্ষমতা মোটামুটিভাবে জাগ্রত থাকে। অবটু গ্রন্থি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের জনন-যন্ত্রগুলির উপর অধিকতর শাসননিয়ন্ত্রণ করে *। স্ত্রীলোকের যৌবনপ্রাক্কালে, ঋতুস্রাব ও গর্ভধারণ-কালে এই গ্রন্থিটিকে অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠিতে দেখা যায়।

* *American Journal of Anatomy*—F. S. Hammeth, 32, 15th July, 1923.

থাইরএড্ গ্রন্থির সন্নিকটেই প্যারাথাইরএড্ (Parathyroid) নামক দুইটি অতি-ক্ষুদ্র গ্রন্থি পাশাপাশি অবস্থান করে। ইহাদের অন্তঃস্রাব খাদ্য-পরিপাকের পর যে সকল বিষাক্ত দ্রব্য পড়িয়া থাকে, সেগুলিকে ঘর্ম, প্রস্রাব ও বিষ্ঠার সহিত ত্বরিৎ বিদূরণে ও শরীর-মধ্যে ক্যালসিয়াম্ সমুচ্চিতি (metabolism বা রক্তে মিশ্রণের উপযোগী করিয়া পরিপাক)-করণে সবিশেষ সাহায্য করে।

পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড (Pituitary, Hypophysis)

মধ্যমস্তিষ্ক ও হাইপোথ্যালামাসের অতি নিকটে, গুরুমস্তিষ্কের তলদেশে ও অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্ভাগে একটি খিলানাকার অস্থিময় গুহার মধ্যে একটি পায়রা-মটরের মত আকারের **পিটুইটারি গ্রন্থি** অবস্থিত। আমাদের কানের উপরিভাগে রগের হাড়খানিকে একটি বড় সূচ দিয়া বিঁধাইয়া সোজাসুজি চালনা করিলে, তাহা পিটুইটারি গ্রন্থির ধ্যানগুহার দ্বারে আসিয়া ঠেকিবে। এই গ্রন্থিটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় হইয়াও গুরুত্বে অনেকখানি বড়। ইহা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। সম্মুখের অংশটিকে বলে 'পুরঃপিণ্ডক' (Anterior lobe), পশ্চাতের অংশটিকে বলে 'পশ্চাৎপিণ্ডক' (Posterior lobe)। প্রত্যেক অংশটিতে এক বা একাধিক প্রকার অন্তঃরস প্রস্তুত হইয়া, শরীরের বিভিন্ন প্রকার উপকার সাধন করে।

পুরঃপিণ্ডক-মধ্যস্থ রস যৌবনের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া, মানুষের শরীরের সমস্ত অস্থি ও তরুণাস্থিগুলিকে দীর্ঘ, প্রশস্ত ও দৃঢ় করে; নাসাগ্র, ওষ্ঠ, জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি সুপুষ্ট করে। এই রস যাহাদের কৈশোর-প্রারম্ভ (অর্থাৎ বারো বৎসর বয়ঃক্রম) হইতে একটু বেশী পরিমাণে সঞ্জাত হইতে থাকে, তাহারা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লম্বাচওড়া অবয়বযুক্ত হয়। তাহাদের হস্তপদদ্বয়ের অস্থিগুলি রীতিমত লম্বা ও মোটা হয়, লিঙ্গ বা যোনি ও অণ্ডকোষ বয়সানুপাতে অতিরিক্ত রকমের সুপুষ্ট হয়। পুরুষের মুষ্কে প্রচুর শুক্রকীট জন্মিতে থাকে ও শুক্রস্থলী শুক্রে পরিপূর্ণ হইয়া তাহাকে কামচর্চার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহশীল করিয়া তুলে।

মেয়েরাও বয়সানুপাতে একটু বেশী লম্বা হয়, তাহাদের স্তনদ্বয় পীনোন্নত হইয়া উঠে এবং একটু তাড়াতাড়ি প্রথম ঋতুধর্ম দেখা দেয়। কেহ কেহ লম্বায় বড় না হইয়া চওড়ায় বাড়ে ও তাহাদের স্তন দুইটি অস্বাভাবিকভাবে ভারী হয়। এই শ্রেণীর কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতী প্রেম সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলী ও অগ্রবর্তী হইয়া উঠে এবং প্রেমাস্পদ-নির্বাচনে বিচারবুদ্ধি পরিচালন করিতে অশক্ত হইয়া অন্ধ আবেগের বশবর্তী হইয়া পড়ে। কিন্তু মধ্যযৌবনে ও যৌবনের শেষভাগে ইহাদের উপভোগস্পৃহা স্পষ্টতঃ না কমিলেও সহবাস-ক্ষমতা রীতিমত কমিয়া যায়। চল্লিশ বৎসরের কাছাকাছি আসিতে না আসিতেই ইহাদের গাত্রে অতিরিক্ত মাত্রায় চর্বি দেখা দেয়, ইহারা বেমানান্ রকমের মোটা ও ভারী হইয়া পড়ে। অনেকেরই প্রস্রাবে শর্করা দেখা দিতে পারে।

আমেরিকার ডাক্তার অস্কার রিড্‌ল ইঁদুর ও পায়রার উপর পিটুইটারি গ্রন্থির পুরঃপিণ্ডকজাত রসের ক্রিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন দীর্ঘকাল ধরিয়া। তিনি আঁতুড়-হইতে-সবে-বাহির-হইয়াছে-এমন কয়েকটি ইঁদুরের দেহে উক্ত রসের অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ ইঞ্জেকশন করিয়াছিলেন পর-পর কয় দিন। ইহার পর তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, ইঁদুর-বাচ্চাগুলি হঠাৎ ধাঁ-ধাঁ করিয়া বাড়িয়া গেল। স্ত্রী ও পুরুষ ইঁদুরগুলি পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া সোহাগ-আদর করিতে এবং যৌনসম্মিলনের চেষ্টা করিতে লাগিল। অল্পবয়স্ক কয়টি পুরুষ-পায়রার রক্তমধ্যে ঐ রস মিশ্রিত করিয়া দেওয়ার ফলে ডাঃ রিড্‌ল দেখিতে পাইলেন যে, পায়রাগুলি আহারনিদ্রা ভুলিয়া কেবলই স্ত্রী-পায়রাগুলিকে উত্যক্ত করে এবং তাহাদের দেহোপভোগের জন্য ছটফট্ করিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ পায়রার জননেন্দ্রিয়ের ওজন স্বাভাবিক জননেন্দ্রিয়ের ওজন অপেক্ষা সতেরো গুণ অধিক হইয়া গিয়াছিল। *

যাহাদের পুরঃপিণ্ডকের রস বাল্যকাল হইতে অতি কম মাত্রায় রক্তে মিশ্রিত হইতে থাকে, তাহারা রীতিমত বেঁটে হয় এবং বর্ধিত বয়সে তাহাদের

* "Some Interrelations of Sexuality, Reproduction and Internal Secretion" in *Journal of American Medical Association*, Dr. Oscar Riddle, No. 12, Vol. 92, 1924.

কামাবেগ অতিশয় কম হইতে দেখা যায়। যাহাদের পুরঃপিণ্ডক রস যৌবনাবধি অতিরিক্ত মাত্রায় নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহাদের দেহের দৈর্ঘ্য জাতির গড়্‌পড়্‌তা দৈর্ঘ্য হইতে অনেক বেশী বাড়িয়া যায়। এক-একজন দৈত্য সদৃশ লম্বা ও/বা চওড়া হয়। মধ্যযৌবনে তাহাদের Acromegaly নামক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঘোরতর সম্ভাবনা থাকে। ইহাদের দেহের হাড় ও তরুণাস্থিগুলি অস্বাভাকিভাবে বাড়িয়া যাওয়ায়, বক্ষোগহ্বর ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠায় এবং তদনুপাতে দেহকাণ্ড অতিশয় গুরুভার হওয়ায়, ইহারা দ্রুত চলাফেরা করিতে পারে না, তাড়াতাড়ি কোন কাজ সমাধা করিতে পারে না। রোগীর চোয়াল, মাথা, কপাল ও মুখের হাঁ বড় হয়, নাসিকাপ্রান্ত যেমন চওড়া তেমনি উন্নত হয়। জিহ্বাটিও এত বড় হয় যে, মাঝে মাঝে সাপের ন্যায় বাহির করিয়া ওষ্ঠপ্রান্ত না চাটিলে যেন তাহারা স্বস্তিবোধ করে না। তাহাদের বুদ্ধি ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে থাকে, শেষে তাহারা একেবারে জড়ভরত হইয়া যায়। দেহটি হাস্যকরভাবে বেমানান্ হইয়া পড়ে। প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে থাকে। প্রথমটা খুব ক্ষুধাবোধ থাকে বটে, শেষটা তাহাও কমিয়া যায়। একমাত্র ঘুম ছাড়া জগতে তাহাদের আর কোনো প্রিয় বস্তু থাকে না। এই অবস্থায় একদিন তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু হয়।

অ্যাড্রেন্যাল বা অধিবৃক্কীয় গ্রন্থি (Adrenals, Suprarenals)

আমাদের কটিদেশে পিঠের দিক্ ঘেঁষিয়া মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ড বর্বটি-বীজের আকারবান যন্ত্র অবস্থান করে। এই যন্ত্র দুইটির প্রধান কৃত্য হইল শরীরের রক্তপ্রবাহকে ক্রমাগত ছাঁকিয়া পরিষ্কার করা ও পরিপাক-প্রাপ্ত খাদ্যের মধ্য হইতে কিছু কিছু বিষাক্ত পদার্থ ও জলীয়াংশ টানিয়া লইয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া মূত্রস্থলীতে পাঠাইয়া দেওয়া। প্রত্যেক বৃক্কের মাথায় একটি করিয়া অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি সংযুক্ত রহিয়াছে। এই দুইটির দক্ষিণ দিকেরটি দেখিতে পানিফলের মত, বাম দিকেরটি দেখিতে কাজুবাদামের মত। অন্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির তুলনায় অধিবৃক্কীয় গ্রন্থি দুইটি বেশ বড়। প্রতি গ্রন্থির উপরিতল

হইতে এক প্রকার ও অন্তস্তল হইতে অন্য প্রকার অন্তঃস্রাব নির্গত হইয়া, শোণিতপ্রবাহে মিশ্রিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, দুই প্রকার রসের দুই ভিন্ন ধরণের ক্রিয়া।

উপরিতল-নিঃসৃত অন্তঃস্রাব কৈশোর-সমাগমে আমাদের বরাঙ্গবোধ (sexual sense) জাগ্রত করে, জননেন্দ্রিয়ের রূপান্তর সাধন করে, ওষ্ঠে বগলে জননেন্দ্রিয়ের চারিধারে ও মদনাচলে কেশোদ্গম করে এবং কণ্ঠস্বরে অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটায়। এই রসের প্রভাবেই মানুষ যৌবনাগমে প্রেম সম্বন্ধে চিন্তা করিতে, কাহাকেও মনে মনে ভালবাসিতে এবং তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আগ্রহান্বিত হয়। এই রস পরিমিত মাত্রায় ক্ষরণের ফলে প্রেমাস্পদ-নির্বাচনে অথবা তাহার গুণাগুণ-বিচারে স্থিরবুদ্ধি প্রয়োগের শক্তি জন্মে। গর্ভধারণ-কালে ও ইতর প্রাণীদের সঙ্গম-মর্শুম-কালে অধিবৃক্কীয় গ্রন্থি দুইটির উপরিতল বেশ স্ফীত হইয়া উঠে।*

বাল্যকাল হইতে যাহাদের এই গ্রন্থির বাহ্যাংশের অন্তঃস্রাব অতিরিক্ত পরিমাণে ক্ষরিত হইতে থাকে, তাহাদের শরীর বেশ সুপুষ্ট, পেশীবহুল ও মেদোময় হয় ; জোড়া ভ্রূ জন্মে, দাঁতগুলি ঈষৎ চওড়া ও খদন্ত দুইটি রীতিমত প্রবর্ধিত হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকদিগকে অনেক সময় পুরুষের ন্যায় স্বভাবাপন্ন হইতে দেখা যায়। তাহাদের ভগাঙ্কুরটি রীতিমত বড়, গলার স্বর ভারী হয়। বহু মেয়ের যৌবন-প্রারম্ভে গোঁফ ও দাড়ির রেখা সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহাদের আদ্য রাজোস্রাব বিলম্বে প্রকাশ পায় এবং পরবর্তী ঋতুগুলি অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে দেখা দিতে থাকে।

অধিবৃক্কীয় গ্রন্থির মজ্জা হইতে যে অন্তঃস্রাব নির্গত হয়, তাহা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের ও শ্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রিত করিতে সহায়তা করে, পেশীসমূহের অবসাদ ও দুর্বলতা দূর করে, শরীরের স্বাভাবিক তাপ ও রক্তচাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করে। এই রস সময়-বিশেষে একটু অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তে মিশ্রিত হইয়া মানুষের প্রাণশক্তি ক্ষণকালের জন্য বাড়াইয়া দেয়, তাহাকে

* *Archives of Internal Medicine*, R. G. & A. D. Huskins, Vol, XVII, p. 584 (1919).

কোনো কার্যে আক্রমশীল ও আত্মরক্ষায় উদ্যমশীল করিয়া তুলে। তখনকার মত ইহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি-গ্রহণ-ক্ষমতা প্রখর করিয়া দেয়। বেদনা, ক্রোধ, ভীতি, সংশয়, উদ্বেগ, উল্লাস প্রভৃতি সংক্ষোভে অধিবৃক্কীয় মজ্জারস রক্তে একটু বেশী পরিমাণে মিশিয়া যায়। হঠাৎ একটি মনোমত নর বা নারীকে দেখিয়া প্রেমিক যে প্রথম দৃষ্টিতেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাহাকে লাভ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠে,—তাহার পশ্চাতে থাকে অধিবৃক্কীয় রসের রসিকতা। অধিবৃক্কীয় গ্রন্থির মজ্জা হইতে নিষ্কাশিত নির্যাস (Adrenalin) ইঞ্জেকশন্ দিলে, সমব্যথী নার্ভতন্ত্র অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠে, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, কর্তিত স্থান হইতে রক্তপাতের মাত্রা কমিয়া যায়, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির পেশীসমূহ কিছু শ্লথ হয় এবং হৃদয়, ফুস্‌ফুস প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া কিছুক্ষণের জন্য বাড়িয়া যায়।

বারাঙ্গিক গ্রন্থিনিচয় (Gonads)

বারাঙ্গিক গ্রন্থি বলিতে পুরুষের মুষ্কদ্বয় ও স্ত্রীলোকের অণ্ডাশয়দ্বয় (ovaries) বুঝিতে হইবে। এই যন্ত্রগুলির আমূল বিবরণ চিত্র-সহযোগে প্রদত্ত হইয়াছে আমাদের "বিয়ের আগে ও পরে" নামক গ্রন্থে। সুতরাং উহাদের সংস্থানতত্ত্ব লইয়া এখানে বেশী আলোচনা করিতে চাহি না। মুষ্কদ্বয়ের ও অণ্ডাশয়দ্বয়ের দুই জাতীয় স্রাব আছে—তৎসম্বন্ধে ইতঃপূর্বেই আপনাদের নিকট ইঙ্গিত করিয়াছি। মুষ্কদ্বয়ের বহিঃস্রাব হইল শুক্র বা বীর্য (Semen)। কামাবেগ অত্যন্ত গভীর ও অসংবরণীয় হইলে, কিছু শুক্র আপনা-আপনি মূত্রপথ দিয়া নির্গত হইতে পারে, আবার কামধর্যাজনিত স্বপ্ন দেখিয়াও এইরূপ ঘটিতে পারে। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কিশোর হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সর্ববয়সী পুরুষ আসঙ্গলিপ্সা প্রশমনকল্পে পাত্রাভাবে নিজ-হস্ত বা পরহস্ত-দ্বারা আপনাদের উত্থিত শিশ্ন বিঘট্টন করিয়া বা করাইয়া বীর্যপাত করিয়া থাকে। বীর্য-প্রস্তুতির আসল উদ্দেশ্য হইল সন্তানোৎপাদন করা ও বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখা। একবারের সহবাসে যে পরিমাণ বীর্য নিঃসৃত হয়, তাহার মধ্যে বহু কোটি অণুদেহী সর্পাকৃতি শুক্রকীটাণু থাকে। ইহাদের প্রত্যেকটিই একটি সন্তান-প্রজননে সমর্থ।

কিন্তু একা শুক্রকীটাণু সন্তান-সৃজনে সমর্থ বলিলে, তাহা তথ্যগত ভুল হইবে। কি ভুল তাহা বলি। প্রাপ্তবয়স্কা নারীর দুইটি অণ্ডাশয় হইতে ক্রমান্বয়িকভাবে প্রতি উনত্রিশ দিনের মাথায় একটি করিয়া প্রায় চক্ষুর অগ্রাহ্য ক্ষুদ্র অণ্ডাণু (ovum) বাহির হইয়া আসে এবং কতকগুলি অনুকূল অবস্থার মধ্যে একটি শুক্রকীটাণু ঐ অণ্ডাণুর গাত্র-মধ্যে সবেগে প্রবেশ করিলে, তবে গর্ভাধানের সম্ভাবনা সূচিত হয়। তাহাও শুধু সম্ভাবনা। ইহার পরও কতকগুলি অনুকূল অবস্থা সংঘটিত হইলে বা উপস্থিত থাকিলে, তবে গর্ভাধান সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। তারপর ভ্রূণ গঠিত হওয়ার পরও তিন, চারি, পাঁচ মাস পর্যন্ত নানারূপ আন্তরিক বা বাহ্যিক দুর্বিপাকে উহা নষ্ট হইয়া, অকালে জরায়ু হইতে নির্গত হইতে পারে।

যাহা হউক, শুক্র যেরূপ পুরুষের মুষ্কদ্বয়ের বহিঃস্রাব, যৎসামান্য রসলিপ্ত একটি অণ্ডাণু হইল নারীর অণ্ডাশয়ের তথাকথিত বহিঃস্রাব। প্রতি চান্দ্রমাসের অন্তে এবং রজোশোণিত দেখা দিবার ১৩।১৪ দিন পরে, প্রায় ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিয়মিতভাবে, মোটামুটি ত্রয়োদশ হইতে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্কালের মধ্যে প্রত্যেক নারীর ক্রমান্বয়ে একটি অণ্ডাশয়-গাত্রের পাতলা আবরণের এক ক্ষুদ্র স্ফীত স্থান ফাটাইয়া দিয়া একটি করিয়া অণ্ডাণু বাহির হইয়া আসে। কোথায় আসে? জরায়ুর উপরাংশ হইতে বাহুর ন্যায় বহির্গত দুইটি ক্ষুদ্র নলের একটি মধ্যে আসে।

উড-পেন্সিলের মত মোটা ঐ ছোট্ট নল দুইটির নাম "অণ্ডাণুপ্রবা" (Fallopian tubes)। কিন্তু শুক্রকীটাণুদের মত অণ্ডাণুর তো চলিবার শক্তি নাই। প্রতি অণ্ডাণুপ্রবার একটি মুখ জরায়ুর সহিত যুক্ত, আর একটি মুখ বেশ চওড়া ও চ্যাপ্টা হইয়া এবং একটি ঝুমকো ফুলের আকার ধারণ করিয়া, প্রত্যেক অণ্ডাশয়ের ধারে ঝুলিয়া রহিয়াছে। যখন একটি চান্দ্রমাসের শেষে হয় দক্ষিণের নতুবা বাম দিকের অণ্ডাশয়ের গাত্র ভেদ করিয়া একটি অণ্ডাণু বাহির হইয়া আসে, তখন এক অজ্ঞাত উপায়ে অণ্ডাণুপ্রবার অসম মুক্ত প্রান্তটি আরো একটু নীচু হইয়া, একটি বহু-ওষ্ঠধর ক্ষুধিত জীবের ন্যায় অণ্ডাণুটিকে নিজের মুখের মধ্যে শুষিয়া লয়।

অণ্ডাণুপ্রবার অতিশয় সরু নালীর ভিতরকার গাত্রে একপ্রকার সূক্ষ্ম রোমের ন্যায় বস্তু প্রচুর সংলগ্ন থাকে। তাহারা ক্রমাগত জরায়ুর দিকে হিল্লোলিত হইতেছে। কাজেই অণ্ডাণুটি এই রোমজ তরঙ্গাঘাতে ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া জরায়ু-গহ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ঐ সময় যদি পুরুষ কর্তৃক নির্গত শুক্র হইতে একদল শুক্রকীটাণু যোনিনালীর শেষপ্রান্তে অবস্থিত জরায়ু-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ও কৃমিগতিতে হামাগুড়ি দিয়া ধীরে ধীরে ঊর্ধ্ব দিকে উঠিতে পারে এবং যে অণ্ডাণুপ্রবার মধ্যে সেইবার অণ্ডাণুর শুভানুগমন হইয়াছে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ দলটির প্রত্যেক শুক্রকীটাণুর মধ্যে দৌড়ের একটা 'মারাথন্ রেস্' সুরু হইয়া যায়। যে শুক্রকীটাণু সর্বপ্রথম আসিয়া অণ্ডাণুটির কোমল জেলিবৎ গাত্রে নিজেকে প্রোথিত করিতে পারে, সেই বীরই জয়ী হয়। বাকি শুক্রকীটাণুগুলি হতাশায় সেইখানেই মরিয়া যায়।

যে-কোনো দিনেই সঙ্গম হইলে, শুক্রকীটাণু দুই-দশ হাজারই হউক বা দুই চারিটিই হউক, জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে এমন কোনো কথা নাই। প্রবেশ যদিও বা করে, বেশীক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে না। জীবিত যদি-বা থাকে, দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া অণ্ডাণুপ্রবার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাও যদি-বা পারে, তাহা হইলে যে অণ্ডাণুপ্রবার মধ্যে অণ্ডাণু নাই, সেইটির মধ্যে সকল শুক্রকীটাণুই হুড়মুড়্ করিয়া প্রবেশ করিতে পারে। অথবা, যে অণ্ডাণুপ্রবার ভিতর অণ্ডাণু রোমতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে, সেইটির মধ্যেই কয়েকটি শুক্রকীটাণু প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা অচিরেই জানিতে পারে যে, যে অণ্ডাণুর আশায় তাহারা ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহা তৎপূর্বেই নিষ্প্রাণ অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে—তাহার দ্বারা গর্ভাধান হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বুঝুন—পেয়ালায় ঠোঁট লাগাইবার মাঝখানে পিছলাইবার ও ফস্‌কাইবার অনেক সম্ভাবনা থাকে। একটি অণ্ডাণু স্ফুটিত হইয়া অণ্ডাণুপ্রবার ভিতর আসিয়া বড়জোর দুই দিন বাঁচিয়া থাকে অর্থাৎ গর্ভাধানের উপযোগী থাকে, তারপরই উহা অকেজো হইয়া যায়। প্রতিমাসে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মৃত অণ্ডাণুটি জরায়ুর মধ্যে গড়াইয়া আসিয়া, ঋতুশোণিতের সহিত বেমালুম মিশিয়া, শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।

যোনি-মধ্যে শুক্র নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহার প্রায় সমস্তটাই যোনিপ্রাচীর বহিয়া অবিলম্বে গড়াইয়া বাহিরে আসে; যেটুকু যোনি-প্রাচীরে লাগিয়া থাকে, তাহাও জল-দ্বারা ধুইয়া ফেলা হয়। শুক্রকে বাহিরে দেখা যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকের অণ্ডাণুকে বাহিরে দেখা যায় না। প্রতিবার সহবাসে ইতিহর্ষ বা চরমানন্দ লাভ করিবার কালে পুরুষের যেরূপ কীটাণুবহুল বীর্য নির্গত হয়, নারীর সেইরূপ অণ্ডাণু নির্গত হয় না। সহবাস-প্রাক্কালে ও সমকালে নারীর যোনিমুখের নিকট অবস্থিত স্কীন্ ও বার্থোলিন গ্রন্থি তিনটি হইতে অল্প অল্প রস নির্গত হইতে থাকে। কোনো দিন গাঢ়তম ইতিহর্ষের সময় জরায়ুমুখ বার কয়েক ঈষৎ সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত হইয়া পুরুষের সাধনদণ্ডের অগ্রভাগকে ঠাসিয়া ধরে; কদাচ কখনো জরায়ু-গ্রীবা হইতে ২।১ ফোঁটা স্বচ্ছ পাতলা রস-নিঃস্রাবও হইতে পারে। এই রসের মধ্যে শুক্রের মত কোনো কীটাণুও থাকে না অথবা জৈব পদার্থ, ফস্ফেট্ প্রভৃতির মত কোনো মূল্যবান শরীর-পোষণোপযোগী বস্তুও থাকে না। কাজেই, একবার বীর্যক্ষেপে পুরুষের যে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, নারীর ৪।৫ বার ইতিহর্ষজনিত রস-নিঃসারণেও তাহার সমান ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। তদুপরি অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির আন্দোলন, পেষণ, চোষণ, ঘর্ষণ প্রভৃতি সক্রিয় পৈশিক চেষ্টায় নারী অপেক্ষা পুরুষের যেমন অধিক শ্রম হয় তেমনি শক্তিক্ষয় হয়। অধিকাংশ রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে নারী হয় নিশ্চেষ্ট নতুবা অল্পচেষ্ট অংশীদার এবং সে গ্রহীত্রীর ভূমিকাই গ্রহণ করে।

এই তো গেল স্ত্রী ও পুরুষের অণ্ডাশয় ও মূত্রদ্বয়ের বহিঃস্রাবের মোটামুটি পরিচয়। এইবার এক-একটির অন্তঃস্রাবের পরিচয় লইব এবং ইহাই হইল আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে অধিকতর প্রাসঙ্গিক। দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমাদের একাধিক পুস্তকে শুক্রকীট, অণ্ডাণু ও গর্ভাধান সম্বন্ধে বিস্তারিত বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করা সত্ত্বেও এখনো বহু শিক্ষিত পাঠকপাঠিকার মধ্যে এ সম্বন্ধে প্রচুর অজ্ঞতাদিগ্ধ অবৈজ্ঞানিক ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। ৩৫ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায়ও তাঁহাদের এ ভুল বিশেষ শ্লথমূল করা যায় নাই।

বড় কাঁটাল বীজের আকৃতি-বিশিষ্ট অণ্ডকোষ বা মুষ্ক দুইটির মধ্যে শুক্র প্রস্তুত হইয়া তলপেটের ভিতর উঠিয়া আসিয়া মূত্রস্থলীর গাত্র-সংলগ্ন শুক্রাধারে রক্ষিত হয় এবং প্রয়োজনমত উহা মূত্রনালীর মধ্য দিয়া নির্গত হয়। কৈশোরের প্রারম্ভ হইতে বার্ধক্যের মধ্যভাগ পর্যন্ত শুক্র প্রতিনিয়ত প্রস্তুত হইয়া শুক্রাধারে আসিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। অবশ্য সকলের শুক্রে সমান সংখ্যক শুক্রকীট উৎপন্ন হয় না এবং সকলের শুক্রকীট সমান শক্তিশালী ও গতিসামর্থ্যবান নয়। আবার এমন পুরুষও দেখা যায়, যাহাদের বীর্যে একটিও শুক্রকীটাণু নাই। যাহাদের শুক্রকীট সুপুষ্ট ও গতিশক্তিমান নয় অথবা যাহাদের শুক্রে আদৌ কীটাণু নাই, তাহারা আসলে বন্ধ্য অর্থাৎ বাঁঝা-পুরুষ, তাহারা আজীবন নিঃসন্তান থাকিতে বাধ্য।

যাহা হউক, প্রত্যেক অণ্ডকোষের অন্তঃপুরে Interstitial cells of Leydig নামক অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ স্তরে স্তরে পাশাপাশি সজ্জিত আছে। তাহাদের মধ্যেই একপ্রকার অন্তঃস্রাব কৈশোরের সূচনা হইতে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করে। উহাই নিয়মিতভাবে আমাদের রক্তস্রোতে মিশিয়া আমাদের দেহে ও মনে যৌবনোচিত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ভিত্তি স্থাপন করে। এই অন্তঃস্রাবের কৃপায় প্রতি কিশোরের গুম্ফ ও শ্মশ্রুরেখা দেখা দেয়, তাহার হাড়গুলি দীর্ঘায়ত, পেশীগুলি পুষ্ট ও স্পষ্ট হয়, গলার স্বর গাঢ় ও ভারী হয়, শুক্র একটু-একটু করিয়া প্রস্তুত হইতে ও তাহার সহিত অল্পসংখ্যক করিয়া বাচ্ছা-শুক্রকীটাণু জন্মিতে সুরু করে।

কৈশোর প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে, প্রত্যেক পুরুষই নারীর প্রতি অল্পবিস্তর আকৃষ্ট হয় এবং তাহাকে ভালো করিয়া জানিবার, অত্যন্ত কাছে টানিবার ও একান্তে আপনার করিয়া লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা উহার ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে।* কাহারো কাহারো একটি বা দুইটি সমবয়সী অথবা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠা মেয়ের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ জন্মিয়া থাকে, কাহারো কাহারো সাধারণভাবে একটা বয়ঃপর্যায়ের অন্তর্গত প্রত্যেক তরুণীর প্রতিই আকৃষ্ট জন্মিতে দেখা যায়।

* *Internal Secretory Organs*, Biedle, pp. 397-98.

যাহাদের শৈশব উত্তীর্ণ হইয়া সবে বাল্যকাল সুরু হইয়াছে (অর্থাৎ ৪-৫ বৎসর বয়সে), সেই সময় যদি তাহাদের মুক্তজ অন্তঃরস প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহাদের দুধে দাঁতগুলি তাড়াতাড়ি পড়িয়া গিয়া আসল দাঁতগুলি একে একে বাহির হইতে আরম্ভ করে, ৭।৮ বৎসর বয়সেই বগলে, জননেন্দ্রিয়ের চতুর্দিকে ও ওষ্ঠের উপরে অল্প অল্প রোম বাহির হইতে থাকে। বয়সের অনুপাতে তাহারা বেশ বাড়ন্ত হয় এবং তাহাদের ব্যবহারে ও বচনে অকালপক্কতার সর্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তদুপরি ইহাদের সাধনদণ্ড ও অণ্ডকোষও সমবয়সী বালকদের তুলনায় যথেষ্ট বড় হয়।*

পুরুষের মুষ্কদ্বয়ের প্রতিরূপ হইল নারীর অণ্ডাশয়দ্বয়। কিন্তু প্রথমোক্ত যন্ত্র দুইটি যেরূপ দুই-কামরাযুক্ত একটি চর্মের থলির মধ্যে দেহের বহির্দেশে ঝুলিতে থাকে, স্ত্রীলোকের অণ্ডাশয়দ্বয় সেরূপ থাকে না। আপনারা জানেন যে, এই দুইটি যন্ত্র তলপেটে জরায়ুর দুই পার্শ্বে খানিকটা ব্যবধানে অবস্থান করে। সুতরাং এই দুইটিকে দেখিবার বা ধরিবার-ছুঁইবার কোনো উপায় নাই। আপনাদিগকে ইতঃপূর্বেই বলিয়াছি, এক এক চান্দ্রমাসে এক এক দিকের অণ্ডাশয়ের মধ্য হইতে মাত্র একটি করিয়া অণ্ডাণু বাহির হইয়া আসে। পুলির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অণ্ডাশয়ের উপরিতল মধুচক্রের মত অতি ছোট ছোট খুঁপরিতে বিভক্ত। এইরূপ দুই সহস্রাধিক খুপ্‌রির প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করিয়া শিশু-অণ্ডাণু জন্মকাল হইতেই সন্নিবিষ্ট থাকে। প্রতি চান্দ্রমাসে মাত্র একটি করিয়া পুষ্ট পরিণত অণ্ডাণু অণ্ডাশয়ের পাতলা আবরণের একবিন্দু স্থান ভেদ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়। কাজেই স্ত্রীলোকের সারা জীবনকালের মধ্যে প্রতি অণ্ডাশয়ের গাত্র ভেদ করিয়া বড় জোর দুই শত বা সওয়া-দুইশত অণ্ডাণু পরিপুষ্ট হইয়া বহিরাগমন করিবার সুযোগ পায়।

অণ্ডাশয়ের দুইটি কিংবা তিনটি অন্তঃস্রাব আছে। এই অন্তঃস্রাবগুলির বিশদ পরিচয় দিতে গেলে অনেকখানি স্থান ব্যয় করিতে হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এই অন্তঃস্রাবগুলি বালিকাদের কৈশোরের সূত্রপাতে স্ত্রীসুলভ সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য

* *Organotherapy in General Practice*, Carnick, p, 188.

দায়ী। এই সময় প্রত্যেক কুমারীর স্তন মুকুলিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নত ও পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে। স্তনোদ্গম হইতেই কিশোরীর লজ্জার সূত্রপাত হয়। তাহাদের মদনাচলে ঈষৎ পিঙ্গল ও কুঞ্চিত রোম উদ্গত হইতে থাকে। উহাও সংগোপনে বালিকার লজ্জা ও বিস্ময় জাগায়। উহার গলার স্বর মিষ্ট ও তীব্র হয়। মনোমত যুবাপুরুষ দেখিয়া সঙ্কোচবোধ অথচ তাহাকে কাছে পাইবার আকাঙ্ক্ষা, তাহার মুখ হইতে স্তুতিবাদ শুনিবার ইচ্ছা ও তাহাকে ঘেরিয়া নানারূপ কল্পনাজাল বোনা···ইত্যাদি অনেক কিছুই অভিনব ভাব তাহার মনে প্রথম জাগ্রত হয়।

একপ্রকার অন্তঃস্রাব রজোধর্ম-প্রবর্তনে সাক্ষাৎভাবে সাহায্য করে এবং প্রতিমাসে জরায়ুর গাত্র চাঁচিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে গিয়া খানিকটা রক্ত নিষ্কাশন করিয়া দেয়—যাহাকে আমরা ঋতুস্রাব বলি। ইহা আর কিছুই নহে, যদি গর্ভাধান হয় তাহা হইলে নিষিক্ত অণ্ডাণু যাহাতে জরায়ুগাত্রে সহজে প্রোথিত হইয়া ও ভ্রূণে পরিণত হইয়া নিরাপদে বাড়িতে পারে, তাহার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। আবার একপ্রকার অন্তঃস্রাব আছে যাহা গর্ভধারণকালে ও প্রসবের কিছুকাল পর পর্যন্ত রজোনিঃস্রাব বন্ধ করিয়া রাখে।

কোনো যুবতীর দেহ হইতে অণ্ডাশয়দ্বয় কাটিয়া বাদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে মাসিক রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, জরায়ুও শুষ্ক সংকীর্ণ সংকুচিত হইয়া যায়, যোনিদ্বয় গুটাইয়া আসে, স্তনদ্বয় চুপসাইয়া প্রায় সমতল হইয়া পড়ে, দেহ পুরুষোচিত পেশীকাঠিন্যময় স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। তাহার গলার স্বর পুরুষের ন্যায় গাঢ় গম্ভীর রুক্ষ হয়। নির্লজ্জতা, অতিসাহসিকতা, গৃহস্থালির কাজে ঘোর বিরাগ, পুরুষের ন্যায় চলা, বলা ও কাজ করার প্রবণতা প্রকটিত হইয়া উঠে।*

প্রফেসর স্টাইনাক, লিপ্‌সাৎস্ প্রভৃতি দেহবিজ্ঞানিগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোনো পুরুষের অণ্ডকোষ কাটিয়া লইয়া যদি তৎস্থলে স্ত্রীলোকের অণ্ডাশয়ের খানিকটা অংশ কলম করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির দেহমনে শতকরা ৮০ ভাগ নারীসুলভ চরিত্রবৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিবে।

* *Gynecology*, Graves, 12th edn. 1948.
Endocrinology, Novak, 1922.

এই প্রয়োজনীয় তথ্যটি আপনাদের ভুলিলে চলিবে না যে, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার সহিত আমাদের স্বভাবচরিত্র-প্রবৃত্তি-প্রবণতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহাদের রসের অল্পতায়, আধিক্যে বা পরিমিততায় আমরা কাপুরুষ, বীরপুরুষ ও মহাপুরুষ হইয়া থাকি; লম্পট বা জিতেন্দ্রিয়, অমিতব্যয়ী বা কৃপণ হইতে পারি; ভাবগম্ভীর ও চিন্তাশীল নতুবা মিশুক ও আমুদে হইতে পারি; অল্পবিস্তর কর্মঠ, উদ্যমশীল ও উপায়জ্ঞ অথবা অলস, ঘুমকাতুরে ও ভবঘুরে হইতে পারি।

আর একটা কথা। প্রত্যেক অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির সহিত একটা রহস্যজনক নিকট-সম্বন্ধ রহিয়াছে—যদিও পরস্পরের মধ্যে একই রক্তনালী ও একই নার্ভতন্তুর দ্বারা কোনোরূপ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষিত হইতেছে না এবং তাহারা কেহই কাহারো ঘন-সান্নিধ্যে অবস্থান করে না। ইহারা রক্তস্রোতের মধ্য দিয়াই পরস্পরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে এবং পরস্পরের সহযোগিতা করে। ইহারা প্রত্যেকে রক্ত হইতেই এক অজ্ঞাত উপায়ে তাহার বিশিষ্ট রসের উপাদান সংগ্রহ করে এবং রস প্রস্তুত করিয়া রক্তের মধ্যে ছাড়িয়া দেয়—যে রস দেহের যেখানটিতে যে কাজ করা প্রয়োজন সেই কাজটি করিয়া রক্তের মধ্যেই মিশিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়।

ব্যাপক প্রমাণের দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, পিটুইটারির পুরঃপিণ্ডক, থাইরএড্ ও বারাঙ্গিক গ্রন্থিগুলির পরস্পরের মধ্যে অদ্ভুত রকমের বন্ধুত্বের সম্পর্ক সংস্থাপিত রহিয়াছে। পিটুইটারির পুরঃপিণ্ডক রস বারাঙ্গিক গ্রন্থিগুলির রস-নিঃসারণ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। আবার থাইরএড্ গ্রন্থি যত সক্রিয় হয়, সেই অনুপাতে বারাঙ্গিক গ্রন্থিগুলিও সক্রিয় হয়। একটি গ্রন্থির ক্রিয়া বন্ধ হইলে অন্যান্য গ্রন্থির ক্রিয়া ব্যাহত হইতে দেখা যায়। সেইজন্য কোন্ গ্রন্থির কোন্ অন্তঃস্রাব আমাদের শরীরে কি কি উপকার কতখানি পরিমাণে করে, তাহা সঠিক নির্ণয় করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। যাহা হউক, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি ও তাহাদের অন্তঃরস লইয়া বহু পণ্ডিত দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যাপক গবেষণা করিয়া শরীর-মনের উপর ইহাদের অমোঘ ও বহুমুখী কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছেন এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে এই সকল রস ব্যবহার করিয়া বিস্ময়কর সুফল লাভ করিতেছেন।

শুধু আমাদের দেশে কেন, অন্যান্য বহু দেশে ষণ্ডদের মুষ্ক কাটিয়া দিয়া তাহাদিগকে অধিকতর পেশীমেদোবহুল, শান্ত, অনুগত ও কর্মঠ করার প্রথা বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত রহিয়াছে। মহিষ-ভেড়া-ছাগল-মোরগ প্রভৃতির মুষ্ক কাটিয়া তাহাদিগকে কষ্টসহিষ্ণু, কর্মতৎপর, মাংসবহুল, প্রচুর-পালকভূষিত বা লোমবহুল করা হয়। হংসী বা মুরগীর অণ্ডাশয়িক অন্তঃরস অন্তঃক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বহু-ডিম্ব-প্রসবিনী করা সম্ভবপর হইয়াছে।

মধ্যযুগে মুসলমানী দেশসমূহে বাল্যবয়সে কতকগুলি স্বাস্থ্যবান লোকের মুষ্ক কাটিয়া তাহাদিগকে খোজা করিয়া দেওয়া হইত। তাহার ফলে বয়োবৃদ্ধির সহিত লোকগুলির গলার স্বর নারীসুলভ হইত, গুম্ফ-শ্মশ্রু বাহির হইত না, শরীর গোলগাল চর্বিবহুল হইত। তাহারা বাধ্য, বিনীত, কষ্টসহিষ্ণু হইত এবং সন্তানোৎপাদন-শক্তি চিরতরে হারাইত। খোজারা নপুংসকজ্ঞানে বাদশাহ্-নবাব-আমীর-ওমরাহগণ তাহাদিগকে জেনানা-মহলের রক্ষীর কাজে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু ইহাদের প্রায় সকলেরই সাধনদণ্ড ঈষৎ হ্রস্বাকার হইলেও সম্ভোগশক্তি প্রায় অব্যাহত থাকিত। বহু রতিবঞ্চিতা বেগমসাহেবা গোপনে ইহাদিগকে মাঝে মাঝে শয্যাসঙ্গী করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেন।

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলি তাহাদের মধ্যে রস-প্রস্তুতির নোদনা ও শক্তি নিশ্চয়ই গুরুমস্তিষ্কের একাধিক কেন্দ্র হইতে লাভ করে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মস্তিষ্কও আবার এই সকল অন্তঃস্রাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহাও অনুমান করা কষ্টকর নয়। শুধু মস্তিষ্কের সহিত নয়, মনের সহিতও এই রসসমূহের আদানপ্রদান চলে। কোনো কোনো পণ্ডিত এক-একজন মানুষকে পিটুইটারি-প্রধান, থাইরএড্-প্রধান, অ্যাড্রেন্যাল-প্রধান ও বারাঙ্গিক গ্রন্থি-প্রধান বলিয়া ভাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এই বিভাজনকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলা চলে না। তবে ইহা স্থির যে, এই সকল গ্রন্থির দীর্ঘকালব্যাপী অথবা সাময়িকভাবে বিভিন্ন পরিমাণে রসনিঃস্রাব বিভিন্ন-চরিত্রের মনুষ্য-গঠনে, তাহাদের মতি, মেজাজ, ভাবাবেগ, রুচি, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

অষ্টম প্রসঙ্গ

চৈতন্য ও অভিনিবেশ

এইবার আমরা মনের খাসমহলে প্রবেশ করিতেছি। দেহ ও মস্তিষ্ক লইয়া আমরা অনেকগুলি পৃষ্ঠা ব্যয় করিয়াছি। কিন্তু তাহা অপব্যয় নয়; কারণ তাহারা হইল মনের বাহির্বাটী, দরদলান ও বারান্দা। তাহাদিগকে ডিঙ্গাইয়া মনের মণিকোঠায় আসিবার জো নাই।

মনস্তত্ত্ব হইল চৈতন্য ও আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। আমাদের যাহা কিছু আচার ও আচরণ, তাহা দেহের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। 'আচরণ' অর্থ হইল পরিবেশের সহিত নিত্যকার লেন-দেন, বোঝাপড়া ও উঠাবসা। এই সমস্ত করিতে হয় সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ও বিবিধ পৈশিক চেষ্টার দ্বারা। আশা করি সে সম্বন্ধে আপনাদের একটা মোটামুটি জ্ঞান জন্মিয়াছে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি অধ্যয়ন করিয়া। এইবার চৈতন্য সম্বন্ধে আপনাদিগকে কিছু বলিতে হইবে। কারণ চৈতন্যই জীবনের লক্ষণ; চৈতন্য না থাকিলে মানুষ আচরণ করিবে কোন্ শক্তিবলে?

চৈতন্যের সংজ্ঞার্থ ও তিনটি প্রধান গুণ

চৈতন্যের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেবল ইহার আংশিক একটা বিবরণ দেওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়া ইহাকে মোটামুটি বিশ্লেষণ করা যায়। মানুষের মন আছে বলিতে আমরা সোজাভাবে বুঝি মানুষের চৈতন্য আছে। কিন্তু চৈতন্য মানুষের সমস্তখানি মন জুড়িয়া নাই, মনের অনেকখানি স্থান অচৈতন্য জুড়িয়া আছে।··· চরম অর্থ দিয়া বস্তুর যেরূপ স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, মন বা চৈতন্য কি তাহাও তেমনি নিঃশেষে ও নিঃসংশয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। বস্তুর সব চেয়ে ছোট অংশ যে পরমাণু—তাহাপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর যে ইলেকট্রন্ ও প্রোটন্, তাহাদের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা শত নীলকণ্ঠ, যশোধরেন্দ্র, মাধবাচার্যের সাধ্যায়ত্ত নয়। বস্তু ও মন—দুইয়ের চরম প্রকৃতি এখনো বৈজ্ঞানিকদের নিকট দুরবগাহ প্রহেলিকা হইয়া রহিয়াছে।

মন একটি অমূর্ত সত্তা, চৈতন্য হইল তাহার একটি অংশ অথবা লক্ষণ। মনকে তথা চৈতন্যকে ধরিতে গেলে, তাহার আচরণকে লক্ষ্য করিতে হয়, বিভিন্ন অবস্থায় বা পরিবেশে তাহার পরিবর্তনকে অধ্যয়ন করিতে হয়। চৈতন্যকে কতকগুলি বড় অংশে ও কতকগুলি ক্ষুদ্র অংশে বিশ্লেষণ করা যায়—যদিও বস্তুর ন্যায় কোনো জড়তত্ত্বমূলক বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে উহাকে বিশ্লেষণ করা একপ্রকার অসম্ভব। বরং চৈতন্যকে তাহার সমগ্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি মৌল গুণের দ্বারা চিনিবার চেষ্টা করা উচিত। চৈতন্যের প্রধান গুণ তিনটি:—(১) **জ্ঞান** বা cognition; (২) **অনুভব** বা affection; (৩) **ইচ্ছা-জাত প্রয়াস** বা **এষণা** বা conation.

জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর অহংজ্ঞান হয়—'আমি আছি' এই জ্ঞান। প্রথমে এই আত্মসংবিৎটাও থাকে অত্যন্ত ধোঁয়াটে বা ঘোলাটে; নিজের দেহ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান কিছুদিন পর্যন্ত থাকে বিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছন্ন। তারপর মাতাকে বারবার দেখিয়া, স্পর্শ করিয়া ও তাহার স্তন্য পান করিয়া তাহার জ্ঞান হয় 'তুমি আছ'। তারপর তাহার জ্ঞান আরো বিস্তৃত হয়; পরিবেশের প্রভাব তাহার উপর যখন আরো বিস্তৃত ও গভীর হয়, তখন তাহার জ্ঞান হয়—'আমাকে লইয়া তোমরা আছ, তোমাদিগকে লইয়া আমি আছি'। তারপর বিভিন্ন সংবেদনের মধ্য দিয়া সে প্রত্যক্ষণ করিতে শিখে। প্রত্যক্ষণের মধ্য দিয়া তাহার স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট হয়। এই শক্তিগুলি তাহার জ্ঞানের পরিধির মধ্যেই বিকশিত হয় এবং উহারা জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ পায়।

তারপর দ্বিতীয় গুণ হইল—অনুভব। অনুভব ও অনুভূতি এই দুইটি শব্দের মধ্যে কোনো বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থসূচক পার্থক্য নাই। কিন্তু সংবেদনজনিত যে অনুভব আমরা পাই, আমরা এখানে অনুভব বলিতে সেই ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিকে বুঝাইতেছি না। এই অনুভূতি ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত একটা কিছু মানসিক ভাব—স্বস্তি বা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, তৃপ্তিবোধ, আনন্দবোধ, রসবোধ, অস্বস্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ, শোক, দুঃখ, চাঞ্চল্য, সাময়িক জড়তা বা নৈরাশ্য-বোধ, একটা বিশেষ কিছু করিবার তাগিদ, একটা অপ্রত্যাশিত প্রেরণা ইত্যাদি।

তৃতীয় গুণ হইল—এষণা, কিছু করিবার বা পাইবার ইচ্ছা ও তজ্জন্য অন্বেষণ ও চেষ্টা। এই ইচ্ছার মধ্যে প্রায় ক্ষেত্রেই একটা আবেগ বা অন্তর্বেগ (impulse) বর্তমান থাকে, নতুবা সেই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টাই জাগিতে পারে না।

চৈতন্যের নিত্যবহতা ও পরিবর্তনশীলতা

এখন দেখা যাক, চেতনার আর কি লক্ষণ বা ধর্ম আছে। চৈতন্য সর্বদা বিষয়ীর জাগ্রৎ অবস্থায় তাহাকে কোনো বিষয়, বস্তু বা অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান দেয় অর্থাৎ বিষয়ীর সহিত বস্তুর সম্বন্ধ স্থাপন করে। শুধু তাহাই নহে, বিষয়ী যে বাঁচিয়া আছে এবং জড় জগতের সহিত তাহার পার্থক্য রহিয়াছে—চৈতন্য প্রতিমুহূর্তে বিষয়ীকে এই জ্ঞান দিতেছে।

জীবের জীবনকাল ধরিয়া চৈতন্য একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক পদ্ধতি—যাহা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত একটা নিত্যবহ নদীর মত অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে। ঘটনার পর ঘটনা, অবস্থার পর অবস্থা, কর্মের পর কর্ম, চিন্তার পর চিন্তা, কল্পনার পর কল্পনা, ধারণার পর ধারণা—ইহাদের মধ্যে মালাকরের সূচসূতার মত চেতনা নিজেকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া মৃত্যুর দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। উইলিয়াম জেম্‌স্ তাঁহার *Principles of Psychology* গ্রন্থে (Vol. I. Chap. ix) চৈতন্যের এই নীরন্ধ্র পারম্পর্যকে বিবৃত করিয়াছেন "a stream of consciousness" বলিয়া।

কিন্তু এই নদী একটানা নয়, ইহাতে জোয়ার-ভাঁটা আছে, বন্যা আছে, ঢল-নামা আছে, ভাঙন আছে, চর আছে। নিদ্রা-বিশ্রাম-রোগ-শোক-অপঘাত-সাময়িক সংজ্ঞাশূন্যতা অতিক্রম করিবার পর আমরা পূর্বের অসমাপ্ত পরিকল্পনা ও কার্যধারাকে পুনরায় হাতে তুলিয়া লই এবং তাহাদিগকে সমাপ্ত করার চেষ্টা করি। নিদ্রাকালে অথবা অচৈতন্যাবস্থায়ও আমাদের চৈতন্য আমাদিগকে একেবারে ছাড়িয়া যায় না, কেবল নির্জীব নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। একেবারে ছাড়ার অর্থ হইল মৃত্যু।

চৈতন্য যেরূপ নিত্যবহমান, তেমনি নিত্য পরিবর্তনশীল। উহার সমরূপতা ও সমশক্যতা একই মানুষের মধ্যে দিনের পর দিন কখনো দেখা যায় না।

উহার মধ্যে মাঝে মাঝে প্রতীয়মানতঃ অবচ্ছেদ ঘটে। উহা নদীর স্রোতের মত ক্রমাগত নূতন জলরাশি লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে বহিয়া চলিয়াছে। আপনি একই নদীর যে ঘাটে নিত্য স্নান করেন, সে-ঘাটে প্রতিদিনই নূতন জল পান্, পুরাতন জল কোনো দিনই আপনার নিকট ফিরিয়া আসে না—যাহা একটা পুষ্করিণীতে সম্ভবপর হয়। চৈতন্য সম্বন্ধে ঐ একই কথা। আজ সকালে আমার যে চৈতন্য ছিল, রাত্রিকালে সে চৈতন্য নাই, কারণ ইতোমধ্যে সে কিছু নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, নূতন কোনো বস্তুর প্রতি সে তাহার ক্যামেরার মুখ ফিরাইয়াছে।

চৈতন্যের একটা সামান্য গুণ ও একটা বিশেষ গুণ আছে। সকল জীবিত মানুষের মধ্যেই এই গুণ দুইটিই বর্তমান। এই বিশেষ গুণের প্রসাদে সে নিজের ব্যক্তিত্ব বা নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে সংজ্ঞাবান থাকে। যে মহাদেব সিকদার গতকল্য রাত্রি এগারোটার সময় তাহার ২২নং গিরিরাজ লেনের দোতলার যে কামরাটিতে ঘুমাইয়াছিল, পরদিন সকালে সেই মহাদেব সিকদারই ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিল সে তাহার নিজের কামরাটিতেই তাহার পুরাতন পালংটির উপর শুইয়া আছে। তাহার চৈতন্য তাহার অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল—সে কাল যাহা ছিল, আজও তাহাই আছে, অন্ততঃ বাহ্যদৃষ্টিতে ও অনুভূতিতে। তাহার চৈতন্য তাহাকে মনে করাইয়া দিল সে গত-কালের মত আজও বার্নার হ্যারিসন কোম্পানির কেরানির পদে বাহাল আছে, তাহাকে তাড়াতাড়ি বাজার ও স্নানাহার সমাপন করিয়া, সাড়ে-নয়টার সময় জীবন পণ করিয়া ট্রামে উঠিতে হইবে।

চৈতন্য ও অনুষঙ্গ

চৈতন্যের আর একটি ধর্ম হইল **অনুষঙ্গ** (Association)। অর্থাৎ যদি কখনো দুইটি বা ততোধিক সংবেদন বা প্রত্যক্ষণ-জনিত অভিজ্ঞতা একসঙ্গে ঘটে বা দ্রুত পর্যায়ে পর-পর ঘটে, তাহা হইলে চৈতন্য পরবর্তীকালে ঐরূপ যে-কোন একটি অভিজ্ঞতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপনা ব্যতিরেকেই আর একটি অভিজ্ঞতার বোধ জাগাইয়া তুলে। সমজাতীয় দুইটি ভাবের একটি মনের

মধ্যে উদয় হইলে অথবা একটি বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে, চৈতন্য তাহার আনুষঙ্গিক বস্তুটিকে বিনা প্রয়াসেই চিন্তারাজ্যে আনিয়া ফেলে। অনেক সময় আমাদের অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ দুই-তিনটি সমজাতীয় বা সমাঙ্গীভূত প্রিয় বা অপ্রিয় শব্দ, চিত্র, বিষয়, ঘটনা, বস্তু, জীব, ধারণা, আবেগ প্রভৃতির একটির নাম শুনিলে বা একটিকে মনে আনিলে, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বা তৃতীয়টির কথা মনে পড়িয়া যায়।

'ছেলে' শব্দটি শুনিলেই তাহার সঙ্গে 'মেয়ে' শব্দটি মনে জাগে। 'বাবা' শব্দটি শুনিলে মা'র কথা মনে পড়ে। মা'র কথা মনে পড়িলে, তাঁহার লালপেড়ে শাড়ি, সিঁথিতে মোটা করিয়া সিঁদুরের রেখা, কপালে সিঁদুর-টিপ্ ও হাসি-হাসি মুখখানি সঙ্গে সঙ্গে জাগে। একটা টেবিল দেখিলেই তাহার নিকট অন্ততঃ একখানা চেয়ার দেখিবার প্রত্যাশা আমরা করি। দোয়াত দেখিলেই কালির কথা স্বতঃই মনে ঝলকিত হয়। আকাশে ঘুড়ি উড়িতে দেখিলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে ধারণা করি—কোনো বাড়ির ছাতে একটি ছেলের হাতে সুতা-জড়ানো একটা লাটাই নিশ্চয়ই রহিয়াছে। আমার প্রধানশিক্ষক স্বর্গত কেশব হাজারী মহাশয়ের কথা মনে পড়িলেই সঙ্গে সঙ্গে জামতাড়া ও ইকড়া স্কুলের কথা, তাঁহার চাঁচাছোলা গলায় জলদগম্ভীরস্বরে নির্ভুল ইংরাজী বাক্যাবলী উচ্চারণ ও কাব্যরসবোধের কথা আপনা-আপনি স্মৃতিপথে জাগরূক হয়। যখনি কোনো পল্লীতে গিয়া একটি মেয়ের নাম শৈবলিনী শুনি, তখনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটির কথা বিনা আয়াসে মনে পড়িয়া যায় এবং তাহার সঙ্গে প্রতাপের ছবিটি ভাসিয়া উঠে।

সংকোচ, অনুভব, আবেগ প্রভৃতিতে দেহ-মনের যে-সকল চাঞ্চল্য ও ভাবান্তর উপস্থিত হয়, সেগুলি চৈতন্য স্মৃতির তোষাখানায় সযত্নে তুলিয়া রাখে। অনুরূপ পরিস্থিতিতে যখনি কোনো সংক্ষোভ, অনুভব প্রভৃতি উদ্ভবের বিন্দুমাত্র কারণ ঘটে, তখনি পূর্বেকার ভাবান্তর ও পরিবর্তনগুলি বিনা চেষ্টায় সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। অবস্থানিবদ্ধ প্রতিবর্তী ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে আপনারা বেশ কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ইহাকেও চৈতন্যের আনুষঙ্গিক ক্রিয়া বলিতে পারেন।

সর্বপ্রকার অভ্যস্ত ক্রিয়ায় যেভাবে অঙ্গাদি ও তাহাদের নানা পেশীকে সঞ্চালন করিতে ও তাহাদের মধ্যে অভ্রান্ত সমন্বয়-সাধন করিতে হয়, তাহাতে চৈতন্য তাহার অনুষঙ্গ-ধর্ম সুবিশ্বস্তভাবে পালন করে। কোন্‌টির পর কোন্‌টি আসিবে, কিভাবে ও কতখানি আসিবে, কতক্ষণ থাকিবে, কখন যাইবে—এগুলি চৈতন্যই বুদ্ধি ও স্মৃতিকে কিছুকাল দুই পাশে লইয়া নির্দেশ করে। সাইকেল চালাইতে, মোটর চালাইতে, বিমান চালাইতে, লিখিতে, টেনিস খেলিতে, সেতার, বেহালা, পিয়ানো, বাঁয়া-তবলা বাজাইতে, তাঁত চালাইতে, সেলাই-কল চালাইতে যাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া অভ্যস্ত হয়, তাহারা প্রতিবার প্রতিক্ষণে বুদ্ধি ও স্মৃতির সাহায্য নামমাত্র লয়, চৈতন্য নিজেই তাহাদিগকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। কোন্ অঙ্গ বা কোন্ প্রত্যঙ্গ কতখানি সঞ্চালন করিতে হইবে, একসঙ্গে না পর-পর করিতে হইবে, কোন্ অবস্থায় কি ভঙ্গী গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা অনুষঙ্গ-ধর্মের বলে চেতনা টপ্ টপ করিয়া বাৎলাইয়া দেয়। ইহা তাহার মনোযোগ নহে, অভ্যাসযোগ।

চৈতন্যের কেন্দ্রবিন্দু ও পরিধি

একদিকে বহির্জগতের অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে চৈতন্যের আদান-প্রদান চলে সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ মাধ্যমে; আবার অন্যদিকে অন্তর্জগতের মস্তিষ্ক, মন, অহংজ্ঞান, স্মৃতি, বুদ্ধি, আবেগ, সংক্ষোভ, চিন্তা, ইচ্ছা, চেষ্টা, ধারণা, ধ্যান প্রভৃতিকে লইয়াও তাহাকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। চেতনা যদিও একটা সীমাবদ্ধ বস্তু নয়, একটা অমূর্ত অনির্দিষ্টভাবে সীমিত সত্তা মাত্র, তথাপি তাহার গুণগুলি ভালো করিয়া শিক্ষার আয়ত্তে আনিবার জন্য আমাদিগকে তাহার একটি রূপ কল্পনা করিয়া লইতে হইতেছে। চৈতন্য যেন একটি বৃত্তাকার দর্পণ বা লেন্স—যাহার কেন্দ্রস্থলটি হইল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং যাহার কেন্দ্রবিন্দু হইতে যতই পরিধির দিকে যাওয়া যায় ততই তাহা দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতে থাকে। যখনি পরিবেশের যে-বস্তু চৈতন্যের কেন্দ্রবিন্দুর সহিত সমসূত্রে স্থাপিত হয়, তখনি সেই বস্তু উজ্জ্বলতম-রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়।

শুধু বস্তুই বা বলি কেন, একটা ঘটনা বা একটা বিষয় সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। একটা জনতার মধ্যে চৈতন্যের কেন্দ্রবিন্দু একটি স্ত্রী বা পুরুষকে স্পষ্ট করিয়া দেখে। তাহার চালচলন ভালো করিয়া লক্ষ্য করে, তাহার কথাবার্তা রীতিমত আগ্রহের সঙ্গে শোনে। তাহার আশেপাশে অন্য যত লোক ঘুরিতেছে, হাসিতেছে, কথা বলিতেছে, কাজ করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে চৈতন্যের বোধ অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট। ইহারা থাকে চৈতন্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে বা পরিধির কাছাকাছি।

আরো দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে এই ব্যাপারটি আপনাদের নিকট সম্ভবতঃ বেশী পরিস্ফুট হইবে। সকালবেলায় আমার পড়ার ঘরে বসিয়া এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লিখিতেছি। আমার চৈতন্য স্বতঃই কাগজ ও দ্রুত সঞ্চরমান ঝর্নাকলমটির প্রতি তাহার কেন্দ্রবিন্দুকে সন্নিবিষ্ট রাখিয়াছে। আমার টেবিলের উপর একটি ঔষধের শিশি, একটি মলমের কৌটা, একটি দোক্তার কৌটা, একটি ছাইদানি, একটি পিন-কুশন, একটি সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই, কয়েকখানি ছোট বড় বই প্রভৃতি ইতস্ততঃ রহিয়াছে; সেগুলি সমস্তই আমার চৈতন্যবৃত্তের মধ্যে কেন্দ্রাতিগ হইয়া রহিয়াছে। আমার চৈতন্য তাহাদের কতকগুলিকে নিতান্ত অস্পষ্টভাবে দেখিতেছে, কতকগুলিকে একেবারেই দেখিতেছে না—যদিও তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে অনবহিত নয়।

লেখার মধ্যে ডুবিয়া আছি, এমন সময় ফুল্‌টু আসিয়া আমার হাতের কাছে এক পেয়ালা গরম চা রাখিয়া দিয়া বলিল, 'দাদু, চা খাও।' চৈতন্য তখন প্রথমে নাতিনীর দিকে, পরে চায়ের বাটির দিকে আমার প্রখর দৃষ্টি ফিরাইল এবং পেয়ালাটি হাতে তুলিয়া লইতে চেষ্টাবান করিয়া ধূমায়িত চায়ের প্রতি তাহার ক্যামেরার মুখ ফিরাইয়া ফোকাস্ করিল। ঐ সময় আমার পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলি ও হাতের ঝর্নাকলমটি চৈতন্যের কেন্দ্রবিন্দু হইতে সরিয়া গেল। চা-পান শেষ করিয়া, কাপটি টেবিলের এক প্রান্তে সরাইয়া রাখিয়া, পুনরায় পাণ্ডুলিপিগুলি টানিয়া লইয়া লিখিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় বন্ধুবর শান্তি পাল আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুধাইলেন, "কি হে, আছো ক্যামন্? আমি তো, ভাই, কোমরের ব্যথায় একেবারে পঙ্গু হবার

যোগাড়!" কাজেই তখন আমার চৈতন্য তাঁহার চেহারা ও কথাগুলির উপর ফোকাস্ ফেলিল অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দুটি সন্নদ্ধ করিল। এমনি করিয়া চৈতন্যের কেন্দ্রবিন্দু এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে—বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সন্নিকৃষ্ট হয়।...

ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমান হরিপ্রিয়ের গৃহে শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্তিমূলক গান শুনিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছি। ছোট প্রাঙ্গণে, তিনদিকের ঘোরানো বারান্দায়, ঠাকুরদালানে ও দোতলার বারান্দায় অন্ততঃ শ' দেড়েক স্ত্রীপুরুষবালকবৃদ্ধের সমাবেশ হইয়াছে। ওদিকে শত উজ্জ্বল দীপমালা-সজ্জিত ঠাকুরদালানের ভিতর দিকে বিবিধ-সুরভি-কুসুমমাল্য-পল্লব-বিজড়িত দোলনায় বহুমূল্য বসনোত্তরীয় ধারণ করিয়া, শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীব্রজবল্লভ দুলিতেছেন। ভক্তেরা প্রণাম করিতেছে, দুই-চারি পয়সা প্রণামী দিতেছে, চরণামৃত পান করিতেছে। কেহ কেহ যুক্তপাণি হইয়া ভাবমুগ্ধ অপলক-নেত্রে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া আছে, কেহ অদূরে বসিয়া নিমীলিতনয়নে জপ করিতেছে। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে শ্রীমতী ছবির সঙ্গীত আরম্ভ হইল। আমার চৈতন্য প্রথমটা তাহার মুখভঙ্গী, তাহার চাহনি, হার্মোনিয়ামের উপর দিয়া তাহার দ্রুত অঙ্গুলি-সঞ্চালন, সঙ্গৎকারীর বাঁয়াতবলার নিপুণ বাদন প্রভৃতি প্রত্যক্ষণ করিতে করিতে এক সময় আমার চৈতন্য কখন ঐ সকল দৃশ্য হইতে সংবেদনগ্রহণ বন্ধ করিয়া দিয়াছে; আমার নয়নসম্মুখে ছবির মুখখানি পর্যন্ত কুয়াসাবৃত হইয়া গিয়াছে। আমার চৈতন্যের কেন্দ্রবিন্দু শুধুই একটা বস্তুনিরপেক্ষ চিত্তবিভ্রাবী সুরহিল্লোলকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

চৈতন্য ও মনঃসংযোগ কি অভিন্ন?

চৈতন্যের এই কেন্দ্রবিন্দুকে কোনো একটি বস্তু বা বিষয়ের প্রতি ফিরানো বা নিবদ্ধ রাখাকে আমরা সাধারণ ভাষায় মনঃসংযোগ বা মনোযোগ বা অভিনিবেশ বলি, কিন্তু এই দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। ছবির গান শুনিবার সময় আমার চৈতন্য উহার গানের উপর তাহার কেন্দ্রবিন্দুকে নিবদ্ধ রাখিয়াছিল। তজ্জন্য আমার দুই কর্ণের গ্রাহক নার্ভতন্তুগুলি কিছুক্ষণ অত্যন্ত সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল; তাহারা অবিচ্ছিন্নভাবে সুরের প্রত্যেক

অংশটি—গানের প্রত্যেক শব্দটি মস্তিষ্কের শব্দগ্রাহী কেন্দ্রে নিপুণ ক্ষিপ্রতার সহিত বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। গানের অর্থবোধ হইতেছিল, সুরটিও ভালো লাগিতেছিল, তখনকার মতো আমার মনও ভাবচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি সামান্য সঙ্গীতরসজ্ঞ বটে, সঙ্গীততত্ত্বজ্ঞ ও সুরবেত্তা নই। তাল-মান-লয়-গমক-মূর্চ্ছনার বেশী কিছু বুঝি না, গান শিখিবার গলা নাই, সুর ধরিবার বিশেষ ক্ষমতা নাই, সুতরাং গানগুলিতে যথেষ্ট মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই, অর্থাৎ এমন মনঃসংযোগ যাহাতে এক-একটি গানের সুরের অন্তর্লোক পর্যন্ত পৌঁছিতে পারি। গানগুলির মধ্যে কি সূক্ষ্ম কাজ হইতেছে তাহার যথাযথ মূল্যাবধারণ করিতে পারি নাই—যাহাতে গৃহে ফিরিয়া হার্মোনিয়াম সহযোগে সেগুলি গলায় তুলিয়া লইতে পারি; অন্ততঃ তাহার অনুরূপ সুরে গানটি আপনমনে গাহিতে পারি। সুতরাং ছবিরগান শুনিয়া আমি তখনকার মত আনন্দ-লাভ করিলাম; গৃহে ফিরিয়া তাহার গানের সুরগুলি কিছুক্ষণ আমার কানে একটা সুমোহন ঝঙ্কার তুলিতে লাগিল। আমার বহুদিনের অভিলাষ ছিল ছবির গলায় গান শোনা, সে অভিলাষ সিদ্ধ হইল, ব্যস্! আর কি চাই? তারপর ছবির গান ভুলিলাম, গানের সুর ভুলিলাম, ছবির আকৃতি পর্যন্ত ভুলিয়া গেলাম।

চৈতন্যে ও মনোযোগে পার্থক্য

চৈতন্যের কেন্দ্রবিন্দু দিয়া কোনো বস্তু বা বিষয় প্রত্যক্ষণ এক জিনিস এবং মনোযোগ আর এক জিনিস। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটা একটু খুলিয়া বলি। এই প্রসঙ্গে প্রথমে আমার একটা ব্যক্তিগত অভিমত আপনাদিগকে জানাই। মনের একটা অংশে থাকে চৈতন্য। উদ্দীপনার মধ্য দিয়া সংবেদন বা প্রত্যক্ষণ আমরা যাহাই করি না কেন তাহা চৈতন্য দিয়াই করি, কখনো উহার কেন্দ্রবিন্দু দিয়া, কখনো বা কেন্দ্রের আশপাশ বা কিছুদূর দিয়া। সংবেদন বা প্রত্যক্ষণের যে ফলভোগ—সুখ, দুঃখ, আরাম, অস্বস্তি, বেদনা, তৃপ্তি প্রভৃতি—তাহা মনই করে। মনোযোগের মধ্যে চৈতন্যগত মনের সহযোগ তো আছেই, তাহা ছাড়া আরো কিছু আছে; যাহা এইবার বলিব। কিন্তু মনোযোগ

শব্দটি ব্যবহারে আমি যুক্তিসঙ্গতভাবে আপত্তি করি। কারণ আমরা যাহাকে অমনোযোগ বলি, তাহার মধ্যেও মনের যোগ আছে। কিন্তু চৈতন্যের কেন্দ্র দিয়া সে যোগক্রিয়া সাধিত হয় না—হয় তাহার পরিধির প্রান্তদেশ দিয়া। যাহা হউক, আমি অতঃপর মনোযোগ বা মনঃসংযোগ শব্দের আর একটি খাটি সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করিব। সে শব্দটি হইল 'অভিনিবেশ'। তাহাতে বোধহয় আপনাদের কাহারো আপত্তি হইবে না।

অভিনিবেশের সংজ্ঞার্থ

যাহা হউক, আপনারা এইটুকু শুধু মনে রাখিবেন যে, চৈতন্য আমাদের জীবনকালের মধ্যে নিত্য, কিন্তু অভিনিবেশ অনিত্য বা স্বল্পস্থায়ী। মনোযোগ বা অভিনিবেশ তাহাকেই বলি যাহা কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রতি সর্বক্ষেত্রেই আমাদের চৈতন্যের কেন্দ্রস্থলকে আকৃষ্ট করে। যাহা আমাদের নার্ভতন্ত্র ও তৎসংলগ্ন সংবেদন-কেন্দ্রগুলিকে দিয়া শুধু প্রত্যক্ষণ করায় না—চেষ্টা-কেন্দ্রগুলিকে দিয়া কোনো ক্রিয়া সম্পাদনের ইচ্ছা ও প্রয়াস (প্রতিক্রিয়া) জাগায় এবং যাহার মূলে নূতন কিছু অধিগত করিবার আগ্রহ, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনবোধ আছে। সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ দ্বারাও আমরা জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু অভিনিবেশ দ্বারা আমরা পূর্ণতর ও অধিকতর স্থায়ী জ্ঞান লাভ করি এবং এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে আমরা কর্মসাফল্যের অভিমুখে চালিত করিতে পারি। অভিনিবেশের মধ্যে মস্তিষ্কের একটি, দুইটি বা তিনটি কেন্দ্রই যে সক্রিয় হয়—তাহা নহে, একত্রে কতকগুলি কেন্দ্র সক্রিয় হয় এবং বিশেষভাবে স্মৃতির কেন্দ্র ও সুখবোধ-কেন্দ্র উদ্যোগী হইয়া উঠে।

অভিনিবেশের প্রকারভেদ

সহজ স্বতোজাত অভিনিবেশ (Primary attention) তাহাকেই বলে যে অভিনিবেশে কোনো চেষ্টার বা উদ্যমের প্রয়োজন হয় না, যাহার লক্ষ্যবস্তু (অর্থাৎ উদ্দীপক) আমাদের সুপরিচিত—হয় বাল্যকাল হইতে নতুবা জন্মকাল হইতে। এই শ্রেণীর অভিনিবেশের উদ্দীপক মাত্রাধিক হইতে ও ঘনীভূত (intense) হইতে পারে, নড়ন্ত বা চলন্ত (moving) হইতে পারে

অথবা পৌনঃপুনিক (repeated) হইতে পারে। এই তিন প্রকার উদ্দীপকই বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। মাইকের দ্বারা কিছু ক্রমান্বয়ে ঘোষণা, শক্তিশালী জলন্ত ও নিবন্ত আলো-দ্বারা পণ্যের নাম প্রচার, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে সাইনবোর্ডে ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নিয়মিতভাবে পুনঃ পুনঃ বিক্রেয় দ্রব্যের গুণবর্ণনা প্রভৃতিতে যথেষ্ট কাজ হইতে দেখা যায়।

চৌরঙ্গী-লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়ে আপনারা নিশ্চয়ই একটি বাড়ির ছাতের উপর রক্ষিত, কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত চা-কোম্পানির নিয়ন্ আলোয় গঠিত চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপনটি লক্ষ্য করিয়াছেন। একটি প্রকাণ্ড চায়ের কেৎলি কাৎ-করা রহিয়াছে এবং তাহার নলটির নিম্নে একটি বিপুল পিরিচের উপর একটি বিরাট পেয়ালা বসানো রহিয়াছে। ক্রমান্বয়ে নিয়ন-আলো জলিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কেৎলির নল দিয়া যেন মোটা ধারায় অনচ্ছ চীনামাটির পেয়ালার মধ্যে তর-তর করিয়া চা পড়িতে থাকে এবং পেয়ালা ভর্তি হইয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবিয়া যায়। আবার কয়েক সেকেণ্ড বাদে আলো জলিয়া উঠিতেছে।

যদিও সহজ অভিনিবেশ জাগ্রত হয় নূতন কোনো দর্শনীয়, পঠনীয় বা শ্রবণীয় বস্তু বা ব্যবস্থার দ্বারা, তথাপি তাহার মধ্যে এমন কিছু মিশ্রিত থাকা চাই যাহা আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচিত অথবা যাহা আমাদের সহজপ্রবৃত্তিজাত রসবোধ বা কৌতূহলকে শাণিত করে। বহু প্রতিষ্ঠানের ঘৃত বা বনস্পতির বিজ্ঞাপনে আপনারা দেখিতে পাইবেন একটি থালায় রকমারি ভোজ্য সামগ্রী এক বা ততোধিক শিশু পরমাগ্রহে আহার করিতেছে অথবা একটি কদাকার বিরাটবপু ঔদরিক তাহার বিরাট হাঁয়ের মধ্যে একখানি লুচি বা কচুরি পুরিতেছে···ইত্যাদি। কাপড়ের বিজ্ঞাপনে রকমারি ভঙ্গীতে শাড়ি-পরিহিতা হাস্যমুখী সুন্দরী যেরূপ দেখিবেন, আবার সাবানের বিজ্ঞাপনে সেইরূপ এলায়িতকুন্তলা স্খলদঞ্চলা অর্ধ-অনাবৃত-বক্ষা তরুণীর সার্টিফিকেট্-সংযোজিত-প্রতিরূপ সন্দর্শন করিবেন।

যে অভিনিবেশে একটা সচেতন প্রয়াসের প্রয়োগ আছে, তাহাকে **সচেষ্ট অভিনিবেশ** (secondary attention) বলা হয়। এই মনোযোগে দুইটি বিপরীত-ভাবমূলক আবেগের মধ্যে একটা ক্ষণস্থায়ী দ্বন্দ্ব, একটা পরা ও

অপরাশক্তির সংঘর্ষ হইতে দেখা যায়; ইহাতে 'হাঁ' কি 'না' অর্থাৎ 'to be or not to be' এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া আমাদের চেতনা দো-মনা হইয়া পড়ে। আমাদের সঞ্চালনজনিত সংবেদন অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পেশী, কণ্ডরা ও সন্ধিস্থল হইতে উত্থিত সংবেদনগুলি এই সংঘর্ষের মধ্যে পড়িয়া অতিশয় সক্রিয় হইয়া উঠে এবং দুইটি লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে যেন ভাগাভাগি হইয়া যাইতে চায়, যদিও ত্বরিৎ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে শেষ পর্যন্ত অধিকতর লোভনীয় বা প্রয়োজনীয় লক্ষ্যবস্তুটির উপরই চৈতন্যের কেন্দ্রবিন্দুটি আপতিত হয়। যেখানে এই দ্বন্দ্বে দুই আবেগই সমান প্রবল হয়, সেখানে কোনো প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ পায় না অর্থাৎ কোনো দিকেই অভিনিবেশ যায় না।

দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই সচেষ্ট অভিনিবেশ ব্যাপারটির ব্যর্থতা ও সফলতা বুঝাই।···কথিত আছে জাঁ বুরিদাঁ নামে এক ফরাসী তার্কিক তর্কশাস্ত্রের একটি সূত্র বুঝাইতে গিয়া নিম্নলিখিত একটি উদাহরণ দিয়াছিলেন। একটি গাধাকে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই দিকে সমান দূরত্বে সম-পরিমাণে দুই আঁটি উৎকৃষ্ট খড় রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গাধাটি একবার দক্ষিণের খড়ের আঁটির দিকে চায়, আর একবার বামের আঁটির দিকে চায়; তারপর দক্ষিণের আঁটির দিকে দুই পদ অগ্রসর হয়, পুনরায় দুই পদ বাম দিকের আঁটির অভিমুখে আগাইয়া যায়। কোন্ আঁটি হইতে সে খড় টানিয়া মুখে পুরিবে তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারে না। সারাদিন সারারাত্রি তাহার মনে দ্বন্দ্ব চলিল। সে একবার ভাবে—ডাইনের আঁটির খড় ভালো, আর একবার ভাবে—বামের আঁটির খড় ভালো। কিন্তু কোন্‌টি অধিকতর ভালো তাহা সে আর সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। চব্বিশ ঘণ্টা উপবাসী থাকিয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে সে মাটিতে পড়িয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরে প্রাণত্যাগ করিল। ইহা হইল সচেষ্ট অভিনিবেশের ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত। এইরূপ কাণ্ড যে শুধু জীবজন্তুর বেলায় ঘটে তাহা নয়, মানুষের বেলায়ও যে ঘটে বুরিদাঁ এই কথিকার দ্বারা তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। দুই নৌকায় পা দিয়া তাহার কোনো নৌকাতেই চড়া হয় না, শেষে জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হয়।

যখন দুইটি প্রবণতার একটি প্রবল হইয়া দুর্বল প্রবণতাটিকে জোর করিয়া

সরাইয়া দেয়, তখন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় অর্থাৎ অভিনিবেশ একমুখী হয়। কিন্তু চেষ্টা-দ্বারা একটি বিপরীত আবেগকে বিতাড়িত করা হয় বলিয়া এই অভিনিবেশটির নাম "সচেষ্ট অভিনিবেশ"। বলা বাহুল্য, দ্বন্দ্ব না উপস্থিত হইলে ঐ চেষ্টা-প্রয়োগের প্রয়োজনই হইত না। এইবার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একমাস পরে দীপ্তির বি-এ প্রথম ভাগের পরীক্ষা আসিতেছে। এমন সময় আসানসোল হইতে তাহার ভগ্নীপতি তাহাকে ও তাহার উপরের বোন সুমিত্রাকে পত্র লিখিলেন যে, সাত দিন পরে তাঁহার কন্যার অন্নপ্রাশন, তাহারা দুই ভগ্নী, তাহাদের মাতা ও ন'-দাদাকে সঙ্গে লইয়া অন্ততঃ তিন দিনের জন্যও আসানসোলে আসিয়া, ঐ শুভ কার্যটিতে যেন অবশ্য যোগ দেয় ও একটু সাহায্য করে। দীপ্তির মন স্বভাবতঃই চঞ্চল হইয়া উঠিল। কল্যাণী দি'র প্রথম শিশুটি সিজারিয়ান্ সেক্সন-দ্বারা প্রসব করানো হইয়াছিল, কিন্তু সে মৃতাবস্থায় নির্গত হয়। পাঁচ-ছয় বৎসর পরে এবারের শিশুটিকেও সিজারিয়ান্ সেক্সন দ্বারা জীবিতাবস্থায় বাহির করা হইয়াছে এবং খুকিটি বেশ সুস্থ সবল আছে।

খুব ঘটাপটা করিয়া খুকির অন্নপ্রাশন হইবে। যোগ না দিলে দিদি ও ভগ্নীপতি উভয়েই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইবেন, অথচ এ সময়ে তিন দিন তো দূরের কথা তিন ঘণ্টাও অপব্যয় করার সাধ্য নাই তাহার। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দীপ্তির অবস্থা হইল—শ্যাম রাখে, না, কুল রাখে! একবার সে স্কুল ফাইন্যালে অকৃতকার্য হইয়াছিল, তারপর প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়িক পরীক্ষায় একবারেই মানে মানে পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছে। গৃহের কাহারো কাহারো ধারণা ডিগ্রী তাহার নিকট প্রাংশুলভ্য ফল, তাহার পক্ষে একবারে বি-এ পাস করাটা মোটেই সোজা হইবে না।

পার্ট-ওয়ান্‌টা ভালোয় ভালোয় তরিতে পারিলে, সে ঈর্ষান্বিত ও সন্দিহান আত্মীয়দিগের সম্মুখে অন্ততঃ বৎসরখানেকের জন্যও গর্বোৎফুল্ল মুখে দাঁড়াইতে পারিবে। সুতরাং এ সময় পড়া কামাই করা কিছুতেই চলিবে না। ওদিকে এত আদরের বাচ্চা বোনঝিটির মুখে-ভাত উপলক্ষে কত আমোদ-আহ্লাদ হৈ-চৈ হইবে, সে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না—একি কম দুঃখের কথা!

দীপ্তি একরাত্রি ভালো করিয়া পড়ায় মন বসাইতে পারিল না। অর্থনীতির

পাতার মধ্য হইতে কেবলই তাহার উৎসব-সাজে-সজ্জিতা ফুটফুটে সেই সাত মাস বয়সের কচি মেয়েটির মুখখানি আর তাহার নীরব আমন্ত্রণভরা টুল্‌টুলে চোখ দুইটি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। একবার ভাবিল একদিনের জন্যও গিয়া উৎসবে যোগ দিয়া, দিনের গাড়িতে একাই চলিয়া আসিবে। কিন্তু অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে স্থির করিল—না, একদিনও পাঠপ্রস্তুতিতে শৈথিল্য করা চলিবে না, বরং চিত্রা ও সুমিত্রা, মা, ন' দাদা যাক্। সে না-হয় অবস্থাটা বেশ ভালোভাবে বুঝাইয়া ও দিদি-জামাইবাবুর ক্ষমা চাহিয়া একখানা লম্বা চিঠি লিখিয়া উহাদের হাত দিয়া পাঠাইয়া দিবে। বরং পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরই সে কাহারো সহিত আসানসোলে গিয়া দিন কয়েক কাটাইয়া আসিবে।....

গীতা চৌধুরী বি-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়িতে কয়দিন বিশ্রাম লইতেছে। প্রায় প্রতিদিনই নিকটবাসিনী বান্ধবীদের গৃহে গিয়া খানিকক্ষণ আড্ডা দিয়া আসিতেছে, মাঝে মাঝে তাহাদের কাহারো কাহারো সহিত সে সিনেমায় যাইতেছে। একদিন তিন-চারিজনে মিলিয়া অ্যাক্যাডেমি অব্ ফাইন্ আর্ট্‌সে বেড়াইতে গিয়াছিল। একদিন প্ল্যানেটেরিয়ামে রাশি-পরিচয় নামক ছায়াছবি দেখিয়া, তাহারা তিন বান্ধবীতে চৌরিঙ্গীর একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকিয়া গোটা আষ্টেক টাকা খরচ করিয়া আসিয়াছে। এইভাবে নিশ্চিন্ত আনন্দে দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে এই আনন্দের স্রোতে একখানা পাল-তোলা তরী তর্ তর্ করিয়া গীতাদের গৃহসম্মুখের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল।

গীতার বাবা নাই, মা আছেন। বড় দাদা দিল্লিতে থাকেন। মেজ দাদা কলিকাতায় থাকেন, বৌদি আছেন, তাঁহাদের তিনটি ছেলেমেয়ে আছে; আর একটি ছোট ভাই আছে—ক্লাস ইলেভেনে পড়ে। বৌদির এক মাসতুতো ভাই প্রিয়তোষ বি-এস্-সি পাশ করিবার পর জব্বলপুরে বংসর পাঁচেক পূর্বে অস্ত্রনির্মাণের কারখানায় চাকরি লইয়া চলিয়া যায়। বর্তমানে সে চারিশত টাকার কিছু বেশী মাহিনা পায়। এক মাসের ছুটি লইয়া সে সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়াছে। পৌছিবার পর তৃতীয় দিনে সে তাহার মাসতুতো দিদির সহিত দেখা করিতে আসিল। ঐ সূত্রে সে গীতার সহিতও পূর্বের ভাসাভাসা পরিচয়টা একটু ঝালাইয়া লইবার অবসর পাইল।

বয়স বছর সাতাশ-আটাশের বেশী হইবে না। শ্যামবর্ণ, সুগঠিত, ঋজু দীর্ঘ দেহ। আয়ত চক্ষু দুইটি কাছের জিনিস দেখিতে গিয়া ভুল করিয়া যেন দূরে চলিয়া যায়। কথা শোনে বেশী, বলে কম; মাঝে মাঝে দুই-একটি যাহা বলে, তাহা প্রসঙ্গের সঙ্গে চমৎকার মানাইয়া যায়; এক-আধটাতে মোলায়েম খোঁচা থাকে যাহাতে ব্যথা মোটেই লাগে না, বরং হাসির ইচ্ছা জাগে।

দিদিকে প্রিয়তোষ ঘন ঘন দেখিতে আসিতে লাগিল। প্রথম সপ্তাহে দুই দিন আসিয়াছিল; দ্বিতীয় সপ্তাহে সে একদিন অন্তর আসিতে আরম্ভ করিল। গীতার মা-ও এবার তাহাকে যেন একটু বিশেষ রকমের আদর-আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন। একদিন সে দিদি ও গীতাকে লইয়া থিএটার দেখিতে গেল। আর একদিন গীতার ছোট ভাই সমেত চারিজনে মিলিয়া উহারা সিনেমায় গেল এবং ফিরিবার পথে পার্ক স্ট্রীটের একটি নামজাদা হোটেলে খানা খাইয়া আসিল। প্রিয়তোষ একদিন গীতার মাতার অনুমতি লইয়া গীতা ও তাহার ছোট ভাইকে তাহাদের যাদবপুরের গৃহে নিমন্ত্রণ করিল। রাত্রি সাড়ে-দশটার পর গীতা ও তাহার ভাই যাদবপুর হইতে ফিরিল।

পরদিন দুপুরে বৌদি গীতার তেতলার ছোট্ট ঘরখানিতে হঠাৎ প্রবেশ করিয়া, কোনো গৌরচন্দ্রিকা ব্যতিরেকেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে গীতু, প্রিয় ছেলেটিকে তোর ক্যামন লাগে? পছন্দ হয়? ওর কিন্তু তোকে খুব ভালো লেগেছে। তোর দাদাকে বল্‌ব মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে?"

গীতা ভালো লাগা না-লাগার কথা কিছু উল্লেখ না করিয়া শুধু বলিল, "আমি এখন বিয়ে করব না। বি-এ পরীক্ষার ফল বেরুক আগে। যদি পাস করতে পারি তো ইকনমিক্সে স্পেশ্যাল্ অনার্স্ নিয়ে এক বছর পড়্‌ব। তারপর বিয়ের কথা ভাব্‌ব।"

প্রিয়তোষের এক মাস ছুটির বাইশ দিন হু-হু করিয়া কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। যাওয়ার দিন ক্রমশঃ শ্রাবণের কালো মেঘের মত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। গীতা সেদিন সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে একা বিছানার উপর বসিয়া সন্তোষবাবুর একখানা নবপ্রকাশিত উপন্যাস পড়িতেছিল, এমন সময় প্রিয়তোষ

নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে তাহার ঘরে ঢুকিয়া থপ্ করিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি পড়্‌ছ গীতু?" বাহিরের নিঃসম্পর্কীয় লোকের মুখে এই প্রথম 'গীতু' সম্বোধন শুনিতে পাইয়া, সে যেমন চমকিত তেমনি পুলকিত হইল।

গীতা তাড়াতাড়ি বুকের কাপড় সুবিন্যস্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বইখানা তাহার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "কখন এলেন? বসুন, আমি চা তৈরি করে আনি।" এই বলিয়া সে যেই বাহির হইয়া যাইতে পা বাড়াইয়াছে, অমনি প্রিয়তোষ তাহার হাতখানি ধরিয়া খাটের উপর একপ্রকার জোর করিয়া বসাইয়া দিল এবং বলিল যে, সে দিদির ঘরে চা-জলখাবার খাইয়াছে। তারপর সে একটু গলা নীচু করিয়া বলিল, "গীতু, দু' মিনিট বোসো। আর দিন পাঁচেক পরেই আমি জব্বলপুর ফিরে যাচ্ছি। তোমার কি আমার কথা একটুও মনে পড়বে না? আমি কিন্তু বেশ কিছু দিন কাজে মন বসাতে পার্‌ব না। কার জন্যে তা কি খুলে বল্‌তে হবে?"

গীতা ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার চক্ষের পাতা দুইটি ঈষৎ বাষ্পাকুল। কিছুক্ষণ পরে সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া উত্তর করিল, "আপনাকে আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে।"

তারপর আরো অনেক কথা হইল প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া। অবশেষে প্রচুর সসঙ্কোচ হৃৎস্পন্দনের মধ্যে প্রিয়তোষ তাহার গুরুতম প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিল। গীতা বলিল, বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর সে জবাব লিখিয়া জানাইবে।

পাঁচ দিন পরে প্রিয়তোষ জব্বলপুরে ফিরিয়া গেল। তাহার ফিরিবার চার দিনের মধ্যেই গীতা তাহার নিকট হইতে একখানি খামে পত্র পাইল। তাড়াতাড়ি জবাব দিবার জন্য প্রিয়তোষ হৃদয়বিদ্রাবী ভাষায় তাহাকে সকাতর অনুনয় জানাইয়াছিল। কিন্তু জবাব দিবার ইচ্ছাকে গীতা জোর করিয়া চাপিয়া রহিল। প্রিয়তোষকে তাহার কি ভালো লাগে নাই? তাহার অদর্শন কি তাহাকে পীড়া দিতেছে না? তাহাকে স্বামিরূপে পাওয়া কি গীতার মত অতি-সাধারণ রূপগুণের মেয়ের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় নয়? তবু সে যৌবনের

স্বতরুৎসারিত নবীন প্রেমাবেগ ও পরিণয়-কামনাকে দাবাইয়া রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কেন?

হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিবার দেড় মাস আগে গীতা দিন পনেরো ধরিয়া টাইফএড রোগে ভুগিয়াছিল। রোগ সারিবার পরও দিন দশ-বারো সে পড়ায় আশানুরূপ মনঃসংযোগ করিতে পারে নাই। কাজেই পরীক্ষার ফলও আশানুরূপ হয় নাই, সে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সেইজন্য বি-এ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সময় সে অনার্স্ গ্রহণ করিবার অধিকার পায় নাই। প্রথম-কৈশোর হইতেই তাহার উচ্চাভিলাষ—সে অনার্স্ লইয়া বি-এ পাশ করিবে এবং তারপর এম্-এ পড়িবে। তাহাদের বংশে কখনো কেহ এম্-এ পাশ করে নাই। এম্-এ ডিগ্রী লাভ করিবার পর সে কিছুদিন অধ্যাপনা করিবে কোনো মেয়ে-কলেজে এবং ঐ সময় সুরুচিবান উচ্চশিক্ষিত কাহাকেও পছন্দ হইলে বিবাহের কথা চিন্তা করিবে।...এই দীর্ঘপোষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সে নবোদ্বারিত ভালবাসার ঝর্নাধারায় একটা ঝরা পালকের মত ভাসাইয়া দিতে পারিবে না। তবু কিছুদিন ধরিয়া দুই আবেগের মধ্যে দ্বৈরথযুদ্ধ চলিল। সত্যই কয়েক রাত্রি সে দুশ্চিন্তাজনিত অনিদ্রায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

বি-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য-লাভের সংবাদ পাওয়ার দিন কয়েক পরে সে স্পেশ্যাল অনার্স্ পড়ার জন্য কলেজে দরখাস্ত করিল এবং প্রিয়তোষকে তাহার অকরুণ সিদ্ধান্তের কথা মোলায়েম ভাষায় লিখিয়া জানাইল। সেসন্ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পাঠ্যপুস্তকগুলি যোগাড় করিয়া পড়াশুনার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। একমাত্র সাথীর সহিত সে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখিল, কারণ সে-ও তাহার মত ইকনমিক্সে স্পেশ্যাল অনার্স্ পড়িতেছিল। পড়ার ধ্যানে ডুবিয়া গীতা প্রেম ভুলিল, বিবাহ ভুলিল, প্রিয়তোষকে প্রায় ভুলিল। প্রিয়তোষের আকুতিনিষিক্ত দীর্ঘ পত্রাবলীর উত্তর দিতেও সে ক্রমাগত ভুলিতে লাগিল। গীতার এই-যে ক্রমাগত প্রয়াসের পর পড়াশুনায় অনন্যোৎসাহে সহজভাবে আত্মনিয়োগ, ইহাকে আপনারা কোন্ শ্রেণীর অভিনিবেশ বলিবেন?

সর্বপ্রকার আবেগিক প্রতিবন্ধক উল্লঙ্ঘন করিয়া এই ধরনের অভিনিবেশের জন্য আর একটি শ্রেণী নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহাকে বলে **অধিগত সহজ অভিনিবেশ** (Acquired primary attention)। সহজ অভিনিবেশে যেরূপ শিশুসুলভ ক্ষণস্থায়ী কৌতূহলই প্রধান—যাহার মধ্যে চেষ্টা নাই, চিন্তা নাই, শিক্ষা নাই, অধিগত সহজ অভিনিবেশে কিন্তু তাহার বিপরীত ভাব দেখা যায়। ইহার মধ্যে প্রথমটা পীড়াদায়ক দ্বন্দ্ব ও শ্রমসাধ্য চেষ্টা আছে, পরে একটা অবিচ্ছিন্ন সাধনা আছে, একটা স্থিতিবান আসক্তি বা আগ্রহ আছে, একটা মহত্তর স্বার্থের সঙ্কেত আছে। এইরূপ মনোযোগ এককালে কেবল একটা বিষয়েই বা বস্তুতেই দৃঢ়নিবদ্ধ হয়, সহজ অভিনিবেশের মত ইহা প্রজাপতি হইয়া ফুলের পর ফুলে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় না। একমুখী অধ্যবসায়, আসক্তি, আনন্দানুভূতি, তন্ময়তা—এই চারিটি পদের উপর অধিগত সহজ অভিনিবেশের সিংহাসন দাঁড়াইয়া থাকে। নর্ম, কর্ম ও ধর্ম—এই তিন প্রকার সাধনার ক্ষেত্রেই অধিগত সহজ অভিনিবেশ অপরিহার্যভাবে কাজে লাগে।

অভিনিবেশের প্রসর (Span of attention)

প্রত্যক্ষণই বলুন আর অভিনিবেশই বলুন, তাহা একসময়ে একটি মাত্র বস্তু বা বিষয়ের প্রতি চালনা করা যায়। একই সময়ে একাধিক সামগ্রীর উপর মনোনিবেশ করিতে গেলে, তাহা তত গভীর ও নিবিড় হয় না; তখন অভিনিবেশ হয় ফিঁকে নতুবা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, কোনো সামগ্রীর প্রতি যথোপযুক্ত সুবিচার করা যায় না। মাতা একটি সন্তানের প্রতি যতখানি মনোযোগ দিতে পারেন, সাতটি সন্তানের প্রতি ততখানি মনোযোগ দিতে কিছুতেই পারেন না।

মনোবিজ্ঞানিগণ বলেন, চৈতন্যগত মনকে যখন ক্যামেরার সহিত—প্রত্যক্ষণকে যখন ক্যামেরার লেন্সের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, তখন আমরা এইটুকু অনুমান করিতে পারি যে, ক্যামেরা যেরূপ একটি এক্সপোজারে একজন, দুইজন, তিনজনের বা ত্রিশজনের ফটো তুলিতে পারে, মনও সেইরূপ একই সময়ে একটি, দুইটি বা দশটি বস্তুতে নিবিষ্ট হইতে পারে। অভিনিবেশের প্রসর

অর্থ—কোনো ব্যক্তির একই সময়ে একসঙ্গে যতগুলি বস্তুতে অভিনিবেশ করিবার ক্ষমতা থাকে। ব্যক্তিবিশেষে এই ক্ষমতার ইতরবিশেষ হইতে দেখা যায়। উদ্দীপকগুলি যদি একই জাতীয়, পরস্পরের সহিত ঘন-সম্বন্ধযুক্ত, কাছাকাছি রক্ষিত ও বিষয়ীর নিকট আকর্ষণজনক হয়, তাহা হইলে তাহারা অনেকগুলি একসঙ্গে একই সময়ে বিষয়ীর অভিনিবেশ টানিয়া লইতে পারে। দেখা গিয়াছে, পরস্পরের সহিত অসম্পর্কিত অবিন্যস্ত বস্তু চারিটি হইতে ছয়টির বেশী বিষয়ীর সমকালীন মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না।

অভিনিবেশের প্রসর সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষণে—কতকগুলি ছোট ছোট একই জাতীয় বস্তু পাশাপাশি রাখিয়া, অথবা অনেকগুলি বড় বড় বিন্দুচিহ্ন অথবা কালি-দিয়া আঁকা কতকগুলি অর্থহীন এলোমেলো শব্দ বা একটি বাক্য লিখিয়া এক-সেকেণ্ড বা তাহারও কম সময়ের জন্য পর পর কতকগুলি সম-বয়োগোষ্ঠির বালকবালিকাদের নয়নসম্মুখে ধরা হয় এবং উহাদের সংখ্যা গণিতে বলা হয়। অনেকেই পাশাপাশি-রক্ষিত চারি হইতে ছয়টার বেশী একবারে দেখিতে বা গণিতে পারে না। পরস্পরবিরোধী অচিত্তাকর্ষক অসংলগ্ন কতকগুলি বিষয় বা সামগ্রী অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না। এক বা একাধিক আকর্ষণীয় সামগ্রীর সন্নিকটে যদি একটি অনাকর্ষণীয় বা বিরক্তিকর সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মনোযোগ তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া অল্পবিস্তর দুইটির মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়।

দুইটি উদাহরণ দিই। থিএটার কিংবা সিনেমা দেখিতে গিয়াছেন আপনি। রঙ্গমঞ্চে বা পর্দাগাত্রে নানা ব্যক্তি ও বস্তুর আগমন, সঞ্চরণ, নানা রসাত্মক বাক্য, সঙ্গীত প্রভৃতি দেখিতেছেন শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময় আপনার পাশের সীটে উপবিষ্ট দুইজন স্বামিস্ত্রী নিজেদের মধ্যে অনুচ্চস্বরে কথাবার্তা সুরু করিয়া দিল। আপনার মনোযোগ নিশ্চয়ই দুই দিকে যাইবে এবং অভিনয়ের অখণ্ড উপভোগে ব্যাঘাত ঘটিবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদের সংলাপের অভিমুখে আপনার মনের খানিকটা অবশ্যই চলিয়া যাইবে।

মনে করুন, প্রত্যাসন্ন ডাক্তারি বা এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার জন্য আপনাদের কাহারো পুত্র একনিষ্ঠভাবে প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায়

পাশের বাড়ির একটি নিষ্কর্মা বধূ আপন কক্ষের দুইটি জানালা ও রেডিও খুলিয়া সঙ্গীতনাটকাদি উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজের পড়ার ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিলেও আওয়াজের উপদ্রব হইতে নিস্তার পাওয়া গেল না। বিশেষভাবে সতীনাথবাবু, সন্ধ্যা মুখার্জী, চিন্ময়বাবু, দ্বিজেনবাবু, ইলা বসু প্রভৃতি তাহার প্রিয় গায়কগায়িকাদের মুখের কোনো গান কাঠের অন্তরাল ভেদ করিয়া কানে আসিলেই, পুস্তকের পাঠ্যবস্তু হইতে অভিনিবেশের অনেকখানি আপনা-আপনি চলিয়া যায় সেই সকল গানের দিকে।...

বাড়ির সম্মুখের বা নিকটের বড় রাস্তা বাহিয়া ঘণ্টা, শিঙা, ঘুঙুর বাজাইয়া, ঘর্ঘর শব্দ করিয়া, দিবারাত্র ট্রাম, মোটর, বাস, লরি, রিক্সা প্রভৃতি গাড়ি যাতায়াত করিতেছে, গৃহের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছুটাছুটি, লাফালাফি, চেঁচামেচি, ঝি-চাকরদের বাসন-মাজা জল-তোলা বাল্‌তি নাড়ার শব্দ, মাথার উপরে বিজলী-পাখা ঘূর্ণনের শব্দ প্রভৃতি শতপ্রকার শব্দ অধ্যয়ন-কক্ষে বসিয়া কানে আসিতেছে, তাহাতে অভিনিবেশ ততখানি ভগ্ন হয় না কেন জানেন? প্রথমতঃ, এই ধরণের শব্দগুলি ক্রমাগত শুনিতে শুনিতে কর্ণেন্দ্রিয়, তৎসন্নিহিত নার্ভগুলি ও সংবেদন-কেন্দ্র অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং কিছুদিন পরে তাহাদের বিরক্তিকর প্রাখর্য ভোঁতা হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন পর্দার শব্দগুলি বিভিন্ন দূরত্ব হইতে উত্থিত হয় বলিয়া উহারা পরস্পর পরস্পরকে খানিকটা প্রশমিত (neutralize) করিয়া দেয়। তৃতীয়তঃ, শ্রোতার নিকট উহাদের কোনো অর্থ বহন করিয়া আনে না। চতুর্থতঃ, শব্দগুলি অপ্রতিকার্য-জ্ঞানে মন সেগুলি কানে তুলিয়াও তাহার অভীষ্ট বিষয়ে সংযুক্ত থাকিতে শিক্ষা করে।

সংবাদপত্রের অফিসে গেলে আপনারা দেখিতে পাইবেন—অবিরাম টেলিফোনের ক্রিং-ক্রিং ধ্বনি, টেলিপ্রিন্টার মেশিনের খটাখট শব্দ, অদূরে টাইপ্‌রাইটারের একঘেয়ে টক্‌-টক্‌ আওয়াজ, রিপোর্টারদের দ্রুত আগমনের পদশব্দ, ডজন ডজন মান্যগণ্য ও সাধারণ সাক্ষাৎকারীর যাতায়াত, বেয়ারা-দিগকে নানা টেবিল হইতে উচ্চরবে আহ্বান, উচ্চ-অনুচ্চ স্বরে নানাজনের কথাবার্তা—এই ব্যাবেল-মিনারের পাদমূলে যোগীর ন্যায় সমাধিমগ্ন ও অবিচলিত

থাকিয়া সম্পাদক ও তাঁহার সহকারীবৃন্দ তথ্যবহুল জ্ঞানগর্ভ অথবা লাভা-নিঃস্রাবী সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও অনুচ্ছেদগুলি লিখিতেছেন। এই বিচিত্র শব্দতরঙ্গ বিন্দুমাত্র তাঁহাদের তপস্যাভঙ্গ করে না।

অভিনিবেশের স্থায়িত্ব

অভিনিবেশ বহুক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু চৈতন্যের মত তাহারও জোয়ার-ভাঁটা আছে। একটি ক্ষুদ্র বস্তুতে বা বিষয়ে তাহা একভাবে বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারে না। প্রতি ৫।৬।৭।৮ সেকেণ্ড পরে মনোযোগের গাঢ়ত্ব কমিয়া যায় এবং তাহা বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ হইতে চায়। যে বস্তু বা বিষয়ে বিষয়ীর অনুরাগ যত বেশী, সে তত বেশীক্ষণ তাহাতে মন নিবিষ্ট রাখিতে পারে সত্য, কিন্তু তথাপি তাহার মন ঐ বস্তু বা বিষয়ের একটি বিন্দুতে ৫।৬।৭।৮ সেকেণ্ডের বেশী নিশ্চল থাকিতে অথবা সমান আগ্রহান্বিত থাকিতে পারে না।

এই ব্যাপারটি ঘটে সর্বক্ষেত্রেই। একটি বুদ্ধিমান শিশুর হাতে একটি নূতন খেলনা দিলে, কিংবা কোনো মহিলার হাতে একখানা নূতন ফ্যাশনের শাড়ি উপহার দিলে, ঐ একই ব্যাপার ঘটে। শিশু ঐ খেলনাটির এক এক অংশে ৫।৬ সেকেণ্ড মাত্র দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখিতে পারিবে; তারপর দুই-তিন মিনিট পরে তাহা নামাইয়া রাখিবে। মহিলাটিও ৫।৬ সেকেণ্ড ধরিয়া ভাঁজ-করা শাড়ির মুখপাতটা দেখিবেন, ৫।৬ সেকেণ্ড ধরিয়া তাহার পিছনটা দেখিবেন, পরে শাড়ির ভাঁজ খুলিয়া ৫।৬ সেকেণ্ড তাহার আঁচলটা দেখিবেন, তারপর তাহার একটা অংশ অঙ্গুলির মাঝখানে ধরিয়া ৫।৬ সেকেণ্ডের জন্য তাহার বুনুনি পরখ করিবেন; শেষে কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া রঙ্ ও নক্সার বিচার করিবেন। তারপর শাড়িখানি তাঁহার পছন্দ হইলেও উহার প্রতি মনোযোগের গভীরতা মিনিট খানেকের মধ্যেই কমিয়া যাইবে। দুই মিনিটের মধ্যেই দেখিবেন—শাড়িখানি সযত্নে আলমারিজাত হইয়াছে।

কোনো বিষয়, বস্তু বা ঘটনা যদি প্রশস্ত ক্ষেত্র জুড়িয়া ঘটে এবং তাহা বহু-মুখযুক্ত বা বহু-দিক্‌যুক্ত বা বহু-লোকযুক্ত বা বহু-গতিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে অল্পবিস্তর মনঃসংযোগ করা যায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হইতে পঞ্চাশ মিনিট

পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে মনোযোগ কমিতে কমিতে একেবারে নিম্নতম ধাপে আসে এবং অন্ততঃপক্ষে দশ মিনিটের জন্য বিষয়ীর পূর্ণবিশ্রামের প্রয়োজন হয়।

সিনেমা, থিয়েটার, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, ভলিবল, স্কুকার, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলায়, দর্শক যতই প্রচণ্ড রকমের ক্রীড়ামোদী হউন না কেন, তিনি নিশ্চয়ই ৪৫ হইতে ৫০ মিনিটের মধ্যে শ্রান্তি ও নিরাসক্ততা এবং বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিবেন। তদুপরি ওই ৪৫ বা ৫০ মিনিটের মধ্যে প্রতি ৫।৬।৭ সেকেণ্ড অন্তর তাঁহার মনোযোগ এক বিন্দু হইতে অন্য বিন্দুতে, এক শব্দ হইতে অন্য শব্দে, এক বাক্য হইতে অন্য বাক্যে, এক সুর হইতে অন্য সুরে, এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে, এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে অর্থাৎ মনোযোগের প্রসরক্ষেত্রের এক অংশ হইতে অন্য অংশে সঞ্চরণ করিতে থাকিবে।

একখানি বইও—তাহা যত লঘুপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, একাদিক্রমে ৪৫ হইতে ৫০ মিনিটের বেশী সমান আগ্রহের সহিত কিছুতেই পড়া যায় না। তাহার পরই আলস্য বোধ হয়, মস্তিষ্ক ঘটনাগুলি অনুসরণ করিতে বিলম্ব করে, হাই উঠিতে থাকে। বই রাখিয়া একটা সিগারেট খাইতে, একটু শুইতে নতুবা একটু চুপচাপ বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। একাগ্রতা ও গভীরতা এবং মস্তিষ্কের শ্রান্তির পরিমাণ পরীক্ষা করিবার জন্য নানারূপ পদ্ধতি আছে। সম্প্রতি একপ্রকার যন্ত্রও বাহির হইয়াছে।

অধ্যয়ন ও পরীক্ষার এককালীন স্থায়িত্ব

ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, চৌদ্দ বৎসরের ঊর্ধ্ববয়স্ক বালকবালিকাগণ কোনো একটি বিষয় অধ্যয়নে বা অন্য কোনো একটি সহজসাধ্য কাজে একাদিক্রমে গভীর হইতে অল্প-গভীরভাবে মন দিতে পারে সর্বাধিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। ১২ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকা ঐভাবে মন দিতে পারে পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। ৯ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীগণ ঐরূপ মনোযোগ দিতে পারে পঁচিশ হইতে ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত। ৬ হইতে ৯ বৎসর বয়স্ক বালকবলিকাগণ ঐভাবে মনঃসংযোগ করিতে পারে পনেরো হইতে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত। ৪ হইতে ৬ বৎসর বয়স্ক

শিশুগণ দশ মিনিটের বেশী পারে না। এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগের পর অবশ্যই তাহাদিগকে অন্ততঃ দশ মিনিটের জন্য বিরাম দেওয়া উচিত। তারপর তাহাদিগকে অন্য বিষয়ে বা অন্য কাজে মন বসাইতে প্রণোদিত করিতে হয়।

কিশোর ও যুবকদের যে-কোনোরূপ লিখিত পরীক্ষার স্থায়িত্ব কোনোক্রমেই এক ঘণ্টার বেশী হওয়া উচিত নয়। বহু পণ্ডিতের ও বর্তমান লেখকের প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা এই যে, ভালো ছাত্রছাত্রীদেরও প্রথম ঘণ্টায় ভুলের সংখ্যা যদি হয় কুড়ি, দ্বিতীয় ঘণ্টায় তাহা হয় চল্লিশ, তৃতীয় ঘণ্টায় তাহা দাঁড়ায় সত্তরের কাছে। ভুলের প্রচণ্ডতাও দ্বিতীয় ঘণ্টা হইতে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

প্রাতঃকালে গৃহে কিছুক্ষণের জন্য পাঠ্যবস্তু কণ্ঠস্থ করিবার জন্য ব্যয় করিয়া, তাহার পরই অঙ্ক কষায় মন দেওয়া উচিত; কারণ সকালে শরীর-মন তাজা থাকে এবং মস্তিষ্কও তাহার পূর্বদিনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিয়া লইয়া নববলে বলীয়ান হয়। স্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় পিরিয়ড পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বলবিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতি গাঢ় অভিনিবেশসাপেক্ষ বিষয়গুলির জন্য নিয়োগ করা উচিত। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, কবিতা, চিত্রাংকন প্রভৃতি শিক্ষার জন্য পরবর্তী পিরিয়ডগুলি পৃথক রাখা চলিতে পারে।

মন একাগ্র রাখার শক্তি অনেকখানি নির্ভর করে পরিবেশ এবং দৈহিক ও মানসিক পরিস্থিতির উপর। এদেশের স্কুল-কলেজের কক্ষগুলিতে অল্পস্থানের মধ্যে যেরূপ অনেক ছাত্রছাত্রীদের ঠাসাঠাসি করিয়া অপরিসর বেঞ্চে বসিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে বেশীক্ষণ কাহারো মনঃস্থির রাখা সম্ভবপর নয়। অল্প আলো, বায়ু-চলাচলের অভাব, পিঠ-তক্তা-শূন্য বেঞ্চি, একজনের গায়ের সহিত অন্য জনের গাত্র-সংলগ্নতা, অতিরিক্ত তাপ বা শৈত্যবোধ, আশেপাশে অমনোযোগী আড্ডাপ্রিয় ছাত্রছাত্রীদের কথাবার্তা, বিদ্যাগৃহের বাহিরে গাড়ি-চলাচলের কর্কশ আওয়াজ ও হর্নের শব্দ, স্কুলের উঠানে ও বারান্দায় অবিশ্রান্ত কোলাহল ও জুতার শব্দ প্রভৃতি অত্যন্ত স্থিরচিত্ত মেধাবী অধ্যয়নভক্ত ছাত্র বা ছাত্রীর মানসিক স্থৈর্যকে পদে পদে ব্যাহত করে।

অভিনিবেশে অস্বাভাবিকতা

মনোনিবেশঘটিত তিনপ্রকার অস্বাভাবিকতার কথা কিছু বলিয়া আমরা এই দীর্ঘ অধ্যায় শেষ করিব।

অনভিনিবেশ (*Aprosexia*) নানা কারণে হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রধান কারণ হইল—মনোযোগের লক্ষ্যবস্তুর অনাকর্ষণীয়তা বা কৌতূহলোদ্দীপনের অশক্ততা। দ্বিতীয় কারণ—দৈহিক বা মানসিক অবসাদ, শোক দুঃখ যন্ত্রণা ক্রোধ প্রভৃতি সংক্ষোভ দ্বারা অভিভূতি, রোগাক্রমণ, নিদ্রালুতা ইত্যাদি। স্বভাবনির্বোধগণ কোনো বিষয়েই মনঃসংযোগ করিতে পারে না, কারণ কোনো একটি বিষয়ে তাহাদের অনুরাগ জাগে না, কাজেই মনও লাগে না। তাহাদের মনোযোগের প্রতিক্রিয়া মাঝে-মাঝে কিছুক্ষণের জন্য দেখা দিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়, তাহারা তখন উদাসীন হইয়া পড়ে। যাহা সম্ভ দেখিল, শুনিল, শুঁকিল, চাখিল বা স্পর্শ করিল, তাহাদের কথা সঙ্গে-সঙ্গেই ভুলিয়া যায়।

আর একপ্রকার অস্বাভাবিক অভিনিবেশের নাম **চিত্তবিক্ষেপ** (distractability)। ইহাতে কোনো আবশ্যকীয় বা সাধারণের আকর্ষণীয় বিষয়ে অভিনিবেশ যতক্ষণ ও যতখানি করা উচিত, বিষয়ীরা তাহা করিতে অশক্ত হয়। ইহাদের মনোযোগের স্থায়িত্ব অতি অল্প এবং শৈশবোচিত। তাহারা একটি কাজ বেশ মন দিয়া উৎসাহের সহিত আরম্ভ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই তাহাদের উৎসাহ জুড়াইয়া যায়, ইতোমধ্যে তাহারা হয়তো অন্য একটি কাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এক-একটা জন্মবোকাদের, একশ্রেণীর উন্মাদদের ও মদ্যপায়ীদের এইরূপ চিত্তবিক্ষেপ হইতে দেখা যায়।

অত্যভিনিবেশ (*Hyperprosexia*)। ইহা হইল অতি প্রগাঢ় রকমের মনোনিবেশ যাহাতে বিষয়ী তাঁহার প্রিয় একটি বিষয়, ধারণা বা পরিকল্পনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকেন। একটি বিন্দুতে তাঁহার অভিনিবেশ এই একনিষ্ঠ, একাগ্র ও কেন্দ্রীভূত যে, তাঁহার চারিপাশে অতি নিকট দিয়া যে-সকল ঘটনা ঘটিয়া যায়, তৎসম্বন্ধে কোনো সংবেদনই তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। এমন কি, তাঁহার দেহধারণের জন্য যে-সকল নিত্যকৃত্যের প্রয়োজন, সেগুলি যথাসময়ে বা আদৌ সম্পন্ন করিতে তিনি ভুলিয়া যান।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-কাব্য-সাহিত্য-ধর্ম-কর্মের ক্ষেত্রে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও একনিষ্ঠ সাধকগণের সকলেই জীবনের অধিকাংশ কাল এই অত্যভিনিবেশের অনুরাগী ছিলেন ও থাকেন। দুর্জ্ঞেয় বিষয়কে জ্ঞানগোচর করিবার, বিজ্ঞানরাজ্যের কঠিন সমস্যাগুলি পূরণ করিবার, দুর্গম পন্থাকে অনায়াসলভ্য করিবার, রোগ-শোক-দুঃখ-দ্বন্দ্ব-জর্জরিত ধরিত্রীকে কল্যাণশ্রীমণ্ডিত করিবার তপস্যায় যাঁহারা আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই এই গুণটি এক গৌরবোজ্জ্বল ব্যাধির সীমান্তে আসিয়া দাঁড়ায়। জৈমিনি হইতে বের্জসঁ, ভাস্করাচার্য হইতে আইনস্টাইন্, সার জগদীশ হইতে বেঙ্কটরামন্, পাস্তর হইতে ফ্লেমিং, অপেনহাইমার হইতে জোলিও-কুরি, ফন্ ব্রাউন্ হইতে নিকোলাই সেমেনভ, প্রিস্ট্‌লি হইতে ক্যালভিন্, সেক্সপীয়ার হইতে ইলিঅট্, কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ—জগতের শত শত মনীষী তাঁহাদের অত্যভিনিবেশের অবিনশ্বর ফলশ্রুতি মানবজাতির কল্যাণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

অত্যভিনিবেশের জ্বলন্ত জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন আর্কিমিডিস্—সিসিলির সির‍্যাকিউজ নগরের গ্রীক বিজ্ঞানী, যিনি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে আপেক্ষিক গুরুত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রোমীয় সেনাবাহিনী সিসিলিতে অবতরণ করিয়া যখন সির‍্যাকিউজ নগরে প্রবেশ করে, তখন কয়েক জন সেনানী আর্কিমিডিসের কুটিরে উদ্ধত পদবিক্ষেপে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নাম ও পেশার কথা জিজ্ঞাসা করে। আর্কিমিডিস্ কয়দিন আহারনিদ্রা ভুলিয়া গণিতশাস্ত্রের একটি দুরূহ সমস্যার সমাধানে এতই তন্ময় হইয়াছিলেন যে, রোমীয় অভিযান-কারীদের দ্বারা তাঁহাদের নগর আক্রান্ত হইয়াছে—এ সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। বর্বর রোমীয় যোদ্ধাদের প্রশ্ন তাঁহার অভিনিবিষ্ট মনের দ্বারে গিয়া অনভ্যর্থিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া একজন রোষাবিষ্ট সেনানী তাঁহাকে তরবারি-আঘাতে হত্যা করিল।...

যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুদীর্ঘ 'পুরস্কার' কবিতায় অভাবক্লিষ্টা কবিস্ত্রীর মুখ দিয়া অনুযোগ করাইলেন—

"রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো,
রচিতেছ বসি' পুঁথি বড়ো বড়ো,

মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো,
তার খোঁজ রাখ কি?"

সেই কবিকুলাবতংস একদিন যখন "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটা বড় গল্প বা ছোট উপন্যাসের কিয়দংশ অবিলম্বে প্রয়োজন—এই জরুরী তাগিদ শিলাইদহে বসিয়া পাইয়াছিলেন, তখনি কুঠিবাড়ির ত্রিতলে তাঁহার শয়নকক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া লিখিতে বসিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক বেগবর্জন ও স্নানের নিমিত্ত তিনি প্রতিদিন একবার করিয়া মিনিট পনেরো-কুড়ির জন্য ঘরের বাহিরে আসিতেন। ভৃত্যগণ দিনে দুইবার জানালার গরাদের ফাঁক দিয়া তাঁহাকে লঘু আহার্য ও পানীয় সরবরাহ করিত। একভাবে দুই দিন তিন রাত্রি বিগততন্দ্র হইয়া একাসনে বসিয়া তিনি 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামক উপন্যাসের বেশী অর্ধাংশ লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডুলিপি সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই অমানুষিক দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফলে তিনি ভিতরে ভিতরে এরূপ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, জোড়াসাঁকোর গৃহে পৌঁছিয়া, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে গিয়া অচৈতন্য হইয়া গড়াইয়া পড়েন।...

অপাভিনিবেশ (*Paraprosexia*) উপসর্গটিকে গুণ না বলিয়া দোষ বা ব্যাধির পর্যায়ে ফেলা উচিত। ইহাতেও গভীর অভিনিবেশ প্রযুক্ত হয় বটে, কিন্তু অভিনিবেশটি কেন্দ্রীভূত হয় একটি অতি অকেজো অকিঞ্চিৎকর বস্তু, পরিকল্পনা, অসার ধারণা, অথবা ভাবের উপর। এক একজন সুস্থ সবল ব্যক্তিরও সময়-সময় দিন কয়েকের জন্য অপাভিনিবেশের ভূত ঘাড়ে চাপে, যাহার ফলে তাহাদের মন বারবার সিনেমায় বা রঙ্গালয়ে দৃষ্ট একটি বাজে দৃশ্যের দিকে, একটি ছোট অভিনেতার একটা ক্ষুদ্র মন্তব্যের দিকে ক্রমাগত প্রতিসরণ করে অথবা গানের একটি কলি বারবার মনে আসে। কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও তাহাদের মন ঐ দৃশ্য, ঐ ব্যক্তি বা গানের উপরে মধুলোভী ভৃঙ্গের মত উড়িয়া বসে এবং ভাবিতে ভাবিতে বা মনে-মনে আওড়াইতে আওড়াইতে বৃথা সময় কাটিয়া যায়। এমন কি, তাহারা সময়ে-অসময়ে সুরে বা বেসুরে সেই তুচ্ছ গানের কলিটি নিম্নস্বরে আপন মনে গাহিতে থাকে।

৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' নামক রস-নাটিকাখানি যাঁহারা পড়িয়াছেন অথবা পর্দায় অভিনীত হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই মনে করিতে পারিবেন একটি ভৃত্যের কথা, যাহার মুখে একটি গানের প্রথম চরণ সর্বদাই লাগিয়া থাকিত—'ভজ মন নন্দ ঘোষের নন্দনে।'...

পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে অধিকাংশই বোধ হয় বহু পুরাতন উপন্যাস "স্বর্ণলতা" পড়িবার সুযোগ পান নাই। তাহার মধ্যে নীলকমল নামক এক পল্লী-ভবঘুরের চরিত্র আছে—যে তাহার একটি ভাঙা বেহালা লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কেহ গাহিতে বলিলে নিতান্ত হাস্যকর সুরে কেবল একটি গানের প্রথম চরণটি গায়—

"পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে,
পদ্ম আমি কোথায় পাব!"....

এক-একজনের এমন এক-একটা মিথ্যা ধারণা মনের মধ্যে অকারণে বসিয়া যায় যে, বিষয়ী তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে এবং সেই বিশ্বাসকে বলবৎ করিবার জন্য রকমারি যুক্তি খাড়া করে। সেই ধারণা লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে চিন্তা করে। যদি তাহার ধারণার উদ্দীপক কোনো কাল্পনিক ব্যক্তি থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে থাকে। ইহা ক্রমে বাতিকে এবং পরিশেষে *Psychasthenia* নামক দুর্ধর্ষ মনোবিকারে পরিণত হয়। তখন রোগী ঐ মিথ্যা ধারণার কেন্দ্রীভূত ব্যক্তিটিকে দেখিলেই চটিয়া যায় অথবা তাহা হইতে দূরে থাকে, নতুবা তাহার ক্ষতি করিবার সুযোগ অন্বেষণ করে।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে দৃষ্ট এক অপাভিনিবেশ-পীড়িত ভদ্রলোকের দৃষ্টান্ত এখানে প্রাসঙ্গিক-বোধে উল্লেখ করিতেছি। আমরা এক সময় একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর কাল কর্নোয়ালিস্ স্ট্রীটের (অধুনা বিধান সরণির) একটি বাড়ির ত্রিতলে বাস করিয়াছি। একতলায় পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসী দুইটি ভাই দেশ-বিভাগের কিছু পূর্ব হইতেই সপরিবারে বাস করিতেন। ছোট ভাইটির স্ত্রীপুত্র ছিল। উপরের ভাইটির স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অপুত্রক। কথিত সময়ে শেষোক্ত ব্যক্তির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো ছিল। তিনি কোনো প্রাইভেট মোটরগাড়ির চালক ছিলেন। মাঝে মাঝে নেশা

করিয়া বাসায় আসিয়া স্ত্রী ও ছোট ভাইয়ের সহিত সপ্তম সুরে ঝগড়া করিতেন। প্রকৃতিস্থ অবস্থায়ও তিনি রুক্ষমেজাজী ছিলেন।

দেশ-বিভাগের পর ইঁহাদের বড় ভাই তাঁহার পত্নী ও কয়েকটি ছেলেমেয়ে লইয়া ভাইদের আশ্রয়ে আসিয়া উঠিলেন। এই ভদ্রলোকের বয়স তখন প্রায় ষাটের কাছাকাছি। দেশে কোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের দ্বিতীয় পণ্ডিতের কাজ করিতেন। কিছুদিন বসিয়া থাকিয়া, পাড়ার মধ্যেই কোনো প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে তিনি পূর্বানুরূপ পদ পাইলেন। তেতলায় আরো এক গৃহস্থ এবং দোতলায় তিনটি গৃহস্থ ভাড়াটিয়া ছিলেন। উহাদের মধ্যে জেনারেল পোস্ট অফিসের কর্মচারী এক ভদ্রলোকের সহিত এক তলার তিন ভাইয়েরই আলাপ-পরিচয় ও মোটামুটি মেশামিশি ছিল। আমি কালেভদ্রে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত দুই-চারিটি কথা বলিতাম। আমাদের বাসার মেয়েরা সুযোগ পাইলে একতলার তিনটি বধূর সহিতই কথাবার্তা বলিতেন। ছোট কর্তার একটি ছেলে আমাদের ঘরে মাঝে মাঝে আসিয়া পুত্রদের সহিত আলাপ করিয়া যাইত।

১৯৫২ সাল। পোস্ট অফিসের ভদ্রলোকটি আমায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও মান্য করিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর তিনি উদ্বেগকাতর মুখে আমার পড়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "শুনুন, এ বাড়ির সিঁড়িটা ভীষণ অন্ধকার; রাত্রিতে সব দিন আলো জ্বলে না। কার্তিককে (আমার মধ্যম কুমারকে) একটু সাবধানে আসা-যাওয়া করতে বলবেন। নীচের মেজো কর্তা একটু গুণ্ডা প্রকৃতির তা' জানেন বোধ হয়? তাছাড়া মদগাঁজা খেয়ে ওর মাথারও খানিকটা গোলমাল দেখা দিয়েছে। হঠাৎ কি করে' ওর ধারণা হয়েছে যে, কার্তিক থানায় খবর দিয়েছে—ও নাকি লুকিয়ে আফিং আর গাঁজা বিক্রি করে; সেজন্যে গোয়েন্দারা নাকি ওর ওপর সর্বদা নজর রাখচে। ও শাসাচ্ছে যে, কার্তিককে একবার দেখে নেবে। আমায় বলেছে, দিনে রাতে যখন ওকে একলা পাবে, ওর মাথায় এক ঘা দায়ের কোপ্ বসিয়ে দেবে। আপনি আমার কাছ থেকে এ কথা শুনেছেন—এ কথা যেন ওর কাছে প্রকাশ করবেন না। পারেন তো থানায় একটা ডায়েরি করিয়ে আসুন।"

কার্তিক তখন এম-এ পড়ে। সংসারের বাজারহাট, কলেজ, পড়াশুনা ও খেলাধূলা লইয়া তাহার জাগ্রত সময়টুকু কাটিয়া যায়। একতলার তিন কর্তার কাহারো সহিত তাহার আলাপ-পরিচয় নাই, এমন কি তাহাদিগকে সে ভালো করিয়া চেনেও না। তদুপরি, মেজো কর্তা কি করেন না করেন সে সম্বন্ধে খোঁজ রাখিবার কোনো প্রয়োজনই তাহার ছিল না। থানার ত্রিসীমানায় সে কখনো যায় নাই।

পোস্টাল কর্মচারী বিভূতিবাবুর কথায় আমি একটু ভয় পাইলাম বটে, কিন্তু ড্রাইভার ভদ্রলোকটি যে আমার পুত্রের নামে এইরূপ একটা মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাহার জীবননাশ করিবার মতলব আঁটিবেন—ইহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি আর থানায় ডায়েরি করাইলাম না, আরো পরিণতির অপেক্ষায় রহিলাম। কার্তিককে অবশ্য বলিয়া দিলাম একটু হুঁসিয়ার হইয়া চলাফেরা করিতে।

ইহার কয়েক দিন পরেই একদিন দুপুরে হঠাৎ একতলা হইতে ক্ষিপ্ত বৃষের ন্যায় সরোষ চীৎকার ও ত্রিতলের দিকে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া আমার মধ্যম পুত্রের নাম ধরিয়া অশ্রাব্য গালাগালির আওয়াজ শোনা গেল। আমি তখন স্নানের উদ্যোগ করিতেছি; মুখ বাড়াইয়া নীচের উঠানের দিকে চাহিয়া দেখি—ভদ্রলোক একখানা গামছা পরিয়া ডান হাতে একটা দা লইয়া রক্তাক্তচক্ষে দুই বাহু তুলিয়া আস্ফালন করিতেছেন—"শিগ্‌গির পাঠিয়ে দাও কার্তিককে, ওর মুণ্ডু নামিয়ে তবে জলগ্রহণ করব। এই মাত্র দেখ্‌লাম একটা গোয়েন্দা ছোক্‌রা আমাদের সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, আমার দিকে চোখোচোখী হতেই তাড়াতাড়ি সরে পড়্‌ল। এ নিশ্চয়ই কার্তিকের কাজ। আমার যে ক্ষতি করবে তাকে আমি সহজে ছাড়ব? ও মশাই, ভালো চান্ তো এখুনি আপনার ছেলেকে পাঠিয়ে দিন নীচে। আমি কৈফিয়ৎ চাই তার কাছে—কেন সে আমার পেছনে লেগেছে। আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন!"

অনর্থক তাঁহার সহিত খানিকক্ষণ কথা-কাটাকাটি ও চেঁচামেচি করিলাম। শেষে তাঁহার ছোট ভাই ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। আহার ও বিশ্রামের পর বেলা তিনটে নাগাৎ ভদ্রলোক কাজে

বাহির হইয়া গেলেন। আমি সেইদিন রাত্রেই আমার পরিচিত এক ফৌজদারী কোর্টের উকিলের বাসায় গিয়া তাঁহার নিকট ব্যাপারটি খুলিয়া বলিয়া, তাঁহার পরামর্শ চাহিলাম। তাঁহারই পরামর্শক্রমে পরদিন কোর্টে দরখাস্ত করিয়া, ড্রাইভার ভদ্রলোককে একটি পুলিস-ওয়ার্নিং দিবার বন্দোবস্ত করিলাম। পরদিন দ্বিপ্রহরে তিনি ওয়ার্নিং পাইলেন।

তারপর মাঝে মাঝে তাঁহার চাপা চীৎকার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃদু তিরস্কার শোনা যাইতে লাগিল। অতঃপর আমি একদিন উপযাচক হইয়া তাঁহার ঘরে গিয়া তাঁহার এই মিথ্যা ধারণা কি করিয়া জন্মিল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কিছুই ভাঙিলেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে কার্তিক থানায় খবর দিয়াছে—এ সংবাদই বা তিনি কোথা হইতে পাইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছিলেন। তারপর আমি কার্তিকের চরিত্রের বিষয় পাড়ার বিশিষ্ট কয়েকজন ভদ্রলোকের নিকট হইতে জানিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম এবং সে যে এম-এ ক্লাসের ছাত্র তাহাও জানাইয়া দিলাম। এ সংবাদটি তিনি জানিতেন না। কার্তিককে তিনি পুলিসের সংবাদদাতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে দুইদিন আমার ঘরে আনিয়া চা-জলখাবার খাওয়াইয়া ও কার্তিকের সহিত আলাপ-পরিচয় করাইয়া দেওয়ার পর মনে হইল তাঁহার বদ্ধমূল মিথ্যা ধারণার গোড়া অনেকখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহার পর তিনি আমাকে পুত্রহীন করিবার সদম্ভ আস্ফালন আর কখনো প্রদর্শন করেন নাই।

নবম প্রসঙ্গ

সহজপ্রবৃত্তি ও সংক্ষোভ

'সহজ প্রবৃত্তি' বা কেবল 'প্রবৃত্তি' শব্দটি আমরা ঘরোয়া কথাবার্তায় ও সাহিত্যে প্রচুর ব্যবহার করি এবং উহার প্রচুর অপপ্রয়োগও করি। বাংলা ভাষায় সহজপ্রবৃত্তির (Instincts) আরো কয়েকটি সমার্থবোধক শব্দ আছে, যথা 'সহজাত সংস্কার', 'সহজ জ্ঞান' 'জন্মগত বুদ্ধি' ইত্যাদি। প্রাকৃতজনের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, সহজপ্রবৃত্তি মানুষের এমন একটা অনির্দেশ্য ও রহস্যপূর্ণ মজ্জাগত শক্তি যাহা মানুষকে শৈশব হইতে কতকগুলি কাজ করিবার প্রবণতা আনিয়া দেয়। দেহবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যেও সহজপ্রবৃত্তির সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ-নির্ধারণ লইয়া মতবিরোধ আছে। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, ইহা জন্মার্জিত কতকগুলি জটিল রকমের প্রতিবর্তী ক্রিয়ানুরূপ আচরণ। কেহ বলেন, এক-এক অবস্থায় একটা কিছু করিবার অন্তরোথিত আবেগ (impulse)। আপাততঃ এই দুইটি মতকে একত্র মিশাইয়া সহজপ্রবৃত্তির একটা চলনসই সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করা যায় এইভাবে যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উত্থিত এক-একটা মৌলিক আবেগ বা মানসিক প্রণোদনা ও তাহাদের ছাঁচে-ঢালা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

আর একটি প্রশ্ন লইয়া আবার মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সে প্রশ্নটি হইল—এই-যে এক-একরূপ অন্তর্বেগের এক-একটা ধরা-বাঁধা প্রতিক্রিয়া, ইহা কি বংশগত, না, শৈশব হইতে অর্জিত ? যাঁহারা উহার বংশানুক্রমিকতায় বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, সহজপ্রবৃত্তিজাত আচার-আচরণ সাধারণভাবে পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে একই রূপ হইতে দেখা যায়। তদুপরি সকল জাতীয় পশুপক্ষীর মধ্যেও, বিশেষভাবে স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে, উহা একই ধরনের হইয়া থাকে। আবার অন্যদিকে অর্জনবাদিগণ বেশ জোরের সহিত বলেন, ইহা পৃথিবীর সর্ব জাতীয় লোকের মধ্যে একই ধাঁজের—এ কথাটা আংশিকভাবে সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ধারণাটি একটু বেশী মাত্রায় অতিরঞ্জিত। সহজপ্রবৃত্তিগুলি বহুলাংশে মানবের শৈশবে অধিগত করা হয় ;

প্রতিক্রিয়াগুলি একই ছাঁচের হয় এইজন্য যে, প্রত্যেক দেশে শৈশবের পারিবেশিক অবস্থাগুলি অল্পবিস্তর একই প্রকারের হয়। পরিবার, আর্থিক অবস্থা, প্রতিপালনের দোষগুণ ও সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিক্রিয়ার ইতরবিশেষ হয় দেখিয়া তাঁহারা এই মত পোষণ করেন যে, সহজপ্রবৃত্তিগুলি প্রধানতঃ শৈশবার্জিত।

সহজপ্রবৃত্তির স্বরূপ ও ধর্ম

এই দুইটি মতেরও সমন্বয় সাধন করিয়া আমরা এইরূপ একটা সংজ্ঞার্থ খাড়া করিতে পারি ;—**সহজপ্রবৃত্তি** তাহাকে বলে যাহা সকল মানুষের মধ্যে একই রকম অবস্থার চাপে একইরূপ অন্তর্বেগ ও একইরূপ আচরণের ইচ্ছা মনে জাগাইয়া দেয়। সহজপ্রবৃত্তি অনেকগুলি আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি জন্মার্জিত, কতকগুলি জন্মের পর অর্জিত। সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে দুইটি গুণের দ্বারা চেনা যায়—তাহাদের সার্বভৌমিক সমরূপতা (universality) ও আদিমতা (primariness)। এই কারণে অভ্যাসের সহিত সহজপ্রবৃত্তির পার্থক্য আছে যে, অভ্যাস পৃথিবীর সর্বত্র একরূপ নহে এবং সেগুলি প্রত্যেকটি মানুষ সারা জীবন ধরিয়া আয়ত্ত করিতে পারে—কতক নিজের বুদ্ধিবশে ও কতক পরের সাহায্যে।

শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কাঁদে, জন্মের পর দুই-তিন দিনের মধ্যেই স্তনবৃন্ত চোষণ করিতে পারে, আরো কিছুদিন পরে শুইয়া শুইয়া হাত-পা ছুড়িতে ও মাতার স্তন আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে। পরে সে নিজে নিজে উপুড় হইতে ও হামা দিতে পারে। ক্ষুধা পাইলে কাঁদে। এগুলি তাহার সহজপ্রবৃত্তি। প্রত্যেক জাতি ও শ্রেণীর পক্ষী ডিম পাড়ে। ডিমে তা দেওয়া পক্ষীমাতার সহজপ্রবৃত্তি। 'তা' শব্দটি তাপ শব্দের অপভ্রংশ। অবিশ্রান্ত তাপ দেওয়ার ফলে ডিমের ভিতরকার ভ্রূণ অর্ধতরল অবস্থা হইতে কঠিনত্ব ও জাতীয় গঠন প্রাপ্ত হয়। তারপর একদিন জীবন-লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পক্ষিশাবক আপনার কচি ঠোঁট দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া খোলা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসে। হাঁস-মুর্গীর বাচ্চাগুলি জন্মিয়াই ইতস্তত হাঁটিয়া বেড়ায় এবং নিজে নিজে খাদ্য খুঁটিয়া

খাইতে থাকে। একটু বড় হইলেই হংসশিশু মাতার সহিত জলে নামিয়া সাঁতার কাটে। এগুলি তাহাদের সহজপ্রবৃত্তি।

ঘোটকী-মাতার স্তন অত্যন্ত অপুষ্ট ও তাহার স্তন্য যেমন গাঢ় তেমনি অপ্রচুর। ঘোটকীর বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিবার পরই হাঁটিতে হাঁটিতে ঠিক মাতার স্তন চিনিয়া তাহা টানিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহাতে তাহার পেট ভরে না এবং বেশী জোরে টানিলে ঘোটকী বেদনা অনুভব করে। তাই সে ক্রমাগত মৃদু রকমের চাট্ মারিয়া বাচ্চাকে নিজের স্তন-সান্নিধ্য হইতে সরাইয়া দেয়। তখন বাচ্চা ঘাস, খড়, বিচালি প্রভৃতি খাদ্য নিজে নিজে চিনিয়া খাইতে শেখে। বাবুই, বুলবুল ও টুনটুনিরা একটু বড় হইলেই নিজে নিজে চমৎকার কলা-কৌশল-সমন্বিত বাসা রচনা করে।

সর্পিণী একসঙ্গে বহুসংখ্যক ডিম পাড়ে। ডিমগুলি ফুটিবার আগেই সে কতকগুলিকে নিজে উদরসাৎ করে। তারপর ডিম হইতে যখন বাচ্চাগুলি প্রায় সমকালে বাহির হয়, তখন তাহারা আপনাআপনি মাতার নিকট হইতে দ্রুতগতিতে চতুর্দিকে কিলবিল করিয়া পলাইয়া যাইতে থাকে। তথাপি সর্পজননী বিদ্যুৎগতিতে তাহাদের কয়েকটির পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গুটিকয়েককে পর পর গলাধঃকরণ করে। বাকি সর্পশিশুগুলি কোনো উইঢিপি বা অগভীর গর্তের নিকট গিয়া পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া তাল পাকাইয়া মৃৎপিণ্ডবৎ নিশ্চল পড়িয়া থাকে যাহাতে রাক্ষসী মাতা তাহাদিগকে চিনিতে না পারে, অথবা পৃথক্ পৃথক্ পাইয়া ধরিয়া মুখে পুরিতে না পারে। এগুলি তাহাদের সহজপ্রবৃত্তি।

এইবার সহজপ্রবৃত্তির আরো কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ ও ধর্ম আপনাদিগকে জানাই। (১) গোড়া হইতে সহজপ্রবৃত্তিগুলি চিন্তা-বুদ্ধি-বিবেচনা-শিক্ষা-প্রসূত হয় না; যেন অন্তরোত্থিত এক অজ্ঞাত অমোঘ স্বতঃপ্রণোদিত শক্তি প্রবৃত্তিগুলিকে প্রকাশ ও চালনা করে। এইগুলি সাধারণতঃ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ন্যায় একটা অন্ধ ক্ষিপ্রতার সহিত চালিত হয়। সর্বাবস্থায়—এমন কি আবেষ্টনীর সম্পূর্ণ পরিবর্তনেও একটি সহজপ্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া একই রকমের হয়—তাহার মধ্যে কোনো নূতনত্ব বা মৌলিকত্বের আভাস পাওয়া যায় না।

একটা বিড়াল একটা ইঁদুরকে সামনে দেখিলেই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে; বাড়ির মধ্যে সে ঐরূপ করে, আবার বাগানের মধ্যেও সে ঐরূপ করে।

(২) সহজপ্রবৃত্তিজাত ক্রিয়াগুলি মূলতঃ জীবের জীবনরক্ষা ও বংশরক্ষার জন্য সাধিত হয়। উত্তর-সাইবেরিয়ার হ্রদ হইতে শীতের প্রাক্কালে বহু শ্রেণীর কলহংস ও অন্য পক্ষী দল বাঁধিয়া তিন-চারি সহস্র মাইল আকাশ-পথ অতিক্রম করিয়া মানস সরোবর, উলার হ্রদ ও গুজরাটের কয়েকটি বড় বড় বিল ও দীঘিতে উড়িয়া আসিয়া সারা শীতকাল কাটায় এবং শীতের শেষে আবার স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। তাহাদের সহজপ্রবৃত্তি তাহাদিগকে নির্ভুলভাবে পথ চিনাইয়া নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে লইয়া আসে ও সুখাবহ বাসাহারের সন্ধান দিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে।

পিপীলিকা দল বাঁধিয়া বর্ষার প্রাক্কালে তাহাদের আহার্যের একাংশ নিজেদের বাসায় আনিয়া জড়ো করে। নদীর ধারে অসংখ্য গর্ত করিয়া যে সকল পিপীলিকা বাস করে, তাহারা যেন হাওয়ার মুখে আসন্ন বন্যার খবর পায়; তখন পুরুষ-পিপীলিকারা সঞ্চিত খাদ্যগুলি ও স্ত্রী-পিপীলিকাগণ নিজেদের ডিমগুলি মুখে করিয়া সারিবদ্ধ হইয়া উচ্চতর ভূমিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসে।

ময়াল সাপ একটা লম্বা কাঠের গুঁড়ির মত নিশ্চল হইয়া বনের মধ্যে পড়িয়া থাকে; তাহার অদূর দিয়া কোনো অসন্দিগ্ধ শিকার গমন করিলে সে অদ্ভুত দ্রুতির সহিত বিস্ফারিত বদন দিয়া তাহার শরীরের একাংশ সজোরে কামড়াইয়া ধরে এবং প্রচণ্ড বেগে তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়া ধীরে ধীরে উদরের অভিমুখে চালনা করিতে থাকে।

সকল জাতি, শ্রেণী ও বর্গের পশুপক্ষী একটা নির্দিষ্ট বয়সে ও নির্দিষ্ট ঋতুতে পৌঁছিলে, সহবাসের কামনায় ব্যগ্র হইয়া উঠে এবং স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে পরিপ্রীণন করিতে থাকে। পুরুষ-পাখিগুলি সাধারণতঃ স্ত্রী-বিহঙ্গ হইতে দেখিতে সুশ্রী হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই সুগায়ক হয়। গান গাহিয়া তাহারা বিহগীদের মনোহরণ করে। শুধু মনোহরণ নয়, তাহাদিগকে প্রতপ্ত করে।

(৩) সহজপ্রবৃত্তিগুলিতে অনেক সময় কাম, ক্রোধ, হর্ষ, অগ্রবর্তিতা, আক্রমেচ্ছা, আক্ষেপ, ভয় প্রভৃতি সংক্ষোভ বিজড়িত থাকে। কোনো-কোনোটি

স্নেহ প্রভৃতি রসানুভবমণ্ডিত হইতে দেখা যায়। একদল পণ্ডিতের মতে যেখানে সহজপ্রবৃত্তি নিরঙ্কুশভাবে কার্য সম্পন্ন করিতে পায়, সেখানে কোনোরূপ সংক্ষোভ প্রকাশের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই সহজপ্রবৃত্তিজাত প্রতিক্রিয়া-সাধনের পর একটা আরাম, তৃপ্তি, স্বাচ্ছন্দ্য বা নিশ্চিন্ততার অনুভূতি প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

সহজপ্রবৃত্তির সহিত মনের সম্বন্ধ

ম্যাগ্‌ডুগাল, হব্‌হাউস, স্টাউট প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সহজপ্রবৃত্তিগুলি জন্মগতই হোক্ আর জন্মোত্তরার্জিতই হোক্, তাহাদের মধ্যে মনের ক্রিয়া থাকিবেই। তাঁহারা থার্‌ন্‌ডাইক্, ওয়াট্‌সন্, উইলিয়াম্ জেমস্, লোএব্ প্রমুখ ব্যবহারবাদীদের সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে কতকগুলি জটিল প্রতিবর্তী ক্রিয়ার শৃঙ্খলের সহিত তুলনা করা* ও ঐগুলিকে পেশী ও নার্ভের দ্বারা তৈয়ারী বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনের একটি সূক্ষ্ম কলকব্জাওয়ালা যন্ত্রের বিভিন্ন উদ্দীপনার এক-একটা নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া বলিয়া ঘোষণা করার বিপক্ষে বহু সারগর্ভ যুক্তি খাড়া করিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন, সহজপ্রবৃত্তিমূলক প্রতিক্রিয়ায় মনের একটা বড় অংশ অবশ্যই আছে। উহা জন্ম হইতে অধিগত, নির্দিষ্ট উদ্দীপনার নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া একান্ত যান্ত্রিকভাবেই সম্পন্ন হয়, এ কথা অতি নিম্নতর প্রাণীদের পক্ষে খানিকটা সত্য হইলেও উচ্চতর প্রাণী ও মানুষের ক্ষেত্রে একেবারে সত্য নয়; কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সহজপ্রবৃত্তিমূলক কাজগুলির প্রত্যেকটিতে মন আসিয়া যোগ দেয়, অর্থাৎ বিষয়ী ঐরূপ কাজ করিবার সময় প্রতি ক্ষেত্রেই মনোযোগ দেয়। সাপ যখন ব্যাঙ ধরিতে যায়, তখন তাহার সহজপ্রবৃত্তিজাত কাজটি যান্ত্রিক বলিলেও বলা চলে, কারণ তাহার মন বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু একটা বাঘ যখন শিকার ধরে, তখন তাহার কাজের পিছনে মন থাকে। সে শিকার ধরিবার পূর্বে শিকারকে ভালো করিয়া লক্ষ্য করে; বিবেচনা করে উহা তাহার

* "An instinct is a series of chained reflexes."—Watson, *Behaviour*, p. 106.

বধের উপযুক্ত কি না; তাহাকে কোন্ দিক হইতে কি ভঙ্গীতে আক্রমণ করিতে হইবে তাহাও ভাবিয়া ঠিক করিয়া লয়। সকল ক্ষেত্রে সে অন্ধ ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ করে না। আত্মগোপন করিয়া সে এক-একটা শিকারকে মাইলের পর মাইল পথ অনুসরণ করে অথবা দিনের পর দিন অদ্ভুত চাতুরীর সহিত শিকারীদলের নজর এড়াইয়া চলে।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল-গোষ্ঠীর পণ্ডিতেরা বলেন যে, যত দিন যায়, বিষয়ী তত তাহার সহজপ্রবৃত্তিমূলক কাজগুলির সহিত তাহার মনকে সংশ্লিষ্ট করে, উদ্দীপনার বস্তুগুলিকে হয় নিজে নিজে নতুবা পরের সাহায্যে ছাঁকাই-বাছাই করিতে শিক্ষা করে, তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলিকে কাজে লাগায় এবং ক্রমশঃ সহজপ্রবৃত্তিমূলক কর্মগুলিকে উন্নত করে, মার্জিত করে; ক্ষেত্রবিশেষে ক্রিয়াগুলিকে নূতন নূতন দিকে প্রসারিত করে, চেষ্টাকৌশলের পরিবর্তন করে, প্রয়োজন-মত চেষ্টার প্রবণতাকে সংযত করে।

মানব-শিশু যখন আপনা-আপনি বসিতে চেষ্টা করে, তখন সে যাহাতে হুম্‌ড়ি খাইয়া না পড়ে তজ্জন্য তাহার চারিদিকে বালিশের আগড় দিয়া দিতে হয়। ক্রমশঃ সে কতক নিজের চেষ্টায়, কতক আত্মীয়স্বজনের সাহায্যে বসিতে শেখে। তারপর সে চেয়ার বা খাটের পায়া ধরিয়া ধরিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করে। দিনকয়েক পরে কোনো সহায়তা না লইয়া একটু-একটু করিয়া ভারসাম্য বজায় রাখিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। ইহার কিছু দিন পরে সে ক্রমান্বয়ে একটু একটু করিয়া দুই পা বাড়াইতে চেষ্টা করে। ক্রমাগত পড়ে আর ওঠে, আবার দাঁড়াইয়া হাঁটিতে চেষ্টা করে। অবশেষে সে ছোট ছোট পা ফেলিয়া ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহার এই সকল প্রবৃত্তিমূলক কার্যে কিছু মনোযোগ তো থাকেই, তদুপরি কিছু পরানুকরণ কিছু বুদ্ধি কিছু পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রয়োগও থাকে।

যখন সে হামাগুড়ি দিতে, বসিতে ও হাঁটিতে শেখে, তখন সে আপনা-আপনি ছোটোখাটো জিনিস ধরিয়া মুষ্টিবদ্ধ করিতে এবং সহজপ্রবৃত্তিবশে খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা করিতে না পারিয়া সব কিছুই মুখে পুরিতে চেষ্টা করে। এমন কি, অর্ধেক দুধে-দাঁত বাহির হইয়া গেলেও তাহার স্বাদবোধ ভাল করিয়া

জাগে না ; তাই সে ধূলা, মাটি, ড্যালা, ঢিল, বীজ, আঁটি, লঙ্কা, অখাদ্য-কুখাদ্য যাহা পায় তাহাই মুখে ফেলিয়া চিবায়। এইগুলি হয় সর্বদা তাহার হাতের বাহিরে রাখিবার চেষ্টা করা হয়, নতুবা হস্তগত দেখিলে হাত হইতে কাড়িয়া লইতে হয়।

পাখির বাচ্চারাও প্রথম প্রথম অনেক অখাদ্য খুঁটিয়া ও বিষাক্ত কীটপতঙ্গ ধরিয়া খায়। বিড়াল-শিশুরা একটু বয়ঃপ্রাপ্ত যখন হয়, তখন বাতাসে কোনো ক্ষুদ্র বস্তু নড়িতে দেখিলে, তাহা নেংটি ইঁদুর মনে করিয়া তাহার উপর লাফ দেয়। তারপর তাহাকে কামড়াইয়া ও সম্মুখের দুই থাবা দিয়া ধরিয়া বুঝিতে পারে উহা তাহার শিকারের বস্তু নয়; বুঝিতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। দুই-চারিবার এইরূপ ভুল প্রতিক্রিয়া করিয়া সে নিজেকে সংবরণ করিতে শিখে।

শিশু নূতন স্বাদবোধ পাইয়া ও সুখাদ্য-কুখাদ্য চিনিতে শিখিয়া যখন-তখন এটা-ওটা খাইতে চায়; পেট ভরা থাকিলেও তাহার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যেন খর্ব হইতে চাহে না। তাহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া বকিয়া-ঝকিয়া এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে শিখাইতে হয়। ইহা ব্যতীত বমি, পেট-কামড়ানি, পুনঃপুনঃ পাতলা মলত্যাগ-জনিত যন্ত্রণার মধ্য দিয়া সে খাদ্যের প্রতি স্বাভাবিক লোভকে নিজে নিজে খানিকটা দমন করিতে শিক্ষা করে।

বৎসরের একটা বিশেষ সময়ে কিছুদিনের জন্য একমাত্র কয়েক শ্রেণীর বানর ব্যতীত অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের অদম্য সংসর্গস্পৃহা জাগে; ইহা তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তি। এই সহজাত প্রবৃত্তি-বশেই প্রায় সকল জাতীয় পশুই অন্তর্গমন (incest) করে না। ছাগছাগীরা ইহার উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। তারপর অধিকাংশ পুরুষ-পশুই প্রতপ্ত হইলেও অপ্রাপ্তবয়স্কা, গর্ভিণী ও সদ্যপ্রসবিনী পশুতে উপরত হয় না। ইহাও তাহাদের সহজাত সংস্কার। এই সকল আচরণ তাহাদিগকে ঘাড় ধরিয়া বা চাবুক মারিয়া শিখাইতে হয় না।

সহজপ্রবৃত্তিগুলির মধ্যে একটা জাতি, শ্রেণী বা বর্গের পুরুষানুক্রমিক শিক্ষার ঐতিহ্য নিবদ্ধ থাকে। সেইজন্য সেগুলি প্রয়োগ করিতে কষ্ট পাইতে হয় না, যদিও সেগুলির প্রয়োগক্ষেত্র-নির্বাচনে ও স্বভাবসঙ্গত প্রতিক্রিয়া-দমনে কিছু

শিক্ষা, কিছু অভিজ্ঞতা, কিছু মামুলি বিবেচনা, কিছু অনুকৃতিস্পৃহা অনেক সময় উপস্থিত থাকে। সহজাত সংস্কার আমাদের জীবনের প্রথম মূলধন, যাহাকে ইংরাজীতে বলা হয় "nest egg"। রেলওয়ে স্টীম এঞ্জিনের কয়লা-জল-আগুনের মত উহারা আমাদিগকে গতিবেগ ও কর্মে প্রণোদনা দেয়। তারপর শিক্ষা, অভ্যাস, অভিজ্ঞতা, এষণা, কল্পনা, স্মৃতি প্রভৃতি ইহাদিগকে উন্নত মার্জিত করে, কখনো বলশালী কখনো সংযত করে।

সহজপ্রবৃত্তিগুলির শ্রেণীবিভাগ ও পরিচয়

সহজপ্রবৃত্তিগুলি সকলে একদলভুক্ত নহে। ইহারা বোধহয় কালো-বুলবুল বা রামশালিকের মত প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি ঝগড়াদ্বন্দ্ব করে; কারণ অনেকগুলি বিপরীতধর্মী সহজপ্রবৃত্তি আমাদের সত্তার মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে, একটি যেন পরাশক্তি, অপরটি যেন অপরাশক্তি। এই ধরুন, যুদ্ধ-প্রবৃত্তির পাশেই আছে পলায়ন-প্রবৃত্তি, তারপর প্রভুত্ব-প্রবৃত্তির পাশে দাসত্ব-প্রবৃত্তি, অহং-প্রবৃত্তির পাশে বারাঙ্গিক প্রবৃত্তি (sex instincts), পীড়নদান-প্রবৃত্তির পাশে পীড়নসহন-প্রবৃত্তি, প্রেমপ্রবৃত্তির পাশে ঘৃণা-প্রবৃত্তি ইত্যাদি। এই সকল প্রবৃত্তির মধ্যে যখন একটু বড় রকমের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং বিষয়ী যখন সহজে ও শীঘ্র তাহার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে পারে না, তখনি দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। এই দুশ্চিন্তা হইতেই নানারূপ মনোবৈকল্য দেখা দিতে পারে।

এক্ষণে কতকগুলি প্রধান সহজপ্রবৃত্তির নাম আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে চাই। কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী সহজপ্রবৃত্তির স্বরূপ নির্ধারণ করিতে গিয়া মুস্কিলে পড়িয়াছেন। কেহ গুটি কয়েককে মাত্র সহজপ্রবৃত্তির পর্যায়ে ফেলিয়াছেন, কেহ উহাদের একটা লম্বা তালিকা তৈয়ারি করিয়াছেন। একদল বিশারদ কিছু করিবার স্বতঃসঞ্জাত অভিরুচি বা ইচ্ছাকে, আবার অন্যদল কিছু করিবার স্বতঃসঞ্জাত চেষ্টাকে সহজপ্রবৃত্তি বলিয়াছেন। সহজ-প্রবৃত্তি প্রধানতঃ সেইগুলিকেই বলা উচিত—যাহারা শৈশব হইতেই উদ্দীপনা ব্যতিরেকে বা উদ্দীপনার উপস্থিতিতে তৎক্ষণাৎ আপনা-আপনি একটা কিছু

করিবার অন্তর্বেগ ও পৈশিক চেষ্টা জাগায় এবং যাহা বয়সের সহিত সংযত বা সংস্কৃত হয়।

ছয়টি প্রধান সহজপ্রবৃত্তি আমাদের জীবনধারণের জন্য ও বংশবিস্তারের জন্য অতিশয় প্রয়োজনীয়। ইহার মধ্যে দুইটি কৈশোর-যৌবন পর্যন্ত মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ও নিষ্ক্রিয় থাকে। এই প্রবৃত্তিগুলি হইল—(১) দেহপোষণ-প্রবৃত্তি; (২) অহংপ্রবৃত্তি; (৩) আসঙ্গ-প্রবৃত্তি; (৪) প্রজনন-প্রবৃত্তি; (৫) আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তি; ও (৬) সামাজিক প্রবৃত্তি।

দেহপোষণ-প্রবৃত্তির (nutritive instincts) মধ্যে শুধু খাদ্য ও পানীয়ের জন্যই অন্বেষণ-চেষ্টা নাই, আলো-বায়ুর জন্যও আগ্রহবোধ আছে, কারণ এই দুইটিও প্রাণীর জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। তাই শিশুরা বদ্ধ স্থানের ভিতর অথবা অন্ধকারের ভিতর বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না, থাকিলে ছট্‌ফট্ করে, কাঁদে। বেশী আঁটা ও গরম জামা পরাইলেও তাহারা দারুণ অস্বস্তিবোধ করে। শুধু শিশুর কেন, বর্ধিতবয়স্কেরও খাদ্য-পানীয় দেখিয়াই ক্ষুধাতৃষ্ণার অভিলাষ উজ্জীবিত হয় না, শরীরের আভ্যন্তরিক তাগিদে দিবসের এক-একটা সময়ে উপস্থিত হয়। খাদ্যপানীয় না পাইলে অসহায় শিশু কাঁদে, প্রাপ্তবয়স্করা খোঁজে ও নিজেরা যোগাড় করে। তবে সম্মুখে সুখাদ্য দেখিলে বা তাহার সুগন্ধ পাইলে, কোনো কোনো জাগ্রতস্বাদ শিশুর নয়, কোনো কোনো বৃদ্ধবৃদ্ধারও দুষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক ও জিহ্বায় পর্যাপ্ত লালার সঞ্চার হয়।

অহং-প্রবৃত্তির (ego instincts) ছত্রতলে কতকগুলি ছোট-মাঝারি সহজপ্রবৃত্তি আশ্রয় লইয়াছে। তাহাদিগকে কোনো কোনো পণ্ডিত পৃথক করিয়া তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। উহারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ও অহং-প্রবৃত্তির সহায়ক বলিয়া আমরা একসঙ্গেই উহাদের আলোচনা করিতেছি। এই প্রবৃত্তির সর্বাপেক্ষা বড় সহকারী হইল **প্রভুত্ব-প্রবৃত্তি বা আত্মপ্রাধান্য-প্রবৃত্তি**। প্রাচীন দার্শনিকগণ ও আধুনিক মনোবীক্ষণিকগণ ইহাকেই will-to-power নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহারই দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইল—**আত্মপ্রদর্শন** (self-display, exhibitionism) অর্থাৎ নিজেকে জাহির ও প্রচার করিবার, নিজের কেরামতি দেখাইবার প্রবৃত্তি। ইহার পিছনে থাকে **বশ্যতা-প্রবৃত্তি,** যাহাকে

আমরা বৈষ্ণবোচিত বিনয় বলি; মহাপ্রভুর সেই 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা' বাণীকে কর্মে রূপান্তরিত করিবার প্রবৃত্তি। ইহা হইল আত্মপ্রাধান্য-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধধর্মী। ইহার মধ্যে থাকে শ্রদ্ধাভাজনকে অনুসরণ করিবার, তাঁহার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার স্বভাবসিদ্ধ অভিলাষ ও চেষ্টা।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল ঠিক কথাই বলিয়াছেন যে, অধিকতর দুর্বলের সম্মুখে আত্মপ্রাধান্যের প্রবণতা ও অধিকতর সবলের নিকট বশ্যতার প্রবণতা পশু ও মানুষের মৌলিক স্বভাব।* তিনি দৃষ্টান্ত দেখাইতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, একটি বড় জাতির (ধরুন অ্যালসেশিয়ান কি রিট্রিভার) কুকুর একটা নীচু জাতির (ধরুন নেড়িকুত্তা) কুকুরের কাছে কিরূপ গর্বোদ্ধত বেপরোয়া চালে চলাফেরা করে। নীচু জাতের কুকুর তাহাকে দেখিয়া হয় অলিগলির মধ্যে ঢুকিয়া বার কয়েক সশঙ্ক আওয়াজ তোলে নতুবা ল্যাজ গুটাইয়া নিঃশব্দে দূরে পলায়ন করে। বালকদের মধ্যেও এই প্রবৃত্তি সুস্পষ্ট দেখা যায়। তাহারা বড় ছেলেদের কাছে সর্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে, বিশেষভাবে সেইগুলির কাছে যাহারা অল্পবিস্তর গোঁয়ার-গোবিন্দ শ্রেণীর। বড়দের মধ্যেও এই রীতি।

আসঙ্গ-প্রবৃত্তির অর্থ—কৈশোরশেষে বা যৌবন-প্রারম্ভে বিপরীত বরাঙ্গ-জাতির (sex) প্রতি মনোযোগ, তাহাদের দেহোপভোগের ইচ্ছা ও চেষ্টা। স্ত্রীলোক পুরুষকে, পুরুষ স্ত্রীলোককে—প্রায় ক্ষেত্রেই একসময়ে একজন আর একজনকে—ভালবাসে; তাহাকে সাময়িকভাবে বা সুদীর্ঘকালের জন্য নিজের কাছে পাইবার জন্য লালায়িত হয়। সাধারণতঃ পুরুষ তাহার মনোমত নারীকে নানাভাবে পরিপ্রীণন ও বিশ্রম্ভন (courtship) করে ও তাহার সহিত বারাঙ্গিক সম্মিলনের জন্য ব্যগ্র হয়। পরিপ্রীণনে প্রীতা নারী মৌখিকভাবে, পত্র-দ্বারা, ভাবভঙ্গী-ইসারার দ্বারা সম্মত হইলে, অথবা বিবাহানুষ্ঠানের মাধ্যমে বাধ্যতাজনিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়া বধূরূপে আত্মদান করিলে, পুরুষ তাহার সহিত ইচ্ছামত কায়িকভাবে মিলিত হয়।

ফ্রএডের মতে, কাম একটি সহজপ্রবৃত্তি হইলেও বিষয়ী কৈশোরে না পৌঁছিলে কামের মধ্যে সচরাচর উপস্থপ্রাধান্য (primacy of the genital

* W. McDougall, *Introduction to Social Psychology* (Mathuen).

organs) ঘটে না। তদুপরি এই কামপ্রবৃত্তিটি শৈশব হইতে দুইটি বা তিনটি স্তরপর্যায় অতিক্রম করিয়া তবে যৌবনে পরিণত ও স্বভাবসঙ্গতরূপে পরিস্ফুট হয়। ইহার প্রথম স্তরের রূপটিকে বলে "আত্মকাম" (auto-eroticism); ইহাতে শিশু নিজেকে ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসে না, ভালবাসিতে পারে না। তাহার পরবর্তীকালে শিশু আপন বরাঙ্গজাতিকে ভালবাসে; যাহাকে বলা হয় "সমকাম" (homosexuality)। তারপর কাহারো কাহারো জীবনে আর একটি স্তরপর্যায় আসে যখন তাহার কাম সঞ্চালিত হয় কখনো সমজাতীয়ের প্রতি, কখনো বিপরীত জাতীয়ের প্রতি। ইহাকে বলে "উভকাম" (bisexuality)। পরিশেষে আসে বিশুদ্ধভাবে অপর-বরাঙ্গজাতির প্রতি আকর্ষণ, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে "বিষমকাম" (heterosexuality)। কেহ কেহ এই মধ্যবর্তী স্তরগুলির মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে, একটা স্তরে আবদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ সেই স্তরসুলভ কাম-সংস্থিতিতে চিরসংসক্ত থাকিয়া যায়। উহাকে বলিতে হইবে "কামবিকার" (sex perversion)। এ সম্বন্ধে পরে আরো কিছু বিশদভাবে বলা যাইবে।

স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বারাঙ্গিক সম্মিলনের একটা মহত্তর বিশ্বপ্রাকৃতিক উদ্দেশ্য হইল **প্রজনন** বা **বংশরক্ষা**, প্রকারান্তরে যাহাকে বলে 'আত্মবিস্তার' (reproduction, propagation, self-expansion)। অবশ্য প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে শৈশব হইতে এই প্রবৃত্তিটি গুপ্ত বা সুপ্ত থাকিলেও সকলের মধ্যে বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহা সমানভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে না। এরূপ বহু স্ত্রী-পুরুষ আছে যাহারা যৌনসম্মিলনের আনন্দের চেয়ে প্রজননকে বড় দেখে না। উহারা প্রথমটিকে একটি মহত্তর উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় মাত্র বলিয়া মনে করে না। বরং তাহারা সারাজীবন অপুত্রক থাকার অখ্যাতি সহিবে, তবু পুত্রকন্যার পিতামাতা হওয়ার গৌরব লাভ করিতে চাহিবে না।

যাহাদের মধ্যে প্রজনন-প্রবৃত্তি পুষ্টিলাভ করে, তাহাদের মধ্যে উহার সঙ্গে-সঙ্গে আর একটি সহজপ্রবৃত্তি মুকুলিত হইয়া উঠে; উহার নাম **অপত্যস্নেহ** (parental instinct)। নিম্নতর প্রাণীদের অনেক জাতি ও শ্রেণীর এবং উচ্চতর প্রাণীদের প্রায় সকলের মধ্যেই এই সহজাত গুণটি বর্তমান থাকিতে

দেখা যায়—বিশেষভাবে ও বেশী পরিমাণে স্ত্রীপ্রাণীর মধ্যে। কেবল সর্পিণী হইল ইহার ব্যতিক্রম। বালিকাদের পুতুল-খেলার রীতিপদ্ধতিগুলি লক্ষ্য করিলে, এই সুকোমল প্রবৃত্তিটি যে তাহাদের সহজাত, তাহার অকাট্য প্রমাণ পাইবেন।

আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তি (defensive instincts) না থাকিলে মানুষ বেশী দিন বাঁচিতেই পারে না। এই প্রবৃত্তিটিকে বর্বর যুগে ও মধ্যযুগের অর্ধ-সভ্য সমাজে অবিশ্রান্ত কাজে লাগাইতে হইত। জীব-জন্তু-কীট-পতঙ্গের হামলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপ্লব, চোর ডাকাত গুণ্ডা বদমায়েস অন্য জাতি উপজাতি বা গোষ্ঠীর আক্রমণ ক্রমাগত উপস্থিত হইত এবং মানুষকে অবিরত ইহাদের সহিত লড়াই করিতে হইত। এই সভ্যযুগেও মানুষকে বিভিন্নমুখী আক্রমণের সম্মুখীন্ হইতে ও তাহার হাত হইতে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে হয়; যদিও আজকাল ব্যক্তিকে রক্ষার ভার কতকটা সমাজ, কতকটা রাষ্ট্র ভাগ করিয়া লইয়াছে।

আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে আরো কয়েকটি প্রবৃত্তি বিজড়িত রহিয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটির নাম **যুযুৎসা** (pugnacity or aggressiveness)। শত্রুকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে নিরস্ত-করণ, নতুবা তাহাকে আহত বা নিহত-করণ হইল এই প্রবৃত্তির লক্ষ্য। আর একটি প্রবৃত্তির নাম **অপসরণ-প্রবৃত্তি** (escape)। ইহাতে প্রকট হয় শত্রুপক্ষ প্রবল বুঝিলে হয় পলায়নেচ্ছা, নতুবা আত্মগোপন-করণ, নতুবা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া আহত বা নিহত হইবার ভান-প্রদর্শন।

সামাজিক প্রবৃত্তি (social instincts) গঠিত হয় কতকগুলি সহজাত প্রবণতা একত্র হইয়া। ইহার মধ্যে প্রধান প্রবণতাটির নাম **যূথচরতা** (gregariousness) অর্থাৎ সমজাতীয় লোকের সহিত একত্র অবস্থান ও বিচরণ। কেবল মানুষকেই সমাজবদ্ধ জীব বলা চলে না, পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার ন্যায় ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ হইতে বন্যমহিষ ও হস্তীর ন্যায় বৃহৎ স্তন্যপায়ী পশুরাও যূথচর।

এই প্রবণতাটি একটি সাধারণ ইংরাজী প্রবাদের মধ্যে প্রাণবন্ত করিয়া

রাখা হইয়াছে—"Birds of a feather flock together." উর্দুতে ইহাপেক্ষা আরো মনোজ্ঞ একটি প্রবচন প্রচলিত রহিয়াছে—

"কুন্দ্‌দ্ হম্ জীন্‌স্ বা হম্ জীন্‌স্ পরওয়াজ।
কবুতর বা কবুতর, বাজ বা বাজ।"

—এক স্বভাবের প্রাণী সমস্বভাবের প্রাণীর সঙ্গ খোঁজে। তাই পায়রার সহিত পায়রা থাকে, বাজপাখির সঙ্গে বাজপাখি বেড়ায়।...বাঘ, গণ্ডার, সিংহ, ভল্লুক, গরিলা, সর্প, কোকিল, নীলকণ্ঠ, শ্যামা প্রভৃতি পশুপক্ষীরা অবশ্য একা থাকিতে ভালবাসে; আবার কোনো কোনো পশু ও পক্ষী জোড়ায় জোড়ায় থাকা পছন্দ করে। কিন্তু ইহারা নিয়মের অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

সাধুসন্ন্যাসীরা কিছুকাল নির্জন অরণ্যে বা পার্বত্য গুহায় তপস্যা করিবার পর মানুষ দেখিবার ও তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য বিচঞ্চল হইয়া উঠেন। বড় বড় পরমহংসও কিছুকাল লোকালয়ে আসিয়া বাস করিয়া, শিষ্যশিষ্যা ও উৎসুক ভক্তদের দর্শন দিয়া ও তাহাদের সুখদুঃখের কথা শুনিয়া, তাহাদিগকে মন্ত্রোপদেশ দিয়া এবং বিবিধ আধি-ব্যাধি-আরোগ্যের পন্থা নির্দেশ করিয়া, পারমার্থিক আনন্দের সমতুল্য আনন্দ লাভ করেন।

সামাজিক প্রবৃত্তির সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে আরও তিনটি সহকারী প্রবৃত্তি; যথা—(ক) **অনুকরণ-প্রবৃত্তি**, (খ) **সহযোগিতা-প্রবৃত্তি** ও (গ) **নিয়মনিষ্ঠা-প্রবৃত্তি**। ইহাদের সহিত আরও দুইটি সহকারী প্রবৃত্তিকেও সংযুক্ত করা যায়; যেমন—(ঘ) **গঠন-প্রবৃত্তি** ও (ঙ) **একত্র ক্রীড়া ও আমোদোপভোগের প্রবৃত্তি**। এই প্রবৃত্তিগুলির চর্চা না করিলে, কি সমাজের সহিত, কি পরিবেশের সহিত, মানুষ নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে না। শিশু পিতামাতার অনুকরণ করে; ছোটরা বড়দের, মূর্খরা বিদ্বজ্জনের, নিকৃষ্ট শ্রেষ্ঠের অনুকরণ করে। এই প্রবৃত্তিজনিত আচরণ প্রত্যেক দেশের সমাজেই দেখা যায়। শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উপকরণই হইল অনুকরণ-ক্ষমতা। যে ছাত্র তাহার গুরুকে যত বেশী অনুকরণ করিতে পারিবে, সে তত পারদর্শী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। অত্যন্ত অধ্যবসায়ী, মেধাবী ও চিন্তাশীল শিষ্য অনুকরণের মধ্য হইতেই মৌলিকত্ব-প্রদর্শনের প্রেরণা লাভ করে।

পশুদের মধ্যেও নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ আছে। একটা হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত দিই। দলের মধ্যে কোনো হস্তিনী যখন আসন্নপ্রসবিনী হয়, তখন পুরুষ হস্তিগণ তাহাকে আহার্য সংগ্রহ করিয়া খাওয়ায়, তাহার যথারীতি বিশ্রামের ব্যবস্থা করে এবং অবশেষে একটা নির্দিষ্ট প্রসব-স্থানের দিকে সদলবলে লইয়া যায়। প্রত্যেক দলের একটি করিয়া প্রসব-স্থান ও মৃত্যু-স্থান পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট করা থাকে। প্রত্যেক গর্ভিণীকে প্রসব-স্থানে যথাসময়ে লইয়া গিয়া শয়ন করানো হয়। প্রসব-স্থান প্রায় ক্ষেত্রে একটি ঘন-মহীরুহ-বেষ্টিত জলাশয়ের ধারে নির্ধারিত থাকে।

সকল পুরুষ-হস্তী প্রসবক্ষেত্র হইতে একটু দূরে আসিয়া, বিপরীত দিকে মুখ করিয়া সারিবদ্ধ হইয়া প্রসব না হওয়া পর্যন্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে। মেয়ে-হস্তীদের জনকয়েক প্রসবক্ষেত্রের চতুর্দিকে পাহারা দেয়। অন্য কয়েকটি বয়োবৃদ্ধা করিণী প্রসবযন্ত্রণাকাতরা হস্তিনীর সেবাশুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করে। কেহ কেহ পত্রবহুল শাখা নাড়াইয়া তাহাকে ব্যজন করে। সন্তান-নির্গমণে বিলম্ব হইলে একটি পরিপক্কা গৃহিণী বিস্ফারিত যোনিনালীমধ্যে শুণ্ড প্রবেশ করাইয়া তদ্দ্বারা সন্তানটিকে বাহির করিয়া আনে। সন্তানটি নিরাপদে প্রসূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল স্ত্রী-হস্তী সমস্বরে গলা কাঁপাইয়া অস্বাভাবিকভাবে চীৎকার করিয়া আনন্দপ্রকাশ করে। পুরুষ হস্তিগণও সেই চীৎকারের উত্তরে আনন্দধ্বনি তুলিয়া বনস্থলী প্রকম্পিত করে।...

গঠনপ্রবৃত্তি যেরূপ সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে, সেইরূপ ব্যক্তিগত সুখসুবিধার উদ্দেশ্যেও নিয়োজিত হইতে পারে। বীবর, মৌমাছি, বিহঙ্গমেরা সুন্দর বাসা নির্মাণ করিতে পারে। বিহঙ্গদের মধ্যে বাবুইয়ের বাসা-নির্মাণ-কৌশল দেখিয়া অট্টালিকা-নির্মাণকারী এঞ্জিনিয়ারও বিস্ময় বোধ করেন। লাল পিপীলিকারাও কয়েকটি পাশাপাশি উদ্গত বৃক্ষপত্র জুড়িয়া গম্বুজ-আকারে চমৎকার বাসা নির্মাণ করিয়া থাকে। আবার পুষ্প-কাননবিলাসী বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতি বাসা-নির্মাণের বর্ণপরিচয়ও জানে না। যূথচর অনেক পশুদের বাসা নাই। জঙ্গলের মধ্যে যেখানে-সেখানে শুইয়া-বসিয়া তাহারা বিশ্রাম করে, নিদ্রা যায়।

মানুষ নিজের ও পরিবারের জন্য যেরূপ বাসগৃহ গঠন করে, তেমনি সমাজের মঙ্গলের জন্য বিদ্যালয়, চণ্ডীমণ্ডপ, মঠ, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, ধর্মশালা, আতুরাশ্রম, ক্লাব প্রভৃতি গঠন করে। অবসর-বিনোদন অথবা অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে নানারূপ মৃৎশিল্প, কারুশিল্প, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া তাহার গঠনপ্রবৃত্তিকে পরিস্ফুরিত করে। এই গঠনপ্রবৃত্তি তাহাকে বস্ত্র বয়ন করিতে, জাল চুপড়ি ধামা ঝুড়ি প্রভৃতি বুনিতে শিখাইয়াছে; নানারূপ শ্রম-ও-সময়-হ্রাসকারক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও নির্মাণের বুদ্ধিনিয়োজক প্রবণতা দিয়াছে। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, বাদ্যযন্ত্র—এগুলিও গঠনপ্রবৃত্তির প্রেরণাজাত।

এই প্রসঙ্গে আপনাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, এই গঠন-প্রবৃত্তির পশ্চাতেই থাকে **ধ্বংসপ্রবৃত্তি**। শিশুদের মধ্যে একটা বয়সে গঠনপ্রবৃত্তির পরিস্ফুরণের পূর্বে এই প্রবৃত্তিটি বলবতী হয়। ইহারা প্রত্যেকেই এক-একটি ক্ষুদ্র মহেশ্বর,—যাহা হাতের কাছে পায় তাহাই ভাঙিয়া-চুরিয়া আহ্লাদে আটখানা হয়। একটু বেশী বয়সে কোনো কোনো মানুষের মধ্যে এই প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্যও সজাগ হইয়া উঠে। কোনো কোনো লোক মারধর তো করেই, তাহা ছাড়া গৃহে স্ত্রী-পুত্রের সহিত কলহ করিয়া ক্রোধ-বশে সম্মুখে থালা-বাসন-পেয়ালা-পিরিচ-আয়না-শিশি-বইপত্র যাহা পায় তাহাই চতুর্দিকে ছুড়িয়া ফেলে।

শুধু কিশোর ও যুবকগণ নহে, প্রৌঢ়রাও জনতা-বিক্ষোভ বা দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় নির্বিচারে পরের মাথায় লাঠির ঘা মারে কিংবা বুকে ছুরি বসায়, ঘরেদ্বারে আগুন লাগায়, রেলের লাইন উৎপাটিত করে, ট্রামে-বাসে অগ্নি-সংযোগ করে, টেলিগ্রাফের তার কাটে, রাস্তার আলোর বাল্বগুলি ভাঙিয়া চুরমার করে। এই প্রবৃত্তি কতকটা গুপ্তপ্রণালীতে চরিতার্থ হয়—সিনেমার বিজ্ঞাপনের ছবিগুলিতে কালিঝুলি মাখাইয়া, পার্কের রেলগাড়ির স্কুল-কলেজের চেয়ার-বেঞ্চিগুলিতে ছুরি দিয়া দাগ কাটিয়া, দেওয়ালগুলিতে অভব্য মন্তব্য লিখিয়া, সাধারণের বা ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমণোদ্যানস্থ মূর্তিগুলির অঙ্গহানি করিয়া, লাইব্রেরি হইতে চাহিয়া-আনা বইগুলির পাতা মুড়িয়া ও ছবি ছিঁড়িয়া···ইত্যাদি। এই ধ্বংসপ্রবৃত্তি যখন চরম উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া লক্ষ্য-

বস্তুকে সম্মুখে না পায়, তখন বিষয়ীর নিজের উপরই ঝাঁপাইয়া পড়ে, বিষয়ী তখন আত্মহত্যা করিতে উদ্‌গ্রীব হয়।

আর দুইটি সহজাত সংস্কার হইল—(ক) **সংগ্রহ** ও **সঞ্চয়প্রবৃত্তি** এবং (খ) **কৌতূহল-প্রবৃত্তি** বা **ঔৎসুক্য**। শুধু মৌমাছি, পিপীলিকা ইত্যাদি ছোট ছোট কীটপতঙ্গের মধ্যে নয়, বড় বড় অনেক পশু ও পক্ষী জাতির মধ্যে —অন্ততঃপক্ষে যাহাদের একটা আশ্রয়স্থান আছে তাহাদের মধ্যে—খাদ্য ও বাসস্থানের উপকরণ সংগ্রহ করিবার প্রবণতা দেখা যায়। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরাও একটা গরু, বাছুর, মহিষ বা মানুষ বধ করিয়া, তাহার সমস্তটাই একবারের আহারে নিঃশেষ করে না। তাহাকে টানিয়া ঝোপের মধ্যে লইয়া গিয়া, খানিকটা খায় এবং খানিকটা পরের দিনের জন্য রাখিয়া দেয়। ঐ স্থান হইতে সে যত দূরেই চলিয়া যাক না কেন, পরদিন ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ঠিক খাদ্যসঞ্চয়ের স্থানটিতে ফিরিয়া আসে। শিকারীরা বাঘ-সিংহদের এই রীতিটি জানেন বলিয়া পরদিন ঐ খাদ্যসঞ্চয়-স্থানের অদূরে পশুকে মারিবার জন্য ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকেন।

ছোট ছোট শিশুদের মধ্যে আহার্য ব্যতীত অন্য অকিঞ্চিৎকর বস্তুসমূহ সংগ্রহ করিয়া এক জায়গায় জড়ো করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। একটু বড় হইয়া তাহারা যখন বিভিন্ন মূল্যের পয়সা চেনে, তখন পিতামাতার নিকট হইতে এক পয়সা, দুই পয়সা করিয়া প্রতিনিয়ত আদায় করিয়া একটি কৌটা বা মৃৎপাত্রে সঞ্চয় করে এবং কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে কাঁদিয়া খুন হয়। কোনো কোনো বালক বা বালিকাদের কাঁচপোকা, সুদর্শন পোকা, প্রজাপতি, ছোট ছোট ছবি, নানা মার্কাওয়ালা সিগারেট ও দেশলাইয়ের বাক্স, ব্যবহৃত পোস্টেজ স্ট্যাম্প, ছোট ছোট কৌটা, হুড়ি, ঝিনুক প্রভৃতি রকমারি অকেজো জিনিস জমা করিবার প্রবণতা বহুদিন পর্যন্ত প্রবল থাকিতে দেখা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও এই সঞ্চয়প্রবৃত্তি অল্পবিস্তর বর্তমান থাকিলেও অবস্থা-বিপাকে পড়িয়া তাহারা সকল ক্ষেত্রে উহার প্রসাদন করিতে পারে না।

যাহারা প্রচুর উপার্জন করে, তাহারা সকল সময়ে প্রচুর সঞ্চয় করিতে পারে না এইজন্য যে, বাসাহার পরিচ্ছদ আমোদপ্রমোদ লোক-লৌকিকতা ও নানা

জনহিতকর কর্মের পশ্চাতে তাহাদিগকে হয়তো নিয়মিতভাবে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এক-একজন সঞ্চয় করে শুধু নিজের সম্ভাব্য দুর্দিনের জন্য নয়, ভবিষ্যতে পুত্রকন্যাদের ব্যবহারের জন্য এবং নিজের সম্মান ও প্রভাববৃদ্ধির জন্য।

কৌতূহলপ্রবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি খণ্ড খণ্ড আগ্রহ ও প্রবণতাকে পাওয়া যায়। ইহা যে জন্মগত, তাহা শিশুদের চালচলন লক্ষ্য করিলেই জানা যায়। যে জিনিসগুলি তাহারা নিত্য দেখে, সে জিনিসগুলির প্রতি তাহাদের ঔৎসুক্য ক্রমশঃ কমিয়া যায়। নূতন জিনিস দেখিলে, তাহা লইবার জন্য তাহারা হাত বাড়ায় এবং হাতে পাইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখে। কখনো কখনো তাহারা খেলনাগুলি ভাঙে এই কারণে যে, উহাদের মধ্যে কি আছে তাহা দেখিবার কৌতূহল তাহাদের অদম্য হইয়া উঠে।

কোনো জিনিস ঢাকা থাকিলে তাহার তলায় কি আছে দেখিবার জন্য শিশুরা আগ্রহে অধীর হয়। বিশেষভাবে রান্নাঘরে ও ভাঁড়ার-ঘরে সমস্ত আবৃত পাত্রকেই তাহারা অনাবৃত করিয়া দেখিতে চায়—উহাদের তলায় রসনাতৃপ্তিকর কি নূতন খাদ্য আছে। শিশু একঘরে, একগৃহে বেশীক্ষণ বেশীদিন থাকিতে চাহে না; অনেক শিশুর ইহাতে মেজাজ বিগড়ায়, স্বাস্থ্য ভাঙে। নূতন স্থানে গেলে, নূতন মানুষের মুখ দেখিলে, নূতন বন্ধুবান্ধব পাইলে, শিশুরা সজীব হইয়া উঠে বর্ষাস্নাত তৃণগুচ্ছের মত।

এই কৌতূহলই মানুষকে খাদ্যপানীয়ের সন্ধানে, প্রেমাস্পদের সন্ধানে, নব নব বন্ধুর সন্ধানে, নূতন দেশের সন্ধানে, নূতন আরামের সন্ধানে, নূতন কর্মের সন্ধানে, রোগশোকদুঃখ-নিবারণের নূতন নূতন পন্থার সন্ধানে, অজানাকে জানিবার সন্ধানে ঘরছাড়া করে। তদ্ব্যতীত এই সংস্কার তাহাকে পুরাতন পরিবেশকে ভালো করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিবার আগ্রহ দেয়; পরিবেশের বাহিরে যে নিঃসীম দুর্জ্ঞেয় রহস্যের যবনিকা পড়িয়া আছে, তাহা তুলিয়া দেখিবার অদম্য অভিরুচি উত্রিক্ত করে। সে দেহ দিয়া না পারিলে, তাহার মনকে রথে পরিণত করিয়া, তাহাতে চড়িয়া লোক হইতে লোকান্তরে উড়িয়া বেড়ায়; বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির বিশালতার মধ্যে দিশাহারা হইয়া সে সসম্ভ্রম ঔৎসুক্যে সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান করিতে থাকে।

সংক্ষোভ কাহাকে বলে

ইংরাজী মনোবিজ্ঞানে যাহাকে **emotion** বলে, বাংলা মনোবিজ্ঞানে তাহাকে **সংক্ষোভ** বলে। কোনো কোনো মাননীয় পণ্ডিত ইহাকে "আবেগ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু আবেগ বা অন্তর্বেগ হইল **impulse**. এই দুইটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রতীয়মানতঃ অভিন্ন মনে হইলেও ইহাদের মধ্যে কিছু প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। কিন্তু এই দুইটি জিনিসের বিশিষ্ট গুণ ও পার্থক্য বিচার করিবার স্থান-সংকুলান হইবে না এই পুস্তকে। শুধু আপনারা এইটুকু জানিয়া রাখুন যে, মনস্তত্ত্বে আবেগ হইতে সংক্ষোভের গুরুত্ব ও মূল্য বেশী এবং আমাদের মতে ব্যবহারিক জীবনে উহার প্রয়োগও বোধহয় অধিকতর সংখ্যক ক্ষেত্রে হইতে দেখা যায়।

সংক্ষোভ জিনিসটির স্বরূপ ও সংজ্ঞার্থ লইয়াও মুনিদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে এবং সে বিরোধের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যবিধান করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। যাহা হউক, আমরা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে মাঝামাঝি পন্থা অনুসরণ করিয়া সংক্ষোভের একটা মনোগ্রাহী সংজ্ঞা রচনা করিয়া লইতেছি। 'সংক্ষোভ' শব্দটির অভিধানগত অর্থ হইল আলোড়ন। আলোড়নটি হয় কোথায়? না, মনে। মনের কোন্ অংশে?—যেখানে চৈতন্যের অবস্থিতি। আলোড়নটা হয় কেন? নিশ্চয়ই অকারণে নয়। কারণরূপে বাহিরে একটা উদ্দীপক অবশ্যই থাকিবে, যাহা চেতনাগত মনে আলোড়নের সৃষ্টি করে। আলোড়নটা কিসের জন্য? নিশ্চয়ই একটা কিছু প্রতিক্রিয়ার জন্য। এই প্রতিক্রিয়াটি প্রধানতঃ কি করে? দেহের মধ্যে—পেশীগুলিতে, গ্রন্থিগুলিতে, আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহে এবং প্রায় ক্ষেত্রে দেহের বাহিরেও—চর্মে, চোখের দৃষ্টিতে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে একটা পরিবর্তন আনয়ন করে।

সহজপ্রবৃত্তি ও সংক্ষোভের মধ্যে সম্বন্ধ

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ তাঁহার *Introduction to Social Psychology* গ্রন্থে বলিতেছেন—"কোনো সহজপ্রবৃত্তিজাত কর্মের সঙ্গে সঙ্গে মনে যে উত্তেজনা

উপস্থিত ও অনুভূত হয়, তাহাকেই সংক্ষোভ বলে।"* ক্রোধ, ভয়, উল্লাস, চাঞ্চল্য, ঘৃণা, বিস্ময়, করুণা প্রভৃতি হইল এক-একটি সংক্ষোভ। শুধু মানুষের নয়, প্রাণীদের দুইটি আদিম ও মুখ্য প্রবৃত্তি হইল—ভয় ও ক্রোধ। তারপর কালের উদ্বর্তনে অন্যান্য সংক্ষোভের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে এক-একটি সহজপ্রবৃত্তির সহচর ও তল্পিদার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, পলায়ন প্রবৃত্তির সঙ্গে থাকে ভয়, হিংসা-প্রবৃত্তির সঙ্গে থাকে ক্রোধ, দূরে-পরিহার-প্রবৃত্তির সঙ্গে থাকে ঘৃণা, কৌতূহল-প্রবৃত্তির সঙ্গে থাকে বিস্ময়াগ্রহ, প্রভুত্ব-প্রবৃত্তির সঙ্গে থাকে উল্লাস, অধীনতা-প্রবৃত্তির সঙ্গে বিনয়, অপত্যস্নেহের সহিত থাকে করুণা ইত্যাদি। এই সংজ্ঞা অনেকখানি সত্য হইলেও পুরাপুরি সত্য নয়। কারণ ক্ষেত্র-বিশেষে এরূপও দেখা যায় যেখানে সহজপ্রবৃত্তিজাত ক্রিয়া চলিতেছে, অথচ তাহার সহিত সংক্ষোভের সহগমন নাই, অথবা সংক্ষোভের উপস্থিতিবোধ হইতেছে অথচ তাহার সহিত সহজবৃত্তিজাত কর্মের উৎপত্তি নাই।

এইবার আমরা নিতান্ত প্রাসঙ্গিক-বোধে সংক্ষোভ ও আবেগের মধ্যে একটা স্থূল পার্থক্যের উল্লেখ করিতে চাই। আবেগ বা অন্তর্বেগ (impulse) হইল অন্তরের মধ্যে একটা স্বতঃসঞ্জাত নিছক তাড়না (drive)—যাহা কোনো বাহ্য উদ্দীপনা ব্যতিরেকেও অকস্মাৎ উপস্থিত হইতে পারে এবং যাহা সাধারণতঃ বিষয়ীকে কোনো কর্মপ্রচেষ্টায় তৎক্ষণাৎ উদ্যোগী করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া যায়। আবেগের মধ্যে অনেক সময় একটা প্রত্যক্ষ কারণ বা উদ্দেশ্য থাকে না এবং অত্যন্ত বেশী না হইলে আমরা ইহার উপস্থিতি বুঝিতেই পারি না—যদিও ইহা চৈতন্যের একটা গুণ। মানুষের নিত্যকার কার্যে ও আচরণে কম বা বেশী আবেগের প্রকাশ অভ্যাস-সাপেক্ষ ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া অর্জিত। সংক্ষোভ হইল একাধারে ভাবগত ও বস্তুগত; ইহার মধ্যে উদ্দীপনা আছে, তাড়না আছে, দেহের মধ্যে সক্রিয়তাজনিত পরিবর্তন আছে। সর্বোপরি ইহার একটি কারণ আছে, কিছুক্ষণ-স্থায়ী আবেশ আছে, একটা ফলশ্রুতি আছে।

এখন একটা জিজ্ঞাস্য হইল যে, উপরে যে সহজ প্রবৃত্তিজনিত প্রতিক্রিয়ার সহিত এক-একটা সংক্ষোভের উদয় হয় বলা হইল, কিন্তু আগে কোন্‌টা পরে

* "Emotion is a felt excitement accompanying instinctive activity,"

কোন্‌টা আসে? না, দুইটাই যুগপৎ উপস্থিত হয়? শুধু আপাতদৃষ্টিতে কেন, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেও বুঝা যায় যে, আমরা আগে ভয় পাই, পরমুহূর্তেই চোঁ-চা দৌড় মারি; আগে রাগে জ্বলিয়া উঠি, তারপর জিনিসপত্র ভাঙচুর ও মারধর আরম্ভ করি; আগে কাহাকেও পরাস্ত করি, পরে আহ্লাদে গদগদ হই···ইত্যাদি।

কিন্তু বিশেষজ্ঞদের এই সমূলক সনাতন ধারণাকে পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন দুই দেশ হইতে দুইজন মনস্তাত্ত্বিক—আমেরিকার উইলিআম্ জেম্‌স্ ও ডেন্‌মার্কের ডক্টর ল্যাঙ্। ইহারা দুইজনে প্রায় সমসময়ে প্রায় একই প্রকার যে মতবাদ প্রচার করিলেন, তাহা 'জেম্‌স্-ল্যাঙের থিওরি' বলিয়া পরিচিত হইল। এই মত ও তাহার সমর্থনজনক ব্যাখ্যা পণ্ডিত-সমাজে যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। আজকালকার পণ্ডিতেরা এই মতবাদের বেশী অংশই অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

এ মতবাদটা কি রকম জানেন? সকলেই আবহমানকাল জানে—তৈলাধার পাত্র, দুইজন নৈয়ায়িক বলিলেন—না, পাত্রাধার তৈল। ইহা কতকটা সেই রকমেরই ন্যায়সূত্র। জেম্‌স্-ল্যাঙ প্রচার করিলেন যে, আমরা মারধর করি থালাবাটি ভাঙি বলিয়াই রাগ করি, অশ্রুবিসর্জন করি বলিয়াই দুঃখানুভব করি, কাঁপি বলিয়াই ভয় পাই, আগে খিল্‌খিল্ করিয়া হাস্য করি পরে হর্ষানুভূতি লাভ করি···ইত্যাদি। তাঁহাদের দুইজনের মতে উদ্দীপকের হঠাৎ সম্মুখীন হইয়া সর্বপ্রথম মস্তিষ্কের চেষ্টাকেন্দ্র হইতে ত্বরিৎবেগে পেশীগুলিতে, গ্রন্থিগুলিতেও কণ্ডরাগুলিতে প্রয়োজনীয় চেষ্টাসমূহ উপস্থিত হয়, যেমন—আগে হাত তুলিয়া উদ্দীপনার পাত্রকে কিল-চড় মারা, তারপর ক্রোধরূপ সংক্ষোভের সমুদ্ভব; উদ্দীপনার পাত্রকে দেখিয়া আগে দুই চক্ষের কোল হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়া, তারপর দুঃখরূপ সংক্ষোভের উদয়। তাঁহারা উদ্দীপনার ফলে দৈহিক পরিবর্তনটাকে আগে আনিলেন, মানসিক পরিবর্তনকে পরে রাখিলেন—ঘোড়ার আগে গাড়িকে রাখার মত।

যাহা হউক, আমরা জেম্‌স্-ল্যাঙের মতবাদকে একপার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া, সংক্ষোভকে আর একটু ভালো করিয়া চিনিতে চেষ্টা করি। একটা উদ্দীপনার

সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের চেতনগত মনে যে আলোড়ন উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে যে সংবেদন ও শারীরিক চেষ্টার উদ্ভব হয়, তাহাকে সংক্ষোভ বলে—এ ধারণা আমরা ইতঃপূর্বে লাভ করিয়াছি। এখন ইহার সহিত আর একটু টীকা যোগ করা প্রয়োজন। প্রথম কথা হইল—সংক্ষোভের ফলে শরীরে যে প্রতিক্রিয়া বা পরিবর্তন হয়, তাহার অধিকাংশ হইল আভ্যন্তরিক এবং লোকচক্ষুর অগোচর, কিন্তু কতকটা বিষয়ীর অনুভবগম্য; যেমন, তাহার ভিতরকার হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, পাকস্থলী, যকৃত, ঘর্মগ্রন্থি, লালাগ্রন্থি, অধিবৃক্কীয় গ্রন্থি, শিরাধমনীর রক্তপ্রবাহের ক্রিয়াশীলতা বাড়ে বা কমে। আবার কতকগুলি শারীরিক পরিবর্তন বাহিরে প্রকাশ পায়—যেগুলি বিষয়ী নিজেও দেখিতে পায়, অপরেও দেখিতে পায়। দুঃখ বা শোকের সংক্ষোভে অশ্রু-নির্গমণ; ক্রোধের সংক্ষোভে দুই চক্ষুর বিস্ফারণ ও উজ্জ্বলতা-বৃদ্ধি, কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও তীব্রতা, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অব্যবস্থিত বিক্ষেপ; ভয়ের সংক্ষোভে ললাটে বা সর্বশরীরে ঘর্মনির্গমণ, চর্মের উপরিভাগে কণ্টকোদ্গম বা রোমাঞ্চ, পেশীসমূহের কম্পন; কান্তপ্রেমের সংক্ষোভে চক্ষের ঢুলু ঢুলু ভাব, গণ্ডে বা সারা মুখমণ্ডলে লালিমার সঞ্চার, সারা দেহে মৃদু প্রকম্পন, হৃৎস্পন্দন-বৃদ্ধি, সমগ্র জননযন্ত্রের পেশীগুলির টান্‌-টান অবস্থা···ইত্যাদি।

আর একটা কথা বলিলেই সংক্ষোভ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাদের একটা সার্বাঙ্গিক জ্ঞান হয়। সে কথাটি হইল এই যে, সংক্ষোভের একটা ফলশ্রুতি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয়। তাহা হইল—হয় একটা স্বাচ্ছন্দ্যের নয় একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি—যাহা বেশ কিছুক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে। কেহ কেহ সন্দেহ করেন, মস্তিষ্কের থ্যালামাস্‌ ও হাইপো-থ্যালামাস্‌ নামক যন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে সংক্ষোভের জন্য এক বা একাধিক পৃথক্‌ সংবেদন ও চেষ্টাকেন্দ্র আছে—যাহারা সম্পূর্ণভাবে মনের তাঁবেদার। যাহা হউক, এই সূত্রে একটা কথা স্মর্তব্য যে, সংক্ষোভজাত সমস্ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রতিক্রিয়াই সমব্যথী ও পরা-সমব্যথী নার্ভতন্ত্র-দ্বারা পরিচালিত হয়।

উদ্দীপনা ইন্দ্রিয়গোচর হইলে তবে সংক্ষোভের উদয় হইবে—এমন কোনো কথা নাই; পরিচিত উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতেও তাহাকে কল্পনা করিয়া বা

গভীরভাবে চিন্তা করিয়াও সংক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই চিন্তা সম্বন্ধে বিষয়ী সচেতন না-ও থাকিতে পারে। জীবিত বা মৃত কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর ফটো দেখিয়া বা টেপ্‌-রেকর্ডে তাহার গলার স্বর বা তাহার নামোল্লেখ শুনিয়া দুঃখের সংক্ষোভ উপস্থিত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কবিগুরু কোনো আত্মীয়গৃহে তাঁহার মৃতা প্রিয়তমার একখানি ধূলিমলিন অস্পষ্ট ফটো দেখিয়া সংক্ষুব্ধ হইয়াই "ছবি" নামক হৃদয়বিদ্রাবী সুদীর্ঘ কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন।

এইবার সংক্ষোভ সম্বন্ধে শেষ কথাটা বলিয়া লই। আপনাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, সংক্ষোভজনিত শারীরিক পরিবর্তনের কতকগুলি লক্ষণ শরীরের ভিতরে থাকে, কতকগুলি লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায়। ঐ লক্ষণগুলি যাহার যত বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহার সংক্ষোভ তত অধিক বা গভীর, এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। কারণ, কেহ কেহ প্রচুর প্রয়াসের দ্বারা লক্ষণগুলি চাপিয়া রাখিতে পারে। সুতরাং একটা সভাস্থলে বা রঙ্গমঞ্চে বা চিত্রাভিনয়ে কেহ রঙ্গরহস্যপূর্ণ কথা বলিলে বা অঙ্গভঙ্গী করিলে যে ব্যক্তি হো-হো করিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি খাইল না, সে নিতান্ত বেরসিক বলিয়া ভুল করিবেন না। সে হয়তো ঐ হাস্যকর কথা বা পরিস্থিতিটি অন্তরের গভীরে উপভোগ করিল। আপনারা বাস্তব জীবনে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, পুত্রশোকে কাতর হইয়া যে মাতা ক্রমাগত কয়দিন ধরিয়া দিবারাত্র উপবাস করিলেন, মাথা খোঁড়াখুড়ি করিলেন, কাঁদিয়া গগন বিদীর্ণ করিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি শোক ভুলিতে পারেন এবং দৈহিক ও মানসিকভাবে খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন না।

একটি ক্ষুদ্র ইংরাজি কবিতা বহুদিন ধরিয়া ম্যাট্রিকুলেশন ও স্কুল-ফাইন্যাল ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচিত ইংরাজি কবিতার পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাইয়াছিল। কবিতাটির শিরোনামা *Home They Brought Their Warrior Dead*; লেখক লর্ড টেনিসন্‌। কবিতাটির বিষয়বস্তু হইল এই।—

যুদ্ধহত তরুণবয়স্ক স্বামীকে তাহার গৃহে বহন করিয়া আনা হইয়াছে। স্ত্রী তাহার সম্মুখে পাথর-প্রতিমার মত নিশ্চল বসিয়া রহিল, স্বামীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বুকফাটা ক্রন্দনে ছটফট্‌ করিতে লাগিল না। প্রতিবেশী-

প্রতিবেশিনীরা আসিয়া কক্ষমধ্যে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহাদের অনেকেরই চোখে জল। আমাদের দেশে একটা প্রবচন আছে—"অল্প শোকে কাতর, বেশী শোকে পাথর"—ইহা তাই। প্রতিবেশিগণ পরিস্থিতিটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিবেচনা করিল যে, বধূটির এরূপ অবস্থা বেশীক্ষণ থাকিলে নিশ্চয়ই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু হইবে। এই সময় একটি নব্বই বৎসর-বয়স্কা দাই-মা—যে তাহাদের একমাত্র শিশুটির তত্ত্বাবধান করিত—সে উঠিয়া আসিয়া খোকাটিকে মাতার কোলের উপর নিঃশব্দে রাখিয়া দিল। তখনি বধূটি হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, শিশুটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "Child, I live for thee."···

সহজপ্রবৃত্তিগুলির প্রতিক্রিয়া যেরূপ চেষ্টা, শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়, সংক্ষোভগুলিকেও সেইরূপ করা সম্ভবপর। একটি শিশু যত বড় হয়, ততই সে তাহার স্বাভাবিক ক্রোধ, ভয়, ক্ষোভ, দুঃখ প্রভৃতি সংক্ষোভগুলি কোন্ পাত্রে বা কোন্ পরিস্থিতিতে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়, তাহা নিজে নিজে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অথবা শিক্ষক-অভিভাবকদের শাসনোপদেশ-মাধ্যমে শিক্ষা করে। যে শিশু একই কারণে গৃহে মাতার উপর রাগ করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া মাটিতে লুটোপুটি খায়, সেই শিশুই বিদ্যালয়ে গিয়া একই উদ্দীপনার উপস্থিতিতে চুপ করিয়া শান্ত শিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। আমাদের স্নেহ ও ভালবাসা বাল্য হইতে কত বস্তু ও ব্যক্তিতে বিভিন্ন মাত্রায় পরিবেশন করিতে হয়—তাহার ইয়ত্তা নাই। সারাজীবন ধরিয়া ঐ মাত্রার ইতরবিশেষ হইতেছে। আবার ভালবাসার পাত্র ও বস্তুকে মাঝে মাঝে পরিত্যাগ করিতেছি, ঘৃণার পাত্র ও বস্তুকে ভালবাসিতে শিখিতেছি।

তারপর আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয়। যখন সকারণে বা অকারণে একটি সংক্ষোভ প্রবল হইয়া কাহারো প্রতি প্রধাবিত হয়, তখন সেই সংক্ষোভের কতকাংশ বিষয়ীর অব্যবহিত পরিবেশের মধ্যে যাহারা থাকে, তাহাদের মধ্যেও স্থানান্তরিত হয়। ধরুন, একদিন সকালে কোনো উকিল ভদ্রলোক এক পুত্র, ভৃত্য, মিত্র বা কলত্রের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া খানিকটা চেঁচামেচি করিলেন। সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার মেজাজ খিঁচ্‌ড়াইয়া

রহিল। স্নান করিতে উঠিবার আগে অহেতুক তাঁহার একটি শাঁসালো মক্কেলকে খানিকটা কড়া কথা শুনাইলেন। আদালতে গিয়া একটি বন্ধু উকিলের সহিত কোনো আইনের ধারা লইয়া তর্ক করিতে করিতে তাঁহাকে বেশ কয়েকটি অপমানসূচক কথা শুনাইয়া দিলেন। শেষে হাকিমের সম্মুখে মেজাজ দেখাইতে গিয়া খানিকটা ধমক খাইলেন এবং সপ্রতিভ হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সন্ধ্যার পর ক্লাবে গিয়া তাস খেলিতে বসিয়া তিনি বারে বারে পিট্-ভুল করিতে লাগিলেন।···

প্রেমের সংক্ষোভে যে-লোক সদ্য সদ্য অভিভূত হয়, সে প্রেমের খানিকটা তাহার দয়িত হইতে অন্যান্য ব্যক্তি ও বস্তুতেও ছড়াইয়া দিতে পারে। তখন সে যাহার সংস্পর্শে আসে, তাহাকেই যেন প্রীতির চক্ষে দেখে।···একটি তিন-বৎসর-কাল বিবাহিতা তরুণী তাঁহার ডাক্তার স্বামীকে ভালবাসেন না, মনে মনে ঘৃণা করেন। পাশের বাড়িতে একটি নূতন ভাড়াটিয়া ভদ্রলোক আসিলেন, তিনিও বিবাহিত। রূপে গুণে পদমর্যাদায় তিনি তরুণীর স্বামী অপেক্ষা শ্রেয়ঃ নহেন, একটু উঁচু পদের কেরানি মাত্র। তথাপি তরুণীটি গোপনে তাঁহাকে ভাল-বাসিলেন। এই কেরানি ভদ্রলোকটি ঐ পিয়াসী নারীকে কান্তপ্রেমের যথার্থ স্বাদ প্রদান করিলেন। ইহার ফলে ব্যাপারটি কি হইল জানেন? এই অবৈধ-ভাবে চর্চিত ভালবাসার খানিকটা তিনি স্বামীর মধ্যে স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হইলেন। যে পতিকে নিত্য গালি না দিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না, তাঁহাকে তিনি নিজ হস্তে নানারূপ সুস্বাদু জলখাবার প্রস্তুত করিয়া খাইতে দেন, তাঁহাকে লইয়া থিএটার-সিনেমায় যান, তিনি অফিস হইতে আসিতে বিলম্ব করিলে বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছট্‌ফট করেন। ইহার মুখের জ্বালায় কোনো বাসন-মাজা ঠিকা-ঝি টিকিতে পারিত না। ইহার পর হইতে ঝিয়ের মুখে হাসি ফুটিল, পালে-পার্বণে সে টাকাটা-সিকিটা বক্‌শিশ পাইতে লাগিল। এই নাটকের পরিণাম হয়তো এমনও হইতে পারে যে, তরুণীটি একটু একটু করিয়া ঐ কেরানিবাবুর প্রতি সঞ্চালিত প্রেমের সমস্তটুকুই তাঁহার স্বামীর দিকে চালনা করিয়া দিলেন। তাঁহার নিকট তখন যেন একটা আলোক-পুলক-গীতি-গন্ধময় রহস্যলোকের দ্বার জীবনে সর্বপ্রথম উন্মুক্ত হইয়া গেল।

একজন প্রেমিককে সমস্ত জগৎ ভালবাসে—এ কথাটা যতখানি সত্য, একজন প্রেমিক সমস্ত জগৎকে ভালবাসে—এই বাক্যটি তাহার চেয়ে বৃহত্তর সত্য। এই সূত্রে কান্ত কবির ভগবদ্বিষয়ক গানের তিনটি চরণ মনে পড়িতেছে, যাহা প্রেমিকের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা কেহ যেদিন কাহাকেও হৃদয় ভরিয়া ভালবাসি,

'সেদিন যেন কে আঁখি-তারকায়
মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়,
সুন্দর ভব, সুন্দর সব, যেদিকে ফিরাই আঁখি।'...

সহজপ্রবৃত্তি ও সংক্ষোভজনিত কয়েকপ্রকার অস্বাভাবিকতা

এই সীমিতকলেবর গ্রন্থে মনের সর্বদিকের সর্ব রকমের অসুস্থতা ও অস্বাভাবিকতার নাম ও লক্ষণ সবিস্তারে দেওয়া সম্ভবপর নহে। প্রধান প্রধান গুটিকয়েককে শুধু স্পর্শ করিয়া যাইতেছি। অতঃপর এগুলিকে সংক্ষিপ্ততর না করিয়া উপায় নাই।

আহারজনিত নানাপ্রকার অস্বাভাবিকতা আমরা সুস্থ ব্যক্তির মধ্যেও অল্পবিস্তর দেখিতে পাই। এমন ব্যক্তি দেখা যায় যাহারা বৎসরের এক-একটি ঋতুতে অথবা গর্ভ প্রভৃতি বিশেষ অবস্থায় দিনের পর দিন কোনো খাদ্যই মুখে দিতে পারে না; কেহ বা খাদ্য মুখে লইয়া যথারীতি চর্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করিল কিন্তু পাকস্থলিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বমন হইয়া গেল। অথচ পাকস্থলীতে তাহাদের ব্যাধির কোনো চিহ্ন নাই। **অরুচি** (*Anorexia*) অথবা ক্ষুধার হ্রস্বতাই তাহাদের ব্যাধি।

আবার কাহারো কাহারো এত বেশী ক্ষুধাবোধ যে, তাহারা যখন যে খাদ্য হাতের কাছে পায়, তাহাই মুখে পুরে। মাত্রাধিক খাদ্যের প্রতি আসক্তির নামই **ঔদরিকতা** (*Bulimia*)। নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গিয়া তাহারা আহারে বসিয়া অন্য সকলের বিস্ময় উদ্রেক করে। খাদ্যের পশ্চাতে তাহারা নিজেরাও প্রচুর ব্যয় করে। কবিখ্যাতিমান আমার জনৈক প্রাক্তন সহপাঠী বন্ধু কোনো বিচারালয়ে একটি দায়িত্বমূলক পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একজন

প্রতিষ্ঠাবান ঔদরিক। গৃহে তাঁহার ঔদরিকতা-প্রবৃত্তি আশানুরূপভাবে মিটিত না বলিয়া তিনি অফিসে টিফিনের সময় এবং অফিস হইতে গৃহে ফিরিবার সময় উহা অবাধে মিটাইয়া লইতেন। আজিও জলযোগে তাঁহার প্রত্যহ ২৲ করিয়া ব্যয় হয়। আমাদের গৃহে একবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া তিনি ১৮।১৯ খানি লুচি, মালাইকারির পঁয়ত্রিশটির অধিক চিংড়ি মাছ, আটখানি রুই মাছের টুকরা, ছয়টি সন্দেশ এবং সম্ভবতঃ ২৭।২৮টি লেডিকেনি উদরসাৎ করেন অবলীলাক্রমে। ইহার উপর অন্যান্য ভোজ্যেরও সদ্ব্যবহার করিতে তিনি কার্পণ্য করেন নাই।

আবার এমন মানুষ দেখিবেন যাহাদের নানারূপ **কুখাদ্যে রুচি** (*parorexia*) থাকে। মাটির ড্যালা, খোলাম-কুচি, খড়িমাটি, ঘুঁটে, গোবর, পুকুরের পাঁক, কাঠকয়লা, ছাই, তামাক-পোড়া গুল, কাগজ, পেস্টবোর্ডের টুকরা, কাঁচা কুমড়াবীজ, চাউল প্রভৃতি অভোজ্য দ্রব্যের প্রতি কোনো কোনো ব্যক্তির স্থায়ী বা অস্থায়ী লোভ দেখা যায়। গর্ভাবস্থার শেষার্ধে কোনো কোনো স্ত্রীলোকের এইরূপ অস্বাভাবিক রুচি প্রকট হয়।

অহং-প্রবৃত্তিজনিত অনেক রকমের স্বভাববিরুদ্ধতা দেখা যায়। বহু স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষের উপর প্রভুত্ববিস্তারের একটি চমৎকার স্বভাবসিদ্ধ কৌশল দেখা যায় যাহাকে ঠিক অস্বাভাবিকতা বলা সঙ্গত হইবে না। এই গুণটিকে অ্যাড্‌লার বলিয়াছেন "winning by yielding"*; ইংরাজ সাহিত্যিকগণ বলেন "stooping to conquer"। অবনত হইয়া, অন্ততঃপক্ষে সংনমনীয়তার ভান করিয়াও, ধীরে ধীরে পুরুষের হৃদয়মন অধিকার করা বহু নারীর সহজপ্রবৃত্তিগত গুণ। কোনো কোনো প্রেমিক পুরুষের মধ্যেও এই গুণটি দেখিতে পাইবেন। শ্রীকৃষ্ণ "দেহি পদপল্লবমুদারং" বলিয়া রাধার অলক্তক-রাগরঞ্জিত শ্রীচরণকমল মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।

কোনো কোনো ছেলেমেয়ের মধ্যে ইচ্ছা করিয়া বা জেদ করিয়া দুষ্টুমি করার প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই দুষ্টুমির ভিতর দিয়া তাহারা গৃহে পিতামাতা-

* *The Neurotic Constitution*, Alfred Adler, (Gluck and Lind's trn. 1917)

ভ্রাতা-ভগ্নীদের ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চায়। শাস্তি পাইয়াও তাহাদের অহংপ্রবৃত্তি প্রসাদলাভ করে। "To excel by being the worst"—এই প্রবণতাটি অনেক প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও দেখা যায়। সামাজিক সদ্‌গুণের চর্চার দ্বারা তাহারা লোকের নিকট যখন আদর পায় না, তখন চুরি, জুয়াচুরি, মিথ্যা কথা, নৃশংসতা, রাহাজানি, গুণ্ডামি প্রভৃতি অপরাধ করিয়া নাম কিনিবার নেশায় মাতিয়া উঠে। অনেক সময় এক নারীকে বহুবার অথবা বহু নারীকে পর পর ধর্ষণ করিয়া, কোনো কোনো দুঃসাহসী লোক নিজেদের ও বন্ধুদের কাছে তাহাদের রমণক্ষমতার উৎকর্ষ প্রমাণ করিতে চায়। কোনো প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়া বা কোনো দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে খুন করিয়াও কেহ কেহ খ্যাতিমান হইতে ইচ্ছা করে।

এক-একজন লোককে দেখিবেন—তাহারা বাড়িতে স্ত্রীপুত্রকন্যাদের সহিত বেশী কথা বলে না। আফিসেও কাজের কথা ছাড়া কাহারো সহিত একটিও বাজে কথা বলে না। অফিসে বা পাড়ায় তাহাদের অকৃত্রিম বন্ধু বলিতে কেহ নাই। পার্কে গিয়া তাহারা একখানি বেঞ্চিতে একা চুপচাপ বসিয়া থাকে। কোনো ভদ্রলোক আসিয়া তাহাদের কাছে বসিলে পাছে তিনি তাহাদের সহিত যাচিয়া কথা বলেন এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ বেঞ্চি হইতে উঠিয়া আপন মনে বেড়াইয়া বেড়ায়। বাড়িতে অবসর-সময় তাহারা রেডিও খুলিয়া বসে, নতুবা একখানা খবরের কাগজ, মাসিক বা সাপ্তাহিক পড়িয়া অবসর-যাপন করে। স্ত্রীকে নিয়মিত সংসার-খরচ যোগায়, পুত্রকন্যাদের প্রতি নিক্তির ওজনে কর্তব্য-পালন করে, ক্বচিৎ তাহাদিগকে শাসন করে। নাতি-নাতিনী থাকিলে, তাহাদিগকে লইয়া পরিমিতভাবে কিছুক্ষণ হাসিঠাট্টা গল্পগুজব করিতে পারে। পারতপক্ষে কাহারো সহিত কথা-কাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটি করে না, কোনো ব্যাপারে সাধ করিয়া মাথা গলায় না। এই শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে যূথচরতা-প্রবৃত্তির মাত্রাল্পতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ইহারা ঘোর অসামাজিক।

অতিরিক্ত সঞ্চয়-প্রবৃত্তি ও অতিরিক্ত রকমের অমিতব্যয়িতা সহজপ্রবৃত্তিগত অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে পড়ে। শিশুদের ন্যায় কোনো কোনো বৃদ্ধেরও নিতান্ত তুচ্ছ অকেজো বাজে জিনিস জড়ো করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। এক অবস্থাপন্ন,

অশীতিপর বৃদ্ধ তাঁহার গৃহের ত্রিতলস্থ ক্ষুদ্র চিলাকোঠার মধ্যে একাকী থাকিতেন। তাঁহার ঘরখানি তিনি নিজে পরিষ্কার করিতেন; আত্মীয়স্বজন কাহাকেও তথায় প্রবেশ করিতে বা তাঁহার কোনো জিনিসে হাত দিতে দিতেন না তিনি। একদিন আহ্নিকে উপবিষ্ট অবস্থায় করোনারি থ্রম্‌বসিসে আক্রান্ত হইয়া তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন্। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ান্তে তাঁহার ঘরদ্বার পরিষ্কার করিবার সময় আত্মীয়গণ দেখিলেন, একটা টিনের সুটকেসের মধ্যে একখানি দামী শালের তলায় নানা আকারের প্রায় তিন শত কাগজের ঠোঙা, নানা দৈর্ঘ্যের অসংখ্য পাটের সুতালির টুক্‌রা, একগাদা ঝিনুকের বোতাম ও ব্যবহারাবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উড পেন্সিলের টুকরা সযত্নে সজ্জিত রহিয়াছে।...

সামান্য কারণে অতিরিক্ত ক্রোধ প্রকাশ এবং অসামান্য কারণে মোটেই ক্রোধ প্রকাশ না করা এই দুইটিই অস্বাভাবিকতার এলাকায় পড়ে। আবার এমন লোকও দেখা যায়, যাহারা একটি সংক্ষোভের অধীন হইয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না, এক সংক্ষোভ হইতে চট্ করিয়া অন্য সংক্ষোভে সংক্রমণ করে। আপনারা বোধ হয় এই ধরনের একটি পুরুষ বা স্ত্রীলোক সহজেই খুঁজিয়া পাইবেন। যদি না পান, তাহা হইলে আমি একটি পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ভদ্রলোকের সন্ধান দিতেছি।

একদিন ইঁহার সেবাপরায়ণা পত্নী একবেলা চায়ে চিনি দিতে (অথবা মাছের ঝোলে লবণ দিতে) ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া ভদ্রলোক রাগিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় গালাগালি করিলেন এবং আগামী কল্য হইতে হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া সদম্ভে শাসাইলেন। তারপর মিনিট দশেক যাইতে না যাইতেই যেন কিছুই হয় নাই এরূপ ভাব দেখাইয়া বেশ প্রফুল্লমুখে স্ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "দেখ পরি, কালকে আমি একটু সকাল-সকাল অফিস থেকে ফির্‌ব, বুঝলে? দু'খানা টিকিট কিনেছি। কাল সন্ধের শো'এ 'মাই ফেয়ার লেডি' দেখ্‌তে যাব। তুমি তাড়াতাড়ি কাপড় কেচে নিয়ে, পাঁচটা লাগাৎ রেডি হয়ে থেকো। কেমন?"

স্ত্রী ঘাড় নীচু করিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিলেন। কর্তা বিস্মিত অনুযোগের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী, কথা বল্‌ছ না যে?"

স্ত্রী গম্ভীর মুখে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি সিনেমা যাব না। তুমি গৌরবাবুকে নিয়ে যেও।"

কর্তা এই কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "তাহলে সত্যি বসছি আমি আজ থেকে বাড়িতে খাওয়া বন্ধ করে দিলুম। তুমি রেঁধে-বেড়ে নিজে খেও আর দেওরকে খাইও।"

রাত্রি সাড়ে-আটটা লাগাৎ কর্তা অভিমান করিয়া শুইয়া পড়িলেন। নয়টার সময় স্ত্রী আসিয়া হাত ধরিয়া ডাকিলেন, "ওগো, শুনছো? ওঠো, খাবে এস। কাল যাব সিনেমায়। তুমি ঠাকুরপোর সামনে আমায় যাচ্ছেতাই কল্লে আমার দুঃখ হয় না? আপিসে তোমার টাইপ্ কর্‌তে ভুল হয় না? নাও, এস।"

কর্তার চোখে জল। স্ত্রীকে বকিয়াছেন বলিয়া ও তাহার দুঃখ হইয়াছে শুনিয়া তিনি আত্মগ্লানিতে মর-মর হইলেন। পরমুহূর্তেই উঠিয়া, চোখের জল মুছিয়া হাফ্‌শার্টটা গায়ে দিয়া "আসছি এখুনি" বলিয়া ঘরের বাহিরে পা বাড়াইলেন। স্ত্রী ভয় পাইয়া গেলেন—সত্যই বুঝি উনি হোটেলে খাইতে যাইতেছেন! তাঁহাকে ধরিতে গেলে, তিনি স্ত্রীর হাত এড়াইয়া, 'যাব আর আসব' বলিয়া দ্রুতবেগে নামিয়া গেলেন। খানিকক্ষণ বাদে একটি আড়াইশো গ্রামের রাব্‌ড়ির ভাঁড় হাতে করিয়া হাসিমুখে ফিরিয়া আসিলেন।...

কর্তাগিন্নী দু'জনে মহানন্দে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিলেন। তারপর কর্তা পান চিবাইতে চিবাইতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেই হঠাৎ দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাঁহার নজর পড়িল—প্রায় পউনে-দশটা বাজে। তাঁহার ছোট ভাই সুসীম বি-এ পার্ট-টু অধ্যয়ন করিতেছে। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সে একটি টিউটোরিয়াল্ প্রতিষ্ঠানে পড়িতে যায়; ফিরিতে প্রায় সওয়া-নয় সাড়ে-নয়টা হয়। রবিবার ছাড়া অন্যান্য দিনই তাহার রাত্রির ভাত ঢাকা থাকে।

ঘড়িতে পউনে-দশটা দেখিয়া কর্তা অত্যন্ত চঞ্চল হইলেন; স্ত্রীকে উদ্বেগ-কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "হ্যাঁগো, সুসি আস্‌তে এত দেরি কর্‌ছে কেন? কোনদিন তো সে এত দেরি করে না, প্রায় দিনই সাড়ে-নটার আগেই ফেরে। তবে কি কোনো"—এই বলিতে বলিতে তিনি আল্‌না হইতে পাঞ্জাবিটা টানিয়া পরিতে উদ্যত হইলেন।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কোথায় যাচ্ছ?"

কর্তা অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বলিলেন, "যাই, একবার এভার-রেডি টিউটোরিয়াল্‌টায় গিয়ে ছেলেটার খোঁজ নিয়ে আসি। পথে-ঘাটে আজকাল যে-রকম অ্যাক্সিডেণ্ট হচ্ছে, তাতে কিছু কি বিশ্বাস আছে? ও ভারী অন্যমনস্ক। মা-বাপ-মরা ভাইটা আমার"—বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল, চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল।

গিন্নী তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে পালঙ্কের উপর জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া জামাটা কাড়িয়া লইলেন; বলিলেন, "কোথায় যাবে? স'নটায় টিউটোরিয়াল্ বন্ধ হয়ে যায়। এত ভাব্‌ছ কিসের জন্যে? কুড়ি বছরের ছেলে, একেবারে কচি খোকাটি নয়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো বন্ধুর সঙ্গে হয়তো গল্প কচ্ছে, নয়তো কেউ তাকে তাদের বাড়িতে টেনে নিয়ে গেছে। তুমি তো খবর রাখো না, এক-একদিন ও দশটায়ও ফেরে। দেখ না আর খানিকক্ষণ।"

কর্তা লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরিয়া সদর দরজার সম্মুখে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলেন।...

এই লোকটির প্রকৃতি এক কথায় কিভাবে প্রকাশ করিবেন?—সংক্ষোভ-প্রবণ, ইংরাজীতে যাহাকে বলে emotional। ইহারা একটার পর একটা রকমারি সংক্ষোভের ঢেউয়ের উপর দিয়া আজীবন ভাসিয়া চলে; সংক্ষোভ না হইলে ইহারা যেন বাঁচিতেই পারে না।...

ভয় মানুষের একটা আদিম ও জন্মগত সংক্ষোভ, তাহা আপনারা অবগত আছেন। কিন্তু সামান্য কারণে বা অকারণে ঘোরতর ভয়-কাতরতার সহিত উদ্বেগ, সন্দেহ, আত্মসঙ্কোচ, উদ্ভ্রান্ততা যখন দেখা দেয়, তখন তাহাকে ব্যাধির চৌহদ্দির মধ্যে না ফেলিয়া উপায় নাই। এইরূপ ভয়কে বাংলা মনোবিজ্ঞানিগণ বলেন **আতঙ্ক**। জলাতঙ্ক একটা বিশুদ্ধ দৈহিক ব্যাধি, উহাকে আমরা আলোচনার আমলে আনিব না। মনোগত আতঙ্ক যে কত রকমের আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রায় ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেকটির উদ্ভবের মৌলিক নিদান বাহির করিয়াছেন।

মাত্র তিন-চারিটি বিভিন্ন প্রকার আতঙ্কের নামোল্লেখ করিতেছি। *Acrophobia* হইল **উচ্চতাতঙ্ক**। কোনো পাহাড়পর্বত তো দূরের কথা,

তিন-চারি তলা বাড়ির উপরে, রেলস্টেশনের ওভারব্রিজের উপরে অথবা লিফ্‌টে উঠিতে এই শ্রেণীর ব্যাধিগ্রস্তরা ভয়ে মরে। মনোবীক্ষণিকগণ উঁচুতে উঠার ভয়ের মধ্যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের ও বিশেষ করিয়া পিতার প্রতি ভয় ও বিদ্বেষ লুক্কায়িত দেখিতে পাইয়াছেন। *Agoraphobia* হইল উন্মুক্ত স্থান, ভ্রমণোদ্যান, প্রান্তর, বড় বড় রাস্তা প্রভৃতিতে হাঁটা বা পার হওয়ার ভয়। *Claustrophobia* হইল কোনো বদ্ধস্থান বা দরজা-জানালা-বন্ধ-করা ঘরে যাইতে ও থাকিতে ত্রাসজনিত ঘোর অনিচ্ছা।

Misophobia হইল ধূলা, ময়লা ও তৎসংক্রান্ত সংক্রামী ব্যাধির আতঙ্ক। এই জাতীয় আতঙ্কের মধ্যে ভয় অপেক্ষা ঘৃণাভাবই বেশী থাকে। ধূলাতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তিগণ নিজেদের হাত-পা-মুখ অনবরত ধোয়, প্রতিদিন বার কয়েক করিয়া স্নান করে, কাপড় কাচে, ঘরের মেঝে দুই বেলা ঝাঁট দেয় ও ধোয়, ব্যবহারের বাসনপত্র বার বার নিজ হাতে পরিষ্কার করে। কয়েক বৎসর পরে ইহাদের হাতে পায়ে হাজা হয়; আঙুলগুলি বেঁকিয়া ধনুকাকার হইয়া যায়। রাস্তায় ইহারা পদমূলের কাপড় ঈষৎ তুলিয়া ডিঙ্গি মারিয়া চলে। আসলে ইহারা জলকে নিজের আত্মার চেয়েও বেশী ভালবাসে। কিন্তু কেন ভালবাসে, তাহার মনোবিজ্ঞানসম্মত কারণ আছে, তাহার আলোচনা এ পুস্তকে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। সর্বদেশে ধূলির আতঙ্ক ও শৌচ-বাতিক মেয়েদের মধ্যে অধিক হইতে দেখা যায়। এই দুইটি তাহাদের একাধিক আন্তরিক ব্যাধির প্রতীক ও লক্ষণ।

উপরোক্ত আতঙ্কগুলি ছাড়া আর বহু ধরনের আতঙ্ক আমরা জীবনপথে চলিতে চলিতে দেখিতে পাই। যেমন, অপরিচিত লোকের সম্মুখীন হওয়ার আতঙ্ক, জনতার মধ্যে যাওয়ার আতঙ্ক, নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক, রক্তের আতঙ্ক, অপরাধ করার আতঙ্ক, বিস্মৃত অতীতে কোনো অমার্জনীয় পাপ করার ও তাহার শাস্তি পাওয়ার অলীক আতঙ্ক···ইত্যাদি।

ক্রোধ ও প্রেমজনিত নানারূপ অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। এ পুস্তকে প্রথমটির সবিস্তার উল্লেখ করার স্থান-সংকুলান কোন মতেই হইবে না। প্রেম সম্বন্ধীয় কতকগুলি অস্বাভাবিকতার কথা আমরা বিস্তারিতভাবে দৃষ্টান্ত সহ

আলোচনা করিয়াছি আমাদের "বিয়ের আগে ও পরে", "ফ্রএডের ভালবাসা" ও "ফ্রএডের নারীচরিত্র" গ্রন্থত্রয়ে। প্রেমের রীতি, গতি, প্রকৃতি ও অনৈসর্গিকতা সম্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত আলোচনা বর্তমান পুস্তকের শেষভাগে প্রাসঙ্গিকভাবেই করিব এবং আমাদের সংগৃহীত কয়েকটি নূতন ও চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত অধ্যাহার করিয়া দিব।

দশম প্রসঙ্গ

স্মৃতি, প্রতিরূপ ও ভাবরূপ

স্মৃতি বলিতে কি বুঝায় তাহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু উহার সংজ্ঞার্থ একটি বাক্যে প্রকাশ করিতে আমরা অনেকেই বোধ হয় অশক্ত হই। অতীতকালে বস্তু, বিষয়, ব্যক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে লব্ধ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বর্তমান কালে পুনরনুভূতিকে **স্মৃতি** (Memory) বলে। আরো ছোট করিয়া বলিতে গেলে এইভাবে বলা যায় যে, পূর্বলব্ধ জ্ঞানকে যথাযথ সচেতন মনে আনয়নকেই স্মৃতি বলা হয়।

স্মৃতিকে আমরা চলিত কথায় বলি 'মনে রাখা' ; এবং 'স্মরণ' মানে—'মনে আনা'। কিন্তু এমন অনেক জিনিসই আছে যাহা আমরা অতীতে একাধিক বার দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, পড়িয়াছি, অথচ চট্ করিয়া তাহা মনে করিতে বা মনে আনিতে পারি না। তাহা হইলে তাহারা কি মন হইতে বাহির হইয়া যায়, না, মনের এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে কোনো অভিজ্ঞতার ছাপ গেলে তাহাকে আর চেতন মনে ফিরাইয়া আনা যায় না ?

স্মৃতির বাসস্থান

বহু পূর্বেই বলিয়াছি, মনকে দেশ বা স্থান দিয়া নির্ণয় বা পরিমাপ করা যায় না, কারণ উহা একটি অমূর্ত অসীমিত সত্তা। তথাপি মনের বিভিন্ন গুণ ও ক্রিয়া বুঝাইতে উহাকে একটি অবয়বযুক্ত বস্তু বলিয়া কল্পনা করা ছাড়া উপায় নাই। বাধ্য হইয়া আমাদিগকে বলিতে হইতেছে (ইতঃপূর্বেও একবার এইভাবে আমরা বলিয়াছি) যে, মনের তিনটি বিভাগ আছে :—একটি হইল সচেতন—যাহাকে লইয়া আমরা বহির্জগৎ ও দেহের অনেকাংশের সহিত কারবার করি। আর একটি অচেতন—যাহার মধ্যে মনুষ্যজাতির ও আমাদের পিতৃপুরুষের সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতার বীজ এবং আমাদের শৈশব ও বাল্যের সর্বপ্রকার অপূরিত কামনা কল্পনা চিন্তা ও সাধনার ছবি বিস্মৃত ও নিরুদ্ধ

অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা তাহাদিগকে ভুলিলেও তাহারা আমাদিগকে ভোলে না ; তাহারা আমাদের উত্তরকালীন জীবনের নানা কর্মে, চিন্তায় ও বাসনায় তাহাদের গোপন প্রভাবের ছোঁয়া দেয়। এই অচেতন মনের কথা ব্যাপকভাবে "ফ্রএডের ভালবাসা" নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে।

এই দুই বিভাগের মাঝখানে মনের আর একটি বিভাগ বা স্তর আছে যাহাকে বলা যায় অধিচেতন বা অধঃচেতন। অচেতন ও অধিচেতন মনোবিভাগকে একত্র মিলাইয়া এদেশে অধিকাংশ সাহিত্যিক—শুধু সাহিত্যিক কেন, কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকও—অবচেতন মন (sub-conscious) বলিয়া একটি জিনিস খাড়া করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ দুই বিভাগকে এক বলিয়া মনে করা ও প্রচার করা এবং উহাদিগকে বুঝাইতে 'অবচেতন' বলিয়া অভিধান-বহির্ভূত একটি শব্দ ব্যবহার করা ঘোর আপত্তিকর।

যাহা হউক, এই অধিচেতন মনোবিভাগটি হইল প্রধানতঃ আমাদের জীবনব্যাপী ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার, আমাদের স্মৃতির সুবিন্যস্ত দপ্তরখানা। আমাদের সকল জ্ঞানের ছবি এখানকার দেওয়ালে আর্ট-গ্যালারির মত টানানো আছে, সকল অভিজ্ঞতার ফাইল এখানকার র‍্যাকে-র‍্যাকে সাজানো আছে। যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাগুলি যত পুরাতন হয় এবং কম ব্যবহৃত হয়, সেগুলি তত তলায় চাপা পড়ে ; সেইজন্য সেগুলিকে সহজে সচেতন মনে টানিয়া আনা যায় না। অধিচেতনের উপর অচেতন ও সচেতন দুই বিভাগই কর্তৃত্ব করে।

এই স্মৃতির ভাণ্ডারে এক-একটি র‍্যাকে বা সেরেস্তায় এক-এক জাতীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মজুত করা থাকে। সেইজন্য স্মৃতিকে একবচনে ব্যবহার না করিয়া বহুবচনে ব্যবহার করাই সঙ্গত। শব্দসমূহের স্মৃতি, তারিখ ও সংখ্যা-সমূহের স্মৃতি, বস্তুরূপসমূহের স্মৃতি, প্রাণিরূপসমূহের স্মৃতি, প্রকৃতি-প্রয়োগের স্মৃতি, বিভিন্ন ক্রিয়া বা ঘটনাসমূহের স্মৃতি, শ্রুত, স্পৃষ্ট, আঘ্রাত, স্বাদিত, অধীত বিষয়ের স্মৃতি ইত্যাদি কত রকম-বেরকমের স্মৃতিই না আছে! সাধারণভাবে যাহাদের স্মৃতিশক্তি ভালো, তাহাদের একটি বিষয়ে খুব ভালো, কতকগুলি বিষয়ে মোটামুটি ভালো এবং কতকগুলি বিষয়ে মন্দ স্মৃতিশক্তি থাকিতে দেখা যায়। এক-একজন বিরাট প্রতিভাশালী মনীষী কোনো কোনো বিষয়ে

একেবারে 'ভোলানাথ', তাহা বোধ হয় আপনাদের অজানা নাই। বিদ্বানদের অন্যমনস্কতা সম্বন্ধেও বহু মজার মজার গল্প সকল দেশে পরিব্যাপ্ত আছে।

স্মৃতির চারি স্তর

যে-কোন একটি স্মৃতিকে পণ্ডিতেরা সচরাচর চারিটি স্তর বা পদ্ধতির মধ্য দিয়া যাইতে হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মতে, উহা পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়া আসিলে তবে স্মৃতিপদবাচ্য হয়। একে একে সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

(ক) কোনো বিষয়ের **সংবেদন, প্রত্যক্ষণ** ও তৎপ্রতি **অভিনিবেশ-স্থাপন**। এই অভিনিবেশটি চেতনের কেন্দ্রবিন্দুর দ্বারা অথবা তাহার পরিধি-সন্নিধান দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। যে বিষয়ে আমরা মনোযোগ দিই নাই অথচ তাহা স্মৃতিপথে উদিতে হইল দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, তাহা আসলে কিন্তু আমরা চেতনের পরিধি-সন্নিধান হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

(খ) কোন বিষয় ইচ্ছা, আগ্রহ বা **আসক্তির সহিত অভ্যাস** করণ, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ দেখিয়া, শুনিয়া, স্পর্শ, ঘ্রাণ প্রভৃতি লইয়া তাহার আকার, স্বরূপ, নাম প্রভৃতি অধিগত করণ। যে বিষয়ে কোনো ব্যক্তির কিছু আগ্রহ থাকে না, সে বিষয়ে সে কিছু শিখিতেও পারে না, মনে রাখিতেও পারে না। সেইজন্য আমরা ঔদাসীন্য বা উপেক্ষার সহিত যে সকল জ্ঞান লাভ করি, তাহা মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলিতে বা মনের উপর কোনো গভীর রেখাপাত করে না। কিন্তু অত্যন্ত আগ্রহের বস্তু একবার দেখিলে, অত্যন্ত শ্রুতিমধুর গান একবার শুনিলে, বহুদিন মনে থাকে। তাহা বহুবার দেখিয়া বা শুনিয়া শিক্ষা করিতে হয় না।

(গ) **সংরক্ষণ** (*Conservation*)। স্মরণীয় বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে চেতন মনে যে রেখাপাত হইল, তাহাকে মুছিতে না দেওয়া অর্থাৎ ধরিয়া রাখা। কোথায়? মহামস্তিষ্কের নিম্নতলে কোনোখানে, অধিচেতন মনের মহাফেজখানায়।

(ঘ) পূর্বজ্ঞানের **পুনর্জনন** (*Reproduction*)। একদা যে জ্ঞানের ছাপ পড়িয়াছিল মনে এবং যাহাকে সেখানকার একটি এলাকায় ধরিয়া রাখা

হইয়াছিল, তাহাকে সচেতনে পুনরুজ্জীবিত করা; অন্ধকারে যাহাকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল তাহাকে আলোকে টানিয়া আনা। সদ্য-সদ্য লব্ধ জ্ঞান না হইলে, এক-এক সময় পুনর্জনন বা পুনরুজ্জীবন ব্যাপারটি আপনা-আপনি ও ত্বরিৎ গতিতে হয় না; প্রায় ক্ষেত্রেই তজ্জন্য অল্পবিস্তর চেষ্টা করিতে হয় এবং আনুষঙ্গিক কোনো ভাবের সহায়তার প্রয়োজন হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা অনেক কিছুই মনে ধরিয়া রাখিতে পারি, কিন্তু তাহার সবটুকুই পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি না। আসলে আমরা যাহাকে ভুলিয়া যাওয়া বলি, তাহা হইল সংরক্ষিত বিষয়ের যাচিত অংশটুকুকে তৎক্ষণাৎ পুনরুজ্জীবিত করিতে না পারা। আমরা কোনো কোনো জিনিস চেষ্টা করিয়া মনে আনিতে পারি না, অথচ কিছুক্ষণ বা কয়েক ঘণ্টা বাদে তাহা আপনা-আপনি মনে পড়িয়া যায়। এই যে পুনরুজ্জীবন—ইহার মধ্যেও মস্তিষ্কের চেষ্টাকেন্দ্র ও তৎসংলগ্ন নার্ভতন্তুদের ভূমিকা রহিয়াছে। পুনরুজ্জীবনের অশক্ততার মূলে সম্ভবতঃ থাকে সিন্যাপ্সগুলির প্রতিবন্ধকতা। মস্তিষ্কের কোনরূপ জৈব অসুস্থতায়ও নার্ভতন্তু ও তাহাদের সিন্যাপ্সগুলির ক্রিয়াশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

(চ) পূর্বলব্ধ জ্ঞান বলিয়া **পরিচিতি** (Recognition)। ইহাতে মৌলিক বস্তু বা ঘটনাটির আকৃতি, পারম্পর্য, অনুষঙ্গী ভাব, অকুস্থল, সময় সম্বন্ধে পূর্বাপর জ্ঞানগুলি চেতন মনে ভাসিয়া উঠে এবং সেগুলি পরিচিত বলিয়া বোধ জন্মে। এই পরিচিতি-বোধের সহিত একটা সুখবোধ বা দুঃখবোধ প্রায় ক্ষেত্রেই সংলগ্ন থাকে। যে মৌলিক জ্ঞানে বা অভিজ্ঞতায় দুঃখানুভূতি হইয়াছিল, অল্পদিন পরেও তাহাকে যথাযথ পুনরুজ্জীবিত করা কষ্টকর হয়। যত দিন যায়, তত তাহার প্রাখর্য ও ঔজ্জ্বল্য কমিতে থাকে। বহুদিন পরে তাহা স্মরণে আনিতে গেলে, ঐ পূর্বজ্ঞানকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুষঙ্গী ভাব ও খুঁটিনাটি অংশগুলি সহ পুনর্জনিত করা যায় না; হারানো অংশগুলিকে অনেক সময় কল্পনা দিয়া পূরণ করিতে হয়।

কেন ভুলি, কেন ভুলি না

আমরা ভুলিয়া যাই কেন—এই প্রশ্নটি করা যত সহজ, উহার উত্তর দেওয়া তত সহজ নয়। ছোট করিয়া উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়—জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মনে গভীর রেখাপাত হয় না বলিয়া তাহা মন হইতে কালক্রমে মুছিয়া যায়। ভাল করিয়া রেখাপাত হয় না কেন, এই প্রশ্নের উত্তর হইল—জ্ঞেয় বস্তু বা বিষয়ে আমরা ভালো করিয়া মনোযোগ দিই না বলিয়া। তাহার পরের প্রশ্ন হইল—ভালো করিয়া মনোযোগ দিই না কেন? কারণ অনুভূত বস্তু বা বিষয়টি আমাদের ভালো লাগে না বলিয়া অথবা তাহাকে ভাল করিয়া অনুভব করিবার বা অভ্যাস করিবার সুযোগ পাই নাই বলিয়া। ইহা ব্যতীত বহু অপ্রীতিকর, অপরাধমূলক, দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আমরা কালক্রমে ভুলিয়া যাই, কারণ তাহাতে আমাদের চেতন মন ব্যথিত বা লজ্জিত হয়।

নিরাগ্রহমূলক বা নিরর্থক বস্তু বা বিষয়ও ক্রমাগত অনুভব করিলে, অভ্যাস করিলে অথবা আবৃত্তি করিলে, তাহার সংবেদন একই নার্ভতন্তুদের দ্বারা বারংবার যান্ত্রিকভাবে বাহিত হইয়া মস্তিষ্কের স্মৃতিকেন্দ্রে আসিয়া জড়ো হয় এবং মস্তিষ্ক প্রয়োজন-মত চেষ্টাবাহী নার্ভতন্তুদের দ্বারা তাহাকে যান্ত্রিকভাবে প্রায় যথাযথ পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিতে পারে—যদি অল্পদিনের মধ্যে সেই জ্ঞানটি পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন হয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ পুনরুজ্জীবনে এমন একটি অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায় যাহাতে গ্রামোফোন বা ফিতার রেকর্ডের মত দরকার হইলেই ঐ জ্ঞানকে চেতনে আনিয়া পুনরুজ্জীবিত করা যায়।

পোষা টীয়া পাখিদিগকে "রাধেকৃষ্ণ" "জয় সীতারাম" "হরি বলো মন" "ভজ রাধাগোবিন্দ" "ও মা কে এল দেখ" ইত্যাদি কত রকম বুলি বহুদিন চেষ্টা করিয়া ও অভ্যাস করাইয়া শেখানো হয়। উহারা ঐ সকল কথার অর্থও বুঝে না অথবা উহাদের মধ্যে কোনো রসকষও পায় না, তথাপি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা এইগুলি মনে রাখিতে পারে। কিন্তু কিছুদিন আবৃত্তি বন্ধ রাখিলে ইহারা কথাগুলির পুনর্জননে ভুল করে।

যাত্রাভিনয়-দলে বহু নিরক্ষর বা বর্ণবোধসম্পন্ন বালক শত শত কঠিন শব্দযুক্ত বাক্যাবলী ও সঙ্গীতরাজীর কথা ও সুর পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা মনে

গাঁথিয়া রাখিতে এবং তোতাপাখির মতই অনর্গল আবৃত্তি করিতে ও গাহিতে পারে। কিন্তু কিছুদিন আবৃত্তি বন্ধ থাকিলে, সংলাপগুলি যথাযথ পুনরুজ্জীবিত হয় না, কতকগুলি শব্দ ও বাক্য কিছুতেই স্মরণে আসে না। পুনরায় অল্প অভ্যাসেই সেগুলি পূর্ববৎ সজীব হয়। দীর্ঘকালীন অনভ্যাসের ফলে গানের সুরগুলি প্রায় যথাযথ মনে থাকে, কারণ তাহার মধ্যে আগ্রহাসক্তি থাকে এবং অর্থবোধের বালাই নাই, কিন্তু শব্দবিন্যাস ও ছত্রগুলি বিশৃঙ্খল বিচ্যুত হইয়া যায়।

স্মৃতির তারতম্য ও প্রকারভেদ

দৈহিক শক্তির মত স্মৃতিশক্তি সকলের সমান নয়—ইহা আমাদের জানা কথা। এক-একজনের এক-এক বিষয়ে স্মৃতিশক্তি বেশী, অন্য বিষয়ে স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত কম। কেহ কেহ বস্তু বা বিষয় ঠিক ঠিক মনে রাখে, কিন্তু তাহাদের নাম ভুলিয়া যায়। কেহ কেহ একটা ঘটনার ছবি প্রায় নির্ভুলভাবে বহুদিন পর্যন্ত স্মরণে রাখে, কিন্তু কবে বা কোথায় তাহা ঘটিয়াছিল, কিছুই মনে করিতে পারে না। একটি ছাত্র বা ছাত্রী কোনো সুদীর্ঘ কবিতা ৩।৪।৫ বার পড়িয়া শব্দের পর শব্দ, ছত্রের পর ছত্র, কমা-সেমিকোলন-দাঁড়ি সমেত আগাগোড়া মুখস্থ করিতে পারে। আর একজন ঠিক তত বারই পড়িয়া কবিতাটি নিখুঁতভাবে মুখস্থ করিতে পারে না বটে, কিন্তু এক-এক জায়গায় কোনো শব্দ ভুলিয়া গেলে তাহার একটা নির্ভুল প্রতিশব্দ বলিয়া দিতে এবং কবিতাটার পূর্বশ্রুত অর্থ আগাগোড়া পরিব্যক্ত করিতে পারে।

স্মৃতিশক্তি তিন রকমের আছে।—(ক) তাৎক্ষণিক স্মৃতি, (খ) সাম্প্রতিক স্মৃতি ও (গ) বিলম্বিত স্মৃতি। একই লোকের মধ্যে এক-একটি বিষয়ে বা ব্যাপারে এই তিন প্রকার স্মৃতিশক্তির বিদ্যমানতা দেখা যায়। আবার কোনো কোনো লোকের যে-কোনো দুই প্রকার স্মৃতি থাকিতে দেখা যায়। কয়েক সেকেণ্ড হইতে কয়েক মিনিট বা ঘণ্টাখানেক স্থায়ী কোনো বিষয়ের স্মৃতিকে বলে **তাৎক্ষণিক স্মৃতি** (Immediate memory)। কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক দিন বা বড় জোর এক মাস পর্যন্ত স্থায়ী স্মৃতিকে বলা হয় **সাম্প্রতিক স্মৃতি**

(Recent memory)। ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই পরীক্ষার পূর্বে এই শ্রেণীর স্মৃতির সহায়তা কামনা করে। দূর-অতীত হইতে নিকট-অতীতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা, দেখা-শোনা লোকের মুখ ও নাম, পরিদৃষ্ট স্থানের নাম, বাল্য-কৈশোরে শেখা কবিতা, শোনা উপদেশ বা গান প্রভৃতি মনে করিয়া রাখার ক্ষমতাকে বলে **বিলম্বিত স্মৃতি** (Remote memory)। বহু বৃদ্ধের এই শ্রেণীর স্মৃতি অত্যন্ত উজ্জ্বল থাকে।

স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোন্ বরাঙ্গজাতির স্মৃতিশক্তি গড়্পড়তা বেশী, সে সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় দুই জাতিরই স্মৃতিশক্তি সমান-সমান ; বরং চুল চিরিয়া বিচার করিলে মেয়েদের দিকের পাল্লা একটু বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে। বালক-বালিকা-কিশোর-কিশোরীদের স্মৃতিশক্তি প্রাপ্ত-বয়স্ক অপেক্ষা বেশী—এ কথা প্রমাণসিদ্ধ নয়। আসলে ঐ বয়সে তাহাদের শেখার আগ্রহ যেমন বেশী তেমনি শেখার প্রয়োজনীয়তাও বেশী থাকে, তদুপরি কাঁধের উপর পরীক্ষার চাপ থাকে, সেইজন্য তাহারা অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি শিখিতে চায় ও পারে। পঞ্চাশ বৎসরের পর হইতে স্মৃতিশক্তি একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে এবং সত্তরের পর স্মৃতিহীনতা যেমন স্পষ্ট তেমনি দ্রুত হয়। এই সময় পর পর তাৎক্ষণিক হইতে সাম্প্রতিক স্মৃতি রীতিমত অস্পষ্ট হইতে থাকে। তারপর মধ্যবয়স ও যৌবনের দেখা ব্যক্তি ও ঘটনা এবং শেখা বিষয়-গুলি বিচ্ছিন্নভাবে অনেকটা স্পষ্টভাবে মনে পড়ে। অবশেষে তাহাও কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া যায় ; তখন অস্তগামী স্মৃতি বাল্যের খেলাঘরে শেষ রশ্মিপাত করে

স্মৃতিঘটিত ব্যাধিসমূহ

স্মৃতিলোপ বা স্মৃতিভ্রংশকে মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায় **অস্মার** (*Amnesia*) বলা হয়। এই অস্মার উপসর্গও নানাপ্রকার হইতে দেখা যায়। কাহারো নাম ভুল হইতে, কাহারো সংখ্যা ভুল হইতে, কাহারো ধারণা ভুল হইতে, কাহারো ঘটনা ভুল হইতে থাকে। আর এক ধরণের অস্মার দেখা যায় যাহাতে বিষয়ী তাহার জীবনের কয়েক মাস বা কয়েক বৎসর-ব্যাপী সব কিছুরই স্মৃতি হারাইয়া ফেলে। আবার কেহ কেহ নিদারুণ মানসিক অভিঘাত বা মস্তিষ্কে

গুরুতর আঘাত পাইয়া একেবারে স্মৃতিহীন হইয়া পড়ে। এই ব্যাধি কচিৎ চিকিৎসা-সাধ্য হয়।

স্মৃতিঘটিত আর এক প্রকার ব্যাধি আছে, যাহার নাম **পরাস্মার** (*Paramnesia*)। সোজা ভাষায় ইহা হইল মিথ্যা স্মৃতি। যাহা সত্য-সত্যই ঘটে নাই, তাহাই ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করা। আসলে রোগী যে ঘটনা যে সময়ে ঘটিয়াছিল বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত মনে করিতেছে, সে সময়ে কোনো ঘটনাই ঘটে নাই ; বরং অন্য সময়ে ঐ ঘটনার প্রায় অনুরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল বটে। হয়তো ঘটনাসংশ্লিষ্ট লোকগুলিও অন্য। এইরূপ পরাস্মার-পীড়িত রোগী আদালতে সাক্ষ্য দিতে গেলে অনর্থ কাণ্ড বাঁধাইয়া বসে।

আর একপ্রকার চরম শ্রেণীর পরাস্মার দ্বারা কেহ কেহ আক্রান্ত হয়। ইহাতে রোগীর স্মৃতি এমন সব ঘটনা চেতনায় আনিয়া হাজির করে, যাহা কস্মিন্ কালে কখনই ঘটে নাই এবং ঐ ঘটনাসম্পৃক্ত ব্যক্তিগুলি সকলেই তাহার স্বকপোলকল্পিত। সে মিথ্যা কথা বানাইয়া বলে না, সে স্বপ্নকেও সত্য বলিয়া ভাবে না, স্মৃতি তাহাকে মিথ্যক সাজায়। হয়তো এই ঘটনাটি রোগী কোনো পুস্তকে পাঠ করিয়াছিল, হয়তো কবে কাহারো মুখে শুনিয়াছিল, হয়তো এইরূপ একটি কল্পনা সে নিজে রচনা করিয়া তাহার উপর কিছুদিন গভীর চিন্তা নিয়োগ করিয়াছিল।

সদ্য সদ্য এইরূপ পরাস্মারাক্রান্তা একটি কিশোরী কুমারী কোনো ছুটির দিন দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়া সন্ধ্যা লাগাৎ জাগিয়া, গা ধুইয়া চুল বাঁধিয়া, সন্ধ্যার পর ছাতে উঠিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় তাহার এক বান্ধবী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে নমিতা, সারা দিন কি কল্লি, শুধু খেলি আর ঘুমুলি ?"

অমিতা হাসিয়া বলিল, "তোর বুঝি তাই ধারণা, স্বাতী ? শোন্ কি কল্লুম সারাদিন। সকাল সাতটায় চা খেয়ে গৌরীদের বাড়ি গেলুম। গৌরী, তার স্বামী, গৌরীর ভাই অজয় আর আমি—এই চারজনে মিলে বেলা সাড়ে-এগারটা পর্যন্ত তাস খেলেছি। তারপর অবশ্যি বাড়ি এসে নেয়েছি, খেয়েছি, তারপর শুয়ে শুয়ে বিমলবাবুর একখানা উপন্যাস পড়েছি। আড়াইটের সময় যখন সবাই ঘুমিয়েছে, তখন আস্তে আস্তে উঠে, তাড়াতাড়ি একখানা ভালো

কাপড় পরে' বেরিয়ে পড়েছি। টালা পার্কে বিমলিনের সঙ্গে সাড়ে-তিনটের সময় দেখা করার কথা ছিল। একটা বেঞ্চিতে তার পাশে বসে' ঘণ্টা দুই গল্প করে' কাটিয়েছি। সাড়ে পাঁচটা লাগাৎ শ্যামবাজারের মোড়ে দু'জনে চা আর কষা মাংস খেয়েছি। ছ'টার সময় বাড়ি ফিরে মাকে বল্লুম—শর্মিষ্ঠাদের বাড়ি লজিক পড়তে গিয়েছিলুম। যাক্, তুই কথাটা যেন পাঁচ কান করিস্ নি।" নমিতার মিথ্যা বলার কোনো উদ্দেশ্য বা অভিলাষ ছিল না, দুপুরে শুইয়া শুইয়া সংঘটনগুলি সে কল্পনায় আঁকিতে আঁকিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মিথ্যাবাদী স্মৃতি পর পর সেই ঘটনাগুলিকে সাজাইয়া মুখ দিয়া সত্যবাণীরূপে প্রকাশ করিয়াছে।...

স্মৃতিজনিত আর এক জাতীয় উপসর্গ হইল **অতিস্মার** (*Hypermnesia*)। ইহাতে কোনো সুদূর অতীতে সংঘটিত একটি অথবা একাধিক ঘটনা পরম্পর্য রক্ষা করিয়া ও প্রত্যেক টুকরা টুকরা অংশ জুড়িয়া স্পষ্ট স্মরণে আনিতে ও বিবৃত করিতে পারা যায়। বিবরণ শুনিলে মনে হয় বর্ণনাকারী যেন ঘটনাটি মাত্র গতকল্য দেখিয়াছেন।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যাহারা নিজেদের সার্বাঙ্গিক স্মৃতিশক্তির উপর অত্যন্ত বিশ্বাস রাখে, তাহাদের স্মৃতি সকল সময় সকল ক্ষেত্রে অভ্রান্ত হয় না। এক-একটি বিষয়ে তাহাদের স্মৃতি স্বভাবতঃ ভালো কাজ করে, বাকি-গুলিতে করে না। গোড়া হইতে একটি ঘটনার সন্নিকটে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে পাঁচজন সংবাদদাতাকে রাখিয়া, ঘণ্টা খানেক বাদে তাঁহাদিগকে স্মৃতি হইতে ঘটনাটির একটি পূর্ণ বিবরণ লিখিতে বলা হইয়াছিল। পাঁচজনের বিবরণের মধ্যে স্থানে-স্থানে ঐক্য যেমন দেখা গেল, তেমনি অনৈক্যও পরিলক্ষিত হইল। এক-এক-জনের বিবরণে একটি-দুইটি করিয়া ক্ষুদ্রাংশ বাদ পড়িয়াছে, আবার যাহা ঘটে নাই এমন এক-একটি ক্ষুদ্রাংশ সংযোজিত হইয়াছে। ঘটনাসংশ্লিষ্ট লোকের সংখ্যা গণিতেও কেহ কেহ ভুল করিয়াছেন। কেহ-বা ভাষার ছটায় ও প্রকাশের কলাকৌশলে ঘটনাটির রূপ বেশ খানিকটা বদলাইয়া ফেলিয়াছেন। ঘটনাটি সম্বন্ধে ইঁহাদের কাহারো স্মৃতি ষোলো আনা নিছক সত্য বিবৃতি রচনা করিতে সাহায্য করে নাই।

তাহা হইলে বুঝিয়া দেখুন, সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে প্রত্যহ প্রাতে যে সকল ঘটনার প্রতিবেদন আমরা পাঠ করি, সেগুলি নির্জলা খাঁটি নয়, তাহাদের মধ্যে কিছু-না-কিছু ভুলচুক-বাদ-বাড়্তি আছে। বহু বিশ্বাসযোগ্য সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত সাক্ষী আদালতের কাঠগড়ায় সাক্ষ্য দিতে উঠিয়া নিজের নিজের অভিজ্ঞতার যে বিবরণ দিয়া থাকে, তাহা পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিহীন বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করা চলে না।

প্রতিরূপ কাহাকে বলে

প্রত্যেক মানুষ যখনি কোনো ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখনি সে ঐ জ্ঞানের একটা প্রতিরূপ (image) তাহার মনে আঁকিয়া লয়। অবশ্য এই অঙ্কন-ব্যাপারে বহুসংখ্যক সংবেদনগ্রাহী নার্ভতন্তু ও মস্তিষ্ক মনকে সাহায্য করে। ইহাদের সাহায্যেই মন যাহা কিছু বহির্জাগতিক জ্ঞান লাভ করে। ইহারা কোনো ভুল সংবাদ আনিলে মনকে প্রায় ক্ষেত্রে তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। মস্তিষ্কই বলুন আর মনই বলুন, প্রত্যেক জ্ঞানের একটি প্রতিরূপ তাহার মধ্যে ক্যামেরার ফিল্মের মত ধরিয়া রাখে। ফিল্ম না বলিয়া মাইক্রোফিল্ম বলিলে আরো শোভন হয়। এই প্রতিরূপগুলিই আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে। যখনি আমরা কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা স্মরণ করি, তখনই আমরা তাহার প্রতিরূপকে আমাদের মনের ঐ স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে টানিয়া আনিয়া পুনরুজ্জীবিত করি এবং পূর্বলব্ধ জ্ঞান বলিয়া চিনিতে পারি।

সকল জ্ঞানের কি ছবি আঁকা যায়? একটি মাত্র ছোট্ট কথায় ইহার উত্তর হইল—যায়। ছবি বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা একমাত্র চক্ষুগ্রাহ্য জ্ঞান সম্বন্ধেই ধারণা করা ও অঙ্কন করা সম্ভব—তাহা কাগজের উপরেই হোক, আর কাপড়ের উপরেই হোক্, দেওয়ালের উপরেই হোক্ বা মনের উপরেই হোক। কিন্তু মন-ক্যামেরা দিয়া অন্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানেরও ছবি তোলা যায়। স্মৃতির প্রথম ধাপ বা স্তরই হইল এই ছবি। সময়ের পৌর্বাপর্য, জ্ঞানের প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুসারে ছবিগুলি মনের মহাফেজখানায় স্তরে স্তরে পাশে পাশে সাজানো থাকে।

শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের ছবি বা প্রতিরূপ

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি স্মৃতির গুদামে চোরের সঙ্গে চোরের, সাধুর সঙ্গে সাধুর, পায়রার সঙ্গে পায়রার, বাজের সঙ্গে বাজের ছবি থাকে। তদুপরি, অনুষঙ্গী বা অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধযুক্ত ছবিগুলিও কাছাকাছি থাকে। যেমন, চেয়ারের ছবির কাছে টেবিলের ছবি, সিগারেটের ছবির কাছে দেশলাইয়ের ছবি, বরের ছবির কাছে বধূর ছবি, থালার ছবির কাছে বাটিগেলাসের ছবি, কাপড়ের ছবির কাছে জামার ছবি, ব্লাউজের ছবির নিকটে ব্রেসিয়ারের ছবি, দরজার ছবির নিকট জানালার ছবি, ডাক্তারের ছবির নিকট স্টেথস্কোপের ছবি, বইয়ের ছবির নিকট খাতার ছবি, খাতার ছবির নিকট ঝর্ণাকলমের ছবি, চিত্রকরের ছবির পাশে রঙ্‌তুলির ছবি, নারায়ণের ছবির পাশে লক্ষ্মীর ছবি, ঠাকুরমার ছবির পাশে জপমালার ছবি, মহিষের ছবির পাশে গরুর ছবি। আবার কর্পোরেশনের ছবির পাশে পর্বতপ্রমাণ জঞ্জালের ছবি, রেশনের চালের পাশে রকমারি কাঁকরের বস্তার ছবি, আবদুল্লার ছবির পাশে মৃদুলার ছবি···এইরূপ হাজার হাজার লাখ লাখ ছবি। একটাকে টানিলে ভাবানুসঙ্গের প্রসাদে পাশেরটা বা কাছেরটা আসিয়া পড়ে, যেরূপ কান টানিলে মাথা আগাইয়া আসে।

শব্দের, সুরের, স্বরেরও অবিকল ছবি বা রেকর্ড তোলা থাকে মনের ফিতায়। জীবনে অন্ততঃ কয়েক সহস্র না হোক্ কয়েক শত লোকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আমরা একাধিকবার আসি ; তন্মধ্যে অন্ততঃপক্ষে শতখানেক ব্যক্তির বিভিন্ন গলার স্বর বারবার শুনিয়া মনের পর্দায় উহার ছবি বা রেকর্ড উঠিয়া যায়। দুই মাস, চারি মাস, চারি বা চল্লিশ বৎসর পরে অদূরে সেই স্বর শুনিলেই আমরা ব্যক্তিটিকে চিনিতে পারি ; চোখে না দেখিয়াও তখনি তাহার নাম ও মুখ মনে পড়িয়া যায় উক্ত ভাবানুষঙ্গের কৃপায়।

একটা গান শুনিয়া যদি ভালো লাগে, তাহা হইলে মন তখনি তাহা যথাসাধ্য টেপ্‌ রেকর্ডে তুলিয়া লয়। সুর সম্বন্ধে যদি শ্রোতার পূর্ব হইতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকে, তাহা হইলে গানের ছত্রগুলি কিছু কিছু ভুলিয়া গেলেও সুরটি অবিকল তাহার মনে গাঁথা থাকে। ছত্রগুলি ভুলিয়া গেলেও কোনো ছত্রের যদি দুই-চারিটি শব্দ মনে থাকে, তাহা হইলে একটু প্রয়াসের দ্বারা প্রায় ক্ষেত্রেই

আনুষঙ্গিক শব্দগুলি মনে পড়িয়া যায়। উহার মধ্যে এক-আধটি শব্দ স্মরণে না আসিলেও, তৎস্থলে সুসঙ্গত এক-আধটি প্রতিশব্দ আসিয়া ছত্রটিকে বা ছত্রগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া দেয়।

বন্ধুবর কাজী নজরুলের গজল-ঢঙের একটি গান বোধ হয় ১৯২৫ কি ১৯২৬ সালে তাহার নিজের মুখে শুনিয়াছিলাম, তখন কাজী সম্ভবতঃ জেলিয়াটোলায় থাকিত। গানটির প্রথম ছত্র হইল—"ভুলি কেমনে, আজো যে মনে, বেদনা সনে, রহিল আঁকা।" দুইবার শুনিয়া গানটির প্রায় সব ছত্রই আমার মনের পর্দায় যথাযথ উঠিয়া গিয়াছিল। ইহার ১৯।২০ বৎসর পরে একবার বন্ধুমহলে ঐ গান গাহিব স্থির করিয়া গানটির আদ্যন্ত একবার নিজে নিজে আওড়াইতে গিয়া দেখি—উহার দ্বিতীয় ছত্র কিছুতেই পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিতেছি না। তখনি কাজীর গানের বই খুলিয়া দ্বিতীয় চরণটি দেখিয়া লইলাম।

এক বৎসর পূর্বের কথা। ১৯৪৫ সালের প্রথমে মরণাপন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া কয়েক দিন উপর্যুপরি যন্ত্রণায় অবিশ্রান্ত চীৎকার করার ফলে চিরদিনের মত আমার পূর্বতন নাতিপরুষ স্বর ও চলনসই সুর হারাই। তাহার পর হইতে ক্বচিৎ কখনো অবসর-সময়ে নিজে গাই, নিজে শুনি ; আপাততঃ কিছুদিন ধরিয়া ক্ষুদ্র-কলেবর নাতিনীটিকে মাঝে মাঝে শুনাইতেছি ও তালিম দিতেছি। গত বৎসর নাতিনীকে হঠাৎ কাজীর উপরোক্ত গানটি শুনাইতে গিয়া পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয় কলিটিকে আবার হারাইয়া ফেলিলাম। ইতোমধ্যে কাজীর সমস্ত বইগুলি বেহাত হইয়া গিয়াছে, কাজেই স্মৃতির দরজায় ধর্না দিতে হইল। কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় ছত্রের 'দিনরজনী' যৌগিক শব্দটি মনে আসিল। গুন্ গুন্ করিয়া সুর আওড়াইতে আওড়াইতে তাহার মধ্য দিয়া কিছুক্ষণ পরেই আমূল চরণটি পুনর্জীবিত হইয়া ধরা দিল—"আজো সজনী, দিনরজনী, সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা।"···

একটা এঞ্জিনের শিস্, একটা পিস্তল ছোড়ার আওয়াজ, একটা বোমা ফাটার শব্দ, কোকিলের তান, ঘুঘুর ডাক, ট্রাম গাড়ির ঠন্ ঠন্, পেয়ালার ঠুনঠুন্—সমস্ত শব্দই একাধিকবার শুনিয়া তাহার ছবিটি আমরা তুলিয়া লই।

ছবি অর্থ—টেপ্-রেকর্ড। গন্ধ, স্পর্শ, শৈত্যাতপ, গাত্রের উপর বিভিন্ন বস্তুর সঞ্চাপ, নানা ধরনের বেদনার সংবেদনও আমরা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখি। দরকার হইলেই তাহাদের ছবি আমরা পুনর্জনিত করিতে পারি এবং ঐ জাতীয় গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির সহিত বর্তমান কালে নূতন কোনো উদ্দীপক হইতে প্রাপ্ত ও অনুভূত গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির তুলনা করি।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে দুই বন্ধুকে লইয়া চৌরিঙ্গীর এক আধা-সাহেবী হোটেলে খানা খাইতে গিয়াছিলাম। ঐ সময় আমাদের টেবিলের পাশ দিয়া এক ইউরোপীয়া তরুণী তাহার স্বামী কিংবা প্রেমিকের বাহুলগ্ন হইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়াছিল। যাইবার সময় তাহার পোষাক হইতে একটি অননুভূতপূর্ব মোহাবেশমণ্ডিত গন্ধ ছড়াইয়া গিয়াছিল যাহা আমাদের তিন-জনকেই অল্পক্ষণের জন্য অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। আমার জানা-শোনা রকমারি এসেন্স্ বা আতরের কোনোটারই সহিত উহার সাদৃশ্য ছিল না। গৃহে ফিরিয়া সে রাত্রিতে তো বটেই, তাহার পর বহুরাত্রে সেই অপূর্ব সুরভি-হিল্লোল আমার নাসারন্ধ্রে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি এবং সেই গন্ধপরিবেশিকার দ্রুতসঞ্চারিণী দেহলতিকার প্রতিরূপ স্মরণে আনিয়াছি। তারপর সে কথা কবে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

কয়েক মাস পূর্বে দক্ষিণ কলিকাতার কোনো সঙ্গীত-সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে টেবিলের ধারে বসিয়া ভূরি জলযোগের নিমিত্ত আমরা জন পঞ্চাশেক ব্যক্তি আহূত হই। আমার পার্শ্বে একটি আসন খালি ছিল। আহারক্রিয়া আরম্ভ হইবার কিছুক্ষণ পরে ভারীরকম অনুলেপিতা, অতিশয় রুচিকর সাজে সজ্জিতা একটি ৩২।৩৩ বৎসর বয়স্কা পীনাঙ্গী গুজরাতী মহিলা আসিয়া "If you don't mind" বলিয়া আমার পাশের আসনটিতে বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শাড়ির আঁচল ভেদ করিয়া পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বেকার সেই ভুলিয়া-যাওয়া সুবাসের ঝলক আসিয়া আমার নাসিকায় লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই দয়িত-সহগামিনী চলচঞ্চলা মেমসাহেবার ক্ষণদৃষ্ট ছবিটি তাহার মৌলিক আলোছায়ার সুষমাসৃষ্ট হইয়া নয়নসম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।...

প্রতিরূপের ব্যাপকতা ও প্রকারভেদ

মহাকবি যে বলিয়াছেন—"হেথা সুখ গেলে স্মৃতি একাকিনী বসি' দীর্ঘশ্বাস ফেলে," সে কথা সত্য, কিন্তু ঐ দীর্ঘশ্বাসগুলি শূন্যে মিশাইবার জন্য নহে, সুখদায়ক ব্যক্তি বা বস্তুর মানসিক প্রতিরূপের পাদপীঠে ঐগুলি অর্ঘরূপে প্রদত্ত হয়। একটা আলপিনের বিঁধ, এক টুকরা মখমলের স্পর্শ, দূর অতীতে দিদিমার হাতে রাঁধা শুক্তানির স্বাদ, মায়ের হাতের গায়ে হাত-বুলানোর অনুভূতি, একদা বদরীনাথ হইতে মানা-গিরিসঙ্কটের দিকে যাওয়ার সময় পাঁচ-ছয় কিলো ওজনের এক্ চাংড়া জমাট-তুষার কাঁধের উপর ভাঙিয়া পড়ার বোধ প্রভৃতির একটা স্পষ্ট প্রতিরূপ বহুদিনাবধি আমাদের স্মৃতির তোষাখানায় সযত্নে সঞ্চিত থাকে। দরকার-মত সেগুলির কতকগুলি স্পষ্ট মনে পড়ে, কতকগুলি অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, কতকগুলি একেবারেই মনে পড়ে না।

বস্তু, ব্যক্তি ও দৃশ্যের যেরূপ প্রতিরূপ থাকে, স্বাদ, স্পর্শ, শ্রুতি, গন্ধজনিত-বোধের যেরূপ প্রতিরূপ থাকে, সেইরূপ শ্রুত বা পঠিত শব্দ ও বাক্যেরও প্রতি-রূপ থাকে। ঐগুলি স্মরণমাত্র হয় চোখের সামনে বইয়ের পৃষ্ঠার মত ভাসিয়া উঠে নতুবা গ্রামোফোনের পিন্ ছোঁয়ানো রেকর্ডের মত কানের কাছে বাজিয়া উঠে। অধ্যাসে এই সব প্রতিরূপ বিকৃত বা অতিরঞ্জিত হইয়া আমাদের প্রতীতির দ্বারে করাঘাত করে।

অতীতে অনুভূত জিনিসের প্রতিরূপের নাম **স্মৃতি-প্রতিরূপ** (memory image) এবং ভবিষ্যতে অননুভূত সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার প্রতিরূপের নাম **প্রত্যাশা-প্রতিরূপ** (anticipation image)। এই দুইটি ব্যতীত আর একপ্রকার প্রতিরূপও সৃষ্ট হইতে পারে, তাহার নাম **মুক্ত প্রতিরূপ** (free image)। ইহা চিন্তায়, কল্পনায়, বিচার-বিবেচনায়, জাগ্রৎস্বপ্নে, গবেষণায়, সমস্যাসম্পূরণ-প্রয়াসে ক্রমাগত বিগঠিত ও বিচূর্ণিত হইতে থাকে। ইহার সহিত স্মৃতি- ও প্রত্যাশা-প্রতিরূপ উভয়ই মিশ্রিত থাকে।

ভাব বা ভাবরূপের স্বরূপ

ভাব বা **ভাবরূপ** (Idea) কাহাকে বলে? ভাবরূপ ও প্রতিরূপের মধ্যে প্রতীয়মানতঃ পার্থক্য যৎসামান্য মনে হইলেও মূলতঃ পার্থক্যটা একটু বেশী রকমের। সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষণের যে পার্থক্য, প্রতিরূপের সহিত ভাবরূপের সেইরূপ পার্থক্য। ভাবরূপের মধ্যে সাধারণতঃ একাধিক প্রতিরূপের সংযোজন ও বিষয়ীর চিন্তার দ্বারা গঠিত একটি সুস্পষ্ট অর্থ থাকে এবং সচরাচর তাহা বর্তমানের পটভূমিকায় দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত থাকে। ভাবরূপকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আমরা শুধু ভাব বলি, কিন্তু কোনো ভাবই, স্পষ্টই হউক বা অস্পষ্টই হউক, একটা রূপ ছাড়া গঠিত হইতে পারে না।

ভাবের ব্যাখ্যাটি অধ্যাপক স্টাউট্ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাষায় সুপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"An idea can no more exist without an image than perception can exist without sensation. But the image is no more identical with the idea than sensation is identical with perception. The image is one constituent of the idea, the other and more important constituent is the meaning which the image conveys". *

বিশ্বকবির প্রতিরূপটি হইল কি রকম? তাঁহাকে জীবনে যদি কখনো দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে তাঁহার আলখাল্লা-পরিহিত দীর্ঘ অবয়বের স্মৃতি; যদি তাঁহার মুখের কথা বা গান শুনিয়া থাকি তো সেই কথা বা গানের স্মৃতি ...ইত্যাদি। তাঁহার কোনো ফটোগ্রাফ্ বা ক্যালেণ্ডারে মুদ্রিত ছবি যদি দেখিয়া থাকি, তাহারও প্রতিরূপ আমাদের মনে অঙ্কিত থাকে। এই প্রতিরূপ আমরা যখন স্মরণে আনি, তখন আধা-স্পষ্ট আধা-অস্পষ্ট রেখায় একটি রজতশুভ্র শ্মশ্রুকেশ, উন্নত নাসিকা ও উজ্জ্বল চক্ষু-সমন্বিত বৃদ্ধের ধারণা মাত্র আমাদের চৈতন্যের সভাতলে আনিয়া উপস্থিত করে। ধারণা যত স্পষ্টই হউক, তাহা কিন্তু ভাব নহে।

* G. F. Stout, *A Manual of Psychology*, (U. T. Press), p. 529.

ধারণা অপেক্ষা ভাবের মধ্যে কিছু গভীরতা আছে, অধিকতর স্থায়িত্ব আছে, স্পষ্টতা আছে, নামজ্ঞান আছে, অর্থবোধ আছে; এই অর্থবোধের সহিত খানিকটা চিন্তা ও বিচারবোধও জড়িত থাকে। তাহা হইলে বিশ্বকবির ভাবরূপটি কিরূপ হইবে? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গলাভ করিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহার রচিত গান শুনিয়া অথবা তাঁহার কাব্য-সাহিত্য কিছু-কিছু ও তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া আমার মনে যে ধারণা হইয়াছে এবং সেই ধারণার সহিত তাঁহার যে ছবিটি মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে (সেই ছবিটি রবীন্দ্রনাথের সজীব ও নিখুঁত প্রতিরূপ হইতে খানিকটা ভিন্ন ও অপরিস্ফুট হইলেও কিছু আসে-যায় না), সেই ধারণাযুক্ত ছবিটি হইল ভাবরূপ। এই প্রসঙ্গে আপনাদিগকে এইটুকু মনে রাখিতে বলি, প্রত্যেক ভাবরূপের মধ্যে প্রত্যক্ষণের ক্রিয়া আছে। প্রতিরূপেও প্রত্যক্ষণ আছে, কিন্তু তাহা ভাসা-ভাসা। প্রতিরূপ বাহির দেখে, ভাবরূপ বাহির ও ভিতর দুইই দেখে।

রবীন্দ্রনাথের মত আকৃতিযুক্ত যে-কোনো পক্কশ্মশ্রুমণ্ডিত ব্যক্তি হইতে আমাদের ভাবরূপ তাঁহাকে পৃথক করিয়া দেখে ও ভাবে। এই এক-একজন বিশেষ ব্যক্তি, এক-একটি বিশেষ পশু, পক্ষী, বস্তু, বিষয় প্রভৃতির স্পষ্ট ভাবরূপকে **বিশেষ ভাবরূপ** (specific idea) বা কখনো কখনো **প্রত্যয়** বা **ধ্রুবজ্ঞান** (concept) বলা হয়। বিশেষ ভাবরূপের লক্ষ্যবস্তুকে সেই জাতীয় অপর বস্তু হইতে আমরা পৃথক করিয়া চিনি, জানি ও মনের গ্যালারিতে তাহার ছবিখানি যত্ন ও বিশ্বাসের সহিত টানাইয়া রাখি। সাধারণ ভাবরূপটি হইল ধারণারই একটি সামান্য উন্নত সংস্করণ। ইহাতে একটি বস্তু, প্রাণী বা বিষয়কে দেখিয়া সেই জাতীয় রকমারি সমস্ত বস্তুর, প্রাণীর ও বিষয়ের একটা ধারণা বা ছবি চকিতে আমাদের মনে জাগাইয়া দেয়। কুকুর বলিতেই আমাদের দেখা ও জানা নানা শ্রেণী ও গণের অসংখ্য কুকুর জাতির একটা ছায়াচিত্র যেন মনের পর্দায় ঝলকিত হইয়া মিলাইয়া যায়। কিন্তু তাপসদের 'ক্রটাস্' নামক গোল্ডেন্ রিট্রীভার কুকুরটি—যাহাকে আমি ভালো করিয়া চিনি ও যাহার স্বভাবটি আমি ভালো করিয়া জানি, তাহার সম্বন্ধে আমার স্থায়ী সচিত্র ধারণাটি হইল বিশেষ ভাবরূপ, প্রত্যয় বা ধ্রুবজ্ঞান।

ভিতরে-বাহিরে রূপের ছড়াছড়ি

প্রত্যেক শব্দের এক-একটি রূপ আছে—সে শব্দ বিশেষ্যবাচকই হউক, বিশেষণবাচকই হউক বা ক্রিয়াবাচকই হউক। ত্রিভুজ বলিলেই তাহার একটি ছবি আমাদের চৈতন্যের প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখা দেয়। 'মধু' শব্দটি শুনিলেই হয় মৌচাকের মধুর একটা ছবি নহেতো যদুর ভাই মধুর প্রতিরূপ মনে জাগিতে পারে। মনীষী বলিলে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম ও তাঁহাদের প্রতিরূপ মনে আসে। যদি তাঁহার কোনো ফটো বা মুদ্রিত ছবি না-ও দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে একটা ছবি আমরা কল্পনায় আঁকিয়া লই। 'বেড়ানো' ক্রিয়াটি উচ্চারিত হইবামাত্র হয় যে-কোনো লোকের বেড়ানোর ছবি নতুবা অন্ততঃ একটা রাস্তায় কতকগুলি চলন্ত পায়ের ছবিও মনের পর্দায় ভাসিয়া উঠিবে।

কাজেই রূপ ছাড়া আমাদের এক পা-ও চলিবার উপায় নাই। আমাদের বাহিরে যেমন রূপের মেলা, ভিতরে সেইরূপ রূপের খেলা। রূপের সাগরে আমরা মীনের ন্যায় ডুবিয়া আছি। আমাদের ধ্যান-ধারণা ও সবিকল্প সমাধির মধ্যে একটা মূর্তিকে অবলম্বন করিতেই হয়। নিরাকার বা অমূর্ত শক্তির উপাসনা করিতে বসিয়া যে-কোনো ভক্তেরই মানসচক্ষে একটা পরিচিত বা অপরিচিত রূপ বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্ত্বেও আসিয়া উপস্থিত হইবেই। নতুবা কাহারো মুখ, কাহারো হাত, কাহারো পদ অথবা অন্য কোনো প্রত্যক্ষিত বস্তু বার বার দেখা দেয় ও মিলাইয়া যায়। শূন্যকে চিন্তা করা যায় না, কল্পনায় আনা যায় না। আকাশকে মহাশূন্য বলা হয়, কিন্তু তাহারও একটা রূপ আছে, রঙ আছে, মহাশক্তিশালী একটা দূরবিনের নিকটও তাহার একটা তথাকথিত সীমারেখা আছে।

অরূপেরও রূপ আছে—যে রূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, মনোগ্রাহ্য ও ধ্যানগ্রাহ্য নয়। ঋষিগণ ভগবানকে রূপহীন গুণহীন অব্যয় অচিন্ত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াও যখন তাঁহাকে নানা নামে ভূষিত করিয়া যাগ-যজ্ঞ-হোম-বলি-মন্ত্রের মধ্য দিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে অর্ঘ প্রেরণ করিতেছিলেন, তখনও তাঁহাকে

এক বিরাট পুরুষরূপে কল্পনা করিতে তাঁহারা বারংবার প্রলুব্ধ হইতেছিলেন। ঋক্‌বেদের একটি মন্ত্র এখনো আমরা নিত্য পূজাপার্বণে শুনিতে পাই—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।"

—ভগবান যেরূপ আকাশে অসংখ্য চক্ষু মেলিয়া তাঁহার সৃষ্টিকে প্রতিনিয়ত দেখেন, জ্ঞানিগণ সেইরূপ ভগবানের পরমপদ সর্বদা দর্শন করেন।...এখানে দেখুন, ভগবানের একটি বিরাট দেহ, তাঁহার চক্ষু ও তাঁহার চরণ কল্পনা করা হইয়াছে। আবার, ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী যিনি পরমেশ্বরের নিকট অমৃত প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" এখানেও সেই গুণহীন মহেশের প্রসন্ন মুখ মনে মনে চিন্তা করা হইয়াছে।

কবিগুরু ব্রহ্মবাদী ছিলেন, কিন্তু ভাবরূপ ও রূপকল্পের যুগ্মমৃণালকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার অলৌকিক কাব্যপ্রতিভার কুবলয় সহস্র দল মেলিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সহস্রাধিক ভক্তিমূলক গানের মধ্যে আপনারা মূর্তিপূজার নীরাজন প্রত্যক্ষ করিবেন, নতুবা তাহার আভাস পাইবেন। তাঁহার গীতাঞ্জলির প্রথম গানের প্রথম চরণই হইল—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।"...

আর একটি সঙ্গীতে তিনি রূপের চরম পূজারী হইয়া গাহিয়াছেন—

"তাইতো তুমি রাজার রাজা হয়ে
প্রভু আমার লাগি'
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে,
তুমি নিত্য আছ জাগি'।
তাইতো প্রভু হেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
হেথা নিত্য বিরাজিছে॥"

ভরা যৌবনে এক জায়গায় কবি বলিয়াছেন ("সমালোচনা," রঃ রঃ, ২য়, পৃ. ৫৯), "প্রত্যক্ষকে দেখিয়া অপ্রত্যক্ষকে মনে আনাই পৌত্তলিকতা। জগৎকে দেখিয়া জগতাতীতকে মনে আনা পৌত্তলিকতা। একখানা চিঠি দেখিয়া যদি আমার অতীত কালের কথা মনে পড়ে, তবে তাহা পৌত্তলিকতা নহে তো কি? ঐ চিঠিটুকু আমার অতীত কালের প্রতিমা।"...কবিমাত্রেই শুধু কল্পনাপ্রবণ নহেন, ধর্মবিশ্বাসে নিরাকার ঈশ্বরবাদী বা শূন্যবাদী হইয়াও পরম পৌত্তলিক। বিশ্বকবি এই নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন না।

ভাবানুষঙ্গ

প্রত্যেক ভাবরূপের সহিত অন্য ভাবরূপের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে অর্থাৎ তাহার বহু অনুষঙ্গ আছে। এই অনুষঙ্গ সম্বন্ধে আপনাদিগকে ইতঃপূর্বেই (১৪৩-৪৪ ও ২১২ পৃষ্ঠায়) কিছু বলিয়াছি। একটি দ্রব্য দেখিলে, আর একটি আনুষঙ্গিক দ্রব্য অনুপস্থিত থাকিলেও তাহার কথা স্বতঃই মনে পড়িয়া যায়। একটি ফুলের গন্ধ নাসিকায় আসিলে, সেই ফুলটির নাম ও রূপ মনে পড়িয়া যায়। একটি ভাব মনে আসিলে আর একটি বা একাধিক ভাব যাহা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল বর্তমানে নাই, তাহার বা তাহাদের কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে ভাসিয়া উঠে। কোন্ ভাবটি অনুষঙ্গী হিসাবে আসিবে, তাহা বিষয়ীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তাৎকালিক মানসিক অবস্থার উপর বহু ক্ষেত্রে নির্ভর করে। একটি বালকের ভাবরূপ মনে আসিলে, একটি বালিকাকে যদি কিছুক্ষণ পূর্বে তাহার সহিত মিশিতে দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে অনুষঙ্গী ভাব হিসাবে একটি বালিকার ছবিই মনে আসিবে। কিন্তু একটি বালককে যদি কিছুদিন পূর্বে লুকাইয়া সিগারেট খাইতে দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে সিগারেটের ভাবরূপই প্রকটিত হইবে।

পল্লীগ্রামে এক মহিলা এক গ্রীষ্মের দুপুরে তাঁহাদের ভাঁড়ার-ঘরে কুঁজায় জল গড়াইতে গিয়া দেখিলেন, একটি ঢোঁড়া সাপ কুঁজার শীতল গাত্র জড়াইয়া মুখটি কাঁধের কাছে রাখিয়া চুপ্‌চাপ পড়িয়া আছে। হাঁউ-মাঁউ করিয়া তিনি পলাইয়া আসিলেন। পরে বাড়ির ছেলেরা আসিয়া সেই ঢোঁড়া সাপটিকে মারিল এবং

কুঁজাটিও ভাঙিয়া চুরমার করিল। অতঃপর একটি কলসী কিনিয়া জল ভরিয়া ঘরের অন্য স্থানে রাখা হইল। কিন্তু যখনই তিনি প্রতিবেশীদের গৃহে গিয়া কুঁজা দেখেন, তখনি তাঁহার নিজের গৃহের কুঁজাটির কথা, সাপের কথা, তাহাকে বধ করা ও কুঁজাটির চূর্ণ হওয়ার দৃশ্য মনে পড়িয়া যায়।

ব্যক্তিবিশেষের কোকিল পাখির ভাবরূপ মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর আমগাছের পত্রাড়ালে তাহার মুহুর্মুহু ডাকের কথা মনে পড়ে; নতুবা শহরের কোনো ধনী গৃহস্থ-বাড়িতে দৃষ্ট পিঞ্জরাবদ্ধ এক মরণাপন্ন কোকিলের ছবি মনে জাগে; নতুবা কোকিল সম্বন্ধে যে ইংরাজী কবিতাটি বিষয়ী সদ্য পাঠ করিয়াছেন তাহার দুই-চারি ছত্র স্মরণে আসে। অথবা, রবীন্দ্রনাথের 'কোকিল' কবিতার প্রথম চারিটি চরণের প্রতিরূপ মনে ভাসিয়া উঠে—

আজ বিকালে কোকিল ডাকে শুনে মনে লাগে
বাংলাদেশে ছিলেম যেন তিন-শো বছর আগে।
সেদিনের সে স্নিগ্ধ গভীর গ্রাম্য পথের মায়া
আমার চোখে ফেলেছে আজ অশ্রুজলের ছায়া।

উদ্দীপক শব্দাবলী ও ভাবানুষঙ্গ

ভাবানুষঙ্গের দ্বারা বহু বিস্মৃত শব্দ, বিষয়, ব্যক্তির নাম বা ঘটনার কথা স্মরণপথে উদিত হয়। অস্মার বা কোনো মানসিক ব্যাধিতে যাহারা আক্রান্ত, তাহাদিগকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন আপাতঃ-অর্থহীন শব্দ একে একে শোনাইয়া, রোগীদিগকে বলা হয় এক-একটি শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি ঐ শব্দসংস্পৃক্ত একটা ছোট্ট উত্তর দিতে। সুস্থ ব্যক্তিগণ শব্দগুলি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শব্দসংশ্লিষ্ট এক-একটা স্বভাবসঙ্গত উত্তর দেয়। কিন্তু ব্যাধিগ্রস্তগণ এক-একটি শব্দের উত্তর দিতে বিলম্ব করে, নতুবা উত্তর খুঁজিয়া পায় না; হয়তো গলা-খাঁকারি দেয়, তোৎলামো করে, কাঁদে, হাসে, রাগ করে, নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করে কিংবা একটা অদ্ভুত বিসদৃশ ধরণের জবাব দেয়। অথবা কোনো একটি শব্দ শুনিয়া অনর্গল বিশেষণবহুল বক্তৃতা সুরু করিয়া দেয়। উত্তরের ভাবভঙ্গী হইতে মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসক রোগের প্রকৃতি ও নিদান বাহির করিবার একটা পন্থা পান।

ডাঃ য়ুং বহুদিন পূর্বে পৃথগ্‌ভাবে এবং কেণ্ট্‌ ও রোজানফ্‌ পৃথগ্‌ভাবে এক শত করিয়া শব্দের এক-একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দুইটি তালিকার মধ্যেই গড়পড়তা মানুষের অতি-পরিচিত ভাবোদ্দীপক শব্দসমূহ স্থান পাইয়াছিল। অবশ্য রোগীর বিশেষ পরিবেশ-সংক্রান্ত কতকগুলি শব্দ চিকিৎসক প্রয়োজনমত ঐ তালিকায় সংযোজন করিয়া দিতে পারেন। এই সমস্ত শব্দগুলিকে বলা হয় **উদ্দীপক শব্দাবলী** (stimulus words)। শব্দগুলি শুনিয়া বিভিন্ন সুস্থ ও অসুস্থ ব্যক্তির বিচিত্র ধরণের উত্তর-দান যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই জ্ঞানসঞ্চারক।

আর এক রকম পদ্ধতি আছে যাহাতে রোগীকে চিকিৎসক একটি নির্জন মৃদু-আলোকিত কক্ষে অত্যন্ত আরামজনক ভঙ্গীতে বসাইয়া, তাহাকে কিছু ভাবিতে-চিন্তিতে না দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মনে যাহা উড়িয়া আসে তাহা ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করেন। তারপর সেই স্বতরুচ্চারিত বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দ ঘেরিয়া তাহার যে ভাবরূপের উদয় হয়, তাহা ব্যক্ত করিতে চিকিৎসক আদেশ দেন। সেই উত্তরগুলির মধ্য হইতে রোগীর অচেতন মনে নিরুদ্ধ দুর্জ্ঞেয় এষণাগুলি (Complexes) ও রোগের আমূল ইতিহাসটি টানিয়া বাহির করা যায়। এই পরীক্ষা-পদ্ধতির নাম **অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি** (Free Association Method).

রূপজ্ঞানে অস্বাভাবিকতা

প্রতিরূপ ও ভাবরূপ সম্বন্ধে নানারূপ অস্বাভাবিকতা আমরা দেখিতে পাই। আপনারা জানিয়াছেন যে, প্রতিরূপ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অবশ্য দৃষ্টিজাতই হয়, কিন্তু উহা শ্রুতিজাত, ঘ্রাণজাত, স্পর্শজাত, স্বাদজাতও হইতে পারে। এক-এক জনের এক-এক ইন্দ্রিয়জনিত প্রতিরূপ গ্রহণের ও রক্ষণের ক্ষমতা অসাধারণ রকমের প্রখর, আবার বাকি ইন্দ্রিয়গুলির প্রতিরূপ-গ্রহণশক্তি অতিশয় দুর্বল।

আবার এক-এক জনের এক শ্রেণীর বা এক ধরণের বিশিষ্ট প্রতিরূপ গ্রহণের সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিদৃষ্ট হয়। কেহ কেহ কিছুক্ষণ পূর্বে দৃষ্ট অথবা চিন্তাপ্রসূত কোনো অদৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তির প্রতিরূপ তাহার স্থূল চক্ষুর সম্মুখে

এরূপভাবে প্রতিক্ষিপ্ত করিতে পারে যাহাতে তাহার নিজেরই ধারণা হয় উহা বুঝি সত্য; কিন্তু একটু পরেই অবশ্য তাহা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারে। উজ্জ্বল আলোকেও এই প্রতিরূপ বা ভাবরূপ প্রায়ক্ষেত্রেই ত্রিমাত্রাসমন্বিত (three-dimension) ও অত্যন্ত স্পষ্ট হয় এবং বাস্তব সামগ্রীর ন্যায়ই ইহা পিছনের বস্তুগুলিকে ঢাকিয়া দেয়। এইরূপ প্রতিরূপের নাম দেওয়া হইয়াছে "Eidetic imagery"।* এই শ্রেণীর প্রতিরূপ সাধারণ প্রতিরূপ ও মায়ার মাঝামাঝি একটা অবস্থা। আইডেটিক্‌ প্রতিরূপ মায়ার মত নড়ে-চড়ে না, ক্বচিৎ কথা বলে, বিষয়ীকে স্পর্শ করে না, অভিভূত করে না; ইহা যেন তাহার কিছুটা প্রত্যাশিত।

বহু উচ্চশ্রেণীর কবিদের এইরূপ আইডেটিক্‌ প্রতিরূপ দর্শনের অভ্যাস থাকে। রাজা বিক্রমাদিত্যের তাল-বেতালের মত অথবা আলাদিনের জাদু-করা প্রদীপ-আনীত দৈত্যের মত এই সকল প্রতিরূপ আহ্বানমাত্র বা ইচ্ছামাত্র যেন তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। কবি গ্যেটের এইরূপ প্রতিরূপ-সৃজনের ক্ষমতা ছিল। মায়া সাধারণতঃ অপ্রত্যাশিত ও অনিচ্ছাকৃত হয়। যেমন, বুদ্ধদেব তপশ্চর্যাকালে নীরঞ্জনা-তীরে গজারূঢ় মারের মায়ামূর্তি দেখিয়াছিলেন; মার্টিন লুথার মায়া-শয়তানকে দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার প্রতি কালির বোতল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

---

* "An Experimental Study of the Eidetic Type". *Genetic Psychology Monographs*, Vol. I. No 2 (1926).

একাদশ প্রসঙ্গ

কল্পনা ও চিন্তা

এই গ্রন্থের গোড়ার দিকে মনের স্বভাবজাত দুইটি গুণের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। সে দুইটি হইল কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তি। মনে হয়—এই দুইটি শক্তিই মানুষকে উচ্চতর পশু হইতে উন্নততর করিয়া রাখিয়াছে। কোনো কোনো উচ্চতর প্রাণীর একটা অস্ফুট বা অর্ধস্ফুট মন আছে তাহার অবিসংবাদিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একদল পণ্ডিত তাহাদের মনস্তত্ত্ব লইয়া যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ও কয়েকখানি পুস্তকও লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনো পণ্ডিত নিষ্পুচ্ছ বানরদের (anthropoid apes) কয়েক জাতির মধ্যে মননের কিছু আভাস পাইয়াছেন, কিন্তু কেহ কোন জন্তুর মধ্যেই কল্পনাশক্তির চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পান নাই।

কল্পনা ও চিন্তা হইল পিঠোপিঠি সহোদর ভাই। ভাই না বলিয়া ভগ্নী বলাই সঙ্গত, কারণ এই দুইটি শব্দই স্ত্রীলিঙ্গ। কল্পনা ও চিন্তা উভয়েই পূর্ব অভিজ্ঞতা, স্মৃতি এবং ভাবানুষঙ্গের উপর অল্পবিস্তর নির্ভরশীল। কিন্তু ডাঃ য়ুং কল্পনাকে বলিয়াছেন একটা অনির্দেশিত, উদ্দেশ্যহীন, পথহারা, চেষ্টাবেদনের অনুভূতিশূন্য, নিরর্গল চিন্তা।* কিন্তু অন্যান্য কয়েকজন মনোবিদের সহিত আমাদেরও অভিমত এই যে, কল্পনার মধ্যেও অনেক সময় জ্ঞানে বা অজ্ঞানে একটা উদ্দেশ্য থাকে, একটা-কিছু অনুভব থাকে—তাহা অনেক সময়েই সুখের, ক্বচিৎ দুঃখের।

কল্পনা কাহাকে বলে

অষ্টম প্রসঙ্গে আপনাদিগকে চৈতন্যের তিনটি গুণের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই স্মরণে রাখিয়াছেন। 'চৈতন্যের গুণ' মানে চৈতন্যগত মনের গুণ। চৈতন্যগত মনের আরো দুইটি প্রধান গুণ এবার প্রাসঙ্গিকভাবে সংযোজিত

* C. G. Jung, *Psychology of the Unconscious*, Ch. I.

করিতেছি; তাহা হইল কল্পনা ও চিন্তাশক্তি। তাহা হইলে আপনারা চেতন মনের পাঁচটি গুণের খবর পাইলেন এবং এই পাঁচটিকেই দয়া করিয়া আপন-আপন মনের কোণে ঠাঁই দিবেন। এখন কল্পনা জিনিসটির কিছু পরিচয় দেওয়া যাক্।

কল্পনা হইল মানুষের একপ্রকার ভাবরূপ যাহা তাহার অনুভবগত ও এষণাগত জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মানুষ পৈশিক চেষ্টার দ্বারা, দৈহিক শক্তির দ্বারা যে ইচ্ছা পরিপূরণ করিতে পারে না, তাহা মানসিক চেষ্টার দ্বারা, ভাবরূপ সৃষ্টির দ্বারা প্রতিকল্পিতভাবে পূরণ করে। সুতরাং ইহা আমাদের অপরিহরণীয় বিলাস, আমাদের বাঞ্ছাকল্পতরু। ইহা দেহের সংকীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া মানুষকে অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত করাইতে, অগম্য স্থানে লইয়া যাইতে, দেবভোগ্যা উর্বশীর সৌন্দর্য-রস-সুধা পান করাইতে, কিন্নরী-কণ্ঠের গান শুনাইতে, অপ্সরীনিকরের লীলালাস্য দেখাইতে পারে।

ইহা শুধু মানুষের কতকগুলি দুষ্পূরণীয় অভিলাষের ভাবগত প্রসাদন করে না, তাহার কতকগুলি প্রয়োজনীয় অভাবও মিটায়। ইহা অনেক ক্ষেত্রে নিত্যকার একঘেয়ে নীরস জীবনযাত্রার মধ্যে বৈচিত্র্য আনে, রসসৃষ্টি করে। ইহার আবির্ভাবের জন্য অনেক সময়ই বেশী প্রয়াস করিতে হয় না। কর্মাবসরে অথবা কর্মের মাঝখানে ঈষৎ ইঙ্গিতে অথবা বিনা আহ্বানেই ইহা অনুগত কিঙ্করীর ন্যায় ছুটিয়া আসে এবং আমাদের চিত্তকে কিছুক্ষণের জন্য ভাবরসে নিমজ্জিত রাখে।

কল্পনার জাতিভেদ

কল্পনা কয়েক জাতীয় আছে। তন্মধ্যে দুইটির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি হইল **পুনরুজ্জীবিত কল্পনা** (Reproductive imagination), আর একটি **সৃজনী কল্পনা** (Creative imagination)। প্রথমটি হইল—বিস্মৃত পূর্বাভিজ্ঞতারই একটি সঠিক ভাবরূপ, যদিও বিষয়ী প্রায়ই তাহাকে সম্পূর্ণ অভিনব বলিয়া মনে করে। আবার কোনো ভ্রমণ-কাহিনী, গল্প, উপন্যাস, সংবাদপত্র-লিখিত ঘটনার বিবৃতি, গাথা, কাব্য, কথিকা প্রভৃতি পাঠ করিবার অথবা কাহারো মুখে শ্রবণ করিবার কালে তদুক্ত স্থান, ব্যক্তি ও

সংঘটনের যে সকল প্রতিরূপ সঙ্গে সঙ্গে চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, তাহাও পুনরুজ্জীবিত কল্পনা। শুধু সঙ্গে সঙ্গে কেন, বহুকাল পরেও সামান্য রূপান্তরিত হইয়া ঐগুলি মনে উদিত হইতে পারে। ইহাকে প্রতিফলিত কল্পনা বলিতেও আমাদের আপত্তি নাই।

দ্বিতীয়টি হইল—চৈতন্যের প্রাঙ্গণে নূতন ভাবরূপের প্রণয়ন ও উজ্জীবন, যদিও বিষয়ী বিশ্বাস করে উহা পুরাপুরি বাস্তবে রূপায়িত করা বা দেখা অসম্ভব। কিন্তু ঐ নূতন ভাবরূপের ভিতর খণ্ডিতভাবে কিছু কিছু নিজের ব্যক্তিগত রসানুভূতি, অভিজ্ঞতা, লোকশ্রুতি বা অধীত বিদ্যার সংমিশ্রণ থাকিবেই।

বহুকাল পূর্বে ফিনিসীয়, রোমীয় ও গ্রীক নাবিকগণ আফ্রিকার পূর্বোপকূলে কোথাও কখনো একটি বা একাধিক ডাগঙ্ নামক দীর্ঘকায় মৎস্য মৃতাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিল। এই মৎস্যগুলি সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৫ ফুট উচ্চ হয়, দুই হইতে আড়াই ফুট চওড়া হয়। ইহাদের মুখমণ্ডল অনেকটা কুশ্রী পুরুষলোকের মত অথচ স্ত্রীলোকের মত দুইটি স্তন আছে, বাকি অংশ অবিকল মাছের মত। ইহাদের গায়ের শল্কগুলি খুব ছোট ছোট চক্‌চকে খয়েরী রঙের। ইহারা ক্বচিৎ জলের উপর খাড়া হইয়া অর্ধেক দেহ তুলিয়া পুনরায় গভীরে ডুব দেয়। প্রাচীন কালে ইহাদিগকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মাঝে মাঝে দেখা গেলেও ধরা দুঃসাধ্য ছিল। বেড়াজালে ক্বচিৎ এক-আধটা ধরা পড়িলেও তাহাদিগকে জীবিত রাখা যাইত না। এখনো মোমবাসা ও কেনিয়া-উপকূলে কদাচ-কখনো একটি ডাগঙ্ ধরা পড়ে এবং তীরে টানিয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি অতি অস্পষ্ট কাতর ধ্বনি নিঃসারণ করিয়া উহা বিগতপ্রাণ হয়। সেকালের নাবিকগণ স্বদেশে বিদেশে যেখানে তরী ভিড়াইত, সেখানেই এই বিরাটাকার মৎস্যগুলির কথা ফলে-ফুলে-পল্লবে সজ্জিত করিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইত।

প্রায় ২৮০০ বৎসর পূর্বে হোমার যখন 'ইলিয়াড্' রচনার পর 'অডিসি' লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন সেই সময় বা তাহার কিছু পূর্বে ওই ডাগঙ্ মৎস্যের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি এই সত্যকার মৎস্যের সহিত তাঁহার কল্পনাশক্তি মিলাইয়া 'সাইরেন্' নাম্নী এক অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী মৎস্যকন্যাকুলের সৃষ্টি করিলেন

যাহারা সুধানিস্যন্দী সুরে গান গাহিয়া নাবিকদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিত, পথভ্রান্ত করিয়া হত্যা করিত। ইহা হইল সৃজনী কল্পনা। ত্রোজান্ যুদ্ধের অবসানে সেনাপতি ইউলিসিস্ একদল সেনানী ও নাবিক লইয়া সমুদ্রপথে দশবৎসর কাল-ব্যাপী যে বিপদবৈচিত্র্যময় দেশভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহারই কল্পিত কাহিনী তিনি 'অডিসি' কাব্যে প্রতিবিম্বিত করিতে গিয়া তাঁহার মানসকন্যা সাইরেন্‌দিগকে কাজে লাগাইলেন।

কল্পনা লইয়া কবিদের কারবার। কল্পনা যতই নির্বস্তুক ও নবপরিকল্পিত বলিয়া মনে করা যায় না কেন, তথাপি তাহার ভিতর কিছু বাস্তবতাবোধের গন্ধ থাকিবে, কিছু নিজের অভিজ্ঞতা, অপরের জীবনস্মৃতি কিংবা লোকশ্রুতির স্পর্শ থাকিবে। কবির কল্পনা হইবে স্মরণ বা অনুকরণ ও উদ্ভাবনের একটি সুচারু সংমিশ্রণ। মাইকেল মধুসূদন তাঁহার অমর কাব্য 'মেঘনাদ-বধে'র বিষয়বস্তুটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন রামায়ণ হইতে। কাব্যের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিতে গিয়া তিনি বাগ্‌দেবীর সহিত কল্পনাকেও আহ্বান করিয়াছিলেন—

তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনে! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে রচ মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।...

কবির সৃজনী কল্পনা—ভাষা, ছন্দ, ভাবরূপ, অলঙ্কার ও রসব্যঞ্জনার মধ্য দিয়া রূপায়িত হয় সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা প্রত্যয়যোগ্য সম্ভাবনীয়তার স্থান থাকে। সে কল্পনার মধ্যে অভিনবত্বের সহিত মাধুর্য ও ঔদার্য এমনভাবে মিশ্রিত থাকে যাহাতে তাহার প্রকাশটি একটি লোকোত্তর আনন্দের কারণ হয়। কবির কল্পনা এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর উপমা খোঁজে, ভাবের সহিত রূপের সম্বন্ধ নির্ণয় করে। আবার রৌদ্রালোকিত বর্তমানের শাখায় শাখায় বিচরণ করিতে করিতে এক কুয়াসাচ্ছন্ন অতীতের বেদনাদিগ্ধ পুলকানুভবের মধ্যে উড়িয়া চলিয়া যায়। কবি কীট্‌স্ নাইটিঙ্গেল্ পক্ষীর উন্মাদনাময় সঙ্গীতনির্ঝরে স্নান করিতে করিতে ভাবমুগ্ধ হইয়া বলিলেন—

The voice I hear this passing night was heard
In ancient days by emperor and clown ;

Perhaps that self-same song that found a path
Through the sad heart of Ruth, when sick for home,
She stood in tears amid the alien corn.

আমাদের দেশের কবিও কল্পনার ডানায় ভর্ করিয়া কোন্ বিস্মৃত কালের অতল অন্ধকারের মধ্যে উড়িয়া গিয়া মণিদীপ জ্বালিয়াছেন—

বহু যুগের ওপার হ'তে আষাঢ় এল আমার মনে।

* * *

সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবানদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈলশিরে।
মালবিকা অনিমিখে
চেয়ে ছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে।

একদিন বিশ্বকবি সত্যসত্যই ঝিলামের তীরে সন্ধ্যার গগনে পৎ-পৎ শব্দের বিদ্যুচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া এক ঝাঁক বলাকাকে উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। কবির সৃজনী কল্পনা মৃত্তিকানিম্নে অঙ্কুরীয়মাণ বীজের বক্ষ ভেদ করিয়া ওই উড্ডীয়মান বকশ্রেণীর সহিত দেশ হইতে দেশান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে, কাল হইতে কালান্তরে উড়িয়া গিয়াছিল। তিনি তাই লিখিয়াছিলেন—

শুনিলাম, মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে!
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

শুধু কবি কেন, গদ্যসাহিত্যিক, গল্পলেখক, উপন্যাসলেখক, সঙ্গীতকার,

পদরচয়িতা—এমন কি দার্শনিক, গবেষক ও উদ্ভাবককেও অল্পবিস্তর এই সৃজনী কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়।

তাহা হইলে, আপনারা যেন স্মরণ ও সৃজনী কল্পনার মধ্যে তফাৎটুকু মনে রাখেন। স্মরণের মধ্যে সবটাই বাস্তব অভিজ্ঞতার মানসিক পুনরুজ্জীবন, তাহার মধ্যে বিস্মৃত টুকরাগুলি হয়তো কিছুটা কল্পনা দিয়া ভরাইয়া লওয়া হয়। কিন্তু সৃজনী কল্পনার মধ্যে নিজের বা পরের অভিজ্ঞতা থাকে যৎসামান্য, ঐ সামান্যটুকুকে কবি অসামান্য রসানুভূতিতে অভিসিঞ্চিত করিয়া ও ভাবলোক হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এক অভিনব তিলোত্তমা গড়িয়া তুলেন। দুইটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিয়া এই দুইটির পার্থক্যকে স্ফুটতর করিয়া দিই।

কবি করুণানিধান যখন বলিলেন—

মনে পড়ে সেই তুলসীর মূলে
'সন্ধ্যা' দিতে
মাটির দেউটি যতনে ঢাকিয়া
আঁচলটিতে।
ভক্তি-উজল মুখ-উৎপল,
আঁখি-পল্লব ঈষৎ সজল,
চোখোচোখী দোঁহে দাঁড়ানু থমকি'
পাটল সাঁঝে,
গৃহ-দেবতার ধূপ-সুরভিত
দেউল-মাঝে।—

তখন তাহা নিছক্ ছন্দোবদ্ধ স্মরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন গাহিলেন—

একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি,
তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।
কিছু পলাশের নেশা কিছু বা চাঁপার মেশা,
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি।—

তখন তাহাকে মোহমেদুর সৃজনী কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু বলা চলিবে না।

সৃজনী কল্পনার মধ্যে যখন পরের অভিজ্ঞতার সহিত নিজের মৌলিকত্ব এবং ব্যক্তির বা সমষ্টির ভবিষ্যৎ সুখসুবিধা লাভালাভ-সম্ভাবনার প্রতি বিচারবোধ মিশ্রিত হয়, তখন তাহাকে **ব্যবহারিক কল্পনা** (Practical imagination) বলা যায়। ইহা পরিকল্পনারই অগ্রদূত। বড় বড় সেনাধিনায়ক, রাষ্ট্রনেতা, সমাজ-সংস্কারক, ব্যবসা-পরিচালক ও সংগঠন-শিল্পীদের এই গুণটি হইল মানসিক দক্ষিণহস্ত।

কল্পনাকে তাহার প্রকৃতি ও পদ্ধতি অনুসারে আরো অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। গুটিকয়েকের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই।

মুক্ত বা **স্বচ্ছন্দ কল্পনা** (Uncontrolled imagination)। এইরূপ কল্পনা অতীত কোনো ঘটনা, পূর্বদৃষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত কিংবা সত্যের সহিত আদৌ সম্পর্কশূন্য। ইহা প্রায় ক্ষেত্রেই আপনা-আপনি অথবা অতি সামান্য চেষ্টাতেই আসে। ইহার মূলে বর্তমানের কোনো প্রিয় বস্তু, ব্যক্তি, বিষয় বা উপলক্ষ থাকিতে পারে। ইহা নিকট- অথবা দূর-ভবিষ্যতের একটার পর একটা সুখশান্তিপ্রাচুর্যের রকমারি চিত্র মনে মনে আঁকিয়া চলে। দিবাস্বপ্ন বা আকাশকুসুম এই শ্রেণীর। বিষয়ী যতক্ষণ এই দিবাস্বপ্ন দেখে, ততক্ষণ সে তাহার মধ্যে এরূপ বিভোর হইয়া থাকে যে, আপন পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন বা সংবেদনশূন্য হইয়া থাকে; সে যেন তাহার কল্পনাট্যের সহিত অথবা তাহার প্রধান নায়ক বা নায়িকার সহিত একীভূত হইয়া যায়। জোরে কোনো শব্দ হইলে, রাস্তায় কিছু বড় রকমের হৈ-চৈ হইলে, কেহ আসিয়া নাম ধরিয়া দুই-তিনবার ডাকিলে তবে তাহাদের চমক ভাঙে। শকুন্তলা যখন কণ্বমুনির আশ্রমে রাজা দুষ্মন্তকে লইয়া এইরূপ স্বচ্ছন্দ কল্পনায় একনিবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ই দুর্বাসা মুনি তাঁহার কুটিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।...

স্বচ্ছন্দ কল্পনার দৃষ্টান্ত

পল্লীগ্রামের ভদ্র গরিব ঘরের কালো মেয়ে, কিন্তু সুগঠিতা ও শ্রীসম্পন্না। পিতামাতার চিন্তার আর অন্ত নাই। আঠারো উত্তীর্ণ হইয়া উনিশে পড়িয়াছে। লেখাপড়া ক্লাস সিক্স পর্যন্ত। পিতা পাঠশালার পণ্ডিত, মেয়েকে

বাড়িতে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। কিন্তু মেয়ের রং কালো, ম্যাট্রিক পাস করে নাই, তদুপরি পণের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য—এই অজুহাতে যাহারা মেয়ে দেখিতে আসে, তাহারা 'খবর দিব' বলিয়া ফিরিয়া চলিয়া যায়, আর খবর দেয় না। মা মেয়েকে বলেন—'ধুম্‌সী, থুবড়ী, এমন কপালও করে' এসেছিলি! তোর বিয়ের ভাবনা ভাবতে ভাবতে ওঁর নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হ'ল।'

মেয়েটি রাত্রিতে শুইয়া, দিনের পর দিন কল্পনা করে—বাদলবাবুদের বাগানের পুকুরে স্নান করিতে যাইবার সময় সে যেন একটা টাকার থলি কুড়াইয়া পাইয়াছে। সে তাহা আনিয়া লুকাইয়া মাকে দিল; তাহাতে দশ টাকার দু'শো খানা নোট রহিয়াছে। বাবাকে আর মেয়ের বিয়ের জন্য ধান-জমি বন্ধক দিতে হইল না। তাহারা ঘটা করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিল, নারায়ণের সির্নি দিল। লক্ষ্মীনারায়ণ একদিন তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া ও হাতে একটি শিকড় দিয়া পরদিন স্নান করিয়া কাঁচা দুধে উহা বাটিয়া খাইতে বলিলেন। সে তাহাদের আদেশ পালন করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তাহার গায়ের রঙ্ ধব্‌ধবে ফর্সা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার একটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ ছেলে তাহাকে নিজে দেখিতে আসিয়া, তখনি পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছে। কলিকাতায় তাহাদের নিজেদের তিন-তলা কোঠাবাড়ি আছে। ফাল্গুনের এক শুভদিনে তাহার...ইত্যাদি।....

স্মরজিৎ একশ' ষাট টাকা মাহিনার কেরানি। সে এবার এক টাকা দিয়া একখানা লটারির টিকিট কিনিয়াছে। যদি সে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় পুরস্কার পায় (যদি কেন, নিশ্চয়ই যে-কোনো একটা পাইবে), তাহা হইলে নিজের পরিবারের জন্য, দূরসম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের জন্য কি কি করিবে তাহার একটা লম্বা তালিকা মনে মনে কেবলি রচনা করিতেছে। যতই ড্রইংয়ের দিন আগাইয়া আসিতেছে, ততই তাহার কল্পনা ঘনীভূত ও প্রলম্বিত হইতেছে। স্ত্রীর জন্য কি গহনা গড়াইবে, কয়খানা শাড়ি কিনিবে, খোকার জন্য কোন্ দোকান হইতে একটা পশমী ওভারকোট্ কিনিবে, মাতার জন্য একখানা ভালো গরদের কাপড় ও ছোট ভাইকে এক জোড়া জরি-পাড় তাঁতের ধুতি ও এক

জোড়া আন্ধির পাঞ্জাবি কিনিয়া দিবে, নূতন কলিকাতায় কাঠা তিনেক জমি কিনিবে। প্রথম পুরস্কার পাইলে, একটা ছোটখাটো বাড়ি তুলিবে, বিবাহিতা ছোট বোনকে পূজার সময় একখানা দামী শাড়ি কিনিয়া দিবে, তাহার খুকিকে ভরি দেড়েকের এক ছড়া সোনার হার গড়াইয়া দিবে, কিছু টাকা ব্যাংকে রাখিবে, আর কিছু ভারত সেবাশ্রমে দান করিবে···ইত্যাদি।····

শ্যামপুকুরের অজিনেন্দ্র তাহার প্রতিবেশিনী সুচিত্রা নাম্নী একটি তরুণীকে ভালবাসে। মেয়েটি যখন ক্লাস টেনে পড়ে, তখন হইতেই উহাকে তাহার নজরে ধরিয়াছিল। অজিনদের দোতলার বারান্দা হইতে সুচিত্রাদের দোতলার ঘরের একটা জানালার একাংশ দেখা যায়। অজিন এক-এক সময় বারান্দায় দাঁড়াইয়া সুচিত্রাকে দেখিবার চেষ্টা করিত। সুচিত্রার সহিত কচিৎ তাহার চোখোচোখিও হইত। রাস্তাঘাটেও মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হইলে, সুচিত্রা মাথা নীচু করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইত। কিন্তু কখনো কথা বলিবার চেষ্টা করে নাই অজিন। সুচিত্রা স্কুল ফাইন্যাল পাস করিবার পর যখন প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাসে ভর্তি হইল, তখন অজিনের এই গোপন প্রেমাঙ্কুর চারাগাছে পরিণত হইয়া দ্রুত বর্ধিষ্ণু হইল। সে সুচিত্রার সহিত আলাপ-করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

সুচিত্রা নিত্য প্রভাতে পাড়া হইতে অল্প দূরে একটি ছোট মেয়েকে ঘণ্টা দেড়েকের জন্য পড়াইতে যায়। অজিন একদিন পড়াইতে যাইবার পথে তাহার সহিত যাচিয়া আলাপ করিল এবং তাহাকে একটা বিশেষ জরুরি কথা নির্জনে বলিবার অভিলাষ জানাইল। সুচিত্রা দুই-একবার কিন্ত-কিন্ত করিয়া সাক্ষাতে সম্মতি দিল। সম্প্রতি সুচিত্রা তাহাদের বাড়ির জানালা দিয়া প্রতি-দিনই এই যুবকটিকে বারান্দায় অথবা তাহাদের একতলার রকে বসিয়া থাকিতে ও তাহার দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছে। এই উন্নতনাস আয়তচক্ষু দীর্ঘদেহী অর্ধকুঞ্চিতকেশা ঘনশ্যাম যুবকটিকে তাহারও ভালো লাগিয়াছিল। হয়তো এই সাক্ষাতের ঘটনার কিছুদিন আগে তাহার সহিত জানালা হইতে দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া সে বার কয়েক অধরযুগে অর্থব্যঞ্জক হাস্যরেখাও ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

উল্টাডাঙা খালের ধারে অজিনের কথিতমত একটি নিভৃত সঙ্কেত-স্থানে পরদিন সন্ধ্যার পর সুচিত্রা গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তারপর বিভিন্ন স্থানে তাহারা আরো ৪।৫ দিন সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎ করিয়াছে। দ্বিতীয় দিন সাক্ষাতের সময় তাহারা দুই-এক মাসের মধ্যেই গোপনে পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা দুইজন এক জাত্যংশ-ভুক্ত নয়, একজন কায়স্থ, অন্য জন বৈদ্য।

সুচিত্রা জানে যে, তাহার গৃহে বিধবা মাতা, কাকারা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীরা কেহই এ বিবাহে সম্মত হইবেন না। এমন কি, অজিনের সহিত গোপনে প্রগাঢ় পরিচয় হইয়াছে জানিতে পারিলে, তাঁহারা উহার মুখদর্শন করিবেন না। তথাপি সে অজিনের সহিত দেখা করিতে ছাড়িল না। সুচিত্রা কালীবাড়িতে এক টাকা পঁচিশ পয়সার পূজা মানৎ করিল। সে দিনেরাতে যখনি ফাঁক পায় তখনি চিন্তা করে—শাস্ত্রমতেই ঘটা করিয়া তাহাদের বিবাহ হইবে। মা কালীর কৃপায় নিশ্চয়ই তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কল্পনা করে, তাহার মেজদিদি তাহার ছোট বোনের নিকট হইতে এই গোপন প্রেমের কথা জানিতে পারিয়া, মাতাকে ও খুল্লতাতগণকে বলিয়া-কহিয়া-বুঝাইয়া অজিনের সহিত বিবাহে সম্মত করাইয়াছে।

সামনের আষাঢ় কিংবা শ্রাবণের একটি শুভদিনে তাহাদের গৃহের ছাতে মেরাব বাঁধা হইয়াছে। সম্মুখের রকে বাজনদারেরা রোশনচৌকিতে টোড়ি-ভৈরবীর সুর বাজাইতেছে। ঝি-চাকরেরা খুঞ্চিপোষ-ঢাকা তত্ত্বের থালা লইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছে; ট্যাক্সি-মোটর-রিক্স করিয়া আত্মীয়-আত্মীয়ারা কাপড় ও উপহারের বাক্স হাতে করিয়া উপস্থিত হইতেছেন। বরপক্ষীয়গণ অন্য পাড়ায় তিনদিনের জন্য একটি প্রকাণ্ড বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন। সেখান হইতে ঐ-যে গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসিয়া সদর-দরজার সম্মুখে পৌছিয়াছে। ঐ-যে সঘন চাঞ্চল্যে হুলুধ্বনি ও শঙ্খনাদ শুনা যাইতেছে। ছোট বোন সুপ্তি ও সেজদি তাহাকে নূতন লালপেড়ে কাপড় পরিয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছে। কে জানে কেন সন্ধ্যা ও কল্পনার ঠাট্টা তাহার ভালো লাগিতেছে না; তাহার সমস্ত শরীরে যেন একটা অলস পুলকের জড়িমা ছড়াইয়া রহিয়াছে; এত

হৈ-চৈয়ের মধ্যে এক কোণে ঘুমাইয়া পড়িয়া কেবলি যেন অজিনের স্বপ্ন দেখিবার ইচ্ছা জাগিতেছে!…ইত্যাদি ইত্যাদি।…

মুক্ত কল্পনার অন্তর্বস্তু সমস্তটাই অসম্ভাব্যতার হাওয়ায় ভরা থাকে রবারের বেলুনের মত। নতুবা কোনটার একাংশে কিছু সম্ভাবনীয়তার অস্তিত্ব থাকিতে পারে; তাহা ভবিষ্যতে হয়তো বাস্তবতায় রূপান্তরিত হইয়া যায়। মুক্ত কল্পনা এক লক্ষের মধ্যে একটি ক্ষেত্রে ষোলো আনা ফলবন্ত হয় কিনা সন্দেহ। সুচিত্রা অজিনের সহিত মন্ত্র পড়িয়া আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহিতা হইবার যে কল্পনা করিয়াছে, তাহা সত্যে পরিণত না হইবারই কথা; তবে বিবাহ যদি একান্তই হয়, তাহা রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়াই হইবে।

কতকগুলি কল্পনা আমাদের প্রতিদিনের কাজ ও অকাজের মধ্যে হঠাৎ কোথা হইতে শরতের লঘু মেঘখণ্ডের মত উড়িয়া আসে, আবার পলকের মধ্যে উড়িয়া চলিয়া যায়। তাহারা মনকে সেরূপ চঞ্চল করে না, তাহার উপর দাগও কাটে না। এগুলি হইল **উড়ন্ত কল্পনা**। ইংরাজীতে যাহাকে বলে passing fancy। পথে-ঘাটে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে দেখিয়া উড়ন্ত কল্পনার উদয় হইতে পারে, আবার কিছু না দেখিয়া না শুনিয়া না ছুঁইয়াও এইরূপ কল্পনার আবির্ভাব অনুভব করা যায়।

শিশুদের এইরূপ কল্পনা অবিশ্রান্ত হয়। তাহা ছাড়া ছোটখাটো মুক্ত কল্পনা তাহাদের সমগ্র বাল্যজীবনের একটা বৃহৎ অংশকে অভিসিঞ্চিত করিয়া রাখে। কল্পনাবলেই তাহারা দড়িকে সাপ করিতে পারে, লাঠিকে ঘোড়া করিতে পারে, খোলাম-কুচিকে টাকা করিতে পারে, প্ল্যাস্টিকের পুতুলকে বিয়ের কনে সাজাইতে পারে, কাঠের বিড়ালকে দিয়া ইঁদুর ধরাইতে পারে, ধূলিকর্দমকে পোলাওয়ে রূপান্তরিত করিতে পারে। ইহারই বলে তাহারা বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর মুখের কথা শোনে, লেপের তলা হইতে রাক্ষস-খোক্কোসদের হাঁউ-মাউ-কাঁউ ধ্বনি শুনিয়া কণ্টকিততনু হয়, চম্পক-বনে পারুল বোনের ডাক শুনিয়া দুঃখে গলিয়া যায়। তাহারা ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যার শিয়রে সোনার কাঠি পায়ের কাছে রূপার কাঠিতে বিশ্বাস করে, পক্ষিরাজের পিঠে চড়িয়া স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতলের সর্বত্র বেড়াইয়া বেড়াইতে পারে।

তাই কবি একদা কচি শিশুর কণ্ঠে এই গানটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন—

"কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা—মনে মনে।
মেলে দিলাম গানের সুরে এই ডানা—মনে মনে।"…

উদ্ভটকল্পনা (Phantasy)। বাল্য ও কৈশোরে কল্পনাশক্তি এত প্রবল হয় যে, বালকবালিকা, কিশোরকিশোরী অনেক সময় কল্পনাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা বিতাড়িত করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়। কারণ তাহারা বাস্তব ছাড়া কল্পনাসৃষ্ট কোনো মিথ্যা বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে তাহা বিশ্বাসই করে না। কল্পনাসৃষ্ট অবাস্তব বস্তু দেখিয়া শিশুরা যাহা বলে, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া অপবাদ দেওয়া উচিত হইবে না। ভোরবেলা সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া ৪ বৎসর বয়স্ক শিশু বারান্দায় মোড়ার উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল; খানিকক্ষণ পরে সে হুড়মুড় করিয়া ঠাকুরমার ঘরে ঢুকিয়া ভয়ার্ত কণ্ঠে কহিল, "ঠাক্‌মা, নীচের সদর দরজাটা বন্ধ আছে তো? পরি জেটুদের রকের ওপর একটা মস্ত ভালুক বসে আছে। বোধহয় চিঁড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে এসেচে। রাঙা রাঙা চোখ ঘুরিয়ে আমার দিকে চাইছিল। দেখ্‌বে এস।" নাতির নির্বন্ধাতিশয্যে ঠাকুরমা তরকারি-কোটা বন্ধ রাখিয়া বারান্দায় গেলেন। ততক্ষণে ভালুক চিঁড়িয়াখানায় ফিরিয়া গিয়াছে।

কোনো কোনো শ্রেণীর উন্মাদাবস্থার রোগী তাহার আবেষ্টনীকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায় অর্থাৎ তাহা হইতে নিজেকে গুটাইয়া শামুকের মত নিজের তৈয়ারি কল্পনার খোলার মধ্যে বাস করিতে থাকে। উদ্ভটকল্পনার মধ্যে প্রায় ক্ষেত্রেই ভাবরূপগুলি বিস্ময়কর রকমের বাস্তবতাবোধশূন্য ও হাস্যকর রকমের শৃঙ্খলহীন হয়। ইহার মধ্যে অতীতের কোন অভিজ্ঞতা বা অর্জিত জ্ঞানের অস্পষ্ট ছাপও থাকে না; ভবিষ্যতের কোনো আশারঙীন ছবিও থাকে না। উদ্ভট-কল্পনাবিলাসীদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বর্তমান লইয়া কারবার।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের এই উদ্ভটকল্পনা একটি প্রিয় উপজীব্য ছিল। স্পেন্সার হইতে মিলটন্ পর্যন্ত ইংরাজ কবিগণ, ভার্জিল হইতে দান্তে পর্যন্ত ল্যাতিন-ইতালীয় কবিগণ, বাল্মীকি হইতে মাইকেল পর্যন্ত বাঙালি কবিগণ

রাশি রাশি উদ্ভটকল্পনার ছবি আঁকিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। এখনো অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিতদের চিরন্তন শিশুমন এইগুলির অধিকাংশকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে।

একটু ভাবপ্রবণ অথচ সুস্থমস্তিষ্ক বালকবালিকা কিশোরকিশোরীদের কেহ কেহ গৃহপরিবেশকে ও কঠোর শাসনশৃঙ্খলাকে কিছুদিন ধরিয়া অপছন্দ করিতে থাকিলে, একদিন কল্পনা করিয়া বসে যে, তাহারা এই পরিবারের পিতামাতার সন্তান নয়, ইহারা তাহাদের পালকপালিকা অভিভাবকমাত্র। তাহাদের সত্যকার পিতামাতা নিশ্চয়ই অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অধিকতর ধনবান, গুণবান ও স্নেহকরুণাময়। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে তাঁহারা আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন, একদিন-না-একদিন আত্মপ্রকাশ করিবেন। এই কল্পনা পুনঃপুনঃ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে উহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসপ্রবণ করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহাদের তথাকথিত সত্যকার পিতামাতার এক-একটা রূপ কল্পনা করিতে সচেষ্ট হয়। নিদ্রিত অথবা জাগ্রত স্বপ্নে তাহাদের প্রতিরূপ দেখে। এইরূপ কল্পনার নাম **পালিতপুত্রজ উদ্ভটকল্পনা** (Foster-child phantasy)।

যখন আদিম সভ্যতার প্রথম উষালোক আসিয়া মানবজাতির ললাট স্পর্শ করিয়াছিল, তখনো বোধহয় একদল তরুণের মনে এই উদ্ভটকল্পনা জাগিয়াছিল। ঋগ্বেদ-রচনার প্রথমাবস্থায় একদল পরিবারদ্রোহী ঋষি স্ব স্ব জনককে অতিক্রম করিয়া এক বিশ্বপিতার ভাবরূপ মনে আঁকিয়াছিলেন এবং তাঁহারই উদ্দেশে উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি। মা মা হিংসী। সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।"...

আর একপ্রকার উদ্ভটকল্পনা সাধারণতঃ বালকদের, কখনো কখনো পুরুষ-ভাবপ্রবণ বালিকাদের, মনে জাগে। তাহাকে বলে **বীরজ উদ্ভটকল্পনা** (Hero phantasy)। ইহাতে তাহারা আপনাদিগকে একজন ঈশ্বরানুগৃহীত মহা বীরপুরুষ বলিয়া কল্পনা করে এবং হয় নিজের কোনো আত্মীয়-আত্মীয়া অথবা পাড়াপ্রতিবাসী নতুবা স্বজাতিকে যেন ঘোর বিপদের কবল হইতে উদ্ধার করিতেছে বলিয়া দিবাস্বপ্ন দেখে। রবীন্দ্রনাথের "বীরপুরুষ" কবিতায় এইরূপ

একটি উদ্ভটকল্পনাই প্রতিফলিত হইয়াছে। ডম্‌রেমি গ্রামের মেষপালিকা কিশোরী জঁা (Jean) মাঠেঘাটে বসিয়া এক উদ্ভটকল্পনা দেখিতে দেখিতে এতই তন্ময় ও প্রত্যয়প্রবণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহা ঈশ্বরনির্দেশজ্ঞানে একদিন ইংরাজবিজিত ফ্রান্সের উদ্ধারসাধন পণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল।

চিন্তা কাহাকে বলে

কল্পনাকে জানা গেলে চিন্তাকে জানা সহজ হয়। কল্পনা কখনো বস্তু-সাপেক্ষ, কখনো বস্তুনিরপেক্ষ। একখানি ছবি, একটি পুরাবস্তু দেখিয়া মানুষ কত কি কল্পনা করিতে পারে। একটি বহু প্রাচীন গ্রীসদেশীয় রঙীন চিত্রখচিত মর্মর ভস্মাধার দেখিয়া, প্রতিভাপ্রদীপ্ত কবি কীট্‌স্ ভাবগদগদচিত্তে এক পঞ্চাশৎ চরণের অপরূপ কান্তিরসসমৃদ্ধ কল্পনার স্বর্ণচ্ছটাময় কবিতা লিখিয়াছিলেন—"Ode on a Grecian Urn"। সংবেদন ও প্রত্যক্ষণও যে সর্বদা বস্তুসাপেক্ষ তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। কিন্তু চিন্তার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল ইহা সর্বদাই বস্তুনিরপেক্ষ এবং ভাবসাপেক্ষ। চিন্তার প্রধান উপজীব্য হইল স্মৃতিগত প্রতিরূপ ও ভাবরূপ বা ধ্রুবজ্ঞান বা প্রত্যয় (concept)।

কতকগুলি ধ্রুবজ্ঞান বা ভাবরূপের মধ্যে বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা সমন্বয়-সাধন, কতকগুলিকে পরিবর্জন-করণ এবং যুক্তির দ্বারা একটি সিদ্ধান্ত-করণের নাম **চিন্তা** (Thought)। বিষয়ীর মনের মধ্যে চিন্তণ বা চিন্তাক্রিয়া চলে তাহার মাতৃভাষার মাধ্যমে। অর্থাৎ চিন্তার অভ্যন্তরে যেমন ভাবরূপ আছে, তেমনি শব্দ-রূপও আছে। চিন্তা প্রথমতঃ করে একটা সাধারণ প্রত্যয় বা ধ্রুবজ্ঞানের সৃষ্টি। পরে করে বিচার, তারপর আনে যুক্তি ও শেষে করে সিদ্ধান্ত। সাধারণ প্রত্যয়কে বিচারের এলাকায়ই ফেলা উচিত, কারণ বিচারের কাজই হইল—একটি বিশেষ ভাবকে সাধারণ প্রত্যয়ের নিকট হাজির করা (reference of a particular idea to a general concept)।

এক্ষণে **সাধারণ প্রত্যয়** (General concept) জিনিসটিকে আমরা একটু ভালো করিয়া জানিবার চেষ্টা করি। সাধারণ প্রত্যয় হইল—একটি বস্তু, প্রাণী বা ব্যক্তির নাম এবং সেই নামের সহিত শুধু তাহার প্রতিরূপ বা ভাবরূপ

নয়, তাহার সমগ্র জাতি, শ্রেণী, গণ বা গোষ্ঠির প্রতিরূপ বা ভাবরূপ। আর একটু ব্যাখ্যা করিতে গেলে বলিতে হয়, একটি বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণীর নাম বলিলে যে ছবিটি মনে জাগে, সেই ছবিটি শুধু তাহার নিজের নয়, তাহার সমজাতীয়, সমশ্রেণীয় বা সমগোষ্ঠীয় প্রত্যেকটি বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণীর একটা সাধারণ আকৃতি-প্রকৃতির। একটি কুকুর বলিলে প্রথমতঃ একটি পশুকে, তারপর সমস্ত কুকুর জাতিকে বুঝাইবে, তারপর হয়তো তাহার শ্রেণী ও গণকে বুঝাইবে। সাধারণ প্রত্যয় গঠন করিতে গেলে, এক জাতি, শ্রেণী বা গণের কেবল একটিকে নয়, বিভিন্ন আকার ও রঙের অনেকগুলিকে প্রত্যক্ষণ করিতে হয়; তারপর অন্যজাতীয় অন্যশ্রেণীর ও অন্যগণীয় ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষণ করিতে হয়। উহাদের পরস্পরের মধ্যে তুলনা করিতে হয়। কোন্ জাতির কিরূপ আকার কি কি গুণ, কোন্ জাতির সহিত অন্য কোন্ জাতির কি কি সাদৃশ্য কোথায় বৈসাদৃশ্য, তাহা লক্ষ্য করিয়া তৎসম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ভাবরূপ মনের মধ্যে ক্ষোদিত করাই হইল প্রত্যয় বা ধ্রুবজ্ঞানের কাজ। বিষয়ীর বয়স, অভিজ্ঞতা, বোধশক্তি, স্বভাব, মেজাজ প্রভৃতির উপর প্রত্যয়ের স্পষ্টতা ও অভ্রান্ততা অনেকখানি নির্ভর করে।

একটি লীচু গাছের প্রত্যয় বা ধ্রুবজ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রথম প্রয়োজন গাছ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-লাভ। গাছের সাধারণ আকৃতিপ্রকৃতি ও প্রাণীর সহিত তাহার আকৃতিপ্রকৃতির পার্থক্য সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। তারপর পাঁচটি অশ্বত্থ, বট, তেঁতুল, কুল, আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি গাছ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। অতঃপর দুই-চারিটি লীচু গাছ দেখিয়া অন্যান্য ফলবান গাছের সহিত উহাদের আকৃতির, পাতার, ডালের, বর্ণের ও ফলের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে অন্যান্য বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মনে রাখিতে হইবে। তারপর একটি লীচুগাছ সম্বন্ধে প্রত্যয় হয়। তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছেন, একটি বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণী সম্বন্ধে প্রত্যয় বা ধ্রুবজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে কত ভাবরূপকে চারিদিক হইতে সংগ্রহ করিতে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে তুলনা করিতে, বহু ভাবকে কাটছাঁট-সংযোগ করিতে হয় এবং জ্ঞানলাভের প্রত্যেক ধাপ বা স্তরের স্পষ্ট স্মৃতি বা

প্রতিরূপ মনের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে হয়। অতি উচ্চতম সাধারণ প্রত্যয়ের মধ্যে একাধিক ছবির সংশ্লেষণ আছে; সে ছবিটি অর্থপূর্ণ শব্দ দিয়া অথবা প্রতীক দিয়া নতুবা সঙ্কেতচিহ্ন দিয়াও গঠিত হইতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি, কল্পনার মধ্যে বস্তু, প্রাণী, বিষয় প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতি থাকিতেও পারে, না-ও থাকিতে পারে। যদি থাকে তো তাহা বিষয়ীর নিকট অজ্ঞাত অথবা অনুভবনীয়ভাবে অস্পষ্ট এবং সেই সকল পূর্বস্মৃতিকে কল্পনা সর্বক্ষেত্রেই অতিক্রম করিয়া বহুদূর চলিয়া যায় অথবা পূর্বস্মৃতির ভিত্তির উপর একটা বিমূর্ত প্রাসাদ গঠন করে। কল্পনার মধ্যে গঠনের ধারা নাই, ধারণা নাই, পরিসীমা নাই। চিন্তার মধ্যে ধারা আছে, ধারণা আছে, পরিসীমা আছে। শুধু তাহাই নহে, উহার মধ্যে পূর্বাপর একটা অর্থ আছে, যত লঘু ও সংক্ষিপ্ত হউক না কেন—একটা বিচার, একটা যুক্তি ও/বা সিদ্ধান্ত আছে।

বিচার, যুক্তি, সিদ্ধান্ত

চিন্তার প্রথম ও প্রধান অঙ্গ হইল—**বিচার**। কোনো কোনো পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন—বিচারই হইল চিন্তার প্রথম ও সহজ সোপান। প্রথমেই বলিয়াছি একটা সাধারণ প্রত্যয়ের নিকট একটি বিশেষ ভাবকে হাজির করা। হাজির করাটা কিসের জন্য? তাহার অর্থবোধ বা স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য। একটি নূতন ভাব যখন আমার মনোগোচর হইল, তখন উহার স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্য আমরা উহাকে অন্য পুরাতন ভাবের সহিত মিলাইয়া দেখি, কোথায় উহার সহিত অন্য ভাবের সাদৃশ্য কোথায় বৈসাদৃশ্য তাহা স্থির করি। তারপর ঐ ভাবটি যদি কোনো বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে হয়, তাহা হইলে তাহার আকার ও গুণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি এবং অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর আকারের সহিত তুলনা করি। তারপর এই নূতন ভাবটিকে পুনরায় সংশ্লেষণ করিয়া তাহাকে একটা নাম দিই অথবা তাহা কি (that is what?)—এই প্রশ্নের উত্তর স্থির করি।

বুলা কাশী গিয়া অনেক উট দেখিয়া আসিয়াছে। উট সম্বন্ধে তাহার

একটা সাধারণ প্রত্যয় আছে। তারপর আলিপুর চিড়িয়াখানায় পুনরায় উট দেখিল। অন্যান্য নানা নূতন জন্তু দেখিতে দেখিতে সে জিরাফের ঘেরা স্থানটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিতা তাহাকে জন্তুটির কি নাম বলিয়া দিলেন না। পরিচয়-ফলকে ইংরাজিতে নাম লেখা ছিল, বুলা তাহা পড়িতে পারিল না। বুলার প্রথমটা দেখিয়া মনে হইল ইহা একরকম উট। কিন্তু ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, উটের চেয়ে জন্তুটির গলা অনেক বেশী লম্বা; উটের গা ঘোর ছাই রঙের, ইহার গায়ের জমি হল্‌দে তাহার উপর ডোরাকাটা; উটের শরীর ও পায়ের চেয়ে ইহার শরীর ও পাগুলি আরো সরু ও বেঁটে। তবে মিলের মধ্যে সে দেখিল যে, উটও লতাপাতা খায়, এই জন্তুটিও লতাপাতা খায়। বাবার নিকট শুনিল যে, ইহারাও উটের মত শান্ত, পুষিলে পোষ মানে। বুলা বিচার করিল যে, উহা উট নয়, অন্য কোনো জন্তু। পরে বাবা বলিয়া দিলেন উহার নাম জিরাফ্। এই যে অত্যন্ত সহজ বিচার, ইহার মধ্যে that বা 'উহা' হইল ব্যাকরণের উদ্দেশ্য বা *subject* এবং 'একটি জিরাফ্' হইল whatএর উত্তর বা *predicate*। 'জিরাফ্ একটি শান্ত প্রাণী' —এই বাক্যটিও একটি বিচার।

পরীক্ষাক্ষেত্রে এক-একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া, ছাত্র বা ছাত্রীর মনে নানারূপ আনুষঙ্গিক ভাবের উদয় হয়। কতকগুলি প্রাসঙ্গিক ভাবকে সে গ্রহণ করে, অপ্রাসঙ্গিক ভাবগুলিকে সে বর্জন করে। কোন্‌গুলি প্রাসঙ্গিক, কোন্‌গুলি অপ্রাসঙ্গিক তাহা স্থির করা হইল বিচার। এখানে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ-ক্রিয়া আছে। তবে বিচারবোধ সকল ছাত্রছাত্রীর সমান নয়; ইহা স্মৃতি ও বুদ্ধি-সাপেক্ষ। যাহা হউক, পরীক্ষা-স্থলে প্রশ্নটি হইল এক বা একাধিক বাক্যযুক্ত that বা 'উদ্দেশ্য', এবং উত্তরটি হইল কয়েকটি বাক্য-সমন্বিত what বা 'বিধেয়'।

তাহা হইলে বহু ক্ষেত্রে বিচার কি করে? একটি বা একাধিক শব্দ বা উদ্দেশ্য যে অসম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে একটি বা একাধিক ক্রিয়াবাচক বা গুণবাচক বিধেয় দিয়া সম্পূর্ণ করে। ঘোড়াটি একটি শব্দ, উহা একটি গৃহপালিত বিশেষ জীবকে বুঝায়। ইহা অসম্পূর্ণার্থক উদ্দেশ্য। যেই বলিলাম

—'ঘোড়াটি দৌড়িতেছে', তখন একটি বিধেয় পাওয়া গেল; অর্থ প্রশস্ত হইল, সম্পূর্ণ হইল। ইহার পর আমরা যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারি—যেহেতু উহা দৌড়িতেছে, তাহা হইলে ঘোড়াটি খোঁড়া নয়, দুর্বল নয়।

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যত অধিক ও প্রশস্ত, এষণা যত প্রখর হয়, আবেগ, অনুভূতি ও সংক্ষোভগুলি যত শাণিত হয়, ততই ভাবের বিস্তার হয়, ভাবানুষঙ্গের সুবিধা হয়। ইহার ফলে বিচার-ক্রিয়া যেমন ত্বরিৎ তেমনি অভ্রান্ত হয়। ভাবগুলি স্মৃতিতে সুবিন্যস্তভাবে রক্ষিত হওয়া নির্ভর করে—পৌনঃপুনিকতা, সাম্প্রতিকতা, সুস্পষ্টতা, সংক্ষোভজনিত সঙ্গতি (emotional congruity) এবং সমজাতীয় ভাবপুঞ্জের (constellation of ideas) উপস্থিতির দ্বারা।

বিচারের সহিত গভীর জ্ঞান, অনুষঙ্গ, বিশ্বাস, সংস্কার ও সংশয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যদি একটা অভিনব পরিস্থিতিতে সুসমঞ্জস ও উপযুক্ত অনুষঙ্গ জাগরিত হয়, তাহা হইলে বিচারপদ্ধতি সহজ হয়, বিশ্বাসও তাহার অগ্রগামী হয়। যাহার যে বিষয়ে গভীর জ্ঞান আছে, তাহার নিকট ঐ বিষয়ক কোনো নূতন ভাব আসিলে, তাহা বিচার করা অত্যন্ত সহজ হয়। যাঁহার পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যায় গভীর জ্ঞান আছে, তিনি কোনো কেসে একটা নূতন ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি বিচার করিতে পারেন। আবার একজন বড় চাউলের ব্যবসায়ী তাহার অসুস্থ পুত্রকে ছানার জল, ডাবের জল, সাগু, বার্লি, বিস্কুট প্রভৃতির মধ্যে কি পথ্য কতখানি দিবেন, তাহা বিচার করিতে হিমসিম্ খান। ভ্রান্ত, মিথ্যা বা বিচ্ছিন্ন অনুষঙ্গের ফলে অনেক সময় বিচারক্রিয়া দূষিত হইয়া যায়। সম্পৃক্ত বিষয়ে বা পরিস্থিতিতে অনাগ্রহ, নিরাসক্তি বা জুগুপ্সার নিমিত্তই এই সকল মিথ্যা অনুষঙ্গ প্রধানতঃ সংঘটিত হইয়া থাকে। ফলে কোনো বিষয়ে এক এক ব্যক্তি পক্ষপাতদুষ্ট হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রীয় বা ধর্মঘটিত গোঁড়ামি অনেক সময় অত্যন্ত শিক্ষিত সমর্থ ব্যক্তিরও বিচারভ্রান্তি ঘটায়। শিশুদের চিন্তা কল্পনামিশ্রিত ও যুক্তিহীন; তাহারা আপনমনে বিড়্‌বিড়্ করিয়া চিন্তা করে। কাহারো কাহারো প্রাপ্তবয়সেও এই অভ্যাস থাকে।

যুক্তি হইল মূলতঃ কতকগুলি পূর্বজ্ঞানের বিচার-ফল ও সমষ্টি। ইহা সর্বদাই জ্ঞান ও সত্যের পথ ধরিয়া বাছ-বিচার করিতে করিতে একটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত

হয়। যুক্তিকে চিন্তারাজ্যে পর্যবেক্ষণ, চেষ্টা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়া সত্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি বলা যায়। ইহা হইল কোনো সিদ্ধান্তের কারণ বা হেতু। যে-কোনো চিন্তা বা কার্য আমরা করি না কেন, তাহার মূলে একটি যুক্তি বা হেতু থাকে। 'ভোম্বল আমাকে অপমানিত করিয়াছিল।' 'আমি তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছি।' প্রথমটি কারণ, দ্বিতীয়টি সেই কারণের ফল, কার্য।

আমি যদি বলি—'এই পৃথিবীর সকল প্রাণীই মৃত্যুর অধীন', একটি বালক অমনি বলিবে—'আপনার যুক্তি কোথায়?' আমি তখন বলিলাম, 'তোমার ঠাকুর্দা মারা গিয়াছেন, আমার মাতা ও পিতা স্বর্গগামী হইয়াছেন, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা বহুদিন আগে মারা গিয়াছে, জওয়াহরলাল নেহরু গত হইয়াছেন। সুতরাং'···তখন সে যুক্তি পাইয়া চুপ করিল। তারপর আমি যদি তর্কশাস্ত্রের অবরোহ প্রণালী অনুসারে এই কথা বলি—'এ বাড়ির বৌটি গহনা ভালবাসে। ও বাড়ির গৃহিণী গহনা ভালবাসেন। যেহেতু বৌ ও গৃহিণী দুইজনেই স্ত্রীলোক। তাহা হইলে সকল স্ত্রীলোকই গহনা ভালবাসে।' এই কথাটি সত্য সিদ্ধান্ত, ইহাকে কোনো প্রতিযুক্তি দিয়া খণ্ডিত করা যায় না।

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা কোনো যুক্তির ধার না ধারিয়াই চট্ করিয়া একটা বাক্য বিশ্বাস করিয়া বসি; অথবা হট্ করিয়া একটা কাজ করিয়া বসি। তারপর আমাদের বিশ্বাস ও কার্যকে লোকগ্রাহ্য করাইবার জন্য কতকগুলি মিথ্যা প্রমাণ ও যুক্তি খাড়া করি। তর্কশাস্ত্রে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞতাবশতঃ প্রদর্শিত দুষ্ট যুক্তিকে বলে **হেত্বাভাস** (Fallacy)।

কোনো ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আচরণকে নানারূপ আপাতমনোজ্ঞ যুক্তিজাল দিয়া মুড়িয়া লোকসমাজে প্রকাশ করার নাম **ন্যায়ারোপণ** (Rationalization)। আবার, ভবিষ্যতে যদি রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বা আর্থিক সঙ্কটে ঐ ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আচরণ আমরা ছাড়িতে বাধ্য হই, তাহা হইলে পুনরায় আর এক প্রস্থ আপাতমনোহর যুক্তিজাল বিস্তার করি। এই দুই প্রকার ন্যায়ারোপণই তর্কশাস্ত্রের কোনো নিয়মই মানে না এবং একজন সংস্কারমুক্ত উদারনৈতিক পণ্ডিতের সত্যকার যুক্তিসম্বলিত নিরপেক্ষ বিচারের কাছে দুইটিই ছিন্নভিন্ন হইয়া বাতাসে বিলীন হইয়া যায়।

ন্যায়ারোপণে বিষয়ী সর্বদা তাহার সত্যকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খুব সজাগ থাকিয়াই তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করে—এরূপ কথা বলা যায় না। অনেক সময় তাহার মূল উদ্দেশ্য তাহার অবিচেতনে চাপা থাকে; কাজেই সে জানিয়া-শুনিয়া মিথ্যার আশ্রয় লয় না এবং সর্বদাই মিথ্যাবাদী হইতে অন্ততঃ এক ধাপ উপরে থাকে। ন্যায়ারোপণের মধ্যে কিছু পরিমাণ সত্য ও তৎপ্রতি সাময়িক নিষ্ঠা থাকে, সেইটুকুকে বহু গুণ অতিরঞ্জিত করা হয়। তাহার সম্বন্ধে কোন্ কোন্ প্রাচীন মনীষী কি বলিয়াছেন এবং কোন্ শাস্ত্র তাহার সমর্থনে কি কি শ্লোক রচনা করিয়াছেন, বিষয়ী তাহা উদ্ধৃত করে; কিন্তু নিজে বিচারশক্তি হারায়।

অনেক সময় আমাদের নিজের কোনো ত্রুটি বা গলদ ঢাকিবার জন্য আমরা খানিকটা জোর ও বিশ্বাসের সঙ্গে যে কৈফিয়ৎ ও অজুহাত উপস্থাপিত করি, তাহার মধ্যে সত্যের স্থান থাকে যৎসামান্য, হেত্বাভাস ও অতিশয়োক্তি থাকে অনেকখানি। উর্দুতে একটি খুব ছোট্ট অথচ হৃদয়গ্রাহী আপ্তবাক্য আছে—'উজ্‌রে গুণাহ্ বদ্‌তর গুণাহ্' অর্থাৎ পাপ করার চেয়ে পাপের সমর্থনে কৈফিয়ৎ-সৃষ্টি করা আরো খারাপ। ন্যায়ারোপণ সম্বন্ধেও এই কথাটি প্রায় সমানভাবেই প্রযোজ্য, যদিও আমরা সকলেই সমাজে চলাফেরা করিতে গিয়া মাঝে মাঝে ন্যায়ারোপণের আশ্রয় লই—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।

আমাদের কুসংস্কারপূর্ণ অনেক পার্বণ ও আচারের মধ্যে একমাত্র গুরু-পুরোহিত সম্প্রদায়ের জীবিকার্জনের অবাধ সুবিধা ও ধর্মস্থানগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থাই এককালে প্রধান ছিল। সে যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে অবশ্য কতকগুলি ব্রতনিয়ম-পালনের আবশ্যকতা ছিল; এ যুগে সে কারণগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে, প্রয়োজনীয়তাও ফুরাইয়াছে। তথাপি পিতৃপিতামহদের দ্বারা পালিত হওয়ার নজির দেখাইয়া, পুণ্যার্জনের সস্তা প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ও পুরোহিতের বিধিনিষেধ অমান্য করিবার স্পর্ধা নাই বলিয়া আমরা এই যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান-প্রাধান্যের যুগে যুগজীর্ণ, অকল্যাণকর বহু আচার-অনুষ্ঠান-প্রথাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছি।

দুই-চারিটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। হিন্দু সমাজে এখন হাজারে

হাজারে দাওয়ানী বিবাহ ও আন্তর্জাতিক বিবাহ হইতেছে। এই সকল ক্ষেত্রে বরবধূর পিতামাতাগণ অসহায়। কিন্তু যেখানে স্বজাতীয়ের মধ্যে পিতামাতার সাক্ষাৎ কর্তৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ হইতেছে, সেখানে এত শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার সত্ত্বেও পণপ্রথা পূর্ববৎ অটুট রহিয়াছে।

কোনো কোনো উচ্চশিক্ষিত পরিবারেও কোষ্ঠিবিচার করিয়া পাত্রপাত্রী-নির্বাচনের রেওয়াজ যথাপূর্ব বর্তমান রহিয়াছে। অথচ একটু যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বিচার করিলে ইহার অসারতা আমরা দেখিতে পাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশের ভদ্র সমাজে অন্ততঃপক্ষে এক হাজার বিবাহে ৯৯৯টি ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে কোষ্ঠি দেখিয়া বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করা হইত। কিন্তু এই সকল বিবাহের মধ্যে অকাল-বৈধব্য ও রোগ-শোক-দুঃখ-অশান্তির কিছু অভাব ছিল কি? তখনকার কালে হাজার হাজার রাজযোটক পরিণয়ে ছয় মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে বালিকাবধূর শিঁথির সিঁদুর মুছিয়া যাইত। এরূপ দৃষ্টান্ত আমি নিজের দেখা ও শোনা ঘটনা হইতে ডজন দুই দিতে পারি।

পুরোহিত ও মন্ত্রমালাকে নস্যাৎ করিয়া রেজিস্ট্রেশন-অফিসে গিয়া যাহারা বিবাহ করে, তাহারা কোষ্ঠীবিচার করে না, পাঁজিপুঁথিও দেখে না। তাহারা কয়জনে বিবাহের পর ছয় মাস বা ছয় বৎসর যাইতে না যাইতেই বৈধব্যদশায় নিপতিত হইতেছে অথবা দুঃখদারিদ্র্য-সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে? রাম যখন হরধনু-ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তখন কি কোষ্ঠির প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল? সেকালে যে সকল কন্যা গন্ধর্ব-বিবাহ করিত অথবা বীর্যশুল্কা অথবা স্বয়ংবরা হইত, তাহাদের ক্ষেত্রে কোষ্ঠি-বিচারের কোনো সুযোগই থাকিত না। তবে সর্বক্ষেত্রে বিবাহের একটা শুভদিন নির্বাচন করা হইত সত্য।

আমাদের কোনো প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে বা গৃহ্যসূত্রে পাত্রপাত্রীর কোষ্ঠি মিলাইয়া বিবাহদানের বিধি লিপিবদ্ধ ছিল না; অন্ততঃপক্ষে স্মার্ত রঘুনন্দন ও হলায়ুধের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ঐরূপ প্রথা বলবৎ ছিল না। অবশ্য বল্লাল-প্রবর্তিত কৌলিন্য-প্রথা সৃষ্টির পর বিবাহ-ব্যাপারে অন্যান্য বহু প্রকার বাছ-বিচারবিধি ও কড়াকড়ির সৃষ্টি হইয়াছিল।

তারপর দিনক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করার কথা। আমরা যদি যুক্তি-অঞ্জন-লিপ্ত নয়ন দুইটি মেলিয়া চাহিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, এই অনন্ত কালকে মহাকালেশ্বর ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে বৎসর-মাস-পক্ষ-দিবসে ভাগ করিয়া দেন নাই এবং ইহার এক-একটি ক্ষুদ্রাংশকে শুভ কিংবা অশুভ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। ভগবান অনন্ত আকাশে মানুষের জ্ঞানগম্য সূর্যাপেক্ষা বহু গুণ বৃহৎ চারি হাজার কোটির অধিক নক্ষত্র ছড়াইয়া দিয়াছেন, পৃথিবীকে আবর্তন ও পরিক্রমণের নিয়মাধীন করিয়াছেন; সমুদ্রে, নদীতে জোয়ার-ভাঁটা দিয়াছেন, সূর্যচন্দ্রের আলো ও আকর্ষণ দিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতভাবেই সৌরগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ দিয়াছেন। পাঁজিপুঁথি, শুভ দিন, অশুভ দিন, কালবেলা, কুলিক বেলা, বারবেলা, অমৃতযোগ, মাহেন্দ্রযোগ, ত্র্যহস্পর্শ, অশ্লেষা, মঘা প্রভৃতি হিন্দু পণ্ডিতগণ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভগবান ৩৮ কোটি হিন্দুদের জন্য এক নিয়ম এবং ৩০০ কোটি অহিন্দুদের জন্য অন্য নিয়ম সৃষ্টি করেন নাই। ভারতে মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, প্রেতপূজক, প্রকৃতিপূজক, নিরীশ্বরবাদী প্রভৃতির সংখ্যা প্রায় নয় কোটি; ইহারা কেহই পাঁজি-পুঁথি দেখিয়া যাত্রা করে না। য়ুরি গাগারিন্, ভ্যালেন্টিনা টেরেস্‌কোভা, কম্যাণ্ডার অ্যালান্ শেপার্ড, পোপোভিচ্, ক্যাপ্টেন হোয়াইট, ম্যাক্‌ডিভিট প্রভৃতি মহাব্যোমবিহারিগণের কেহই মানুষের স্বপ্নাতীত বিপদা-শঙ্কাপূর্ণ অভিযাত্রা-প্রাক্কালে ভট্টপল্লী-নবদ্বীপের কোনো পণ্ডিতের দ্বারেই বিধান-ভিক্ষা করেন নাই, অথচ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা নিরাপদে মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সপরিবারে বা একাকী আমার দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণের বাতিক যৌবন হইতে অদ্যাবধি সমানভাবে বলবৎ রহিয়াছে। ক্যালেণ্ডারে বৃহস্পতিবারের বারবেলা, অশ্লেষা, মঘা, মাসের প্রথম দিবস দেখিয়া যাত্রা করাটা আমার বহুকালের প্রতিষ্ঠিত নীতি। পাঁজির প্রতি এইরূপ অশ্রদ্ধা-প্রদর্শনে ভাগ্য-দেবতা আজ পর্যন্ত আমাদের প্রতি বিরূপ হন নাই। তাহার উপর সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল অশুভ দিবসে ট্রেন, স্টীমার, উড়োজাহাজে যাত্রীর ভিড় অন্যান্য শুভদিন অপেক্ষা কখনো কম দেখি না। যাত্রীরা

যে সকলেই অহিন্দু নয় তাহারো প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি। তারপর রেলগাড়ি, স্টীমার, উড়োজাহাজ, যাত্রী-বাস সম্পর্কিত যে সকল আকস্মিক বিপদ ঘটিতে দেখা যায়, সেগুলি বাছিয়া বাছিয়া পঞ্জিকা-নির্দিষ্ট অশুভ দিন-ক্ষণেই ঘটে না—তাহাও লক্ষ্য করিয়াছি ও করিতেছি।

শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও কুসংস্কার অতি ধীরে ধীরে মানুষের মন হইতে বিদূরিত হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম-জার্মানি, আমেরিকার মত জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পদ-চিন্তায় অগ্রসর দেশগুলিতেও আজো কিছু কিছু কুসংস্কার সমাজের নিম্নস্তরগুলিতে জীবিত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের মত এত সর্বজনীন কুসংস্কারের আধিক্য ও আধিপত্য সদ্যসুপ্তোত্থিত আফ্রিকার কোনো রাষ্ট্রেই বোধ করি নাই। এই ধরুন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ ব্যাপারে সেই শিশু-কপোল-কল্পনা-সুলভ কবন্ধহীন রাহুর রাক্ষসী ক্ষুধার ধারণা এখনো শুধু অল্পশিক্ষিতের নয়, অধিক-শিক্ষিতেরও মনকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী মাত্রই জানে যে, পূর্ণিমার রাত্রিতে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িলে চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে অমাবস্যার চন্দ্র সমসূত্রে আসিলে সূর্যগ্রহণ হয়। গ্রহণের সময় হিন্দু ব্যতীত আর কোনো জাতির রন্ধনই অশুদ্ধ হয় না। সংরক্ষণশীল হিন্দুর গৃহে গ্রহণের আগেই রান্নাবান্না ও আহারাদি সারিয়া, একদিকে হাঁড়িকড়া-মাজার পালা অন্যদিকে সংকীর্তন-সহযোগে গঙ্গাস্নানের তাড়া পড়িয়া যায়। ইহাতে কত লোকের যে স্বাস্থ্য, অর্থ ও সময়ের ক্ষতি হয় তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু যানবাহনওয়ালা, পেশাদার ভিক্ষুক, মন্দিররক্ষক ও বিপ্রকুলের প্রচুর লাভ হয়।

এই সকল তথাকথিত পুণ্যস্নান, তীর্থস্নান ও অর্বাচীন শাস্ত্রবিহিত ধর্মাচারের মধ্যে কোনো যুক্তি নাই, বিচার নাই, তবে বিপ্র, পুরুক্ষী ও অন্ধ-বিশ্বাসীদের দুর্দান্ত ন্যায়ারোপণ আছে। অথচ আমাদের শাস্ত্রই বলিতেছেন—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে॥

দ্বাদশ প্রসঙ্গ

বুদ্ধিবৃত্তি

সিরিল বার্টের সমগোত্রীয় প্রত্যেক পণ্ডিতের মতে মানুষের **বুদ্ধি** (Intelligence) হইল সহজাত প্রবৃত্তির অন্যতম। সকল পণ্ডিত এ বিষয়ে একমত না হইলেও প্রত্যেক শিশুই যে কিছু বুদ্ধিবৃত্তির মূলধন লইয়া জগতে আসে এবং বিভিন্ন শিশুর মধ্যে এই কিছুর তারতম্য হয়, তাহা আমরা দশটি সদ্যোজাত শিশুর ছয় মাস অবধি ক্রমপরিবৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। বুদ্ধিবৃত্তি না থাকিলে অন্যান্য সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে শিশু চালনা করে কি করিয়া? ইহা ব্যতীত নিজের পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে গেলেও গোড়া হইতে কিছু বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন হয়।

বুদ্ধির সংজ্ঞার্থ ও প্রকৃতি

অন্ততঃ পঁচিশ জন আধুনিক মানসবিজ্ঞানী বুদ্ধির পঁচিশ রকম সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছেন। উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে বুদ্ধির নানাবিধ লক্ষণের কথা সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। অবশ্য এক-একজনের মতের সহিত অন্যান্য জনের মতের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। যাহা হউক, বুদ্ধি সম্পর্কে জনকয়েকের বাছা-বাছা মত আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; ঐগুলি একত্র মিলাইলে সম্ভবতঃ বুদ্ধির একটা চলনসই গোছের সংজ্ঞার্থ দাঁড় করানো যায়। সিরিল বার্ট বুদ্ধিকে জ্ঞানার্জনের একটি জন্মগত সাধারণ ক্ষমতা বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এই ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত নূতন পরিবেশের সংস্পর্শে আসিয়া, তাহার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইবার জন্য দেহ-মনের সংশ্লেষণকে নূতন-ভাবে সংগঠিত করিতে পারে।

বিনে (Binet) বলেন—অভিনিবেশ, অভিযোজন (Adaptability) এবং আত্মনিরীক্ষার (self-criticism) ক্ষমতাগুলিকে বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে সন্নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

এবিংহাউজ্ বলেন—বুদ্ধিবৃত্তির সারমর্ম হইল সংশ্লেষণ বা সংযোজনের ক্ষমতা, অর্থাৎ মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে একতাবদ্ধ করিয়া নূতন নূতন ধাঁচ (pattern) প্রস্তুত করার শক্তি।

স্টার্নের অভিমত হইল এই যে, জীবনের নূতন নূতন অবস্থা ও সমস্যার সহিত দেহমনকে অভিযোজিত করিবার সাধারণ ক্ষমতাকে বুদ্ধি বলে।

থর্নডাইক্ এবং আরো জনকয়েক মনোবিদ্ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বুদ্ধি হইল একটিমাত্র মানসিক ক্রিয়াশীলতা নয়, উহা হইল মনের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার যোগফল। এই ক্ষমতাগুলিকে তাঁহারা জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান হিসাবে অনুক্রমিকভাবে সাজাইয়াছেন। বিচার ও যুক্তিকে তাঁহারা স্মৃতি অপেক্ষা উর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন; স্মৃতিকে চেষ্টাবেদন-সমূহের উর্ধ্বে আসন দিয়াছেন; চেষ্টাবেদন ও পৈশিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে সংবেদনসমূহের উপরে বসাইয়াছেন। এই সকল ক্ষমতাই বুদ্ধির আয়ত্তাধীন।

তাঁহাদের মতে উচ্চস্তরের বিশেষ বিশেষ মানসিক ক্ষমতাগুলি পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ও পরস্পরের প্রতি সহায়তাপ্রবণ। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ও অন্য পর্যায়ের কর্মক্ষমতার সহিত উচ্চস্তরের কর্মক্ষমতার ঘনিষ্ঠতা খুব বেশী নয়। কেহ যদি বিজ্ঞানের একটি শাখায় পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের অন্য একটি শাখায় পাণ্ডিত্যলাভ করা তাহার পক্ষে সহজ। একজন রাসায়নিক অল্প চেষ্টায়ই পদার্থবিজ্ঞান বা ভূ-বিজ্ঞান বা উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে। একজন গণিতবিজ্ঞানবিশারদ অতি সহজেই উচ্চতর হিসাব-পরীক্ষা বিদ্যায়, আবহ-বিজ্ঞানে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে বা পূর্তবিদ্যায় কৃতবিদ্য হইতে পারে। কিন্তু এই সকল বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে প্রবন্ধ-লেখায়, রক্তৃতায়, খেলাধূলায়, সুকুমার শিল্পে, অভিনয়ে, সঙ্গীতে, সংসার-পরিচালনায়, সমাজতত্ত্বে বা কূটনীতিতে কৃতিত্বলাভ করিতে গেলে একটু কঠোর সাধনা করিতে হয়।

হোমরা-চোমরাদের নানারকম গোলমেলে অভিমতগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া আমরা বুদ্ধির একটা সংজ্ঞার্থ এইভাবে রচনা করিতে পারি :—বুদ্ধি হইল শিখিবার ও শিক্ষাকে বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ করিবার স্বাভাবিক

ক্ষমতা। এই নির্বচনটিকে অবশ্য আরো সম্প্রসারিত করা চলে। এই ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে বিবিধ বস্তুগত ও ভাবগত বিদ্যা, উপায়-কৌশল অধিগত করিবার সামর্থ্য ও তাহার সহিত কিছু সৃজনী কল্পনা বা ব্যবহারিক কল্পনার মিশ্রণ।

কিছু বুদ্ধি জন্মগত তাহা আগেই বলিয়াছি। যাহার নার্ভতন্ত্র এবং মস্তিষ্কের সংবেদন- ও চেষ্টাকেন্দ্রগুলি যত সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত, তাহার বুদ্ধি গোড়া হইতেই তত ধারালো হয়। যাহার বুদ্ধি যত ধারালো হয়, ততই তাহার শিখিবার ও শিক্ষাকে মনে রাখিবার আগ্রহ জন্মে। এই আগ্রহের সহিত যদি সুযোগ যোগ দেয় এবং পারিবেশিক অবস্থা অনুকূল হয়, তাহা হইলে একটি বুদ্ধিমান ছেলে বা মেয়ে বিদ্বান বা বিদুষী হইতে পারে অতি সহজে; কর্মক্ষেত্রে সে বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে।

একটি শিশুর মধ্যে, এমন কি একটা জানোয়ারের মধ্যে, কোনো কিছু ত্বরিৎ শিখিবার ক্ষমতা দেখিলে আমরা বলি—'দেখেছ, কি বুদ্ধি ওর!' বড়দের বুদ্ধির আমরা কিছু তারিফ করি যখন তাহারা কোনো নূতন জ্ঞান ও কোনো নূতন বিষয়ে নিপুণতা অর্জন করে। কিন্তু খুব বেশী প্রশংসা করি যখন তাহারা কোনো মৌলিক ভাবধারা প্রবর্তন বা কোনো নূতন সত্য আবিষ্কার বা নূতন কিছু কল-কব্জা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। নূতন আবিষ্কারের মধ্যেও পুরাতন প্রতিরূপ ও ভাবরূপ থাকে; তাহা লইয়া মানুষের চিন্তা সংযোজন-বিয়োজন-বিখণ্ডন-সংশ্লেষণ করিতে করিতে একটা নূতন পথের খোঁজ পায়। তাহার বোধি, শ্রমনিষ্ঠা ও ব্যবহারিক কল্পনা ঐ পথ দিয়া তাহাকে কল্পিত অভীষ্টের অভিমুখে টানিয়া লইয়া যায়।

পাশ্চাত্ত্য ও আমেরিকান্ মানসবিজ্ঞানীদের পরস্পরের মধ্যে বুদ্ধির প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগ লইয়া প্রচুর মতবিরোধ আছে। আমরা ঐ বিরোধের ভিত্তি ও বিষয়বস্তু লইয়া দীর্ঘ আলোচনা করিতে চাহি না। কেবল রাশিয়া ব্যতীত অন্যান্য সভ্যদেশগুলিতে বর্তমানে যে তিনটি মতবাদ সর্বাধিক প্রচলিত, সেই তিনটির অতি-সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

বুদ্ধি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

প্রথমটি হইল স্পীয়ারম্যান-গোষ্ঠীর—বুদ্ধির **দ্বিবিধত্ব মতবাদ** (Two-factor theory)। স্পীয়ারম্যানের মতে মানুষের দুই প্রকার বুদ্ধি আছে; একটি সাধারণ ও অন্যটি বিশেষ। তিনি সাধারণ বুদ্ধির নাম দিয়াছেন General Component এবং বিশেষ বুদ্ধির নাম দিয়াছেন Special Component। প্রথমটির সাঙ্কেতিক চিহ্ন *g* ও দ্বিতীয়টির *s*। তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল এই যে, জন্ম হইতে এক-একজনের মনে এক-এক রকম মাত্রায় সাধারণ বুদ্ধি সংযোজিত থাকে। উহা স্থিরনির্দিষ্ট, বাড়ে-কমে না। বিশেষ বুদ্ধি চর্চার দ্বারা, সাধনার দ্বারা বাড়িতে পারে। কোন ব্যক্তির একটি কাজে বিভিন্ন মাত্রায় ঐ দুই প্রকার বুদ্ধিই একযোগে নিয়োজিত হয়। স্পীয়ারম্যানের মতে, *g* ও *s*-য়ের সম্মিলিত ক্রিয়ার উপর প্রত্যেক কাজের সাফল্য নির্ভর করে। তিনি প্রতি-মানুষের এক-একটি কাজে বুদ্ধির পরীক্ষা-ফল বীজগণিতের সূত্রে প্রকাশ করা যায়, তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কিভাবে দেখাইয়াছেন তাহা দৃষ্টান্ত সহযোগে বিবৃত করিতে গেলে অনেকখানি স্থান অধিকার করিবে।

ভার্নন ও বার্ট বলেন—বুদ্ধির ভিতর শিক্ষা করিবার ও তাহা ব্যবহার করিবার নানাপ্রকার ক্ষমতা ওতপ্রোত আছে। এক-এক জাতীয় ক্ষমতা ছোট ছোট দল বাঁধিয়া অবস্থান করে। তাঁহারা আট প্রকারের প্রধান প্রধান ক্ষমতার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেগুলি হইল: (১) ভাষার শক্তি বা verbal ability, (২) সংখ্যার শক্তি বা numerical ability, (৩) যন্ত্র-ব্যবহারের শক্তি বা mechanical ability, (৪) সঙ্গীতবাদ্যের শক্তি বা musical ability, (৫) যুক্তিগর্ভ চিন্তাশক্তি বা logical ability, (৬) বিশেষ বিশেষ বিষয়ে স্মৃতিশক্তি, (৭) একাদিক্রমে গভীর মননশীলতা-প্রয়োগের শক্তি এবং (৮) একপ্রকার চিন্তাধারা হইতে ত্বরিৎগতিতে ও সাফল্যের সহিত অন্য প্রকার চিন্তাধারায় আত্মনিয়োগের শক্তি।

থার্সটোনের দৃঢ় ধারণা যে, বুদ্ধির একাধিক দিক বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন অংশ আছে যেগুলি এক-একপ্রকার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই স্বাধীন অংশগুলির উপর একটি বিশেষ বুদ্ধি অবশ্য কর্তৃত্ব করে। তাঁহার মতে বুদ্ধির

ক্রিয়াকে কাজের প্রকৃতি অনুসারে সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) স্থান সম্বন্ধে কোনো বস্তুর ত্রিমাত্রিক রূপ ও দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণা, (২) সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা, (৩) বাক্যের অন্তর্গত ভাব-গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, (৪) ভাবপ্রকাশের শব্দগুলি ত্বরিৎ কাজে লাগাইবার ক্ষমতা, (৫) স্মৃতিতে ধরিয়া রাখার ক্ষমতা, (৬) যুক্তিযুক্ত চিন্তা করিবার ক্ষমতা, (৭) প্রত্যক্ষণজাত সামগ্রীকে তাড়াতাড়ি চিনিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা।

আর একটি ক্ষুদ্র পণ্ডিতের দল বুদ্ধির তিনটি স্বতন্ত্র সেরেস্তা নির্দিষ্ট করিয়াছেন। একটির নাম **জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি** (Cognitive intelligence)। দ্বিতীয়টির নাম **অনুভবাত্মিকা বুদ্ধি** এবং তৃতীয়টির নাম **চেষ্টাত্মিকা বুদ্ধি** (Conative intelligence)। এই শ্রেণীবিভাগকে আমরা পছন্দ করি ও আপনাদিগকেও উহা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে বলি। জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি নূতন নূতন ভাব, তথ্য ও জ্ঞান সংগ্রহ করিবার এবং তদ্দ্বারা মৌলিক ভাব গঠন করিবার ক্ষমতা দেয়। এই বুদ্ধি বাল্য-কৈশোর-যৌবনে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যার্জন ও পরীক্ষায় কৃতকার্যতা-লাভের ব্যাপারে বিশেষভাবে কাজে লাগে। অনুভবাত্মিকা বুদ্ধি আমাদের অনুভূতি, আবেগ ও সংক্ষোভগুলিকে অবস্থানুসারে কমবেশী করিতে ও দমন করিতে সামর্থ্য দেয়। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক-রক্ষায় ও লোকপ্রিয়তা-অর্জনের ব্যাপারে এই বুদ্ধির অনুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। চেষ্টাত্মিকা বুদ্ধি হইল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নরূপে উপযোগী কার্য করিবার ক্ষমতা। ইহাতে সহজপ্রবৃত্তিগুলি, প্রতিবর্তী ক্রিয়াগুলি ও পৈশিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে অবস্থানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিতে এবং অভ্যাসে পরিণত করার যোগ্যতা জন্মায়। ইহা বহু অসামাজিক ইচ্ছা কার্যে পরিণত করার প্রবণতাকে দমন করিতে শিখায়; কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারিক দক্ষতা ও যান্ত্রিক কৌশল অধিগত করিতে শিখায়; সর্বোপরি মানুষের চরিত্রগঠনে সাহায্য করে।

উক্ত তিন প্রকার বুদ্ধিই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় বর্তমান। সুতরাং ইহার কোনটাই ফেলিবার নয়। চেষ্টাত্মিকা বুদ্ধি সুকুমার শিল্প, কারুশিল্প, ভাস্কর্যশিল্প, পূর্তবিদ্যা, যন্ত্রশিল্প, শ্রমশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে যেরূপ কাজে লাগে, তেমনি বস্ত্রবয়ন, সূচের কাজ, পশম বোনা, শালের কাজ,

হিসাবরক্ষণ, ঘরগৃহস্থালির কাজ, রন্ধনকলা, নৃত্য-গীত-সঙ্গীত কলায়ও সেইরূপ প্রয়োজন হয়। বুদ্ধির একটি অংশ একজন চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রকে পরীক্ষায় সসম্মানে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে; বুদ্ধির আর একটি অংশ তাহাকে কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসাবিদ্যার নানা শাখাকে কৃতিত্বের সহিত নিয়োজিত করিতে শিক্ষা দেয়; বুদ্ধির তৃতীয় অংশটি চিকিৎসককে হাসপাতালে নার্স ও সহযোগীদের সহিত সুব্যবহার করিতে এবং রোগীদিগের প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে শিক্ষা দেয়।

ধী বলিতে কি বুঝায়

ধী (Intellect) হইল বুদ্ধির আর একটু উচ্চ স্তরের ক্ষমতা। প্রকৃতিদত্ত অল্প বুদ্ধির পুঁজি লইয়া মানুষ যখন বিরাট অধ্যবসায়, অমানুষিক পরিশ্রম ও ব্যবহারিক কল্পনা-বলে তাহার তিনপ্রকার বুদ্ধিকে যথাসাধ্য বাড়াইয়া প্রতিভাশালী হয় এবং একটা বিজ্ঞানসম্মত উদার জাগতিক দৃষ্টির অধিকারী হয়, তখন তাহাকে 'সুধী' বলা হয়। আমাদের শাস্ত্রকারগণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আটটি গুণ অথবা লক্ষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; এই নিরুক্তিকে বোধহয় আধুনিক যুগের পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানিগণ কটূক্তি করিতে সাহসী হইবেন না। ঐ অষ্ট ধীগুণ হইল—(১) শুশ্রূষা বা জানিবার ইচ্ছা, (২) শ্রবণ, (৩) গ্রহণ, (৪) ধারণ, (৫) উহ বা তর্কক্ষমতা, (৭) অপোহ বা তর্ক-খণ্ডনের ক্ষমতা, (৭) অর্থবোধ ও (৮) তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। বাহিরের সুযোগ ও ভিতরের তাড়না যখন বুদ্ধিকে সচল, সক্রিয় ও শাণিত করে, তখনি ধীশক্তি আয়ত্ত করা সুসাধ্য হয়। যৌবনপ্রারম্ভ হইতে বার্ধক্যের মধ্যভাগ (১৭৬৫।৬৬ বৎসর বয়স) অবধি ধীশক্তিকে ধীরে ধীরে পরিবর্ধিত করা সম্ভবপর। তাহার পর উহা দ্রুত কমিয়া যায়।

বুদ্ধি-পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি

পণ্যদ্রব্য যেমন দাঁড়িপাল্লায় মাপা যায়, ঔষধ যেমন মেজার-গ্লাসে মাপা যায়, বুদ্ধি-মাপারও সেইরূপ নানারূপ পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানিকগণ পরীক্ষণাগারে দীর্ঘকাল গবেষণার পর উদ্ভাবন করিয়াছেন। পারী শহরের নিম্ন বিদ্যালয়ের

ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধি-পরিমাপ করিবার জন্য ১৯০৮ সালে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া আল্‌ফ্রে বিনে ও থাওদোর সিমঁ (Binet and Simon) নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ্ একটি আদর্শ পদ্ধতি বাহির করেন—যাহা অতঃপর শুধু সমগ্র ফ্রান্সে নয়, জগতের বহু দেশে পরিগৃহীত হয়। বহু বৎসর ধরিয়া ইহাতে সর্বত্র সন্তোষজনক ফল দেখা যাইতেছে। এই পদ্ধতিকে বলা হইত Binet-Simon scale।* আমেরিকায় এই পদ্ধতিকে খানিকটা অদল-বদল করিয়া তৈয়ারি হয় Sanford-Binet scale।

এই সকল পরীক্ষণ-পদ্ধতি ভাষাভিত্তিক ছিল, অর্থাৎ মুখে-মুখে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর লওয়া হইত। এক-এক বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য এক-এক প্রস্থ করিয়া পৃথক প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে পিণ্টনার ও প্যাটারসন্* ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা ব্যতীত হাতের কাজ দিয়া একপ্রকার কর্মসম্পাদন-পরীক্ষার পদ্ধতি বাহির করেন। সাধারণতঃ ইহাতে কতকগুলি ছোট ছোট চতুষ্কোণ ব্লক থাকিত, তাহার প্রত্যেকটির এক-পিঠে বা চারি পিঠেই একটি সম্পূর্ণ ছবির একটি ভগ্নাংশ আঁকা থাকে। পরীক্ষার্থীকে বলা হয় ব্লকগুলি গায়ে-গায়ে জোড়া লাগাইয়া ছবিটির সম্পূর্ণ রূপ দিতে। অথবা, কতকগুলি সাদা ব্লক সাজাইয়া কোনো একটা জ্যামিতিক আকার গঠন করিতে বলা হয়। অথবা, একখানি আস্ত ছবির উপর এক-একটি ক্ষুদ্র স্থান ফাঁকা বা অসম্পূর্ণ রাখিয়া, সেই স্থানে এক-একটি যোগ্য ছবির ব্লক বসাইতে বলা হয়। অথবা, একটি কুকুর বা মানুষের রেখাচিত্র আঁকিতে আদেশ করা হয়।* এই সকল কাজের প্রত্যেকটিতে পরীক্ষার্থী কতবার করিয়া চেষ্টা করে, কাজটি সম্পন্ন করিতে কত সময় লয় এবং কাজটি কিরূপ নিখুঁত হয়, তাহার হিসাব লইয়া উহার বুদ্ধি স্থির করা হয়। এখনো সর্বত্র এই ধরণের পরীক্ষা লওয়ার রীতি প্রচলিত রহিয়াছে।

---

* L. M. Terman, *The Measurement of Intelligence* (Houghton Mifflin, 1916)

* Rudolph Pintner and D. G. Paterson, *A Scale of Performance Tests* (Appleton, 1917)

বিনে ও সিমঁ দুইজনেরই এই যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস হইয়াছিল যে, প্রত্যেক ছেলে বা মেয়ের একটা সময়গত বয়স (Chronological age) ও একটা মানসিক পরিণতির বয়স (Mental age) আছে। তাঁহারা মনে করিতেন—আট বৎসর বা তাহার নিম্নবয়স্ক কোনো ছেলে বা মেয়ের মানসিক পরিণতির বয়স যদি তাহাপেক্ষা দুই বৎসর কম-বয়স্ক ছেলেমেয়ের মানসিক পরিণতির মত হয়, তাহা হইলে তাহাকে নির্বোধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আবার, দশ বৎসর বা তাহার উর্ধ্ববয়স্ক কোনো ছেলে বা মেয়ের মানসিক পরিণতির বয়স যদি তাহাপেক্ষা তিন বৎসর কমবয়স্ক ছেলেমেয়ের মানসিক পরিণতির মত হয়, তাহা হইলে তাহাকে নির্বোধ বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে। এই সকল নির্বোধকে গড়বুদ্ধির স্তরে আনা খুব কষ্টসাধ্য।

প্রত্যেক বৎসরের বয়সের জন্য যে পৃথক প্রশ্নাবলী আছে, তাহার উত্তর শুনিয়া বিনে-সিমঁ পরীক্ষার্থীর মানসিক বয়স কত তাহা সহজেই স্থির করিতেন; এখনো কতকটা এই ভাবেই স্থির করা হয়। তাঁহারা এই মানসিক বুদ্ধির হিসাবটি অঙ্কের দ্বারা স্থির করিবার একটি সংকেত (formula) বাহির করিয়াছিলেন, যাহা এখনো বহু দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। এই হিসাবটির নাম হইল **বুদ্ধি-ভাগফল** (Intelligence Quotient)। সংকেতটি নিম্নলিখিতরূপ :

$$\text{বুদ্ধি-ভাগফল (I. Q.)} = \frac{\text{মানসিক বয়স (M.A.)}}{\text{সময়গত বয়স (C.A.)}} \times ১০০$$

কাহারো সময়গত বয়স যদি ১০ ও মানসিক বয়স হয় ১২ তাহা হইলে পূর্বোক্ত সংকেতানুসারে বুদ্ধি-ভাগফল হইতেছে—

$$\frac{১২}{\cancel{১০}} \times \overset{১০}{\cancel{১০০}} = ১২০ \text{ বু. ভা.}$$

বলা বাহুল্য, এই ছেলে বা মেয়েটির বুদ্ধি গড়পড়তা ছেলে বা মেয়ের বুদ্ধি অপেক্ষা বেশী। টার্ম্যান তিন হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বহু ছেলের মানসিক বয়স পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়া ও বুদ্ধির তারতম্যানুসারে তাহাদিগকে

শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, তাহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর বুদ্ধিভাগফল কত হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে বার্ট ও স্পীয়ারম্যান এই শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিনে-সিমঁ-টার্ম্যানের পদ্ধতি লইয়া ব্যাপক পরীক্ষা করিয়াছেন। ওই পদ্ধতির কিছু উন্নতি সাধন করিয়া তাঁহারা ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধি-পরিমাপের একটা বৈজ্ঞানিক উপায় বাহির ও বুদ্ধির স্তরভেদ-প্রদর্শক একটি সুন্দর নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন।—

প্রতিভাশালী বা তাহার কাছাকাছি	১৪০	বু. ভা.
অত্যন্ত উচ্চস্তরের বুদ্ধিমান	১২০—১৪০	„
উচ্চস্তরের বুদ্ধিমান	১১০—১২০	„
স্বাভাবিক বা গড়	৯০—১১০	„
স্বল্পবুদ্ধি বা বুদ্ধিতে পশ্চাৎপদ	৮০—৯০	„
জড়বুদ্ধির সীমারেখায়	৭০—৮০	„
জড়বুদ্ধিসম্পন্ন (ক) 'মরোন্' (Moron)	৫০—৭০	„
(খ) 'ইম্‌বেসাইল্ (Imbecile)	২০—৫০	„
(গ) 'ইডিঅট্' (Idiot)	২০র নীচে	„

বহু পর্যবেক্ষণের ফলে ইহা নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক বালকবালিকার বুদ্ধি বারো বৎসর পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট হারে বাড়ে, তারপর বৃদ্ধির গতি অনিয়মিত হয়; ষোলো বৎসর বয়সের পর সাধারণতঃ কাহারো বুদ্ধির সামর্থ্য, মাত্রা বা প্রাখর্য আর বাড়ে না। যদিও তাহার অভিজ্ঞতা বাড়ে, কর্মক্ষমতা বাড়ে, অর্জিত বিদ্যার পরিমাণ বাড়ে।*

* "In the case of a person sixteen years of age or *more*, the intelligence quotient is obtained by dividing the mental age by sixteen on the assumption that the abilities measured by the test do not improve much after sixteen years of age."—*Psychology : Normal and Abnormal*, J. W. Bridges, p. 414 (Appleton, 1930).

"The degree of intelligence is not considered to increase after sixteen years of age, though the mental content of the individual does and should do so."—*Hygiene and Health Education*, M. B. Davies, p. 234 (Longmans, 1948)

যাহাদের বু. ভা. ৭০ দেখা যায়, তাহাদিগকে বহু আয়াসের দ্বারা ৯০য়ের কাছাকাছি টানিয়া তোলা যায়। তাহার উপরে আর তোলা যায় না। যাহাদের বু. ভা. ৭০য়ের নীচে, তাহাদিগকে কোনো বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতির দ্বারাই উন্নত করিবার আশা করা অসঙ্গত। একটি প্রাপ্তবয়স্ক মরোন্ চিরদিনই সাত হইতে দশ বৎসর বালকের বুদ্ধিতে নিবদ্ধ থাকিয়া যায়। কেবল তিন হইতে ষোলো বৎসর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদিগকে পরীক্ষা করিয়াই যে তাহাদের বুদ্ধির পরিমাপ পাওয়া যায়—এমন নয়, আঠারো বা তাহার ঊর্ধ্ব বয়স্ক তরুণ-তরুণীদিগকে পরীক্ষা করিয়াও তাহাদের বুদ্ধি কতখানি পরিণত হইয়াছে তাহা যেরূপ জানা যায়, তেমনি কোন্ বিশেষ বিদ্যা বা পেশার দিকে তাহাদের প্রবণতা তাহাও কিছুটা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। টার্ম্যান-স্পীয়ারম্যানের স্কেল ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া এখন পৃথিবীর সর্বত্র চালু হইয়াছে। ইহার দ্বারা একসঙ্গে সেনাবিভাগে কর্মপ্রার্থীদিগকে ও নানা অফিসে চাকরির দরখাস্তকারীদিগকেও পরীক্ষা করিয়া, তাহাদের আপেক্ষিক যোগ্যতা স্থির করা হইতেছে।

তিন হইতে ষোলো বৎসরের বালকবালিকাদিগের বুদ্ধি কি কি লক্ষণ ও কি কি প্রশ্নের উত্তর দ্বারা স্থির করা হয়, তাহার কতকগুলি বিচ্ছিন্ন নমুনা নিম্নে লিখিয়া দেওয়া হইল। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিবার জন্য প্রশ্নগুলির কোনো কোনোটার মধ্যে যৎসামান্য ইতরবিশেষ করা হইয়াছে। আপনারা নিজের নিজের বাড়ির ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি-ভাগফল এই প্রশ্নাবলীর সাহায্যে মোটামুটি স্থির করিতে পারেন।

তিন বৎসর বয়স্ক শিশুদের গড় বুদ্ধির লক্ষণ

(১) জিজ্ঞাসা করিলে নিজের নাক, দুইটি চক্ষু, দুইটি কান, মুখের হাঁ ও জিব দেখাইতে পারে।

(২) নিজের বরাঙ্গজাতি (sex)—ছেলে না মেয়ে বলিতে পারে।

(৩) চাবি-তালা, অন্ততঃ দুই রকমের মুদ্রা, একটা ছুরি বা কাঁচি বা বঁটি দেখাইতে পারে।

(৪) অন্ততঃ তিনটি রঙের ঠিক্ ঠিক্ নাম বলিতে পারে।

(৫) নির্ভুলভাবে নিজের পূর্ণ নাম ও পিতার নাম বলিতে পারে।

(৬) তিনটি জিনিস বা মানুষ গণিতে পারে। অথবা ৩, ৭ ; ৬, ৪ ; ৯, ৫ পর পর একবার করিয়া বলিয়া গেলে, তাহা শুনিয়া আবৃত্তি করিতে পারে। [ইহার মধ্যে অন্ততঃ একটা প্রস্থ ঠিক্ বলিতে পারিলেই যথেষ্ট।]

ছয় বৎসর বয়স্ক শিশুদের গড় বুদ্ধির লক্ষণ

(১) পাঁচটি অংকের নিম্নলিখিত দুইটি রাশি প্রতিটি তিনবার করিয়া বলিয়া গেলে তাহা যথাযথ আবৃত্তি করিতে পারে ; ৫২৯৩৭, ৬৮৫৩২।

(২) নিজের কোন্ দিকটি ডান কোন্ দিকটি বাম বলিতে পারে। নিজের ডান হাত, বাঁ চোখ ও ডান কান অভ্রান্তভাবে দেখাইতে পারে।

(৩) সপ্তাহের সাতটি দিনের নাম পর পর বলিতে পারে।

(৪) প্রতি হাতে ও প্রতি পায়ে কয়টি করিয়া আঙুল আছে বলিতে পারে। [ঠিক বলিলে, ইহার পর হাতে-পায়ে মোট কয়টি আঙুল আছে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।]

(৫) এলোমেলোভাবে তেরটি পয়সা চতুর্দিকে ছড়াইয়া রাখিয়া, তাহা এক দুই তিন করিয়া গণিয়া তুলিতে পারে।

(৬) একটা উপবৃত্ত (ডিম), একটা গোল ও একটা চতুষ্কোণ দেখিয়া আঁকিতে পারে। [খানিকটা ঠিক হইলেই যথেষ্ট।]

(৭) একটি দুই-পয়সা, একটি তিন-পয়সা, একটি পাঁচ-পয়সা ও একটি দশ-পয়সার মুদ্রা চিনিতে পারে। [মোট কয় পয়সা হইল যোগ করিয়া বলিতে পারে কিনা ?]

১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের গড় বুদ্ধির লক্ষণ

(১) নিম্নলিখিত পাঁচটি বাক্যের মধ্যে অসঙ্গতি ধরিতে পারে ;—

ক) কাল যে ছেলেটি বাসের তলায় চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছিল, তাহার বোধ হয় আর বাঁচিবার আশা নাই।

খ) আমার তিনটি ভাইবোন আছে,—সুমঙ্গল, রেবা এবং আমি।

গ) সেদিন যে ট্রেন দুর্ঘটনা হইয়া গেল, তাহাতে খুব গুরুতর ক্ষতি হয় নাই। মাত্র দু'খানা বগি ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, ৪৭টি লোক মারা গিয়াছে, আহতের সংখ্যা আন্দাজ একশত হইবে।

ঘ) মেয়েটির দেহ আঠারো খণ্ডে কর্তিত দেখা গিয়াছিল; মনে হয় সে আত্মহত্যা করিয়াছিল।

ঙ) দুলাল বলিল যে, বৃহস্পতিবারের বারবেলায় সে আত্মহত্যা করিবে না, কারণ ঐ সময়টি বরাবরই তাহার নিকট অশুভ।

(২) তাহার দেখা-শোনা ষাটটি জিনিসের নাম তিন মিনিটের মধ্যে বলিয়া যাইতে পারে।

(৩) অন্ততঃ কুড়ি হইতে তেইশটি শব্দ-সম্বলিত কয়েকটি সম্পূর্ণ বাক্য লিখিতে পারে। [৩টি, ৪টি বা ৫টি করিয়া শব্দ প্রত্যেক বাক্যে থাকিবে।]

(৪) পাঁচটি অঙ্ক-সমন্বিত একটি রাশি একবার বলিলে, তাহা উল্টা দিক হইতে নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করিতে পারে।*

অন্যান্য পরীক্ষা-পদ্ধতি

বুদ্ধি-পরীক্ষার আরো নানাপ্রকার প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ-করণ পরীক্ষা একটি। দুইটি ভিন্নপ্রকার উদ্দেশ্যসাধক কতকগুলি দ্রব্যের নাম এলোমেলোভাবে সাজাইয়া, একই প্রকার বা সদৃশ অর্থবাহী শব্দগুলিকে হয় বাছিয়া লিখিতে বলা হয় নতুবা এক এক জাতীয় নামগুলিকে পর পর দুই পংক্তিতে লিখিতে বলা হয়। যেমন ধরুন,—কালি, জুতা, কলম, ছাতা, জামা, কাগজ, স্যাণ্ডাল, বই, টুপি, মোজা, খাতা, পেন্সিল। কিংবা এই বস্তুগুলির ছোট ছোট চৌকা কার্ডবোর্ডে ছাপানো ছবি পরীক্ষার্থীর সম্মুখে দিয়া, এক-এক জাতীয় বস্তুর ছবি বাছিয়া তুলিয়া লইতে আদেশ করা হয়।

* এই প্রশ্নগুলি H. Herd লিখিত *Diagnosis of Mental Deficiency* (Hodder Stoughton, 1945) বইখানির সাহায্য লইয়া গঠিত হইয়াছে।

অনুষঙ্গ-বোধের সহিত বালক বা বালিকার কতখানি পরিচয় তাহা পরীক্ষার জন্য তাহাকে নিম্নলিখিত রূপ গুটিকয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়—

"ছুরি বল্‌লে এর সঙ্গে তোমার কোন্ জিনিসটির কথা মনে পড়ে?"

"একটা পেয়ালা দেখে তোমার কোন্ জিনিসটির কথা মনে পড়ে?"

"বই দেখলে অন্য কোন্ জিনিসটির কথা তোমার মনে আসে?"

"একটা ছাতা দেখে তোমার কিসের কথা মনে পড়ে?"...ইত্যাদি।

এই প্রশ্নগুলি ছবির সাহায্যেও করা যায়। কখনো কখনো বিপরীতার্থবোধক কয়েকটি শব্দ জিজ্ঞাসা করা হয়; যথা, নির্দয়, সুখী, বলবান, মলিন, সুন্দর, তরল, মোটা, লম্বা ইত্যাদির বিপরীত গুণবাচক বিশেষণ।

একটি গড় বুদ্ধিসম্পন্ন সাত বৎসর বয়স্ক ছেলে বা মেয়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর দিতে সমর্থ, তাহা সিরিল বার্ট নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন:—

অনিল অরুণের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান।

অরুণ বঙ্কিমের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান।

সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান কে—বঙ্কিম, অরুণ, না, অনিল?*

একটি নয় বৎসর বয়স্ক ছেলে নিম্নলিখিত প্রশ্নটির জবাব দিতে পারে:—

তিনটি মেয়ে এক সারিতে বসিয়া আছে। অজন্তা তপতীর বাঁয়ে বসিয়া রহিয়াছে, আরতি অজন্তার বাঁয়ে বসিয়া আছে। বলতো মাঝখানটিতে কে বসিয়া আছে?

বয়ঃপ্রাপ্ত (ষোলো বা তাহার উর্দ্ধবয়স্ক) ছেলেমেয়েদের সাধারণ বুদ্ধির পরীক্ষা করা হয় যুক্তিমূলক প্রশ্নের দ্বারা। টার্ম্যান্ এইরূপ একটি প্রশ্নের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি ৩-পিণ্টের মাপ-পাত্র আর ৫-পিণ্টের মাপ-পাত্র আছে, কি করিয়া ঠিক ৭-পিণ্ট জল মাপিয়া একটি পাত্রে রাখা যায়?

এককালে আমাদের দেশে কেরানি-পদপ্রার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষায় নিম্নলিখিত প্রশ্নটি বহুবার প্রদত্ত হইয়াছিল:—

এক ব্যক্তি একটি পোষা বাঘ, একটি সদ্যক্রীত গরু এবং এক বোঝা খড়-সমেত ধান লইয়া একটি নদীতীরে আসিয়া ছোট্ট একখানি খালি ডিঙ্গি নৌকা

* C. Burt, *Mental and Scholastic Tests* (P. S. King & Son Ltd.)

দেখিতে পাইল। ওপারে তাহার ঘর। একসঙ্গে ঐ তিনটি প্রাণী ও দ্রব্য ছোটো নৌকায় ধরে না, একবারে একটি করিয়া মাল সে বহন করিতে পারে। তিনবারে ঐ তিনটি মাল সে কি করিয়া ওপারে লইয়া যাইবে? খাদ্য ও খাদককে সে একসাথে অরক্ষিত অবস্থায় রাখিতে পারিবে না, তাহা হইলে একটি আর একটিকে খাইবে, তাহার ক্ষতি হইবে।

শ্রুতিলিখন, স্বাক্ষর ও হাতের লেখা দেখিয়া বুদ্ধিনিরীক্ষার কতকগুলি পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

যাহা হউক, নানারূপ বুদ্ধি-পরীক্ষার প্রণালী-প্রয়োগে বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিদের বুদ্ধির নিখুঁত পরিমাপ করা সম্ভবপর নয় এবং প্রণালীগুলি এখনো পূর্ণাঙ্গ নয়। তাহা ছাড়া, উহাদের দ্বারা বুদ্ধির সর্ব দিক বিচার করিয়া দেখা যায় না এবং তাহার ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি-প্রবণতা সুস্পষ্ট বোঝা যায় না। মানুষের বুদ্ধির সহিত তাহার বিশেষ কর্মক্ষমতা, বিশেষ আসক্তি ও অন্তঃপ্রকৃতির গুণগুলিও পরিমাপ করার প্রয়োজন রহিয়াছে বুঝিয়া, তদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরীক্ষা-প্রণালী ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হইয়াছে ও হইতেছে।

ত্রয়োদশ প্রসঙ্গ

প্রকৃতি, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব

আপনারা এতক্ষণ মন সম্বন্ধে কিছু স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিলেন। ইহাও নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, মানুষের দেহকে জানা যতখানি কঠিন, মনকে জানা তাহার চেয়েও অনেক বেশী কঠিন। তাহার প্রধান কারণ হইল দেহ বাস্তব ও সীমায়িত, মন হইল নির্বস্তুক ও অসীমায়িত সত্তা—যাহাকে তাহার ধর্ম ও লক্ষণ দ্বারা খানিকটা মাত্র ধরা যায়। আর একটি পরিজ্ঞান আপনাদের অবশ্যই হইয়াছে যে, দেহের সহিত মনের—বিশেষভাবে মস্তিষ্কের সহিত মনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; সে সম্পর্ক কোন্ দিক্ দিয়া কতখানি গভীর তাহা লইয়া এখনো গবেষণা ও অন্বীক্ষণ চলিতেছে। মস্তিষ্কের জড়ত্ব ও মনের চৈতন্য এমনভাবে মাখামাখি হইয়া রহিয়াছে যে, কোন্‌টির কোথায় আরম্ভ ও কোথায় শেষ তাহা নিশ্চিত করিয়া কেহই বলিতে পারে না।

মনের অনেকগুলি দিক্, বিভাগ, ক্রিয়া, লক্ষণ ও গুণ সম্বন্ধে আপনাদের নিকট কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছি, ইহাতে সম্ভবতঃ মনকে পূর্বাপেক্ষা একটু ভালো করিয়া চেনা আপনাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে।* নিছক মনের আর একটি দিকের সহিত এইবার আপনাদের পরিচয় ঘটাইতে চাই। এই দিক্‌টির নাম দিয়াছি "প্রকৃতি", ইংরাজিতে যাহাকে বলা হয় temperament। কখনো কখনো nature শব্দটি ব্যবহার করিয়া মানুষের প্রকৃতিকে বুঝানো হয়। স্বর্গত উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী প্রিন্সিপ্যাল্ গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয় temperamentয়ের পরিভাষা করিয়াছিলেন 'প্রকৃতি'; এই কথাটি আপাততঃ সর্বাপেক্ষা উপযোগী বুঝিয়া আমি ইহাই সশ্রদ্ধায় পরিগ্রহণ করিলাম।

প্রকৃতি হইল মানুষের চরিত্রের একটা বড় অংশ, কিন্তু প্রকৃতি ও চরিত্র দুইটি অভিন্ন নয়। প্রকৃতির স্বরূপ ও সংজ্ঞার্থ লইয়া মহাজনদের মধ্যে দারুণ বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছে, এখনো হইতেছে। আমরা ইহার মধ্য হইতে আমাদের

চলিবার মত একটা সরল নিরাপদ পথ বাহির করিয়া তাহার মাধ্যমে প্রকৃতি সম্পর্কে একটা সুবোধ্য ধারণা করিয়া লইব।

প্রকৃতি-বিভাগ—প্রাচীন ও আধুনিক

খৃষ্ট-জন্মের বহু পূর্বেই গ্রীক্ বৈদ্য গ্যালেন মানব-প্রকৃতিকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া, ঐ চারিটিকে শরীরের অভ্যন্তরে নিঃসৃত চারি প্রকার রসের প্রভাবাধীন বলিয়াছিলেন; অর্থাৎ তাঁহার মতে ঐ চারি প্রকার অন্তঃরসের একটির আধিক্য বা প্রাধান্য এক-এক প্রকার প্রকৃতি সৃষ্টি করে। গ্যালেনের ঐ চারি প্রকার প্রকৃতির ইংরাজি নাম হইল—(১) *Choleric* temperament, (২) *Sanguine* temperament, (৩) *Melancholic* temperament ও (৪) *Phlegmatic* temperament। মনুষ্য-প্রকৃতির এই চারি প্রকার বিভাগ মধ্যযুগ পর্যন্ত ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ মানিয়া লইতেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও ভূণ্ট প্রমুখ মনোবিদ্‌গণও এই বিভাগানুযায়ী মনুষ্যদিগকে পৃথক করিয়া দেখিতেন।

আমাদের দেশেও চরক হইতে চক্রদত্ত পর্যন্ত বৈদ্যকশাস্ত্র-বিশারদগণ পৃথিবীতে তিন প্রকার ধাতুর মনুষ্য দেখা যায় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন—বায়ুপ্রধান, পিত্তপ্রধান ও কফপ্রধান। গ্যালেনের শ্রেণীবিভাগ ও প্রত্যেক শ্রেণীর বিশিষ্ট লক্ষণের সহিত হিন্দু পণ্ডিতদিগের শ্রেণীবিভাগের কিছু কিছু মিল দেখা যায়।

Choleric প্রকৃতির লোকেরা সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। কাজের মধ্যে ইহারা ত্বরিৎগতিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। প্রেমের ব্যাপারে ও ঘৃণার ব্যাপারে ইহারা পূর্বাপর চিন্তা করে না, যুক্তির ধার ধারে না। বাধা ও প্রতিবাদ সহিতে পারে না। ইহারা অল্পবিস্তর বদমেজাজী ও জেদী। এইরূপ মানুষগুলি আমাদের শাস্ত্রমতে পিত্তপ্রধান প্রকৃতির। Sanguine প্রকৃতির লোকগুলি উৎসাহী, আত্মবিশ্বাসী, প্রেমিক, আমুদে ও আশাবাদী হয়। Melancholic প্রকৃতির ব্যক্তিগণ একটু ঢিলা বা অলস হয়। কর্ম অপেক্ষা চিন্তা ইহাদের প্রধান অবলম্বন। একটুতেই ইহারা অবসন্ন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। দিবাস্বপ্নে

মগ্ন হইয়া ইহারা অপূর্ব পুলক লাভ করে। ইহারা স্বভাবতঃ নৈরাশ্যবাদী, দাসমনোভাবাপন্ন ও পরের কথায় নাচে। এইরূপ প্রকৃতির লোকগুলিকে আমাদের শাস্ত্রমতে বায়ুপ্রধান ধাতুর বলা যায়। Phlegmatic প্রকৃতির লোকেরা সহজে উত্তেজিত হয় না। তাড়াতাড়ি কোনো কাজ সারিতে পারে না; অত্যন্ত ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করে; খুব ধীর ঠাণ্ডা। ইহারা কাহারো সাতে-পাঁচে থাকে না বটে, কিন্তু বেশ একটু স্বার্থপর, অনুভূতিশূন্য, উদাসীন হয়। আমাদের চরক মুনির মতানুসারে এই লোকগুলিকে শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুর এলাকাভুক্ত করা চলে।

আপনারা আগের একটি অধ্যায়ে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহ, তাহাদের বিশিষ্ট অন্তঃস্রাব ও আমাদের দেহমনের উপর উহাদের প্রত্যেকটির প্রভাব সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে আপনাদিগকে বলিয়াছিলাম—আপনাদের স্মরণ আছে বোধ হয় যে, কোনো কোনো পণ্ডিত ঐ গ্রন্থিগুলির এক-একটির অন্তঃরসের প্রাধান্যানুসারে এক-একজন ব্যক্তিকে এক-একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।* দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা থাইরএড্-প্রধান, অ্যাড্রেন্যাল-প্রধান, পিটুইটারি-প্রধান ও বারাঙ্গিকরস-প্রধান—এই চারিটি মুখ্য শ্রেণীতে পৃথিবীর যাবতীয় লোকগুলিকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত পণ্ডিতগণের মতে থাইরএড্-প্রধান লোকগণ সর্বদা চঞ্চল, উত্তেজনশীল অথচ একটু ভীরুস্বভাব হয়। অ্যাড্রেন্যাল্-প্রধান ব্যক্তিগণ অত্যন্ত তেজী, কর্মঠ হইয়া থাকে; উহাদের একদল হয় আশাবাদী, আর একদল হয় আত্মবিশ্বাসী ও জেদী। গ্যালেন ও আধুনিক গ্রন্থিরস-তাত্ত্বিকদের এই সকল শ্রেণীবিভাগ কিছু পরিমাণে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য নয়।

এইবার প্রকৃতি জিনিসটির স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করা যাক্। প্রকৃতি হইল মানুষের স্বভাবের এমন একটি অংশ যাহা অনুভব ও সংক্ষোভ লইয়া গঠিত এবং যাহা প্রত্যেক অনুভব ও সংক্ষোভকে প্রয়োজনমত সংযুক্ত করিতে, বিচ্ছিন্ন

* Louis Berman, *The Glands Regulating Personality* (Macmillan, 1921).

করিতে ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। পৃথিবীর প্রত্যেক লোকের মধ্যে যেরূপ সমপরিমাণে অনুভবশক্তি ও সংক্ষোভ-প্রকাশশক্তি থাকে না, সেইরূপ প্রত্যেক লোকের মধ্যেই এক-একটি অনুভব ও সংক্ষোভ প্রাধান্যলাভ করে এবং বহির্জগতের সহিত আদান-প্রদানে ঐগুলি সহজে প্রকাশ পায়।

এইরূপ একটি বিশেষ অনুভব ও একটি বিশেষ সংক্ষোভাধিক্যযুক্ত ব্যক্তিগণ এক-একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত। বিমর্ষতা বা দুঃখ একটি অনুভব, আনন্দ-শূন্যতা বা নৈরাশ্য একটি অনুভব, প্রফুল্লতা একটি অনুভব, মনশ্চাঞ্চল্য একটা অনুভব, স্বচ্ছন্দচিত্ততা একটা অনুভব। আবার, ক্রোধ একটি সংক্ষোভ, বরাঙ্গকাম একটি সংক্ষোভ, ভয় একটি সংক্ষোভ, সাহস একটি সংক্ষোভ, অপত্যস্নেহ বা করুণা একটি সংক্ষোভ, ঘৃণা একটি সংক্ষোভ, বিনয় বা দাস্যভাব একটি সংক্ষোভ।

তাহা হইলে আমরা উপরোক্ত একটি অনুভব বা সংক্ষোভ-প্রবণ ব্যক্তিকে সেই প্রকৃতির লোক বলিয়া স্থির করিতে পারি। কাজেই রুক্ষ প্রকৃতির, গোঁড়া প্রকৃতির, ধার্মিক প্রকৃতির, নিষ্ঠুর প্রকৃতির, হিংসুটে প্রকৃতির, হিংস্র প্রকৃতির, ভীরু প্রকৃতির, গম্ভীর প্রকৃতির, দয়ার্দ্র প্রকৃতির, দাম্ভিক প্রকৃতির, ক্রোধী প্রকৃতির, প্রেমিক প্রকৃতির, শান্ত প্রকৃতির, অস্থির প্রকৃতির, ভাবুক প্রকৃতির মানুষ আমরা চতুর্দিকে দেখিতে পাই। যাহারা ভীরু বা হিংস্র প্রকৃতির, তাহারা যে অন্য অনুভব ও সংক্ষোভ-বর্জিত—তাহা নয়, সেগুলি তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পমাত্রায় থাকে।

একটি ভীরুপ্রকৃতির ব্যক্তি সময়-বিশেষে চরম সাহসের পরিচয় দিতে পারে। একটি বিনয়ী ব্যক্তি ক্ষেত্রবিশেষে ঘোর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে পারে। একটি বিশ্বনিন্দুক-প্রকৃতির লোক কোনো মনীষী অথবা কোনো পামরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতে পারে। একটি অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক অন্ততঃ একটি অত্যন্ত অসহায় ব্যক্তিকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারে। পাগলা-হত্যাকারী বলিয়া কুখ্যাত, দুরন্ত নিষ্ঠুর ও লম্পট, খোকা গুণ্ডা গুটিকয়েক দরিদ্র ঘরের মেয়েকে ভগ্নী সম্বোধন করিয়া নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিত।

তাহা হইলে প্রকৃতি বলিতে আমরা বুঝি—মানুষের মনের সমস্ত অনুভব

ও সংক্ষোভের সমষ্টি এবং তাহাদের মধ্যে একটির সর্বাধিক প্রাবল্য। সি. বি. ড্যাভেনপোর্টের মতে মানুষের প্রকৃতি মূলতঃ বংশগত, কিন্তু এ মত এখনো প্রমাণসাপেক্ষ। তবে ইহা সত্য যে, প্রধানতঃ শৈশববাল্যের পরিবেশ ও কৈশোর-যৌবনের শিক্ষা প্রকৃতিকে অনেকখানি পরিবর্তন করিতে পারে। তবে সম্পূর্ণ পারে না।

মনোভাব বা মেজাজ কাহাকে বলে

প্রকৃতি ও মনোভাব হইল একই জিনিস; কেবল প্রথমটি হইল দীর্ঘস্থায়ী এবং দ্বিতীয়টি হইল স্বল্পস্থায়ী। প্রকৃতি সাধারণতঃ একটি বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের জীবনকালের মধ্যে ক্বচিৎ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু মনোভাবের বা মেজাজের দ্রুত বদল হয়। এমন কি, কোনো ব্যক্তির মনোভাবের বদল একদিনের মধ্যেই দুইবার হইতে পারে। অবশ্য এইরূপ পরিবর্তনের একটা বাহ্য বা আভ্যন্তরিক কারণ থাকিতে পারে এবং থাকেও। কারণটি যেরূপ গুরুতর ও দীর্ঘক্ষণব্যাপী হইবে, ব্যক্তিবিশেষের মেজাজটিও তদনুপাতে ভাল বা মন্দ থাকিবে।

কোনো দিন বেশী গরম, বেশী ঠাণ্ডা পড়িলে অথবা বেশী বৃষ্টিপাত হইলে, কোনো কোনো ব্যক্তির মেজাজ বিগ্‌ড়াইয়া যায়। যে ব্যক্তি কোনো খেলার ক্লাবের সদস্য বা ভক্ত, সেই ক্লাব খেলায় হারিলে, সেই ব্যক্তির মন স্বভাবতঃ খারাপ হয়, তাহার মেজাজ বিগড়াইয়া যায়। কোনো কোনো ভক্ত সেদিন পেট ভরিয়া খাইতে পারে না, গৃহের কাহারো সহিত ভালো করিয়া কথা কহে না। অন্য পক্ষে জয়ীদলের অনুরাগিগণ কেহ বাজার হইতে গোটা মৎস্য ক্রয় করে, কেহ টাকা ধার করিয়াও দধি-মিষ্টান্ন কেনে, কেহ সবান্ধবে রেস্তোরাঁয় ঢুকিয়া সরবে পানভোজন করে।

'লজ্জানিবারণ ভাণ্ডারে'র মালিকটি রাশভারী লোক, কৃপণ বলিয়া তাঁহার একটু বদনামও আছে। সেদিন তাঁহার মেয়েটির ডিস্টিংশন পাইয়া বি. এ. পাস করার খবর বাহির হইয়াছে। দুপুর বেলা হইতে তাঁহার মেজাজ খুব ভালো, সকলের সহিত হাসিয়া কথা বলিতেছেন। প্রত্যেক কর্মচারীকে ২৲

করিয়া সন্দেশ খাইবার জন্য দিলেন এবং রাত্রি পউনে আটটার সময় দোকান বন্ধ করিয়া গৃহের দিকে রওনা হইলেন।

শরীর অসুস্থ হইলে কাহারো মনোভাব ভালো থাকিতে পারে না। পুরাতন অম্লরোগীদের মেজাজ অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয়। সাধারণতঃ একটু স্থূলকায় সুস্থ ব্যক্তিগণের ক্বচিৎ বিষণ্ণ বা বিরক্ত মনোভাব দেখা যায়। তাহারা সর্বাবস্থায় প্রফুল্লচিত্ত ও অপেক্ষাকৃত মুক্তহস্ত।

রসানুভূতির স্বরূপ

এই সূত্রে উল্লেখ করিয়া যাই যে, কোনো একটি বা একাধিক ব্যক্তি, একটি বস্তু বা একটি প্রাণী বা কোনো বিমূর্ত ভাবকে কেন্দ্র করিয়া ভাব, অনুভব, আবেগ ও সংক্ষোভ-মিশ্রিত যে জটিল মানসিক প্রক্রিয়া আমাদের চৈতন্য-সত্তায় চলিতে থাকে, তাহাকে বলে **রসানুভূতি** (sentiment)। সংক্ষেপে আমরা কখনো কখনো ইহাকে বলি 'রস'। বলাবাহুল্য, দেহবিধানের গ্রন্থিসমূহ নিঃসৃত রসের সহিত, স্বাদজনিত ষড়রসের সহিত বা অলঙ্কারশাস্ত্রের নবরসের সহিত এই রসের কোনো সম্পর্ক নাই। একটু নীচু মূল্যের অথচ নির্দোষ রসানুভূতিকে আমরা 'সখ্' বলি। একটা উদ্দেশ্য, অদম্য স্পৃহা বা আসক্তি এই রসানুভূতির সহিত সর্বদা একাঙ্গীভূত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাতে উচ্চস্তরের স্বার্থসাধন হয় বটে, একটা পরিপূর্তিকর আনন্দও উপলব্ধি করা যায় বটে, কিন্তু কোনো আর্থিক লাভের প্রশ্ন জ্ঞানতঃ উপস্থিত থাকে না।

যে মানুষের মধ্যে কোনো রসানুভূতি নাই, সে মনুষ্যপদ-বাচ্যই নয়। রসানুভূতি অগণ্যপ্রকার আছে। তন্মধ্য হইতে মাত্র গুটিকয়েকের নাম এখানে উল্লেখ করিয়া যাইতেছি; যথা, জ্ঞানার্জনজনিত রসানুভূতি (Intellectual sentiments), সৌন্দর্য-রসানুভূতি (Esthetic sentiments), সামাজিক রসানুভূতি (Social sentiments), আনুগত্যজনিত রসানুভূতি (Loyalty), ধর্ম-রসানুভূতি (Religious sentiments) ও প্রেম-রসানুভূতি।

সৌন্দর্য-রসানুভূতির মধ্যে পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা ও সুরুচিবোধ নিহিত

রহিয়াছে; সুকুমার কলাসমূহ, সঙ্গীত, কাব্যসাহিত্য প্রভৃতিতে অনুরক্তি এই রসেরই অন্তর্ভুক্ত। সভ্যতার নিম্নস্তরে অবস্থিত জাতিদের মধ্যেও আশ্চর্যভাবে সৌন্দর্য-রসানুভূতির পরিশীলন দেখা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে ঘৃণা, ঈর্ষা, ক্রোধ ও ভয়ও রসানুভূতির পর্যায়ে উঠে (যেমন, যুদ্ধের সময়)।

চরিত্র বলিতে কি বুঝায়

প্রকৃতি ও চরিত্র আপাতদৃষ্টিতে এক বলিয়া মনে হইলেও উভয়ের মধ্যে কিছু ভাবগত পার্থক্য আছে।

প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যেরূপ অনুভব ও সংক্ষোভনিচয়ের সহিত, সেইরূপ চরিত্রের নিবিড় আদানপ্রদান আবেগসমূহ ও আচরণের সহিত। অন্তরের দিক হইতে আবেগাবলী, তাহাদের বিন্যাস ও নিয়ন্ত্রণ হইল চরিত্রের লক্ষ্য; আবার বাহিরের দিক হইতে মানুষের চালচলন, আচারাচরণ ও ঐগুলির নিয়ন্ত্রণ হইল চরিত্রের কৃত্য। আসলে চরিত্রের পশ্চাদ্ভাগে থাকে মানুষের সহজপ্রবৃত্তিগুলির উদ্দীপন বা তাড়না ও তাহার ফলে চেষ্টা বা প্রতিক্রিয়াসমূহ। এই প্রতিক্রিয়াগুলি মিলিয়াই আমাদের চরিত্র সৃষ্টি করে।

কিন্তু আপনারা জানেন, সাধারণতঃ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সহজপ্রবৃত্তি-গুলি বিভিন্ন মাত্রায় অবস্থান করে এবং উহাদের মধ্যে এক-একটি প্রবৃত্তি সর্বাপেক্ষা বলশালী হইয়া এক-একজন মানুষকে তাহার প্রভাবাধীন করিয়া রাখে। তাহা হইলে আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, এক-একটি সংক্ষোভের আধিপত্য যেরূপ এক-এক ছাঁচের প্রকৃতি-গঠনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে, তেমনি এক-একটি প্রবল সহজপ্রবৃত্তি এক-এক ছাঁদের চরিত্র-গঠনে সাক্ষাৎভাবে সাহায্য করে। যেমন ধরুন, যুযুৎসা-প্রবৃত্তির প্রাবল্য থাকে যে ব্যক্তির মধ্যে, সে একরোখা ও রুষ্ট চরিত্রের হয়; অপসরণ-প্রবৃত্তি যাহার মধ্যে অতিশয় বলবান, সে খানিকটা ভীরু, সংশয়বাদী ও নির্লিপ্ত চরিত্রের লোক হয়; আত্মপ্রাধান্য-প্রবৃত্তি বলশালী যাহার মনে, সে লোক স্বার্থপর ও প্রভুত্বপ্রিয় চরিত্রের না হইয়া যায় না; আবার দাস্য-প্রবৃত্তি যাহার মনে রাজত্ব করে, সে বিশ্বস্ত, পরার্থপর ও সংসারনিস্পৃহ চরিত্রের মানুষ না হইয়া পারে

না ; সঞ্চয়-প্রবৃত্তি যে ব্যক্তির মনে অতিশয় প্রতাপশালী, তাহার কৃপণ চরিত্রের হওয়া স্বাভাবিক ; আবার, কামপ্রবৃত্তির আধিক্য মানুষকে লম্পট চরিত্রের না করিয়া ছাড়ে না···ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অচেতন মনোবিভাগে অতিরিক্ত দাস্যভাব থাকিলে তাহা প্রশমিত করিতে ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ করিবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকর্তা তাহার চেতন মনোবিভাগে আত্মপ্রাধান্য-প্রবৃত্তি অধিক মাত্রায় সন্নিবিষ্ট করেন। কাহারো অচেতন মনে অতিরিক্ত মাত্রায় কাম-প্রবৃত্তি জাগ্রত থাকিলে, ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাহার চৈতন্যগত মনে অত্যন্ত বিসদৃশ রকমের আত্মাভিমান ও গর্বভাব উদ্ভূত হয়। এইরূপ এক প্রবৃত্তির প্রাবল্য খর্ব বা দমন করিবার জন্য চেতন মনে অন্য একটি বিপরীত গুণসম্পন্ন প্রবৃত্তির উপস্থিতিকে "অতি-ক্ষতিপূরণ" (over-compensation) বলে।

কাহারো কাহারো মনের গভীরে অত্যন্ত অধিক মাত্রায় ভয়ের প্রবৃত্তিকে ঢাকিবার জন্য মনের উপরিভাগে অতিমাত্রায় সাহস সঞ্চারিত হয়। প্রগাঢ় চেষ্টার দ্বারা বিষয়ী এই সাহসের পরিমাণ এত বাড়াইতে পারে যে, তাহা ক্ষেত্রবিশেষে দুঃসাহসে পরিণত হয়। অনেক সময় জানিবেন, নিরতিশয় ভীরু স্বভাবের ছেলে বড় হইয়া একটা বিরাট-প্রতিভাধর দুর্ধর্ষ সেনাপতিরূপে পরিস্ফুট হয়। এক-এক ব্যক্তির মনের অন্তস্তলস্থ অধিক পরিমাণ দাস্যভাবকে প্রদমিত করিবার নিমিত্ত অতি-ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রভুত্বস্পৃহা জাগিয়া উঠে। ঐ প্রভুত্বস্পৃহা এক-এক সময় নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের জন্ম দেয়।

একটা চরিত্রের মধ্যে বহু সদ্‌গুণ অনুশীলন করিবার কমবেশী সম্ভাবনীয়তা থাকে এবং বদ্‌গুণগুলিকে শক্তিহীন করিবার অভ্যাসও ধীরে ধীরে গঠিত হইতে পারে। যেরূপ অসংখ্য আকৃতির ও অসংখ্য প্রকৃতির মানুষ দেখা যায়, সেইরূপ অসংখ্য প্রকারের অভ্যাস দিয়া গঠিত মানুষ দেখা যায়। বস্তুতঃ বাল্যকাল হইতে মানুষ নিজ নিজ পরিবারের সংস্পর্শে, বিদ্যালয়ে অথবা সঙ্গীদের সাহচর্যে যে-সকল অভ্যাস আয়ত্ত করে, সেইগুলি তাহার চরিত্রগত হইয়া যায়। সেই সকল অভ্যাসবশেই সে বাহিরের সহিত নানাভাবে আলাপ-ব্যবহার করে। সুতরাং একটি মানুষের চরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করিতে

গেলে, প্রথমেই তাহার অভ্যাসগুলিকে লক্ষ্য করিতে হয়। আমরা অভ্যাস বলিয়া যে বৃত্তিগুলিকে জানি, তাহা আর কিছুই নয়, বাল্য হইতে পরিশীলিত কতকগুলি প্রতিক্রিয়া। এক-এক অবস্থায় সেই প্রতিক্রিয়াগুলি কতকটা ইচ্ছাক্রমে, কতকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংঘটিত হয়।

সত্যবাদিতা, সময়নিষ্ঠা, নিয়মনিষ্ঠা, বিনয়, বাধ্যতা, সাধুতা, সহযোগিতা, দয়া, হৃদ্যতা, মিতব্যয়িতা, সহনশীলতা, প্রফুল্লতা, শ্রমশীলতা প্রভৃতিকে আমরা সদ্‌গুণ বলি এবং ইহাদের বিপরীত বৃত্তিগুলিকে আমরা অসদ্‌গুণ বলি। একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহাদের প্রত্যেকটির মূল থাকে—পদ্মের মৃণালের মত—আমাদের সহজপ্রবৃত্তিগুলির মধ্যে প্রোথিত। এই গুণ বা দোষগুলিকে চর্চায় ও অভ্যাসে পরিণত করার কালক্রমে আমরা সর্বদাই ঐ সহজপ্রবৃত্তিগুলি হইতে শক্তি পাই, তাড়না পাই।

শিক্ষার উদ্দেশ্যই হইল—কতকগুলি সহজপ্রবৃত্তির তাড়না বা আবেগকে প্রশ্রয় দিতে ও কতকগুলির তাড়না বা আবেগকে দমন করিতে মনকে সমর্থ করিয়া তোলা। চরিত্রের একটা বিশিষ্ট গুণই হইল অবস্থা-বিশেষে ও সময়-বিশেষে এক-একটা প্রতিক্রিয়ার প্রকাশকে সংযত করা। ডাঃ রোব্যাক্ চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিতেছেন, "It is an enduring psychophysical disposition to inhibit instinctive impulses in accordance with a regulative principle."*

চরিত্র সম্বন্ধে আর একটি কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। কোনো ব্যক্তির চরিত্রের কোনো একটি বিশেষ গুণ এমনভাবে ছাঁচে ঢালা হয় না যাহাতে সর্বক্ষেত্রে সর্বপাত্রে সর্বসময়ে উহা সাধারণভাবে সমান রূপ প্রকাশ করিবে ; উহা প্রকৃতপক্ষে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে-পাত্রে-সময়ে বিভিন্ন মাত্রায় দেখা দেয়, অথবা একেবারেই দেখা দেয় না। বাল্য হইতে তাহার মনের মধ্যে যে নিয়ন্ত্রণ-তত্ত্ব (regulative principle) দানা বাঁধে, তাহাই উহাকে কোন্ দোষ-গুণ কোথায় কতখানি প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দেয়।†

* A. A. Roback, the *Psychology of Character, with a Survey of Temperament* (Harcourt, 1927).

† Hugh Hartshorne and M.A. May, *Studies in Deceit* (Macmillan, 1928).

একজন ঘোর মিথ্যাবাদী কোথাও কম মিথ্যা কথা কোথাও বেশী মিথ্যা কথা বলে, হয়তো একটি কিংবা দুইটি প্রিয় ব্যক্তির নিকট নির্জলা সত্য কথা বলে। একটা অসাধু চরিত্রের লোক—যে দুনিয়া শুদ্ধ সকল লোককে ঠকাইয়া বেড়ায়, সে হয়তো অত্যন্ত অভাবের মধ্যে পড়িলেও এবং প্রশস্ত সুযোগ পাইলেও কোনো নিঃসহায়া বিধবাকে ঠকায় না। একটা দুর্ধর্ষ চরিত্রের গুণ্ডা, যে একটা টাকার জন্য একজন পথচারীর বুকে ছুরি বসাইতে পারে, সে একটা আহত কুকুর-ছানাকে বুকে লইয়া চোখের জল ফেলিতে পারে। আবার যে আকুমার ব্রহ্মচারী গৈরিকধারী সন্ন্যাসী নিখিলের যত নারীকে আজীবন মাতৃস্বরূপ জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন, তিনি অতি-গোপনে একটি হীন চরিত্রের রমণীকে ঐ উচ্চ নীতির ব্যতিক্রম-স্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারেন।

একটি সুগঠিত চরিত্রের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ-তত্ত্ব শারীরিক ও মানসিক কারণে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে—অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও। তখন একটা দুষ্ট সহজপ্রবৃত্তির তাড়না তাহাকে পথভ্রষ্ট করে। তারপর তাহার নিয়ন্ত্রণ-তত্ত্ব সজাগ হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনে এবং সমাজ বা রাষ্ট্র তাহার ঐ বিচ্যুতির জন্য তাহাকে শাস্তি না দিলে, নিজের নিয়ন্ত্রণ-তত্ত্ব বা বিবেক বা super-ego তাহার অপরাধের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে। কাহারো কাহারো নিয়ন্ত্রণ-তত্ত্ব এমনভাবে ভাঙিয়া পড়ে যে, তাহারা আর বিষয়ীকে সুপথে ফিরাইতে পারে না; তখন তাহারা অসৎ প্রবৃত্তির নিকট দাসখৎ লিখিয়া পাপের পর পাপ করিতে থাকে।

আমাদের পুরাণ-উপপুরাণ, জাতক, কথা-সরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে বিরাট বিরাট মহাত্মাদের পদস্খলনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আনাতোল্ ফ্রাঁস তাঁহার *Thais* উপন্যাসে, টলস্টয় তাঁহার *Father Sergius* নামক বড় গল্পে ও অনেকগুলি ইংরাজী, ফরাশী, জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষায় লিখিত উপন্যাসে এইরূপ আদর্শ চরিত্রের আকস্মিক পতনের চমকপ্রদ কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা মমের *Rain* নামক বড় গল্পটি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বোধহয় পরম নীতিনিষ্ঠ মিঃ ডেভিড্‌সনের শোচনীয় পরিণামটি স্মরণে আনিতে পারিবেন।

আবার রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গে' লীলানন্দ নামক আর এক টাইপের সাধুপুরুষের ছবি আপনারা দেখিতে পাইয়াছেন—যাঁহাদের ভগবদ্ভক্তির সুবর্ণ-শকট নারীসৌন্দর্যের শ্বেতাশ্ব-দ্বারা বাহিত হয় এবং যাঁহারা আধুনিক পার্থিব প্রেমের গান গাহিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না; যথা—

"পথে যেতে তোমার সাথে মিলন হল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে, সাঁজের আলো মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।"...

বলা নিষ্প্রয়োজন, এইরূপ শত শত লীলানন্দ ব্রহ্মচারী ও খেলানন্দ স্বামীজীতে আধুনিক শ্রীহীন নিরানন্দ পশ্চিম-বাংলার অশুদ্ধ আশ্রম ও বিশুদ্ধ অন্তঃপুর ছাইয়া গিয়াছে। কিছুকাল যাবৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী জোঁদা সাহেব-বিবিরাও জটা-গেরুয়া-দাড়ি-ফোঁটা-তিলকের তড়াগ মন্থন করিয়া সর্বসন্তাপ-মোচন ও সর্বার্থসাধনের বীজমন্ত্র উদ্ধারের আশায় আশ্চর্যভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

তাহা হইলে আপনারা দেখিতে পাইতেছেন যে, চরিত্র একটা অখণ্ড নিরেট ধরা-বাঁধা ছাঁচের সামগ্রী কখনই হয় না এবং অপরিবর্তনীয়ও নয়। প্রত্যেক মানুষকেই শৈশব হইতে এক-একটি প্রবৃত্তির তাড়নাকে সংযত করিতে অভ্যাস করিতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাহারা কতকগুলি মন্দ প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের আবেগকে দমন করিতে শিক্ষা করে, তাহাও হয়তো এক-এক পরিস্থিতিতে পারে না; এই সকল পরিস্থিতিতে তাহার শিক্ষা বা সদভ্যাস বা নিয়ন্ত্রণ-তত্ত্ব মুহূর্তের জন্য পঙ্গু হইয়া পড়ে। দুই-একটা উদাহরণ দিই।

এক শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার ব্যবসায়ে অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির হন। কিন্তু কোনো দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, বারোয়ারী দুর্গোৎসব, রক্ষাকালী পূজা অথবা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বা সাহায্য-সমিতিতে জনসাধারণের চাঁদার তহবিল যখন হাতে পান, তখন তিনি তাহা হইতে কিছু টাকা আত্মসাৎ করিবার লোভ দমন করিতে পারেন না। এমন এক-একজন লোক আপনারা দেখিতে পাইবেন যাঁহারা ট্রামে বাসে বা ট্রেনে কাহারো ভুলিয়া-ফেলিয়া-যাওয়া দশ হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তদবস্থায় তাহা পুলিসের হেফাজৎ করিয়া দেন, কিন্তু ট্রামের ১২ পয়সার

টিকিট ফাঁকি দিতে, অপরের ঝর্নাকলম, বই বা ছাতা অপহরণ করিতে যাঁহাদের বিবেকে বাধে না। এরূপ সতীলক্ষ্মী মধ্যবয়স্কা সধবা নারীকে আমরা জানি যিনি বিবাহের আগে ও পরে জনকয়েক কন্দর্পকান্তি পুরুষের সকাম দৃষ্টিকে সরোষে প্রতিহত করিয়াছেন, অথচ এক-একটি সুশ্রী কিশোরকে ডাকিয়া গোপনে তাহাদের জননেন্দ্রিয় লইয়া ক্রীড়া ও চোষণ করিতে ভালবাসেন।

আর একটি অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। একটি বলিষ্ঠ বা দৃঢ় চরিত্রের মধ্যে এমন একটি নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালন শক্তি থাকে যাহার বশে সমস্ত সহজপ্রবৃত্তিগুলির প্রবণতাকে শাসনাধীন রাখা যায়; একটা উচ্চস্তরের সুগঠিত ও প্রভাবশালী রসানুভূতি দৃঢ় চরিত্রের মধ্যে ওতপ্রোত থাকে। কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক মূল্যমান দিয়া সর্বক্ষেত্রে দৃঢ় চরিত্রের বিচার করা যায় না। ব্রিজিজ্ বলিয়াছেন, "A strong character is not necessarily identical with a conventionally moral character."*

একটি দুর্বল চরিত্রের মধ্যে সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে শাসনে রাখিবার প্রভুশক্তিটি দুর্বল বলিয়া যখন একটি সু ও একটি কু-প্রবৃত্তির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বাধে, তখন তাহার প্রভুটি নিশ্চেষ্ট উদাসীন থাকে; কাজেই কোনো প্রতিক্রিয়াই তাড়াতাড়ি পরিস্ফুরিত হইতে পারে না। যুক্তিসহ চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির নিরোধ হইয়া বিষয়ীর প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে; সে তখন মুক্তির নিঃশ্বাসের জন্য ছটফট্ করিতে থাকে। ঐ সময় বাহিরের লোক তাহাকে যাহা করিতে বলে, সে সম্মোহিতের মত তাহাই করিতে অগ্রসর হয়।

ইচ্ছা জিনিসটি কি

আধুনিক মনস্তত্ত্বে একা **ইচ্ছা** নামক মানসিক ক্রিয়াটিকে খুব বড় স্থান দেওয়া হয় না। তর্কশাস্ত্রে ও দর্শনশাস্ত্রে চৈতন্যগত মনের একটি ধর্মই হইল ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। মনস্তত্ত্বে চেষ্টাত্মিকা ইচ্ছা বা এষণাকে অবশ্য উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। চেষ্টার অনুভূতিশূন্য ইচ্ছাকে কল্পনার সহিত অভিন্ন করিয়া

* Ibid., p. 448.

দেখাই উচিত। নাটকে, উপন্যাসে, গল্পে, সাধারণ কথাবার্তায় আমরা বিশেষ্য ও ক্রিয়ারূপে ইচ্ছা শব্দটিকে ভূরি ভূরি প্রয়োগ করি। অথচ এই অনুপাতে আমরা অনিচ্ছা শব্দটিকে বড় বেশী ব্যবহার করি না।

রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশে' আপনাদের অনেকেরই বোধহয় ছক্কা-পাঞ্জার সেই মজার গানটি শোনা আছে এবং কাহারো কাহারো মনে আছে—

ইচ্ছে।
সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,
সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।
সেই তো আঘাত করছে তালায়,
সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়,
বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে।

এত কম কথায় ইচ্ছার এমন সহজ সুন্দর ব্যাখ্যা অন্য কাহারো দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নয়। আমাদের ইচ্ছা সাধারণতঃ দুই প্রকার, ভাবগত ও ক্রিয়াগত; কিছু জানার ইচ্ছা, কিছু করার ইচ্ছা। আমাদের প্রত্যেক কর্মের পশ্চাতেই ইচ্ছার সঙ্কেত আছে, প্রেরণা আছে। যাহা কিছু করি না কেন, তাহার মধ্যে কিছু পাওয়ার কামনা থাকে—কোনো ব্যক্তিকে বা বস্তুকে পাওয়ার কামনা নতুবা নিছক্ আনন্দ পাওয়ার কামনা। তথাকথিত নিষ্কাম কর্মের মধ্যেও আনন্দলাভের ইচ্ছা সংবদ্ধ থাকে।

ইচ্ছার মধ্যে উদ্দেশ্য আছে, সহজপ্রবৃত্তিজাত আবেগ আছে, চেষ্টার অনুভূতি আছে। কোনো আবেগকে দমন করার মধ্যে, কতকগুলি আবেগকে সুসংবদ্ধ করিয়া পরিচালিত করার মধ্যেও আকাঙ্ক্ষা বর্তমান থাকে। কাজেই মানুষের চরিত্রের একটা লক্ষণ ও ধর্ম হইল তাহার অসংখ্যপ্রকার ইচ্ছা। তাহার মনের নিয়তোদিত কতকগুলি ইচ্ছা জানিতে পারিলেই সে কিরূপ চরিত্রের মানুষ তাহা অনায়াসেই ধরা যায়। আমরা কোনো কোনো সময় অনিচ্ছার বশেও এক-একটা কাজ করিয়া থাকি—হয় তাহা অপরের প্ররোচনায় নতুবা আমাদের অচেতন মনের প্রণোদনায়। অচেতন মন এক-এক সময় অতি মহৎ চরিত্রের লোককেও অতিশয় জঘন্য পাপে প্রবৃত্ত করিতে পারে।

ব্যক্তিত্ব বলিতে কি বোঝায়

এক-একটি লোক সম্পর্কে **ব্যক্তিত্ব** বা *personality* শব্দটি আমরা এমনভাবে ব্যবহার করি যাহাতে মনে হয় এ জগতে সেই সেই বিশেষ লোকেরই ব্যক্তিত্ব আছে, বুঝি বাকি সকলের নাই। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের মতে, ব্যক্তিমাত্রেরই ব্যক্তিত্ব আছে। তবে হ্যাঁ, কাহারো ব্যক্তিত্বের মূল্য বেশী, কাহারো ব্যক্তিত্বের মূল্য কম। যাহার ব্যক্তিত্বের মূল্য বেশী, সে বেশী লোককে আকর্ষণ করিতে পারে, বেশী লোকের ভালবাসা বা শ্রদ্ধা লাভ করে।

শুধু সুন্দর মুখশ্রী বা সুঠাম আকৃতি দিয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় না। ব্যক্তিত্ব হইল একটা দেহমানসিক প্রত্যয় (concept), অর্থাৎ ইহার একটি দৈহিক আকৃতি ও একটি মানসিক আকৃতি আছে। একটি বাক্যে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞার্থ দিতে গেলে বলিতে হয়, ব্যক্তিত্ব হইল মানুষের দেহগত ও মনোগত সর্বপ্রকার আচার-আচরণ, দোষগুণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যোগাযোগ ও কার্যকরী সমন্বয় ; ঐ দোষগুণগুলির কিছু জন্মগত, কিছু অর্জনগত।

এখন ব্যক্তিত্বের আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই ভাবে করা যায়।—ব্যক্তিত্বের তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত অংশ আছে ; এই তিনটি অংশই আমাদের পরিচিত—(ক) বুদ্ধি, (খ) প্রকৃতি ও (গ) চরিত্র। ইহাদের প্রত্যেক অংশের পরস্পরের সহিত আদানপ্রদান, সঙ্গতিরক্ষা ও বাহ্য প্রকাশের রীতিসমূহের তারতম্যই ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে পার্থক্য সৃষ্টি করে। ইহাদের কোনোটির সহিত কোনটির দীর্ঘস্থায়ী অমিল, অসঙ্গতি বা সংঘর্ষ ঘটিলে ব্যক্তিত্বের মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। দেহের অথবা মনের কোনরূপ বিশৃঙ্খলাকে ব্যক্তিত্বের বিশৃঙ্খলা বলিয়া মনে করিতে হইবে।

দেহের দিক হইতে একটি মানুষের ব্যক্তিত্ব হইল—তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, জাতিসুলভ আকৃতির সহিত সামঞ্জস্য, ফর্সা শ্যাম অথবা কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ, স্ত্রী বা পুরুষ, যুবা, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। ক্রেট্শ্মার বহু মাপজোক ও পরীক্ষানিরীক্ষার পর দেহগতভাবে মানুষকে চারিটি বিশিষ্ট ছাঁচে পৃথক করিয়াছেন। এই টাইপগুলির ইংরাজী নাম—asthenic, athletic, pyknic ও dysplastic। যাহারা

'এস্থেনিক্' ছাঁচের মানুষ, তাঁহারা রীতিমত কৃশ, ওজনের তুলনায় বেশী লম্বা হয়। যাহারা 'অ্যাথ্লেটিক্' ছাঁচের, তাহারা সুগঠিত, পেশীবহুল ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন ; তাহারা লম্বা হইলেও সেই অনুপাতে গুরুভার। যাহারা 'পিক্নিক' ছাঁচের, তাহারা বেশ মোটাসোটা, বেঁটে গোছের, কিন্তু ওজনে ভারী। যাহারা 'ডিস্প্ল্যাসটিক' তাহারা উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কোনো টাইপের মতই নয়।*

লোকচক্ষের সম্মুখে একটি লোক উপস্থিত হইলে প্রথমেই তাহার আকৃতি সম্বন্ধ একটা ধারণা জন্মায়। জাতির গড়্ গাত্রবর্ণ অপেক্ষা তাহার গাত্রবর্ণ বেশী কালো বা বেশী ফর্সা হইলে, গড় অপেক্ষা তাহার উচ্চতা ও পরিসর বেশী বা কম হইলে, তাহার নাক, কান, চোখ বেশী ছোট-বড় হইলে, সে কানা খোঁড়া বা ট্যারা হইলে, তাহার চুল কোঁকড়া ঘন পাতলা বা একেবারে বিরল হইলে, হস্তপদের কোনো বৈকল্য থাকিলে, তাহার গলার স্বর রুক্ষ কর্কশ হইলে ও/বা তাহার সম্মুখের দাঁত দুই-তিনটি বেশী উঁচু হইলে, সেগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিচারবোধকে নাড়া দেয়। বচনের মধ্যে প্রাদেশিকতার টান, গ্রাম্য শব্দাধিক্য-দোষ, অভিনয়োচিত সুরেলা ভাব, কথনে অতিরিক্ত দ্রুততা দীর্ঘসূত্রতা, মাঝে মাঝে থামিয়া যাওয়া, তোৎলামো, কথা বলার সময় হাত-নাড়া, ঠোঁট কোঁচ্কানো, চক্ষুতারকা-ঘুরানো, সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়ানো বা চলা, চলিবার সময় দুই পা হাঁটুর নিকট বাঁকাইয়া দেওয়া, দুই পায়ের মধ্যে বেশী ব্যবধান রাখা, দুই পায়ের পাতার অগ্রার্ধ বাহিরের দিকে তীর্যগ্ভাবে বিস্তার করিয়া চলা প্রভৃতি লক্ষণগুলি দৈহিক ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে বিশেষ কাজে লাগে।

মানসিক বিকাশের লক্ষণগুলি ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে দৈহিক স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য অপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় আমাদের বিবেচনাধীনে আসে। বুদ্ধি, প্রকৃতি ও চরিত্র—এই তিনটি মিলিয়া যদি একটি সমত্রিবাহু ত্রিকোণ তৈয়ারি করিতে পারে, তাহা হইলে ব্যক্তিত্ব সম্যক্ বিকশিত হইবার সুযোগ পায়। অভিব্যক্তির প্রত্যেক স্তরে প্রতি কাজে এই তিনটি পরস্পরের সহযোগিতা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, সংক্ষোভ ও ভাবরূপগঠন (ideation) ব্যতিরেকে কোনো সহজপ্রবৃত্তি

* Ernst Kretschmer, *Physique and Character* (Kegan Paul, 1925)

উদ্দীপ্ত হইতে পারে না; আবার সংক্ষোভ, অনুভব, ভাবরূপ এবং আবেগ—এই কয়টির সংযোগ ব্যতীত রসানুভূতি জাগিতে পারে না।

প্রত্যক্ষণ, ভাবরূপ, প্রতিবর্তী ক্রিয়া, অনুভূতি, সংক্ষোভ, সহজপ্রবৃত্তির তাড়না প্রভৃতি সদস্যবর্গ লইয়া মনের একটি একান্নভুক্ত বৃহৎ সংসার। এই সংসারটির আকার যেন একটি ত্রিভুজের মত। উহার চূড়ায় নিত্যজাগ্রত কর্তারূপে বসিয়া আছে একটি সর্ব-নিয়ামক উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়, যাহার কতকটা আছে আমাদের চৈতন্যের আয়ত্তে, কতকটা আছে আমাদের চৈতন্যের বহির্ভূত। কর্তা যখন যাহা করেন বা করান, তখন তাহার সবটা আমাদের বোধগম্য হয় না।

ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে প্রভেদ ঘটে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে—(ক) মনের পূর্বোক্ত ত্রিমূর্তির উপাদান-সংখ্যার আধিক্য বা হ্রস্বতায় ও/বা উহাদের অন্তর্বলের তারতম্যে; (খ) জ্ঞানগতা, অনুভবগতা ও চেষ্টাত্মিকা বুদ্ধির ইতরবিশেষে; (গ) বাহিরের পরিবেশের প্রভাব, সুশিক্ষা, পরিরক্ষণ, পরামর্শ প্রভৃতির ভিন্নতায়।

ব্যক্তিত্বের চারি পদ

ব্যক্তিত্বের বাহু যদি তিনটি ধরা হয়, তাহা হইলে উহার চরণ চারিটি মনে করিতে আমাদের দ্বিধা করা উচিত নয়। ঐ চারিটি চরণের একটি হইল—(ক) **বহুপল্লবতা** (Complexity of personality)। এক-এক ব্যক্তির বুদ্ধি, প্রকৃতি ও চরিত্র-গঠনের উপাদানগুলির সংখ্যা রকমারি মাত্রায় কম, বেশী, মাঝারি হইতে দেখা যায়। কোনো কোনো লোকের কোনো বিষয়েই বেশী জ্ঞান থাকে না; কোনো কোনো লোকের এক বিষয়ে বেশী জ্ঞান থাকে, অন্যান্য বিষয়ে অতি সামান্য জ্ঞান থাকে।

কোনো কোনো ব্যক্তির সাধারণ জ্ঞান এত অল্প যে, নিজের গ্রামের বা পাড়ার কোনো খবর তাহারা রাখে না। দেশে কবে কি বড় রকমের ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সে জানে না, দেশের শাসনবর্গের নাম, মনীষীদের নাম, ঐতিহাসিক চরিত্রদের নাম, কোনো দেশের ভৌগোলিক সংস্থান, কোনো

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতির খবর রাখে না। হয়তো তাহারা সংবাদপত্র নিয়মিত পাঠ করে না, হয়তো মাঝে মাঝে মোটা অক্ষরে লিখিত খবরগুলিতে একবার চোখ বুলাইয়া যায়, পরমুহূর্তেই পঠিত বিষয়ের সমস্ত কথা মন হইতে ঝাঁটাইয়া বাহির করিয়া দেয়। ইহারাই উইলসনকে আমেরিকার রাজা বলে, বিলাতের রাণীর নাম মেরী বলে, লালবাহাদুরকে জওয়াহরের পুত্র বলে। শ্যামাপ্রসাদের পিতার নাম জানে না, মাতার নাম বাসন্তী দেবী বলে। কামরাজকে রাজস্থানের অধিবাসী বলে। নেতাজীর পুরা নাম বলিতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃপিতামহের নাম জানে না, সূর্য বড় কি চন্দ্র বড় তাহা বলিতে গিয়া মাথা চুলকায়···ইত্যাদি।

তারপর একদল মানুষ প্রতি গ্রামে ও নগরে দেখিতে পাইবেন যাহাদের জীবনে কোনো সখ নাই, জীবিকা-উপার্জনঘটিত কাজের বাহিরে অন্য কোনো কর্মে আসক্তি নাই, সৌন্দর্যানুভূতি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই নাই। কোনো কলকব্জায় হাত দিতে তাহারা ভয় পায়, প্রাত্যহিক জীবনে কোথাও কোনোরূপ প্রাকৃতিক বা মানসিক সামান্য দুর্যোগ বা বিচ্যুতি দেখিলে তাহাদের মেজাজ খারাপ হয়; অপরিচিত লোকের সহিত তাহারা আলাপ করিতে ভালবাসে না, সমাজে বসিয়া তাহাদের কপাল ঘামিতে থাকে।

ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় পদ হইল—**সার্বাংশিক সম্মিলন** (integration)। জগতে এমন খুব কম লোকই আছে যাহাদের বুদ্ধিগত, অনুভবগত ও চেষ্টাগত উপাদানগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। জগতের অধিকাংশ লোকের কতকগুলি উপাদান যেন পৃথগন্ন ভাইয়ের মত এক বাড়ির মধ্যে ভিন্ন সংসার পাতাইয়া বাস করে। ভিন্ন সংসারের দুই ভাই বা ভাই-বউদের মধ্যে যেরূপ নিত্য বিবাদবিসম্বাদ চলে, মনের ভিতরও সেইরূপ দুই দল জ্ঞানগতা, অনুভবগতা ও চেষ্টাত্মিকা বৃত্তিসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

কখনো কখনো জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তির সহিত অনুভববৃত্তির অথবা অনুভববৃত্তির সহিত চেষ্টাত্মিকা বৃত্তির দ্বন্দ্ব লাগিয়া যায়। এইভাবে একটি মানুষের মধ্যে যেন দুইটি সত্তার স্পষ্ট অস্তিত্ব অনুভূত হয়। কখনো-বা কেহ তিনটি সত্তার অস্তিত্বও টের পায়। এক সত্তা যে কাজ করে, অন্য সত্তাটি ঠিক তাহার উল্টাটি

করিয়া বসে এবং প্রত্যেক সত্তাই তাহার কাজের সমর্থনার্থ এক-একটি চমৎকার ন্যায়ারোপণ রচনা করে। এইরূপ অবস্থাকে **বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব** (split personality) বলা হয়।

ডাক্তার জেকিল ও মিস্টার হাইড্ শক্তিমান সাহিত্যিকের কল্পনাপ্রসূত বটে, কিন্তু সত্যকার জীবনেও আমরা এইরূপ দুইটি বিপরীত সত্তা-সমন্বিত মানুষের সাক্ষাৎ পাই। এমন কি, আমরা অনেকেই বোধহয় আমাদের নিজের জীবনে অল্পকালের জন্যও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি অনুভব করিয়াছি। এক শ্রেণীর উন্মাদের মধ্যে এইরূপ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের দীর্ঘস্থায়ী অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। তাহারা একাই যেন দুইজনের ভূমিকা অভিনয় করে।

ব্যক্তিত্বের তৃতীয় পদ হইল—উহার **বলিষ্ঠতা** (strength of personality)। যখন প্রত্যক্ষণগুলি ও ভাবরূপগুলি সুগৃহীত, সুসংবদ্ধ ও সুরক্ষিত হয় না, যখন সেগুলি চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিমার্জিত হয় না, যখন সেগুলি একটি ঘোর নীতিনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ-শক্তির কর্তৃত্বাধীনে থাকে না, তখন ব্যক্তিত্বের দুর্গপ্রাকারে ফাট ধরে। সেইরূপ অনুভব, সংক্ষোভ, আবেগ, অনুরক্তি ও বিরক্তিগুলি যখন ঐক্যবদ্ধ হয় না, তাহাদের মধ্যে সঙ্গতি, শৃঙ্খলা, বশ্যতাবোধ বজায় থাকে না, তখন ব্যক্তির আচারাচরণ যেমন অসংযত তেমনি খেয়াল-প্রসূত হয়। বুদ্ধি, প্রকৃতি ও চরিত্র একই মিলনের ভিত্তিভূমিতে থাকিয়া যখন এক স্বয়ংজাত শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ-কর্তার শাসনসীমার মধ্যে অবস্থান করে, তখন আমরা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাই। এই বলিষ্ঠতার মধ্যেও পরিমাণের প্রচুর তারতম্য আছে।

বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আর একটি লক্ষণ হইল **ভারসাম্য** (balance)। সর্বদিক্ দিয়া সুস্থিত ব্যক্তিত্ব এজগতে দুর্লভ বলিলেই চলে। একদল ব্যক্তিকে দেখিবেন জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রতিভায় মেধায় উদ্ভাবনী শক্তিতে স্বাধীন চিন্তায় কীর্তিমান হইয়াছেন; ইঁহাদিগকে মনোবিজ্ঞানিগণ "cold-blooded intellectuals" বলিয়া অভিহিত করেন, কারণ তপ্তরক্তযুক্ত স্তন্যপায়ীদের মত ইহাদের মায়া, দয়া, স্নেহ, সাংসারিক বুদ্ধি, সামাজিকতাবোধ, সঞ্চয়-প্রবৃত্তি, প্রেম বা সৌন্দর্যরসানুভূতি নাই বলিলেই চলে। আবার, আর একটা

বড় দলকে দেখিতে পাইবেন, যাহাদের অনুভব ও অনুভূতিশক্তি অল্পবিস্তর প্রখর ও প্রবল। ইহাদের বিদ্যাবুদ্ধি হয়তো মোটামুটি রকমের হয় অথবা তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা উচ্চ ডিগ্রী প্রচুর পরিশ্রম করিয়া লাভ করে, কিন্তু ইহারা শিল্পরসবোধ, সৌন্দর্যজ্ঞান ও সুকুমার কলায় পরমাগ্রহের পরিপোষক; কোনো কোনো বিষয়ে রীতিমত সূক্ষ্ম সমালোচক ও সৌখিন হয়। ইহারা নিজের জন্য যতখানি না ভাবে, তাহার চেয়ে বেশী ভাবে পরিবারের জন্য; সময় পাইলে সমাজের জন্যও খানিকটা সময় ও সামর্থ্য দিতে পারে। দুঃখবোধ, করুণা, সহানুভূতি, বন্ধুবাৎসল্য, স্বজনপ্রীতি, পত্নীপ্রেম, অপত্যস্নেহ ইহাদের মধ্যে অনুভবনীয়ভাবে পরিস্ফুট হয়। ইহারা ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি হাসি ও অশ্রুজলে চিরশ্যাম করিয়া রাখে।

আবার আর একদল আছে যাহারা অদম্য উৎসাহী, অক্লান্ত কর্মী, অদ্ভুত সাধারণ বুদ্ধি ও ভবিষ্যৎদৃষ্টির অধিকারী। নূতন নূতন কর্মের চিন্তায় ও অনুষ্ঠানে ইহারা নিয়ত ব্যাপৃত থাকে। ইহাদের সকল সময় সঞ্চয়ের নেশা থাকে বটে, কিন্তু ব্যয়ের আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ এক-এক সময় জাগে। ছোট বড় ব্যবসা-বাণিজ্যে ও কূটবুদ্ধিতে ইহারা পারদর্শী হয়। ইহাদের সমস্ত কল্পনাই ব্যবহারিক। অনুভব, অনুভূতি, শিল্পকলারস, প্রেম, স্নেহ, সহানুভূতি প্রভৃতি ইহাদের অত্যন্ত সীমায়িত; ইহাদের হাসা ও কাঁদার সময় থাকে অতি অল্প।

ব্যক্তিত্বের চতুর্থ পদ হইল—**বিকাশ-পদ্ধতি** (mode of expression)। ব্যক্তিত্বের বহুপল্লবতা, সার্বাংশিক সম্মিলন ও ভারসাম্য নানা দিক দিয়া নানা ভাবে অভিব্যক্তি-লাভ করে। এই বিকাশ-পদ্ধতিগুলি বাহিরের লক্ষণ বা আচরণ দেখিয়া জানা যায়। এই লক্ষণগুলির তারতম্য লক্ষ্য করিয়া এক-একটি মানুষকে কতকগুলি নির্ধারিত ছাঁচের একটির মধ্যে ফেলা যায়। সেই ছাঁচের সমস্ত মানুষকে একটি বিশেষ স্বভাবের মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয়।

জগতের সমস্ত মানুষকে ডাঃ য়ুঙ্ দুইটি সাধারণ ও বড় রকমের ছাঁচে ফেলিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক দল হইল **অন্তর্মুখী** (*Introvert*) এবং বাকি এক দল হইল **বহির্মুখী** (*Extrovert*)।* যাহারা অন্তর্মুখী, তাহারা

* C. G. Jung, *Psychological Types* (Harcourt, 1923).

নিজের মানসিক পদ্ধতি অনুযায়ী চিন্তা করে, অনুভব করে এবং কাজ করে। তাহারা সর্বদাই তাহাদের নিজেদের মত ও ইচ্ছানুসারে চলাফেরা করে। সেইজন্য তাহারা এমন একটি আদর্শ রচনা করে যাহার সহিত যুগাচরিত সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শের খুব কমই মিল থাকে। চিন্তায়, অনুভবে ও কর্মে অন্তর্মুখী ব্যক্তিরা প্রায়ই সংস্কারবাদী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন অথচ ভাব- বা কল্পনা-প্রবণ। বর্তমান শিক্ষাধারা, সমাজ ও রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তনের তাহারা পক্ষপাতী হয়। এ বিষয়ে কেহ কেহ প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখে, বক্তৃতা দেয়, প্রচারকার্য চালায়। অন্তর্মুখীদের একটা ছোট দল অবশ্য নিজেদের আদর্শে শুধু আপন পরিবার বা আত্মীয়স্বজনকে গড়িতে চায় এবং বাহিরের সহিত বড়-একটা যোগাযোগ রাখে না; বেশ খানিকটা স্বার্থপরও হইতে পারে।

আর একটা দল কিন্তু রীতিমত পরার্থপর হইয়া গঠিত হয়। কিন্তু উহার মধ্যে আপন মতবাদ-প্রতিষ্ঠার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস থাকে। যাহা হউক, অন্তর্মুখীদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যবহারিক বুদ্ধিপ্রসূত হয় না ও বাস্তবতা হইতে দূরান্তরিত হয় বলিয়া, তাহাদের সহিত ক্রমশঃ বহির্জগতের বিরোধ ঘটিতে থাকে। জীবনের অপরাহ্নে বা সায়াহ্নে তাহাদের সহিত আত্মীয়বান্ধবদের পর্যন্ত মতদ্বৈধ ঘটিতে পারে। সেইজন্য বার্ধক্যে তাহারা একান্ত অসহায় ও নিঃসঙ্গ হইয়া পড়ে। কেহ কেহ মানসিক বিকারগ্রস্তও হইয়া যায়।

বহির্মুখী ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ বহির্জগতের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলে এবং তাহাদের প্রত্যেক কর্মই অপরের কর্মধারার সহিত তাল রাখিয়া চলে। তাহাদের চিন্তার ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী কখনো বাস্তবতার কূল ভাঙে না—ভাসায় না। তাহাদের অনুভব চিরপ্রতিষ্ঠিত আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাহাদের ব্যবহারিক বুদ্ধি প্রখর হয় এবং পুরাতনের প্রতি অচলা ভক্তি থাকে। তাহারা জনসাধারণ মত ও পথের অনুসরণকারী হয়।

সামান্য আয়াসেই বহির্মুখী ব্যক্তিরা লোকপ্রিয় হইতে পারে। তাহাদের একমাত্র দোষ হইল এই যে, তাহারা বহির্জগতের গতি-প্রকৃতি-পরিস্থিতির সহিত এরূপভাবে বিজড়িত হইয়া পড়ে যে, তাহাদের নিজেদের ব্যক্তিত্ববোধ

ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। শেষে অনেকেই অবস্থার দাস হইয়া স্বাধীন চিন্তাশক্তি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলে। ফলতঃ বিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াও তাহারা সামাজিক উন্নতি ও জ্ঞানের প্রসারকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখে না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যবয়সে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ও manic-depressive টাইপের উন্মাদ হইয়া যায়।

বলা বাহুল্য, এই দুই প্রকার টাইপের বিশিষ্ট লক্ষণাবলীর অল্পাধিক একত্র-সংযোগে আরো নানারূপ মাঝামাঝি ছাঁচের ব্যক্তি দেখা যায়। ইহাদের সংখ্যাই জগতে অধিক। কোনো কোনো পণ্ডিত আরো নানা টাইপে ব্যক্তিদিগকে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা অহংসর্বস্ব, পরার্থপর; সংরক্ষণপন্থী, সংস্কারপন্থী; আদিম মনোবৃত্তিসম্পন্ন, উৎসর্পিত-কাম (sublimated); ভাববাদী বা আদর্শবাদী, বাস্তববাদী; ধীসর্বস্ব, ব্যবহারিক বুদ্ধিপ্রধান; শিল্পরুচিবোধসম্পন্ন, সামাজিক…ইত্যাদি।

ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষার পদ্ধতিসমূহ

ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করিবার, একটি লোক কোন্ টাইপের তাহা বুঝিবার নানারূপ পরীক্ষণ-পদ্ধতি বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে উদ্ভাবিত ও ক্রমোন্নত হইতেছে। আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, ব্যক্তিত্বের পরিমাপ অর্থ—কোনো ব্যক্তির বিদ্যাবুদ্ধি, অনুভব ও কর্মশক্তির পরিমাপ। এই সকল পরীক্ষণের মধ্যে প্রকৃতিগত গুণগুলির উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে Woodworthএর *Test of Emotional Instability* সম্ভবতঃ পথপ্রদর্শক। ইহার পর Presseyর "X-O Tests" বুদ্ধি ও সংক্ষোভ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের একটি নির্ভরযোগ্য পন্থা বলিয়া গৃহীত হয়।

উড্‌ওয়ার্থের টেস্ট ১১৬টি প্রশ্ন দিয়া গঠিত। প্রশ্নগুলির কতকগুলি গূঢ়ার্থপূর্ণ, কতকগুলি অতি স্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক। যেমন, একটি প্রশ্ন—"আপনি কি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে মধ্যরাত্রে জাগিয়া উঠেন?" বা "আপনি কি বেশীর ভাগ সময় বিমর্ষ বা নিরুৎসাহ বোধ করেন?" চরিত্রগত বিশেষ বিশেষ গুণগুলির হদিস্ পাইবার জন্য বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে ডাউনি একখানি কার্যকরী

ও মনোরম পুস্তক লিখিয়াছিলেন ;* উহার উপর নির্ভর করিয়া আজকালকার ঐ জাতীয় অনেকগুলি পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পর F. H. Allport বিচরিত *Systematic Questionnaire for the Study of Personality* বহু দেশে সর্বদিক দিয়া ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ পন্থা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ঐ প্রশ্নমালার মধ্যে ১৭৬টি দফা আছে।

এক-এক দেশের এক-একটি সরকারী বা বে-সরকারী পদার্থী-নির্বাচন-বিভাগ উক্ত জিজ্ঞাস্য-সংগ্রহের মধ্য হইতে ২০ হইতে ৩০টি প্রশ্ন বাছিয়া লয়। যেগুলির মধ্যে পরীক্ষাধীন ব্যক্তির (ক) সংক্ষিপ্ত পারিবারিক ইতিহাস, (খ) নিজের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, (গ) সাধারণ বুদ্ধি, উপস্থিত বুদ্ধি, কর্মসামর্থ্য ও শ্রমসহিষ্ণুতা, (ঘ) উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, সখ ও বিশেষ বিশেষ কাজের প্রতি ঝোঁক্, (ঙ) খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদের ধরন, (চ) সামাজিক ও নৈতিক বোধ, (ছ) বারাঙ্গিক ও পারিবারিক জীবন, (জ) আত্মবিশ্বাস, বাস্তবতার প্রতি মনোবৃত্তি এবং (ঝ) নিজের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে সংবিৎ ও সেগুলি সংশোধনের প্রতি উদ্যমশীলতা প্রভৃতি তথ্য জানার উপায় নিহিত থাকে।

এইরূপ মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে অবশ্য পদপ্রার্থীর চলা, দাঁড়ানো, গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গী, চোখ-মুখের ভাব, আকৃতি প্রভৃতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া, তজ্জন্য পৃথক মার্ক দেওয়া হয়। অবশেষে হয় তাহার কঠোরভাবে দৈহিক স্বাস্থ্যপরীক্ষা।

আপনারা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছেন যে, সংক্ষোভ-উদয়ে যে-সকল দেহযান্ত্রিক পরিবর্তন হয়, সেগুলির বেশীর ভাগই বাহিরে প্রকাশ পায় না। কতকগুলি অবশ্য বাহিরে প্রকাশ পায়, কিন্তু কোনো কোনো ব্যক্তি বাহ্য লক্ষণগুলি কঠিন আত্মসংযম-দ্বারা চাপিয়া রাখিতে পারে। সম্প্রতি সংক্ষোভ-জনিত আভ্যন্তরিক শারীরিক পরিবর্তনগুলি পরিমাপ করিবার ও উহার নিবিড়তা পরীক্ষার যন্ত্র বাহির হইয়াছে। এই যন্ত্রটির নাম *Psycho-galvanic*

* J. E. Downey, *The Will-Temperament and its Testing* (World ook Co. 1923).

Reflex। সংক্ষুব্ধ অবস্থায় চর্মোপরিভাগে তাড়িৎ প্রতিরোধ-শক্তির পরিবর্তন হয় ; ঐ পরিবর্তন কতখানি পরিমাণে হইয়াছে, তাহা এই যন্ত্রটিকে বিষয়ীর গাত্র-সংস্পর্শে আনিলে, গ্যাল্‌ভ্যানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ-দ্বারা (deflection) ধরা যায়।

উক্ত যন্ত্রের অনুরূপ আর একটি যন্ত্র আছে। তাহাকে *Lie-detector machine* বলা হয়। কোনো অপরাধ করিয়া ভয়ে মিথ্যা কথা বলাকেও সংক্ষোভের পর্যায়ে ফেলা যায়। ইহাতে বিষয়ী তাঁহার মনোভাবকে গোপন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। ইহাতেও তাহার অভ্যন্তরে নানারূপ পরিবর্তন হয় ; শ্বাসক্রিয়া, হৃৎস্পন্দন, রক্তচাপ প্রভৃতি অল্পবিস্তর অস্বাভাবিক না হইয়া পারে না। ইহা ছাড়াও শীতল বায়ুপূর্ণ ঘরেও তাহার চর্মনিম্নে অসংখ্য ঘর্মগ্রন্থি-গুলি সক্রিয় হইয়া উঠে এবং স্পষ্ট ঘর্মবিন্দু বাহির না হইলেও চর্মের উপরিভাগ অনুভূতভাবে সিক্ত হইয়া যায়। শুষ্ক চর্মের চেয়ে ভিজা চর্মের তড়িৎ-প্রতিরোধ শক্তি স্বভাবতঃ কম, কাজেই ঐরূপ চর্মের সংস্পর্শে গ্যালভ্যানো-মিটারের কাঁটার বিক্ষেপ ঘটে।

কাহারো কর্মশক্তি কতখানি তাহা পরিমাপ করিতে হইলে কিছুক্ষণ তাহাকে দিয়া কোনো কাজ করাইবার পর, তাহার শরীরে কতখানি শ্রান্তি বা অবসাদ হইয়াছে তাহা পরিমাপ করিতে হয়। ব্যক্তিবিশেষের শ্রান্তি-পরিমাপ করিবার জন্য *Dynamometer* নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের সহিত যে সূচটি সংলগ্ন থাকে, উহা একটি গ্র্যাফ্-কাগজের উপর রক্ষিত হয়। শ্রান্তির সূত্রপাত হইতে উহা কাগজের উপর নানা আকারের উচ্চাবচ বক্ররেখা অঙ্কন করিতে আরম্ভ করে। ঐ বক্ররেখাগুলি অধ্যয়ন করিলেই শ্রান্তির মাত্রা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। ইহা অনেকটা cardiograph গ্রহণ-পদ্ধতির অনুরূপ।*

আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে "ইলেক্ট্রনিক ব্রেন্" দ্বারা যে-কোনো মানুষের প্রকৃতি, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব নিখুঁতভাবে নির্ধারণ সম্ভবপর হইবে।

* *Psychology* (*General, Industrial & Social*), John Munro Fraser, pp. 64-5.

চতুর্দশ প্রসঙ্গ

"পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর"

চেতনগত মনের অনেকগুলি এলাকা, অনেকগুলি ক্রিয়া, অনেকগুলি সামর্থ্য ও সম্ভাবনার কথা আমরা এই পুস্তকে স্থানাভাবে বাদ দিতে বাধ্য হইতেছি। যেগুলির কথা বলা হইল, তাহাও নিতান্ত ছোট করিয়া বলিয়াছি এবং প্রতি পদেই আশঙ্কা জাগিয়াছে আপনাদিগকে ঠিকমত বুঝাইতে পারিতেছি কিনা অথবা আপনাদের বিরাগ উৎপাদন করিতেছি কিনা। যাহা হউক, এবার যে বিষয়ে বলিব, তাহা আপনাদের বোধসৌকর্যকে কোথাও ব্যথিত করিবে না এবং তাহার সহিত আপনাদের সকলেরই সৌহার্দ্য আছে।

মনের মহারাজ্যের মধ্যে প্রেমের একটি উপরাজ্য আছে, তাহা বোধ হয় আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, অসঙ্গলিপ্সা ও অপত্যস্নেহ এই দুইটিই আমাদের সহজ-প্রবৃত্তি। মেয়েদের মধ্যে অপত্যস্নেহের সূত্রপাত হয় তাহাদের বাল্যকাল হইতেই এবং তাহা হয় তাহাদের পুতুল খেলার মাধ্যমে। আসঙ্গলিপ্সা বা বরাঙ্গ-কাম স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে একেবারে শৈশব হইতে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়। কেবল কৈশোরসূচনাবধি তাহাতে উপস্থপ্রাধান্য থাকে না এবং উহা কতকটা ছদ্মবেশে থাকে।

বরাঙ্গ-কাম বা আসঙ্গলিপ্সা শুধু সহজপ্রবৃত্তিগত নয়, ইহা সংক্ষোভগতও বটে; আবার রসানুভূতিগত হইতে পারে ও বহু ক্ষেত্রেই হয়। যখন কাম রসানুভূতির পর্যায়ে আসিয়া পরিণতি-লাভ করে, তখন তাহাকে পরিভাষিক-ভাবে প্রেম নামে অভিহিত করা ও উচ্চাসন দেওয়া হয়, নতুবা তাহাকে ভদ্র সমাজের বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। আসলে প্রেম ও কামের অন্তর্বস্তু ও উদ্দেশ্য প্রায় এক, কেবল প্রকৃতি, রূপ ও রসের তফাৎ।

কাম ও প্রেম লইয়া আমরা আমাদের পূর্ববর্তী অনেকগুলি পুস্তকে—বিশেষভাবে "প্রেম ও কাম-বিজ্ঞানে" এবং "ফ্রএডের ভালবাসা" পুস্তক

দুইখানিতে—ব্যাপকভাবে যুক্তিসহ আলোচনা করিয়াছি। এই পুস্তকের পূর্ণাঙ্গতা-সাধনের জন্য যথাসাধ্য পুনরুক্তি-দোষ বর্জন করিয়া, ঐ সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিয়া আমরা অবিলম্বে প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া যাইব।

প্রেম কি স্বর্গীয়?

প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি অথবা বৈষ্ণব কবিদিগের পীরিতি লইয়া আধুনিক যুগের বহু লেখক মস্তিষ্ক স্বেদাক্ত করিয়া, উহার স্বরূপ-নির্ধারণ, প্রকৃতি-ভেদ, বিচার-বিশ্লেষণ, টীকা-ভাষ্য করিয়াছেন; বহু প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা, প্রবচন লিখিয়াছেন। এদেশের ও বিদেশের প্রত্যেক লেখকই চেষ্টা করিয়াছেন দাম্পত্য প্রেমের ভিতরে ও বাহিরে একটি ইন্দ্রিয়াতীত, পবিত্র স্বর্গীয় প্রেম কল্পনা করিয়া, তাহাকে উচ্চ পূজাবেদীর উপরে বসাইয়া রাখিতে। আমরা প্রমাণ-প্রয়োগে দেখাইয়া দিয়াছি যে, ঐরূপ ইন্দ্রিয়বোধ-পরিশূন্য নিষ্কাম কান্তপ্রেম আকাশ-কুসুম, কমলে কামিনী, utopia।

এমন কি, জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাস-লোচনদাস প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনদিগের বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাও মন্দারপারিজাত-পরিমল-লিপ্ত নহে; তাহাও পার্থিব ধূলিকর্দম-গুরুজন-গঞ্জনাপবাদদিগ্ধ; তাহার মধ্যেও শঠতা-বিপ্রলব্ধতা-মিলন-বিরহ-কলহ-মান-অভিমান-অভিসার-অভিশাপ-অশ্রু-দীর্ঘশ্বাস আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে বিবাহ-বহির্ভূত ইন্দ্রিয়জ ও মানবিক প্রেমের-প্রতিফলন, তাহা বৈষ্ণব ভক্তগণ বিশ্বাসই করিবেন না; যাঁহারা মনে মনে বিশ্বাস করেন, তাঁরা অন্ততঃপক্ষে মুখে স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা উহাকে জীবাত্মা-পরমাত্মার পবিত্র মিলন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; উহা দেহমাধ্যমে দেহাতীতের, ইন্দ্রিয়-মাধ্যমে ইন্দ্রিয়াতীতের অনুভূতি—এই কল্পনায় সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহেন। কিন্তু চণ্ডীদাস যেখানে বলিলেন—

সুখের পীরিতি আনন্দ যে রীতি,
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীযূষে মদন সহিতে
মাখিলে সে রসময়॥

সই! কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগে করি অনুরাগে
কেমতে গঠিল দে।

অথবা বিরহিণী রাধা যেখানে বলিতেছেন—

কানু-অঙ্গ পরশে শীতল হব কবে।
মদন-দহন-জ্বালা কবে সে ঘুচিবে॥
করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে।
দুখ-দশা ঘুচি তবে সুখ উপজিবে॥

অথবা যেখানে বিদ্যাপতি ঠাকুর রাধিকার মুখ দিয়া কানুর সহিত প্রথম সম্মিলনের কথা সখীদের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন—

লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুখ দেলি॥
হঠ ভেল রস হাম হরল গেয়ান।
নীবিবন্ধ তোড়ল কখন কো জান॥
দেলহি আলিঙ্গন কুচযুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয় উঠল মঝু কাঁপি॥—

সেখানে পুরাপুরি দেহেরই নীরাজন দেখিতে পাই। সেখানে যদি ভাবভূয়িষ্ট আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া এই স্বভাবোচিত প্রেমরসকে আবরিত করিতে যাই, তাহা হইলে উহার মধ্যে প্রচুর হেত্বাভাস ও ন্যায়ারোপণই স্থান পাইবে, যুক্তিসঙ্গত বিচারের অসম্মান হইবে। বৈষ্ণব কবিপ্রধানগণ রাধাকে দিয়া পুরুষায়িত প্রথায় বিপরীত-বিহার করাইয়াছেন, তাহার উপরও কামগন্ধপরিশূন্য উচ্চভাবমূলক নানা মনোজ্ঞ ভাষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা আমাদের মত বাস্তববাদীদিগের মনকে দোলা দেয় না, সেখানে কোনো প্রত্যয় জাগায় না।

আমাদের প্রাচীন কবিগণ যাহা কিছু স্বর্গীয় প্রেমের ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত না করিয়া পারেন নাই। তাঁহাদের আপন রসানুভূতির রঙে উহা অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া উহা এরূপ রসোত্তীর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারিয়াছিল। পদ্মাবতী হইতে কাদম্বিনী দেবী পর্যন্ত নারীগণ যদি হ্লাদিনী শক্তিরূপে জয়দেব হইতে ভানুসিংহের হৃদয়

স্পর্শ না করিতেন, তাহা হইলে শ্রীরাধিকা পোষাকের দোকানের গবাক্ষ-পুত্তলি হইয়াই বাঁচিয়া থাকিতেন; তাঁহার বিরহ-বেদনার অংশভাগী হইয়া আমাদের অন্তরাত্মা অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত না। তাই এ যুগের কবি বৈষ্ণব-কবিদিগকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

সত্য ক'রে কহ মোরে হে বৈষ্ণবকবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি।
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?
বিজন বসন্ত রাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি?

সুতরাং আমরা প্রেমকে যতই উচ্চাদর্শের পাদপীঠে বসাইতে যাই না কেন, তাহার ভিত্তি থাকিবে ইন্দ্রিয়ানুভব ও চেষ্টাবেদনের মৃত্তিকায়। ধ্যানলোকেও যদি প্রেমাস্পদাকে বসাইয়া তাহার চিন্তায় নিমগ্ন হই, তাহা হইলেও দেহে স্বেদ, পুলক, কম্প প্রভৃতি পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। এমন কি, সংক্ষোভজনিত নানারূপ লক্ষণ আবির্ভূত হইতে পারে। কাজেই আমরা এ গ্রন্থে দেহ, ইন্দ্রিয়, চেতন মন, সহজপ্রবৃত্তি, বুদ্ধি, সংক্ষোভ ও রসানুভূতির দিক্ হইতে প্রেমকে সন্দর্শন করিব ও তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কাম ও প্রেমে প্রভেদ-নিরূপণ

একটা কথা আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আসঙ্গলিপ্সা নামক সহজপ্রবৃত্তি বা কাম জিনিসটি প্রেমের একটি বড় অঙ্গ সন্দেহ নাই, কিন্তু কাম ও প্রেম ঠিক এক নয়। প্রেমের মধ্যে কাম সচরাচর থাকে, কিন্তু কামের মধ্যে প্রেম সচরাচর থাকে না। কারণ এক কথায় কাম জিনিসটি হইল একটি আবেগ, যাহা অনুকূল সংবেদন বা প্রত্যক্ষণের ফলে অথবা কোনো কামদৃশ্য

বা কাম্য ব্যক্তিকে চিন্তা করার ফলে অথবা কোনো ইচ্ছা বা অনুভব ব্যতিরেকেই অকস্মাৎ আসিয়া দেহমনকে আচ্ছন্ন করে এবং একটা অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিপূর্তির অনুভব জাগ্রত করিয়া প্রসাদনের চেষ্টা করে। কোনো কিছুর মাধ্যমে উহা অচিরে প্রসন্ন হয় তো ভালোই, নতুবা উহা আপনা-আপনি প্রশমিত বা বিলীন হইয়া যায়। কাম হইল সাময়িক বা ক্ষণিক এবং উহাতে সর্বক্ষেত্রে সকল সময় প্রসাদনের একটা বিশেষ পাত্র বা পন্থার জন্য উদগ্রীব হয় না, যে-কোনো পাত্র বা পন্থাকে তখনকার মতো অবলম্বন করে, নতুবা আত্মরতির দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে।

কিন্তু প্রেমের মধ্যে সাধারণতঃ একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যপাত্র থাকে এবং তাহার সহিত একটা দীর্ঘস্থায়ী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস জন্মে। প্রেমের মধ্যে কাম জাগিলে একমাত্র তাহার সহিতই উপরত হইবার আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হয় এবং কামের প্রসাদন ব্যতীত প্রেমাস্পদের সহিত কোমলতা, মোহ, সম্মান, স্নেহ, সৌহার্দ্য, সাহচর্য ও সান্নিধ্যের মধ্য দিয়া একটা কিছু মহত্তর উদ্দেশ্য-সাধনের আকুতি বা অনুভূতি জাগ্রত হয়। আমরা এই অনুভূতিকেই রসানুভূতি বা sentiment বলি। এই উদ্দেশ্যের মধ্যে থাকে একটি আরাম-দায়ক নীড় গড়িবার, অন্ততঃ একটি সন্তান সৃষ্টি করিবার এবং প্রেমাস্পদের ঘনতম সংস্পর্শে আসিয়া নিজের ব্যক্তিত্বকে তিলে তিলে নূতন করিয়া রচনা করিবার এষণা।

কামে শুধু লওয়া আছে, দেওয়া নাই। প্রেমে আগে দেওয়া, তারপরে পাওয়া আছে—ত্যাগের মধ্য দিয়া ভোগের আনন্দ আছে। লওয়া জিনিসটা অনেকখানি প্রবৃত্তিগত, দেওয়া জিনিসটি অনেকখানি শিক্ষাগত। শিশুকে দেখিবেন সে দুই হাত ভরিয়া তাহার পছন্দসই জিনিসগুলি লইতে জানে; যতক্ষণ বা যতদিন জিনিসগুলির উপর তাহার আসক্তি থাকে, ততক্ষণ বা ততদিন সে জিনিসগুলি প্রাণ থাকিতে কাহাকেও ছাড়িয়া দেয় না। তাহার একটা সখের খেলনা বা হাতের খাবারের কিছু অংশ অন্য ছেলেমেয়েকে দিতে সে ধীরে ধীরে শিক্ষা করে। পিতামাতার আদেশে অনেক সময় সে দেয় বটে, কিন্তু মনের মধ্যে খানিকটা ক্ষোভ চাপিয়া রাখিয়া। প্রেমের ব্যাপারে

কাড়িয়া লইবার শক্তি থাকিলেও পাওয়ার জন্য সাধনা করিতে—যোগ্যতা অর্জন করিতে—তাহার জন্য নীরব প্রতীক্ষা করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'আলোচনা' গ্রন্থের একস্থলে জ্ঞান ও প্রেমের তুলনা করিতে গিয়া বলিতেছেন, "জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় মাত্র, প্রেমের দ্বারা পাওয়া যায়। জ্ঞানেতেই বৃদ্ধ করিয়া দেয়, প্রেমেতেই যৌবন জিয়াইয়া রাখে। জ্ঞানের অধিকার যাহার উপরে তাহা চঞ্চল, প্রেমের অধিকার যাহার উপরে তাহা ধ্রুব। জ্ঞানীর সুখ আত্মগৌরব নামক ক্ষমতার সুখ, প্রেমিকের সুখ আত্মবিসর্জন নামক স্বাধীনতার সুখ।"...

প্রেমের মধ্যে কাম জিনিসটি সহজপ্রবৃত্তি ও সংক্ষোভ হিসাবে থাকে বটে, কিন্তু একটা প্রবল রসানুভূতির তলায় চাপা থাকে। অবশ্য কাম বলিতে আমরা কেবল উপস্থপ্রাধান্য বা যোনিলিঙ্গের সংযোগ বুঝাইতেছি না, যদিও লৌকিক-ভাবে তাহাই বুঝায়। চুম্বন, বক্ষোনিপীড়ন, আলিঙ্গন, হস্ত বা অন্য কোনো প্রত্যঙ্গ-দ্বারা লিঙ্গ বা যোনির স্পর্শন, অন্য কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পারস্পরিক স্পর্শ, গাত্রগন্ধ-গ্রহণ, জিহ্বা-দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চোষণ, মৃদু দংশন, নিকটে বসিয়া বাক্যালাপ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ, কিছুক্ষণ প্রিয়জনকে দর্শন, তাহাকে লইয়া ভ্রমণ বা তাহার নিবিড় সান্নিধ্য-উপভোগও কামের এলাকাভুক্ত। ইহাদের সমস্তগুলিকেই আমরা প্রেমের অন্তর্ভুক্ত করিতেও ইতস্ততঃ করিব না। এমন কি, পুরুষে-পুরুষে ও মেয়েতে-মেয়েতে যে দীর্ঘস্থায়ী ভালবাসা জন্মে, তাহাকেও আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকগণ স্বাভাবিক প্রেম নামেই অভিহিত করেন।

প্রেমের মধ্যে সংক্ষোভ ও সহজপ্রবৃত্তি

দুইটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে প্রেমজনিত একটা স্থায়ী আকর্ষণ ও তজ্জনিত রসানুভূতিটিই হইল আসল বিবেচনার বিষয়—তাহাদের বরাঙ্গ-জাতি (sex) যাহাই হউক না কেন। প্রেমের মধ্যে যখন রসানুভূতি একটা বড় স্থান অধিকার করে, তখন তাহার মধ্যে শুধু কোমলতার সংক্ষোভই স্থান পায় না, নারীর পক্ষ হইতে সহজাত **অপত্যস্নেহ** অল্পবিস্তর প্রেমাস্পদের প্রতি সঞ্চারিত হয়। বহু ক্ষেত্রে পুরুষেরও ঐ প্রবৃত্তিটি কিছু পরিমাণে তাহার

প্রিয়তমার প্রতি প্রধাবিত হইতে পারে। পতির প্রতি স্ত্রীলোকের আচার-ব্যবহারের মধ্যে অনেক সময় এই মাতৃত্ব-ভাব বিসদৃশভাবে ফুটিয়া উঠে। পতিকে তাহারা অসহায় শিশুর মতই স্নিগ্ধ-করুণার চক্ষে দেখে ও আদর-যত্ন করে। অনেক সময় তাহারা স্বামীকে এমন সব উপদেশ দেয়, যাহা একটা অবুঝ বালককে দিলে ভালো মানায়। তাই সীতাকে হারাইয়া রামচন্দ্র দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তমা শয়নে ছিল বেশ্যার মত, স্নেহে ছিল মায়ের মত, ক্ষমায় ছিল ধরিত্রীর মত।

প্রেম যত উচ্চস্তরের হউক না কেন, তাহার মধ্যে অন্যান্য সহজপ্রবৃত্তি কখনো কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে নচেৎ প্রকাশ্যভাবেই আত্মপ্রকাশ করে—আবেগ ও সংক্ষোভের মধ্য দিয়া। তন্মধ্যে **অহংপ্রবৃত্তিটি**—পতিপত্নীই হোন বা প্রেমিক-প্রেমিকাই হোন্—প্রত্যেকের প্রেমের মধ্যেই প্রবল হইয়া অবস্থান করে। পুরুষ যেমন নারীকে তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া জ্ঞান করে এবং মনে মনে গর্ববোধ করে, স্ত্রীলোকও সেইরূপ 'উনি একান্ত আমার, অন্য কোন মেয়েই ওঁর ভালবাসার অধিকারিণী হ'তে পারে না'—এই বিশ্বাসে বলীয়সী হইয়া থাকে।

তারপর **আত্মপোষণ-প্রবৃত্তিটি** দুইজনের মধ্যে দুই আকারে দেখা দেয়। স্ত্রী চাহে—যে তাহাকে সুখপ্রদ আহার-পরিচ্ছদ-আবাস দিবে তাহাকে ভালবাসিতে। স্বামী চাহে—যে তাহাকে রাঁধিয়া-বাড়িয়া যত্ন করিয়া খাওয়ায়, অসুখে সেবা করে, রোগান্তে পুষ্টিকর পথ্য প্রস্তুত করিয়া দেয়, তাহাকে ভালবাসিতে। সেইজন্যই ইংরাজীতে দুইটি দ্ব্যর্থ প্রবচন আছে যাহার অনুরূপ আমরা বাংলা ভাষায় খুঁজিয়া পাই না; যথা—"The way to a man's heart is through his stomach" এবং "A woman marries for a meal ticket." এই প্রথা ও এই প্রবাদ এখন শিক্ষিত নাগরিক-সমাজে উদ্দেশ্য ও অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে এই কারণে যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে শহরের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানিনী গৃহলক্ষ্মীগণ দ্রৌপদীর রন্ধনকলায় অপরূপ নৈপুণ্যের কথা ভুলিয়া তাঁহার পঞ্চপতিত্বের কথাই বেশী করিয়া ভাবিতেছেন এবং সম্প্রতি পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিয়া গৃহবহির্ভাগে পুরুষোচিত অর্থকরী কর্মে দলে দলে আত্মনিয়োগ করিতেছেন।

কৌতূহল-প্রবৃত্তিও নববিবাহিতের মধ্যে থাকে পর্যাপ্ত মাত্রায়। প্রত্যেকেই অপরের অতীত জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনার কথা জানিতে চায়—বিশেষভাবে কৈশোর-যৌবনে সে আর কাহাকেও ভালবাসিত কিনা তাহার খবর লইতে আগ্রহান্বিত হয়। ইহা ছাড়া একজন আর জনের দেহের ও মনের সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চায়। সহস্রবার অধরকপোলে চুম্বন করিয়া, সহস্রবার কুচযুগ-সম্পীড়ন করিয়া, সহস্রবার বক্ষে বক্ষ রাখিয়া, সহস্রবার দশপ্রকার ভঙ্গিমায় মদনোপাসনা করিয়া কাহারো যেন পূর্ণতৃপ্তি হয় না, মনে হয় আরো কিছু তৃপ্তির জিনিস আড়ালে রহিয়া গেল। দুইজনে যদি দুইজনের মন পায়, তথাপি মনের অন্ত পায় না।

দুইজনের মনের মধ্যে সর্বদা **ভয়**—কখন উহার প্রেম হইতে বঞ্চিত হইবে। 'হারাই হারাই সদা ভয় পাই!' আত্মীয় বা অনাত্মীয় অন্য যুবক বা যুবতীর সহিত গোপনে বা অর্ধপ্রকাশ্যে বেশী মেশামেশি হাসাহাসি করিতে দেখিলে তাহাদের **ক্রোধ** হয়, বিদ্বেষের জ্বালায় তনুমন জ্বলিতে থাকে। পত্নী পিত্রালয়ে যাইতে চাহিলেও মনে মনে ক্রোধ হয়। সম্ভোগ-বাসনা জাগিলে উপক্রম করিতে গিয়া স্ত্রীর অসুস্থতার সংবাদ পাইলেও বহু স্বামীর ক্ষোভের অন্ত থাকে না।

প্রেমে সংবেদন ও অনুভব

সংবেদন ও অনুভব তো সর্বপ্রকার প্রেমে উৎপন্ন হইবেই। অনুভবটি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সুখের। যে দিনের বরাঙ্গ-সম্মিলন অধিকতর আনন্দদায়ক হয়, সে দিনের কথা বহুদিন মনে থাকে। বরাঙ্গ-সম্মিলনে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই সজাগ হইয়া উঠে এবং পাঁচটি হইতেই সংবেদনসমূহ মস্তিষ্কের কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছিতে থাকে। এমন কি, মাদনিক আবেগ যখন অতিশয় উগ্র ও উদগ্র হয়, তখন উভয়েরই ঘর্ম ও অন্যান্য রসের অপ্রীতিকর গন্ধও খানিকটা দুর্বল ও সহনীয় হইয়া মস্তিষ্কে পৌঁছে। আবেগ যখন সবে জন্মিতে আরম্ভ করে, তখন কিন্তু সুগন্ধ উভয়ের নাসিকায় ত্বরিৎ রাগোদ্দীপক ও প্রীতিপ্রদ হয়।

প্রেমের সর্বাপেক্ষা বড় অনিবার্য উপকরণ হইল স্পর্শানুভব। শিশু জন্মিয়াই

সর্বপ্রথম স্পর্শানুভূতি পায়, ধাত্রীর করস্পর্শ ও মাতার বক্ষের স্পর্শ, সর্বোপরি বায়ুর স্পর্শ। সেই জন্মকালীন আদিম স্পর্শ ও তারপর করাঙ্গুলি দিয়া মাতার স্তন আঁকড়াইয়া ধরার অভিজ্ঞা প্রত্যেক শিশুর মনে এরূপ গভীরভাবে রেখাপাত করে যে, উত্তরকালীন প্রেমজীবনে উহারই জন্য সে প্রথম লালায়িত হয়। যৌনসম্মিলনের মধ্যেও এই স্পর্শই ঘন হইতে ঘনতর হয়, ক্রমে ঘর্ষণে ও সঞ্চাপে পরিণত হয় এবং স্পর্শসুখকালে নয়নপল্লব আপনাআপনি মুদিত হইয়া যায়।

প্রেমে বাস্তব ও আদর্শ

কাহারো প্রতি প্রেম যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তখন প্রেমিক তাহার প্রেমাস্পদাকে, প্রেমিকা তাহার প্রেমাস্পদকে রক্তমাংসের দেহধারী একটি বিশেষ সত্তা হইতে উচ্চতর পাদভূমিতে তুলিয়া ধরে এবং অতি নিকটে থাকিয়াও যেন তাহাকে দূরাবস্থিত বলিয়া জ্ঞান করে। অর্থাৎ সোজা কথায়, তাহার ব্যক্তিত্বের ন্যায্যাধিক মূল্য দিয়া তাহাকে আদর্শীভূত করিতে প্রয়াস পায়। ইহার পরের অবস্থায় সে কৈশোর-যৌবনে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে প্রিয়তম বা প্রিয়তমার যে এক বা একাধিক কল্পিত প্রতিরূপ মানসপটে বারংবার আঁকিয়াছিল, এই বাস্তব মূর্তির সহিত সেই ছবিকে প্রতিযোজিত করিতে চেষ্টা করে।

যদি সেই আপন-মনের-মাধুরী দিয়া পূর্বরচিত আদর্শের সহিত সত্যকার প্রেমপাত্রের রূপগুণের কতকটা মিল থাকে এবং যদি তাহার শৈশব-মনে গৃহীত পিতামাতা বা অন্য কোনো অতি প্রিয়জনের রূপগুণের সহিত কতকটা মিলিয়া যায়, তাহা হইলেই তাহার প্রেম তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়। তাহা হইলে বাকি ত্রুটিগুলি কল্পনা ও ক্ষমাস্নিগ্ধ প্রশ্রয়-দ্বারা সে পূরণ করিয়া লয়। সেইজন্য ভাবমুগ্ধ সত্যকার প্রেমিক বা প্রেমিকা যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে স্বরূপে দেখিতে পায় না, তাহাকে সর্বদাই অন্য রূপে দেখে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক উইন্‌ফ্রেড্ ব্রিজিজ্ বলিতেছেন, "The dreamer falls in love, but all the time he really perceives his own ideal and not the real person. The real person is thus greatly overvalued.

This is the psychological significance of the expression 'love is blind'."

প্রেমে দীর্ঘস্থায়িত্ব

প্রেম ঘনভূত ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে গেলে উভয়ের মধ্যে রুচি, নৈতিক বোধ, বিশ্বাস ও অনুরাগের বস্তু বা বিষয়ের মোটামুটি ঐক্য থাকার প্রয়োজন হয়। অন্ততঃপক্ষে যেন অবসর ও বিশ্রামকাল-যাপনের পন্থাগুলি এরূপ হয় যাহাতে উভয়েই সেগুলিতে একত্র যোগ দিতে পারে। তাহার উপর, ধর্মবিশ্বাস, ধর্ম-সম্বন্ধীয় আচারানুষ্ঠান, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রাষ্ট্রিক্ মতবাদে দুইজনে দুই বিপরীত মেরুবাসী হইলে চলিবে না। অন্ততঃ এ সম্বন্ধে উভয়পক্ষেরই যেমন খানিকটা মধ্যপন্থী, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মতসহিষ্ণু হওয়ার দরকার, তেমনি প্রেমের জন্য কিছু কিছু পুরাতন অভ্যাস ও সংস্কার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয়। তাহা ব্যতীত বর্তমান সংসার-পরিচালনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গঠন বিষয়ে উভয়েরই মতৈক্য ও ধীর বিচারবোধ থাকা কর্তব্য। সকলের উপর থাকিবে উভয়ের প্রতি উভয়ের সমানুভূতি, বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা।

প্রেমের এই সকল উপকরণ-সংগ্রহ এবং ইহার আভ্যন্তরিক রসানুভূতির উৎকর্ষ-সাধন একদিনে হয় না। ইহা তিলে তিলে ক্রম-পরিণতির পথে আগাইয়া চলে এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর লক্ষ্যস্থলে উপনীত হয়। কাজেই যাহারা এক লহমায় প্রথম দর্শনেই পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলে, তাহারা আবেগ বা সংক্ষোভের বশবর্তী হইয়া এরূপ করিতে পারে, রসানুভূতির ধারে-কাছে পৌছিতে পারে না। একবার দেখিয়াই যাহারা বলে 'উহাকে না পাইলে বাঁচিব না', তাহারা উহাকে পাইয়া অনেক ক্ষেত্রে ঠকিতে পারে, কারণ তাহাদের মানসগঠিত আদর্শের সহিত উহার রূপেরই শুধু সাদৃশ্য থাকে, হয়তো গুণের সাদৃশ্য কিছুমাত্র থাকে না। কাজেই তাহাদের নির্বাচন-তরণী ব্যর্থতার মরুশৈলে আঘাত খাইয়া নিমজ্জিত হইবার পুরাপুরি সম্ভাবনা পোষণ করে।

প্রেম ভঙ্গুর হয় কেন

প্রেম—বিশেষভাবে দাম্পত্য প্রেম—যে যে কারণে ক্ষণস্থায়ী, শ্লথভিত্তি ও ভঙ্গুর হয়, তাহার মধ্যে ঈর্ষা হইল অন্যতম। যখনি এক পক্ষ অন্য পক্ষের নিকট হইতে প্রত্যাশিত আদরযত্ন ও অভিনিবেশ পায় না, তখনি তাহার মনে ঈর্ষার উৎপত্তি হয়। ঈর্ষা হইল—ক্রোধ ও আহত অহমিকার সংমিশ্রণ। প্রেম-রসানুভূতি যেখানে যত কম, সেখানে ঈর্ষার বিষতরু তত সহজে অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ পায়।

আর কয়েকটি কারণ হইল—স্বামীর দীর্ঘকাল প্রবাস-বাস, নেশার বশীভূত ও/বা অন্যা নারীতে আসক্ত হওয়া, পত্নীকে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করা ('নষ্টনীড়ে'র চারুলতাকে মনে করুন)।

তারপর পত্নীর অতিরিক্ত বিলাসবৈভব-প্রসাধনপ্রিয়তা ও ব্যয়বাহুল্য, স্বামীর আত্মীয় বা বাহিরের কোনো পাতানো আত্মীয়ের সহিত বিসদৃশ ঘনিষ্ঠতা, স্বামীর পুরুষত্বহীনতা, সঙ্গমদৌর্বল্য, রতিজ ব্যাধিতে ভুগিবার কালে পত্নীকে সংক্রামিত করা, যে-কোনো পক্ষের ঘোর স্বার্থপরতা ও সন্তানদের প্রতি অবহেলা, পত্নীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ।

আরো কতকগুলি হেতু হইল—এক পক্ষের দীর্ঘস্থায়ী কঠিন ব্যাধি, অনটন অর্ধাশন শোক দুঃখ ও ঋণভার, নিত্য রুচি অভ্যাস ও আদর্শের সংঘর্ষ, স্বামীর অতিরিক্ত আত্মীয়-নির্ভরতা ও মাতা খুড়ি জ্যেঠী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াদের প্রতি দাসসুলভ আনুগত্য, স্ত্রীর অভাব-অভিযোগের প্রতি ঔদাসীন্য, সংসারে ক্রমাগত দ্বেষ-হিংসা-সন্দেহ-বিবাদ-অশান্তি, সর্বোপরি অবসর-বিনোদন দেশ-ভ্রমণ উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগদানের একটানা বঞ্চনা··· ইত্যাদি।

মনের একটি সৌন্দর্য আছে যাহা চোখে দেখা যায় না, অনুভব করা যায়; ঐ সৌন্দর্য স্বাস্থ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেমিককে দেহের স্বাস্থ্যের সহিত এই মনের স্বাস্থ্যটি অটুট রাখিতে হয়। এইবার আপনাদিগকে মানসিক সুস্থ ব্যক্তিদের কয়েকটি লক্ষণ শুনাইয়া দিই। এইগুলি দেহের সৌন্দর্যরক্ষায়ও প্রচুর সহায়তা করে। আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিম্নলিখিত গুণগুলির কোন্ কোন্‌টির অধিকারী, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। যে যে গুণ

আপনাদের কাহারো মধ্যে অভাব বুঝিবেন, এখন হইতে তাহার অনুশীলন করিতে পারেন।

একজন মানসিক সুস্থ ব্যক্তি

ভয়, ক্রোধ, প্রেম, ঈর্ষা, অপরাধবোধ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, শোক, বিরহ প্রভৃতি সংক্ষোভ-দ্বারা দীর্ঘকালের জন্য অভিভূত ও জীবন্মৃত হইয়া থাকে না। জীবনের অকৃতকার্যতা ও নৈরাশ্যকে সে অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক বলিয়া জ্ঞান করে। জগৎটাকে সে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর হইয়াও দেখে না, ছেলেখেলার সামগ্রী বলিয়াও মনে করে না। নিজের জীবনের ঘটনাগুলিকে জগতের বৃহত্তর ও অখণ্ড জীবনের ঘটনাস্রোতের একটি অতি ক্ষুদ্রাংশ বলিয়া মনে করে।

সে আপন সামর্থ্যকে বড় করিয়া ও পরের সামর্থ্যকে খাটো করিয়া দেখে না। একজন মুচি, মেথর, মুদ্দাফরাশ, মিস্ত্রি বা দিনমজুরের কাজের মধ্যেও কৃতিত্ব আছে, কৌশল আছে, মর্যাদা আছে, তাহা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।

নিজের ভুলত্রুটি, দুর্বলতা, অযোগ্যতাকে শুধু মনে মনে নয়—প্রয়োজন হইলে লোকসমক্ষে স্বীকার করে। তাহারা নিজেকে যেরূপ সম্মান করিতে জানে, তেমনি পরকেও সম্মান করিতে শিক্ষা করিয়াছে।

সর্ব প্রতিকূলাবস্থার সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি, সাহস ও ভরসা রাখে সে। ভয়ে ও দ্বিধায় কোনো নূতন কর্মভার হইতে পিছাইয়া আসে না। আকস্মিক দুর্ঘটনায় বা সঙ্কটাবস্থায় সে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত করে। সে জীবনের ছোটোখাটো ঘটনা, শ্রম ও ভ্রম হইতে শিক্ষা যেমন পায়, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও তেমনি পায়।

নিজেকে ও পরিবারকে কষ্ট দিয়া সে সঞ্চয় করে না। ছোটো খাটো হাওলাৎ সে হয়তো প্রয়োজন হইলে করে, কিন্তু ত্বরিৎ-পরিশোধ-ক্ষমতার অতিরিক্ত ঋণকে সে প্লেগের মত ভয় করে।

সে নিজের স্বার্থসাধন করিতে গিয়া অপরের স্বার্থে আঘাত হানে না; সে সম্বন্ধে তাহার বিচার-বিবেচনা-বিবেক সর্বদা জাগ্রত থাকে। সে গুটিকয়েক এমন বন্ধু রাখে যাহারা তাহার বিপদে সুপরামর্শ দিতে পারে, পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, অবসন্ন অবসরে সঙ্গ ও আনন্দদান করিতে পারে।

তাহার মতের সহিত আত্মীয়-বান্ধব-প্রতিবেশী-সহকর্মীদের মতভেদকে সে মাননা করিতে না পারিলেও অন্ততঃ স্মিতমুখে সহ্য করিতে পারে। প্রভুর আসনে বসিয়া তাহার বাধ্য ও অনুগত ব্যক্তিদিগকে সে ক্রমাগত হুকুম করিয়া খাটায় না, মাঝে মাঝে তাহাদিগকে বিশ্রাম দিয়া নিজে খাটে। সে সর্বদাই তাহাদিগকে মনে করিতে দেয় যে, সে তাহাদেরই মত একজন মানুষ।

সে প্রতিবেশীদিগের সহিত ভাব রাখিয়া চলে; তবে কাহারো সহিত বেশী দহরম-মহরম করে না অথবা কতকগুলি চক্রান্তকারীদের লইয়া দল পাকায় না। পাড়ার সমস্ত উৎসবে যোগদান করে, কিন্তু মাতামাতি করে না। সাধ্যমত চাঁদা দেয়, কিন্তু চাঁদা আদায়কারী বা কোষাধ্যক্ষ বা পরিচালকের পদ গ্রহণ করে না। যদি দায়ে পড়িয়া তাহাকে কোনো দায়িত্বমূলক পদের ভার গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে টাকা-পয়সার নিখুঁত হিসাব রাখে; প্রতি কঠিন সমস্যায় অন্ততঃ একজন জ্ঞানবৃদ্ধ পদস্থ ব্যক্তির ও অন্ততঃ দুইজন বয়ঃকনিষ্ঠ সৎস্বভাবের উৎসাহী কর্মীর পরামর্শ গ্রহণ করে।

সে নিত্য অন্ততঃ কয়েক মিনিটের জন্যও প্রাণ খুলিয়া হাসিবার সুযোগ করিয়া লয়। সে পরিস্থিতি, পরিবেশ, যুগ ও সময়ের পরিবর্তনের সহিত নিজের নীতি, মত ও কর্মপথ বদলাইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। অদূর ভবিষ্যতের কোনো দায়িত্বমূলক কাজের জন্য সে বর্তমানে একটা পরিকল্পনা করে এবং এই পরিকল্পনা-রচনায় গৃহ-বাহিরের একজন দক্ষ ব্যক্তির ও গৃহের ভিতরকার একটি প্রিয়জনের মন্ত্রণা গ্রহণ করে। নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন আবিষ্কার, নূতন ভাবগুলিকে সে নিজের ও পরিবারের পক্ষে কল্যাণদায়ক বলিয়া বিশ্বাস করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা সাগ্রহে বরণ করে।

সে কাজ করে যতখানি সময়, ঠিক ততখানি সময় বিশ্রামে ও নিদ্রায় ব্যয় করে। কাজের অবসরে সংবাদপত্র ব্যতীত অন্য কোনো শিক্ষামূলক বই পড়ে। প্রতিদিন যত অল্প সময়ের জন্য হউক না কেন, পতিপত্নী পরস্পর পরস্পরের সহিত ভাব-বিনিময় করে, গল্পগুজব করে, ছেলেমেয়েদের তত্ত্ব লয়; এক-একটা ছুটির দিন সমগ্র পরিবার ভ্রমণে বাহির হয়।

চিন্তার জন্য সে খানিকটা সময় পৃথক করিয়া রাখে; উহার মধ্যে সৃজনী

কল্পনার নিমিত্ত একটা অবসর থাকে বটে, কিন্তু উদ্ভটকল্পনা আসিয়া তথায় ক্বচিৎ অনধিকার প্রবেশ করে। সে বাস্তববাদী হয় ৭৫% ও ভাববাদী হয় ২৫%। ভাবোন্মত্ততা, যুক্তিহীন বিচারবুদ্ধি, বিশ্বাসের গোঁড়ামি বা গোঁয়ার্তুমি, জাগ্রত স্বপ্ন ও সুপ্তিস্বপ্ন তাহাদের জীবনের নাটমঞ্চে যদি কখনো দেখা দেয়, তাহা হইলে তাহারা মূক প্রহরীর অভিনয় করিয়া নিমেষে অদৃশ্য হয়। সে যে কাজই করুক না কেন, আগে গোড়া হইতে দেখে তাহাতে নিজের প্রাণভরা তৃপ্তি হইতেছে কিনা, তারপর পরের সন্তোষের প্রত্যাশা করে।

যাহারা মানসিকভাবে সুস্থ সবল, তাহারা বিশ্বাসী বন্ধু হয়, অনন্যমনা ও অক্লান্ত কর্মী হয়, হৃদয়বান পতি বা সেবাময়ী পত্নী হয়, স্নেহশীল পিতা বা মাতা হয় এবং নিয়মনিষ্ঠ নাগরিক হয়।

প্রেম কি চায়, কাহাকে চায়

কবি ব্রাউনিং একবার বলিয়াছিলেন, "Take away love and our earth is a tomb." প্রেমের সংজ্ঞার্থ লইয়া শুধু পণ্ডিতদিগের মধ্যে নয়, সাধারণ লোকেদের মধ্যেও—এমন কি মূর্খদের মধ্যেও মতদ্বৈধ আছে। প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে, উত্তরে ও দক্ষিণে যে দেশে যে অঞ্চলে যান না কেন, যাহাকেই প্রেম বলিতে তিনি কি বুঝেন জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাতে তিনি যে উত্তরটি দিবেন, তাহার সহিত তাঁহার বন্ধু বা বান্ধবীর উত্তরের মিল হইবে না। তারপর একজন শিক্ষিতের উত্তরের সহিত অশিক্ষিতের উত্তরের মিল হইবে না, পতির উত্তরের সহিত পত্নীর উত্তরের ঘোর অমিল দেখা যাইবে।

প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন্ পণ্ডিতের কি অভিমত, কি ব্যাখ্যা, কি ভাষ্য, তাহা লইয়া এ পুস্তকে আলোচনা করিবার স্থান সঙ্কুলান হইবে না। কেবল আপনাদিগকে মনে রাখিতে বলি যে, প্রত্যেক নর বা নারী মূলে আত্মপ্রেমিক অর্থাৎ সে নিজেকে যতখানি ভালবাসে, জগতের অন্য কাহাকেও ততখানি ভালবাসিতে পারে না। তাহার পর সে আজীবন ভালবাসে তাহার আদর্শকে। তারপর সে ভালবাসে তাহাকে যে তাহার আদর্শের সহিত সবচেয়ে বেশী খাপ খায়, যে উহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী রূপায়িত করিতে পারে। প্রেমের মনোমত

পাত্র বা পাত্রী পাওয়ার অর্থ হইল—কাহারো বস্তুগত ও ভাবগত জৈব আদর্শকে লাভ করা। কিন্তু লাভ করা ও অধিকার করা এক কথা নয়।

প্রেমাস্পদ নির্বাচনে স্বাধীনতা

এখনো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ও পাশ্চাত্ত্যের রোম্যান্ ক্যাথলিক সমাজে পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের দ্বারা বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্বাচনের যে প্রথা সনাতন কাল ধরিয়া প্রচলিত আছে, তাহাতে কোনো পক্ষই প্রেমের আদর্শানুযায়ী জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী স্থির করিবার অধিকার ও সুযোগ পায় না। উভয়কেই ভাগ্যনির্দেশ মানিয়া চলিতে হয় এবং ভাগ্য কাহারো প্রতি কমবেশী প্রসন্ন, কাহারো প্রতি কমবেশী অপ্রসন্ন হয়। পতিপত্নী উভয়কেই এখনো কতকটা অবস্থার দাসদাসী ও ভাগ্যের খেলার পুতুল হইয়া পতিপত্নীর ভূমিকা অভিনয় করিতে হয়; উভয়কেই বহু অসঙ্গতি অস্বাচ্ছন্দ্য অবিচার অত্যাচার অভিঘাতের সহিত দ্বন্দ্ব ও সন্ধি করিতে হয়।

মুসলমান সমাজে কতকগুলি সঙ্গত কারণে পতিপত্নীর বিবাহবিচ্ছেদ ধর্মসম্মত ও আইনানুগভাবে সম্ভবপর ও সহজসাধ্য। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও সম্প্রতি বিবাহবিচ্ছেদ আইন বিধিবদ্ধ ও প্রচলিত হইলেও তাহা নানাকারণে লোকপ্রিয় হয় নাই। তন্মধ্যে একটা কারণ হইল—সনাতন প্রথার প্রতি সশঙ্ক শ্রদ্ধাবশেষ; দ্বিতীয় কারণ হইল—মামলার ব্যয়, হাঙ্গামাহুজ্জৎ, সত্য-মিথ্যা-অতিরঞ্জিত সাক্ষ্যের মধ্য দিয়া আদালতে উভয় তরফের কলঙ্ক-প্রকাশ; তৃতীয় কারণ হইল—পুত্রকন্যাদের নিকট নিজেদের সম্মানহ্রাস ও শিশু-সন্তানদের ভরণপোষণ বা রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্ন; চতুর্থ কারণ হইল—উভয় তরফেরই বন্ধনচ্ছেদনের পর প্রেম-নির্ভরতা, সংসার-পরিচালন ও আর্থিক জীবন সম্বন্ধে সংশয়পূর্ণ অনিশ্চয়তা।

প্রাপ্তবয়স্ক তরুণতরুণীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আলাপ-পরিচয় ও কিছুকাল প্রণয়-বিশ্রম্ভনের ফলে আইনঘটিত যে স্বাধীন বিবাহ হিন্দুসমাজে সম্প্রতি নগরে নগরে লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, সেখানেও বিবাহজীবনে নৈরাশ্যকর ব্যর্থতার আবির্ভাব হওয়া কিছু বিচিত্র নয়; কিন্তু এই ব্যর্থতার জন্য তাহারা

হয় আপন-আপন প্রাগ্‌বিবাহিক বিচারবুদ্ধিকে দোষী করে এবং বন্ধনমুক্তির উদ্দেশ্যে হয়তো আইনের আশ্রয় লয়, কিন্তু পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের প্রতি দোষারোপ করিতে পারে না। তাঁহারা এ বিষয়ে আগাগোড়া অসম্পৃক্ত ও ও নিরাসক্ত থাকেন।

স্বাভাবিক প্রেম-সৌধের প্রথম সোপান হইল—দেহগতভাবে পারস্পরিক বারাঙ্গিক আকর্ষণ ও সামঞ্জস্য। সকলের প্রথমে রূপযৌবনের আকর্ষণ। এ বিষয়ে মেয়ে-পুরুষের আশ্চর্য রকমের রুচিবৈচিত্র্য আছে। গাত্রবর্ণ সম্বন্ধে বিবেচনা ভারতবর্ষে, বিশেষভাবে বাংলাদেশে যতখানি আছে, এতখানি বুঝি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নাই। শীতপ্রধান দেশগুলিতে অবশ্য blonde ও brunette লইয়া বেশ-কিছু বাছ-বিচার আছে। অধিকাংশ গৌরী মেয়েরা কিন্তু শ্যাম ও কৃষ্ণবর্ণের পুরুষের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। তারপর তাহারা বেশীর ভাগই পুরুষের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সাহসকে পছন্দ করে। বহু নারীর লোভ থাকে টানা চোখ, টিকালো নাক ও আধ-কোঁকড়ানো ঘন চুলের প্রতি।

প্রেমে সম্ভোগের স্থান

একের যদি প্রকৃতিগতভাবে সম্ভোগেচ্ছা অত্যন্ত বেশী ও অন্যজনের অত্যন্ত কম হয়, তাহা হইলে একটা সংঘর্ষের সূত্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা দানা বাঁধে। এইরূপ ক্ষেত্রে এক পক্ষকে খানিকটা আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হয় এবং অন্য পক্ষের রাগোদ্দীপনের জন্য পূর্বসূরী-প্রদর্শিত যে সকল পদ্ধতি আছে সেগুলি প্রয়োগ করিতে হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই পুরুষেরা বস্তুগত কামজ্ঞানে অধিকতর অগ্রসর ও সহজোত্তেজনশীল এবং মেয়েরা বিবাহ বা প্রথম-পুরুষসম্মিলনের পর কিছুদিন পর্যন্ত—এমন কি কেহ কেহ একটি সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত—আসঙ্গব্যাপারে সেরূপ আগ্রহশীল ও আবেগপ্রবণ হয় না। তদুপরি কামকেলির জন্য দেহমনে প্রস্তুত হইতে তাহাদের যেরূপ পুরুষ অপেক্ষা বিলম্ব হয়, তেমনি আসঙ্গে চরমতৃপ্তি লাভ করিতেও বিলম্ব ঘটে।

গত ৩৭ বৎসর ধরিয়া নানা বয়সী যুবকযুবতীদের কামজীবনের নানা দিক সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করিতে গিয়া লক্ষ্য করিতেছি যে, বাঙালী

তরুণদের একবারের সহবাসের স্থায়িত্ব গড়পড়তা তিন মিনিট, অপর পক্ষে তরুণীদের চরমানন্দ (যাহাকে ইংরাজীতে বলা হয় orgasm, আমি পরিভাষা করিয়াছি 'ইতিহর্ষ') লাভ করিতে লাগে গড়্‌পড়তা অন্ততঃ ছয় মিনিট। এইখানে দুই বরাঙ্গজাতির রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রকৃতিগত অসঙ্গতি দেখা যায়। অবশ্য সামান্য বিরামের পর দ্বিতীয় সহবাসে অনেক পুরুষেরই সম্ভোগ-স্থায়িত্ব ছয়-সাত মিনিট উঠিতে পারে।

চিরকালই পুরুষের সহবাস—বারে বেশী, স্থায়িত্বে কম ; নারীদের বারে কম, স্থায়িত্বে বেশী। তারপর গড়পড়তা পুরুষের সহবাস-শক্তি চল্লিশ বৎসর হইতে স্পষ্ট কমিতে থাকে, স্ত্রীলোকের কমিতে থাকে পঁয়তাল্লিশের পর হইতে। এখানেও অসঙ্গতি। তদুপরি পঁয়তাল্লিশের পর বহু স্ত্রীলোকের সম্ভোগস্পৃহা সামান্য কম হইলেও তাহারা পুরুষের সংসর্গ প্রায় ক্ষেত্রেই পায় না, কারণ পঞ্চাশ হইতে পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে প্রায় শতকরা নব্বইটি পুরুষের সহবাসশক্তি একেবারে নিম্নতম ধাপে নামিয়া আসে। ঐ সময় কাহারো ধ্বজদণ্ড প্রত্যাশিতরূপে দৃঢ়তা-লাভ করে না ; যদি-বা কিছু দৃঢ় হয়, তাহা হইলে অন্তঃপ্রবেশের কয়েক সেকেণ্ড হইতে এক মিনিটের মধ্যেই রেতঃপাত হইয়া যায়। ক্রমাগত এইরূপ অতৃপ্তিকর অসম্পূর্ণ রমণের ফলে উভয় তরফ হইতে অল্পবিস্তর বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্য আসে। পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর কাহারো কাহারো এক-একটা দিন বহু চেষ্টা সত্ত্বেও লিঙ্গ উচ্ছ্রিত হয় না। ষাট হইতে পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের পর হাজার-করা ৯৯৯ জনেরই কায়িক পুরুষত্বহীনতা চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

দুই-তিনটি সন্তান জন্মিবার পর অথবা বিবাহের তিন-চারি বৎসর পর বহু নারীই ঘন ঘন যৌনসংযোগ পছন্দ করে না। অথচ স্বামীর পার্শ্বে কিছুক্ষণ আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া শুইয়া মোলায়েমভাবে পুনঃপুনঃ চুম্বন, ওষ্ঠ-গণ্ড-চুচুকাদি চোষণ, মাঝে মাঝে কুচসংবাহন, সারা অঙ্গে মৃদু মৃদু হস্ত-বিলেপন প্রভৃতি উপচার অধিকতর পছন্দ করে। তারপর প্রেমিকের নিকট হইতে কিছুক্ষণ প্রিয়বচন শুনিতে ও তাহাকে শুনাইতে ভালবাসে। অথবা উভয়ে উভয়কে স্পর্শ করিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে পারিলে যেন আসল সহবাস হইতে

অধিকতর পুলকলাভ করে। কিন্তু অধিকাংশ পুরুষেরই অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক উপচার প্রয়োগ করিতে করিতে লিঙ্গোচ্ছ্রার ঘটে এবং তৎফলে তাহাদের সহবাসেচ্ছা উদ্রিক্ত না হইয়া পারে না।

বহু স্ত্রীলোকই বিবাহের অব্যবহিত পর হইতেই সহবাসে আনন্দ পায় না প্রধানতঃ চারিটি কারণে। প্রথম কারণ—প্রথম সহবাসজাত বেদনার কিছুকালস্থায়ী আশঙ্কাজড়িত স্মৃতি।

দ্বিতীয় কারণ—বল্লভের ত্বরিৎস্খলন। আমরা এমন বহু পুরুষেরই সন্ধান পাইয়াছি যাহারা প্রথম-যৌবন হইতেই এক-মিনিট হইতে দেড়-মিনিটের বেশী শুক্রসংযমন করিতে পারে না। আমাদের নিকটে এ সম্বন্ধে দুই তরফ হইতে রাশি রাশি বেদনানিষিক্ত অভিযোগ আসিয়াছে।

সকল ক্ষেত্রেই যে বিবাহপূর্বিক অতিরিক্ত পাণিমেহন (masturbation), পায়ুমেহন (homosexual practice), সুপ্তিস্খলন অথবা বারনারীগমন ইহার কারণ তাহা বলা যায় না। আমরা এরূপ বহু কেস জানি যে-ক্ষেত্রে কোনো যুবক কৈশোর-প্রারম্ভে অল্পকালের জন্য অত্যন্ত পরিমিত মাত্রায় পাণিমেহন করিয়াছে এবং যৌবনে প্রতি মাসে দুই-একবার করিয়া সুপ্তিস্খলনের অধীন হইয়াছে, অথচ তাহার সহবাসশক্তি শোচনীয়ভাবে ক্ষীণ, অতি অল্প উত্তমেই তাহা বীর্যনিষ্কাশন হয়। এক্ষেত্রে তাহার স্বাস্থ্যবতী ও স্বাভাবিক রাগময়ী প্রিয়তমা ক্রমাগত নৈরাশ্যবোধ ও পরে নির্বেদবোধ করে। তাহাতে দোষ দিবার কিছু নাই। গড়পড়তা সুস্থ রমণী কামনাপীড়িত হইয়া একাদিক্রমে প্রায় কুড়ি মিনিট কালব্যাপী রতিক্রিয়ায়ও শ্রান্তিবোধ করে না। এই সময়ের মধ্যে অধিকাংশ নারীরই দুই বা তিনবার ইতিহর্ষলাভ হইতে পারে।

তৃতীয় কারণ—গর্ভাশঙ্কা। জগতের অধিকাংশ সুস্থা নারীই বিবাহের মাধ্যমে অন্ততঃপক্ষে একটি নতুবা দুইটি সন্তান চায় ; প্রথমটি বা দ্বিতীয়টি পুত্র হইলে ভালো হয়। দুইটি শিশু জন্মিবার পর তাহাদের গর্ভ-ধারণে ঘোর বীতরাগ জন্মে। জন্মনিরোধ-উদ্দেশ্যে তাহারা যথাসাধ্য আসঙ্গ পরিহার করিয়া চলে এবং তজ্জন্য নানা অছিলার সৃষ্টি করে। জন্ম-নিরোধক যন্ত্রপাতিতে শতকরা ৮০টি অশিক্ষিতা ও অল্পশিক্ষিতা মেয়েদের বিশ্বাস নাই, রুচি নাই।

উচ্চশিক্ষিতাদের মধ্যেও কেহ কেহ ঐগুলির ঘোর বিরোধী, যদিও তাহারা অস্ত্রোপচার-দ্বারা চিরতরে জন্ম-নিরোধ বেশী পছন্দ করে। কোনো ফলপ্রদ সেবনীয় ঔষধ ব্যবহারেও তাহাদের আপত্তি নাই। পেশারি, লুপ, রিং প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্র ব্যবহারে তাহাদের অধিকাংশেরই পর্যাপ্ত অনিচ্ছার প্রমাণ আমরা নিত্য পাইতেছি। পুরুষের vasectomyর দ্বারা উৎপাদনশক্তির চিরাবসান-ঘটানোকেও তাহারা আন্তরিকভাবে সমর্থন করে।

চতুর্থ কারণ—প্রকৃতিগত কামশীলতা (frigidity)। জগতের প্রতি দেশে শতকরা দুই হইতে তিনজন পুরুষ যেরূপ স্বাভাবিকভাবে জন্ম হইতেই ক্লীব বা স্ত্রীসঙ্গমশক্তিবিবর্জিত থাকে, সেইরূপ শতকরা দুই হইতে তিন জন নারী জন্মগতভাবে পুরুষসঙ্গমবিতৃষ্ণ বা ব্যবহারিক কাম সম্বন্ধে ঘোর উদাসীন থাকে। ইহারা মনোমত পুরুষকে ভালবাসিতে পারে এবং প্রগাঢ়ভাবেই ভালবাসে; তাহার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু সঙ্গমোদ্যোগেই তাহারা কাতর হয়, অনিচ্ছা-প্রকাশ বা বিদ্রোহ করে। এই মানসিক বিরাগ তাহাদের সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, বিশেষভাবে যোনিনালীতে। যোনি-প্রাচীর ফুলিয়া শক্ত হইয়া এরূপভাবে নালীটি প্রায় বন্ধ করিয়া দেয় যে, পুরুষ পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও তাহার মধ্যে সাধনদণ্ড প্রবেশ করাইতে সমর্থ হয় না। তদুপরি এই চেষ্টার ফলে তাহারা উভয়েই সত্য সত্যই যন্ত্রণাবোধ করে; আবার অন্য দিকে পুরুষও কিছুক্ষণ এইরূপ নিষ্ফল প্রয়াসের ফলে স্খলন করিয়া ফেলে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য আপনাদিগকে জানাইয়া দিই। পৃথিবীতে আরো অন্ততঃ ৩% পুরুষ ও ২% স্ত্রীলোক আছে যাহারা স্বভাবনির্দেশেই জন্ম হইতে বিপরীত বরাঙ্গজাতিকে অর্থাৎ পুরুষ স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোক পুরুষকে ভালবাসিতে পারে না। এই সকল ও উপরোক্ত স্ত্রীপুরুষ আজকাল অনেক ক্ষেত্রে নিজেরা বিবাহ করে না। আগে ইহাদের প্রায় সকলেই সমাজবিধি মান্য করিতে ও বাল্য-কৈশোরে পিতামাতার উদ্যোগে নিতান্ত অসহায়ভাবে বিবাহজীবনে প্রবেশ করিত এবং বিবাহজীবনকে প্রায় ক্ষেত্রেই অভিশপ্ত, বিষাক্ত করিয়া তুলিত। আজকালও এইরূপ ঘটনা অবস্থাগতিকে দুই-চারিটি ঘটিতে দেখা যায়।

সংসারের ভিতরে ও বাহিরে আপনারা যে-সকল চিরকুমার ও চিরকুমারী দেখেন, তাহাদের শতকরা ৯০ জনের অধিক উপরোক্ত শ্রেণীর। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আমার পূর্বলিখিত ২।৩খানি পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে, পুরুষের মধ্যে যেরূপ জন্ম-সমকামী আছে, নারীর মধ্যেও সেইরূপ আছে। ইহারা আজকাল পারতপক্ষে উদ্বাহবন্ধনে বাঁধা পড়ে না। ইহাদের কেহ কেহ আযৌবন অথবা আমরণ একটি প্রেমাস্পদকে কাছে লইয়া পরম সুখে দিনযাপন করে। ইহাদের কয়েকটি কৌতূহলপ্রদ জীবনকাহিনী আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কিছু তথ্য গ্রন্থান্তরে পরিবেশন করিয়াছি, আরো করিব। এ গ্রন্থে নারীর সমকাম সম্পৃক্ত একখানি দীর্ঘ পত্র পরে উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের কথঞ্চিৎ কৌতূহল চরিতার্থ করিব।

আর একটি স্ত্রীপুরুষের ক্ষুদ্র দল—আন্দাজ ২-৩%—জীবনে কখনো নিজেকে ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না; ইহারা আত্মকেন্দ্রিক, আত্মকামী ও আত্মপ্রেমিক। ইহারা ঘোর স্বার্থপর, পরচ্ছিদ্রান্বেষী ও পরশ্রীকাতর। ইহারা বিবাহ করিলেও অপরপক্ষকে কিছুতেই সুখী করিতে পারে না। নিজেদের সাজসজ্জা, আমোদপ্রমোদ ও দেহসুখ লইয়া সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। সন্তান-স্নেহও ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত কম।

আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকার কৃত্য

আদর্শ প্রেম ও প্রেমিকের প্রসঙ্গে আমরা ফিরিয়া আসি। আসঙ্গলিপ্সা ও ও তাহার প্রসাদন প্রেমজীবনে একটি বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকে—এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রেম যত পরিণতির পথে অগ্রসর হয়, ততই আসঙ্গলিপ্সা কমিতে থাকে (কমানোও উচিত) এবং পুরুষের ক্ষেত্রে আসঙ্গ-ক্ষমতাও ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে। তখন উভয় তরফের অন্যান্য গুণগুলির বিকাশ অধিকতর প্রয়োজন হয়। আপনাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, প্রেমের গোড়া হইতেই একটা পারস্পরিক অধিকারবোধ (sense of belonging) অর্থাৎ 'তুমি আমারি, আমি তোমারই'-ভাব মনের মধ্যে বদ্ধমূল হওয়া চাই। ইহার জন্য চাই পারস্পরিক বন্ধুত্ব, বিশ্বাস ও নির্ভরতা। কোনো

পক্ষ হইতেই যেন ঐ অধিকার-বোধের মধ্যে একাধিপত্যের দুরাশা না জাগে। অনেক সময় প্রেমিকরা এ বিষয়ে স্বার্থপর ও একদেশদর্শী হয় বটে, কিন্তু আজকাল তদপেক্ষা বেশীসংখ্যক প্রেমিকাই বেশী করিয়া এইরূপ হইয়া থাকে। স্বামীর নূতন ভালবাসা পাইয়াই তাহারা স্বামীকে তাহার পূর্বের সমস্ত পুরাতন ভালবাসার বস্তু ও ব্যক্তি হইতে ছিনাইয়া, তাহাতে একান্তসমর্পিতপ্রাণ-রূপে দেখিতে চায়। পুরুষও অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর পিত্রালয়ের প্রতি আসক্তি, বাপ-মা-ভাইবোনের প্রতি ভালবাসার স্রোতকে যথাসাধ্য স্তিমিত বা রুদ্ধ করিয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। স্ত্রীর ঘন ঘন পিত্রালয়ে যাইবার বাসনাকে সে পারতপক্ষে উৎসাহিত করে না। অধিক দিন সেখানে থাকিলে সে স্পষ্টই অপ্রসন্ন হয়।

আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পর পরস্পরের নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্মে ও রসানুভূতির লক্ষ্যবস্তুতে কিছু প্রেরণা দিতে বা সহযোগিতা না করিতে পারুক, অন্ততঃ সহানুভূতি ও আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রতিভাবান স্বামীর একটা অনন্যসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কর্মের মর্ম স্ত্রীর নিকট সম্পূর্ণ বোধগম্য না হইলেও সে মাঝে মাঝে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং উহার প্রতি সে প্রচুর অনুরাগ পোষণ করে; অন্ততঃপক্ষে তাহা ভাবে-ভঙ্গীতেও প্রদর্শন করে। আমি আগের একটি গ্রন্থে বলিয়াছি, এই গ্রন্থেও পুনরায় বলিতেছি, স্বামী তাঁহার পরিবারের মধ্যে যাহাকে যতখানি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেন, পত্নীরও তাহার বেশী নয়, অন্ততঃ ততখানি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাঁহাদিগকে দিবার চেষ্টা করিতে হয়; অন্ততঃপক্ষে প্রদর্শন করিতে হয়। 'প্রদর্শন' শব্দটি আমি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিলাম। তাহাকে হয় পরিবার-মধ্যে অথবা সান্নিধ্যে নতুবা দূর হইতেও ইঁহাদের সহিত প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। বিবাহ সে শুধু স্বামীকেই করে না, স্বামীর পরিবারকেও করে।

স্বামী যতই বিদ্বান বুদ্ধিমান শক্তিমান প্রতিভাবান অর্থবান হউন না কেন, তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হন নববল লইয়া এবং গৃহে ফেরেন হৃতবল হইয়া। আদর্শা পত্নী তাঁহার গৃহ-প্রত্যাগমনটি যেন সোৎসুক সানুকম্প হৃদয়ে প্রতীক্ষা করেন এবং অধিক বিলম্বে সঙ্গতভাবেই উদ্বেগকাতর

হন। গৃহে পৌঁছিবামাত্র তাঁহাকে বিশ্রাম-গ্রহণের সর্ববিধ সুবিধা করিয়া দেন এবং চা-জলখাবারের অবিলম্বে ব্যবস্থা করেন। সন্তানদিগকে নানা আবদার অভিযোগ লইয়া তাঁহার গাত্রের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেন না। নিজের বা সংসারের অভাব-অনটন ও ফাই-ফরমাসের কথা বা অপ্রিয় সংবাদ শুনান না।

এক-একটি সংসারে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, পত্নী তাঁহার স্বামীর আফিস হইতে ফেরার প্রত্যাশায় দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহাকে সানন্দে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য নয়, কিছু ফাইফরমাস খাটাইবার বা একটা মন্দ খবর দিবার জন্য। "এখুনি কয়লা না এনে দিলে এ বেলা রান্না চড়বে না;" "শুভ্রার বাবা এই মাত্র বাজার থেকে একটা তাজা গঙ্গার ইলিশ এনেছে, একবার বাজারটা ঘুরে এসো তো, দেখ একটা আধ কিলোটাক্ ওজনের ভালো মাছ পাও কিনা;" "কাল রেশনের দোকান বন্ধ থাকবে, তাড়াতাড়ি রেশনটা নিয়ে এসে ব'সো।" "আর জামা কাপড় ছেড়ো না, ডাইং-ক্লিনিং থেকে একেবারে জামাকাপড়গুলো নিয়ে এসে জিরোও;" "হ্যাঁ ছাখো, ঐ সঙ্গে আধ পাউণ্ড চা-ও কিনে এনো, পার তো আমার জন্য একটা লিপস্টিক্ আর খোকার জন্যে বেবি পাউডার বুঝলে?...ইত্যাদি ফরমাস। যে স্বামী তখনি হাসিমুখে ছোটেন, হয় তিনি ত্রৈণ, নয় তিনি দেবতা।

প্রত্যেক স্ত্রী যেন মনে রাখেন, পুরুষ লোক গৃহমধ্যে শিশুর মত অসহায়; গৃহ তাঁহার বল ও আরাম-লাভের জায়গা। দুই জাতির মধ্যে এক দিক্ দিয়া পুরুষ দুর্বলতর, কারণ তাহাকে সংসারের জন্য খাটিতে হয় বেশী, চিন্তা করিতে হয় বেশী, আত্মীয় ও পরের জন্য বেগার খাটিতে হয় বেশী, প্রেমের ব্যাপারেও তিনি শক্তিক্ষয় করেন বেশী। কাজেই স্ত্রীলোক যদি নিজে চাকরিজীবী না হন, তাহা হইলে যেন স্বামীর স্বাস্থ্য ও শক্তি-রক্ষার জন্য, তাঁহার পুষ্টিকর আহার ও চিত্তবিনোদের জন্য—সন্তানগণের প্রতি যে মনোযোগ দেন—তাহার চেয়েও যেন বেশী মন ও সময় নিয়োগ করেন। পুরুষদের পরমায়ু স্ত্রীলোকদিগের চেয়ে ৫-১০ বৎসর কম হয়। একটি বহুপুত্রবতী, শ্রমশীলা, দরিদ্র ঘরের মাঝারি স্বাস্থ্যের স্ত্রীলোকও স্বামী অপেক্ষা অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের বেশী আয়ু লাভ করে।

যত নিম্ন-মধ্যবর্তী পরিবারের বধূ হোন না কোনো নারী, বৈকালে স্বামীর প্রত্যাগমনের পূর্বেই যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও রুচিকরভাবে সজ্জিত হইয়া তিনি স্বামীর প্রতীক্ষায় থাকেন। এই বেশটি তিনি যেন রাত্রি পর্যন্ত বজায় রাখেন। বহু গৃহেই নিত্য বৈকালে পাউডার-রুজ মাখার একটি অভ্যাস মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে দেখিতে পাই; কিন্তু বহু স্বামীই এই কদভ্যাসটিকে আদৌ সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেন না যদিও প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে তাঁহাদের সৌজন্যে বাধে। তদুপরি, সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-নিশীথে যখনই মেয়ে-গৃহিণীরা বাহিরে বেড়াইতে বা নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে যান, তখনি তাঁহাদের পাউডার ভ্রূ-অঞ্জনী নখ-রঞ্জনী ওষ্ঠ-রঞ্জনী ভ্যানিশিং ক্রীম রুজ প্রভৃতি প্রসাধনী ব্যবহারের পরব পড়িয়া যায়। প্রায় ক্ষেত্রেই এইগুলি এরূপ জবড়জঙ্গভাবে লাগানো হয় যে, তাহাতে তাঁহাদের স্বাভাবিক অসৌন্দর্য ও ত্রুটি আরো বাড়িয়া যায়, এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য যদি কাহারো কিছু থাকে, তাহা নিশ্চয়ই এই অনচ্ছ মুখোসের তলায় ঢাকা পড়িয়া যায়। এই কুরুচিকর অভিনেত্রী-বেশ লম্পটদের ক্ষুধা জাগায় কিনা জানি না, রুচিশীল ভদ্রলোকদের শ্রদ্ধা উৎপাদন করে না—ইহা নিশ্চিত।

স্থায়ী প্রেমে বৈচিত্র্য চাই

স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে কখনো আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব পুত্রকন্যা দাস-দাসীদের সম্মুখে, অপমানজনক তিরস্কার তো দূরের কথা, যেন দৃষ্টির দ্বারা, ভঙ্গীর দ্বারাও খাটো করিবার চেষ্টা না করেন। তাঁহারা দুজনেই যেন পরস্পরের দোষগুলি যথাসাধ্য ঢাকিয়া অপরের নিকট গুণগুলি তুলিয়া ধরেন, যাহাতে তাঁহারা আপন দোষগুলি সঙ্গোপনে শোধরাইবার সুযোগ পান। যুক্তির সহিত কেহ কাহারো দোষ দেখাইলে, দোষী যেন তাহা গায়ের জোরে জিদ করিয়া আত্মসমর্থন না করে।

পুরুষ ও মেয়ে দুইজনেই—মেয়েরা বেশী করিয়া—যেন মনে রাখে:

Variety's the very spice of life
That gives it all its flavor.

প্রেম বা বিবাহবন্ধন দীর্ঘস্থায়ী করিতে গেলেই তাহার মধ্য হইতে একাঘয় ও একঘেয়েমিত্ব যথাসাধ্য দূর করিবার চেষ্টা করিতে এবং তাহার মধ্যে নূতনত্ব ও বিচিত্রতার রঙ্ ফলাইতে হইবে। যে বাড়িতে আমরা বাস করি, তাহাতে যেরূপ মাঝে মাঝে কলি ফিরাইতে হয়, আসবাবপত্রগুলির অবস্থান বদল করিতে হয়, পুরাতন বদলাইয়া নূতন আনিতে হয়, ছবিগুলির ঝাড়পোঁছ করিতে হয়, পর্দাগুলির প্যাটার্ন বদল করিতে হয়, তেমনি ঘরের গৃহিণীরও ভাবভঙ্গী, রন্ধনকৌশল ও রূপসজ্জার অদলবদল করিতে হয়।

স্বামী ও স্ত্রীর প্রেম যত পুরাতন হয়, তত তাহা একদিক দিয়া শক্ত হয় বটে, আবার আর একদিক দিয়া তাহাতে ফাট্ ধরার সম্ভাবনা জমা হইতে থাকে। পুরানো প্রেমের মদিরায় ফেনা মরে, গাদ জমে; তলে তলে অবসাদ আসে, বিতৃষ্ণা জন্মে। বিদ্বেষের হরিতচক্ষু দৈত্য শয়নকক্ষের গবাক্ষ দিয়া উঁকি মারে। সেইজন্য বলি, সংসার-পালনের ঝঞ্ঝাট পোহাইতে ও ছেলেমেয়েরা বড় হইতেছে—এই অজুহাতে স্ত্রীলোকগণ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধা হইবার জন্য যেন কৃত্রিম প্রয়াস না করেন; স্বামীর প্রতি যথারীতি মনোযোগ-দানে যেন কার্পণ্য না করেন। দেহমনে ভিতর-বাহিরে তাঁহারা নিজেরা যতটা নিজেদের সৌন্দর্য ও যৌবনসুলভ ঠাটঠমক বিলাসবিভ্রম বজায় রাখিবেন এবং স্বামীর যত্নমমতায় তৎপর থাকিবেন, ততই তাঁহার প্রতি স্বামীর সনাতন মোহ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

অনেক স্ত্রীলোককেই দেখি ৩৫।৩৬ বৎসর বয়সেই সাজসজ্জায় প্রসাধনে অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি রঙিন্ বা ডুরে শাড়ি পরিতে লজ্জাবোধ করেন। ইহা ঘোর আপত্তিকর। স্ত্রী যত বৃদ্ধা সাজিবে, স্বামী তদপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ হওয়ায় সে-ও বৃদ্ধতর হইবার উদ্দেশ্যে বসনভূষণে অযত্নবান হইতে প্রলুব্ধ হইবে। একটি প্রৌঢ়োত্তর বা বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরও সুসৌষ্ঠবা ও সুসজ্জিতা পত্নীকে পাশে লইয়া প্রমোদভবনে, উৎসবানুষ্ঠানে বা কুটুম্বভবনে যাইবার ও মনে মনে তজ্জনিত উল্লসিত গরিমা অনুভব করিবার সাধ জাগে।

বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব আনিবার জন্য, আমার মতে, কিছুদিন আপোষে বা ঝগড়া করিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে থাকাও বাঞ্ছনীয়। মাঝে মাঝে

খুঁটিনাটি লইয়া ছোটখাটো বিবাদ করিয়া কথা বন্ধ করিলেও স্বল্পস্থায়ী বিরহ ও তাহার পর মিলনের মধ্য দিয়া সুন্দর একটা রুচি-বদল হয়। স্ত্রী যেন নিজেকে এরূপভাবে প্রস্তুত করেন যাহাতে তিনি বচনে-ব্যবহারে-দৃষ্টিতে-ভঙ্গীতে-বিলাস-বিভ্রমে স্বামীর নিকট চিরন্তন নবপ্রেমিকা হইয়া থাকিতে পারেন তাঁহার প্রৌঢ়ত্বের শেষ পর্যন্ত। অবশ্য স্বামীর চোখের বাহিরে বা আড়ালে তিনি পুত্র-কন্যাদের নিকট মাতার ও অন্য সকলের নিকট গৃহিণীর ভূমিকা নিপুণভাবে অভিনয় করিয়া যাইবেন।

স্ত্রী যেন উপসর্পণের জন্য স্বামীর প্রস্তাব ও উপক্রমের জন্য অপেক্ষা না করেন। এক-একদিন যেন নিজে উপযাচিকা হইয়া স্বামীর পার্শ্বে শুইয়া তাঁহাকে উত্তপ্ত করিয়া তোলেন। পুরুষসিংহেরও এক এক সময় নিশ্চেষ্ট মৃগশিশু হইয়া পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। তখন স্ত্রীলোকের পুরুষসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। এই ভঙ্গীকেই বাৎস্যায়ন 'পুরুষায়িত' বলিয়াছেন, বিদ্যাপতি হইতে ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন 'বিপরীত বিহার'। ইহাতে পুরুষের শুক্রস্খলনে কিছু বিলম্ব হয়। নারী অপেক্ষাকৃত ত্বরায় ইতিহর্ষ লাভ করে। সর্বোপরি কামজীবনে একটা বৈচিত্র্য-সম্পাদনেরও সুযোগ ঘটে।

আবার এক-একদিন পুরুষের অঙ্কে উপবেশন করিয়া নারী তাঁহার উচ্ছ্রিত সাধনদণ্ড আপন সম্বাধ-মধ্যে গ্রহণ করিয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অনেকটা সক্রিয়ভাবে শৃঙ্গারক্রিয়া চালনা করিতে পারেন। ইহাতে পুরুষের অঙ্গ-সঞ্চালন-জনিত শ্রম কম হয় এবং প্রিয়াকে দুই হস্ত দ্বারা আবক্ষ-সংশ্লেষণ, চুম্বন, বক্ষোনিপীড়ন ও চুচুক-চোষণ প্রভৃতি করিতে তিনি সে স্বচ্ছন্দে সমর্থ হন। ইহাও আর একটি বৈচিত্র্য। কিন্তু যাহাদের এক মিনিটের মধ্যে স্খলন হইয়া যায়, তাহাদের পক্ষে এ ভঙ্গী গ্রহণ না করাই ভালো।

প্রেম ও সাংসারিক কর্তব্য

আর একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া এই প্রসঙ্গের ইতি করি। স্ত্রীলোক পুরুষের গৃহবাহিরের দুশ্চরিত্রতা যদি বা বরদাস্ত করিতে পারে, কিন্তু গৃহমধ্যে জ্ঞানতঃ তাহার চরিত্রহীনতাকে ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারে না। আবার

অন্যপক্ষে দুশ্চরিত্রা, গৃহকর্মে ঘোর অমনোযোগী, সর্বদা বহির্মুখী, পুত্রকন্যাদের প্রতি অতি-উদাসীনা, অমিতব্যয়ী ও স্বমতস্পর্ধী স্ত্রী অচিরে স্বামীর প্রেম হারায়, তাহার গুরুজনদের স্নেহ হারায়, সন্তানদের শ্রদ্ধা হারায়। একটা রাজার রাজ্যনাশের চেয়েও ইহা যেমন দুর্ভাগ্যজনক তেমনি মর্মান্তিক।

পুরুষদিগকেও বলি মনোমত স্ত্রীকে পাইয়া তিনি তাঁহার আত্মীয়বান্ধবদের সহিত পুরাতন সম্পর্ক যেন পূর্ববৎ বজায় রাখেন। তিনি মাতা, ভগ্নী, খুড়ি, জ্যেঠীদের সহিত তাঁহার স্ত্রীকে নিক্তির ওজনে তৌল করিয়া যেন প্রত্যেকের নূতন করিয়া মূল্য-নিরূপণে প্রবৃত্ত না হন্। স্ব স্ব কক্ষে ভ্রাম্যমান গ্রহগুলির মত তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক-একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, তাঁহারা একটা যুক্ত উদ্দেশ্য ও মহৎ আদর্শকে ঘেরিয়া কাহারো সহিত সংঘর্ষ না করিয়া পরিক্রমণ করিবেন। অনেক সময় একজনের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বমতপ্রাধান্য ও সহানুভূতিশূন্যতা সংসারের ঐক্য, শান্তি ও পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দেয়।

গৃহকর্তাকে শুধু সুবিচারক ও সুবিবেচক হইলে চলিবে না, পত্নীপ্রেমের সংস্পর্শে থাকিয়া তাঁহাকে শতচক্ষুষ্মান্ হইতে হইবে। পত্নীর ভালবাসার সহিত তাঁহার ভালবাসার কোথায় পার্থক্য, কোন্‌টির কি দাম তাহা পুনঃ পুনঃ বিচার-বিবেচনা করিয়া, নিজের মূল্য ও ব্যক্তিত্বকে যেন বেশী উঁচুতে না তোলেন অথবা বেশী নীচুতে না নামান্। কোনো কোনো পুরুষকে দেখি, পত্নীকে পণ্যাঙ্গনা পরিচারিকা ও পাচিকার এক ধাপ উচ্চে স্থাপন করেন, আবার কেহ কেহ 'পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে' এইরূপ ভাব দেখাইয়া সর্বদা তাঁহার নিকট তটস্থ ও জোড়হস্ত হইয়া থাকেন। এই দুইটি মনোভঙ্গীকেই দুই চরমপ্রান্তিকতা বলিয়া জানিবেন।

জগতের গড়পড়তা অল্পশিক্ষিতা ও মোটামুটি শিক্ষিতা নারী যতই স্বাধীন-চেতা ও স্বাবলম্বী হউক না কেন, চিত্রাঙ্গদার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া যেন স্পর্ধার সহিত বলিতে পারে—

> "দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী,
> পূজা করি রাখিবে মাথায়—সেও আমি
> নহি; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে

পিছে—সেও আমি নহি ; যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।...

আবার পুরুষ-পাঠকদিগকে বার বার সতর্ক করিয়া দিই—তাঁহারা যেন কখনো গ্যেটের Wertherয়ের মত মিত্রসমাজে নিজের প্রণয়াস্পদা সম্বন্ধে গর্বিত গাম্ভীর্যে এই মন্তব্য না করেন—"She is sacred to me, all desire is silent in her presence."

পঞ্চদশ প্রসঙ্গ

ব্যবহারিক প্রেমে কতকগুলি অস্বাভাবিকতা

ফলিত প্রেমের ক্ষেত্রে বহুবিধ অস্বাভাবিক লক্ষণ, উপসর্গ ও ব্যাধির উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। অত্যন্ত সাধারণ কতকগুলির নাম উল্লেখ করিয়া যাইব, ইচ্ছা সত্ত্বেও গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় ঐ সকল অস্বাভাবিকতার বিবিধ কারণ, লক্ষণ ও আমাদের জানা-শোনা উদাহরণ অধিকসংখ্যক দিতে পারিব না। কেবল পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রেমজীবনের কয়েকটি সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি ও সমস্যামূলক সংঘটনের আত্মকাহিনী ও পত্র উদ্ধৃত করিব।

মানসিক ক্লৈব্য

এই ব্যাধি অল্পবিস্তর অস্থায়ী। ইহা মনের কতকগুলি সংক্ষোভ ও হেত্বাভাসদ্বারা উৎপন্ন হয়। বিবাহের অব্যবহিত পরে বহু পুরুষদের মধ্যে ইহা শোচনীয়ভাবে প্রকাশ পায়। অথচ ইহা সর্বক্ষেত্রেই চিকিৎসাসাধ্য। অত্যন্ত সুস্থ সবল যুবাপুরুষেরও এইরূপ অপ্রত্যাশিত, নৈরাশ্যকর উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কেবল নবপরিণীতা বধূ-সংসর্গে নয়, বিবাহের বাহিরে কোনো কুমারী বা সধবার সহিত গোপনে ও ভয়ে ভয়ে সঙ্গম করিতে গিয়া বহু কামোত্তেজিত তরুণের ধ্বজোত্থানরাহিত্য আবির্ভূত হয়। ইহার মধ্যে কিছু অবশ্য যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে।

ফুলশয্যা-নিশীথে ও তাহার পরবর্তী কয়েকটি নিশীথে পত্নীতে উপরত হইতে গিয়া এই ধরনের গ্লানিকর ব্যর্থতা আসিয়া উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে হয়তো অতীতের সেই আতঙ্কিত অভিজ্ঞতার স্মৃতি কাহারো মনের কোণে উদিত হয়; নতুবা 'একটি অনাঘ্রাত কুসুমকে কলঙ্কিত করিতে যাইতেছি' এইরূপ একটা অপরাধবোধ আসিয়া কাহারো হৃদয় অধিকার করে; নতুবা পূর্ববর্তী জীবনপর্যায়ে নানারূপ অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃপাতের যে-যে বিষময়

পরিণামের কথা বন্ধুদের নিকট শোনা বা নানা স্থূলবুদ্ধি কুসংস্কারাচ্ছন্ন লেখকদের ভ্রান্তিপূর্ণ অসার বইয়ে পড়া ছিল, তাহা না ঘটিয়া যায় না—এইরূপ একটা ভয়ার্ত বিশ্বাস কাহারো মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

যাহাদের বিবাহের পূর্ব হইতেই পূর্ণভাবে ধ্বজোত্থান হইত না, তাহাদের এই অসামর্থ্য প্রথম স্ত্রী-সম্মিলনে আরো স্ফুটতর হইয়া দেখা দিতে পারে এবং প্রধানতঃ দেখা দেয় মনোগত ভয়ে ও লজ্জায়। দ্বিতীয়তঃ, অজ্ঞতাবশতঃ স্ত্রীর যোনিনালী রসাক্ত না করিয়া হঠাৎ ধ্বজ-প্রবেশ করাইতে গিয়া বাধা-প্রাপ্তিতে। দেহগত যে যে কারণে সাময়িক বা চিরস্থায়ী ক্লৈব্য প্রকাশিত হয় সেগুলি এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিব না, তাহা গ্রন্থান্তরে ইতঃপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। শুধু এই স্থানে উল্লেখ করিতে চাই যে, কৈশোর-যৌবনে ঘন ঘন সুপ্তিস্খলন ও বরাঙ্গগত কদভ্যাসের অতিরিক্ত চর্চায় দেহমনের ততখানি ক্ষতি হয় না যত বেশী ক্ষতি হয় তজ্জনিত সশঙ্ক অপরাধবোধকে মনে স্থান দেওয়ায় ও অনাগত ভয়াবহ পরিণামের কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করায়।

আরো কতকগুলি দৈহিক সংবেদনগত ও সংক্ষোভজনিত হেতুর ফলে মানসিক লিঙ্গশৈথিল্য দেখা দিতে পারে; যথা—কিছুকাল ধরিয়া গনোরিয়া ব্যাধিতে ভুগিবার পরবর্তী অবস্থা, গুরুতর দুশ্চিন্তা, শোক, দুঃখ, ক্রোধ, অর্থনৈতিক সমস্যা, অতিরিক্ত কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম, কক্ষের বাহিরে এক বা একাধিক লোকের গোপনে অবস্থিতি সম্বন্ধে সংবিৎ, অপছন্দসই উপভোগপাত্রী, ঘৃণ্য দৃশ্য, জঘন্য দুর্গন্ধ, সহবাসের পূর্বে বহুক্ষণ ধরিয়া কল্পনা ও চিন্তার ফলে পুনঃ পুনঃ উত্তেজনার সঞ্চার প্রভৃতি।

পুরুষের ন্যায় মেয়েদেরও মানসিক রতিশক্তিহীনতা দেখা দিতে পারে। তাহাদের ক্ষেত্রে ধ্বজোত্থানের প্রশ্ন উঠে না, পুরুষের উত্থিত ধ্বজ যোনিনালী-মধ্যে গ্রহণের অক্ষমতা। এ সম্বন্ধেও "ফ্রএডের নারী-চরিত্র" গ্রন্থে বিস্তারিত-ভাবে বিচারবিবেচনা করা হইয়াছে। ইহাতে যোনি-প্রাচীর ফুলিয়া ফাঁপিয়া নালিমুখ একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়। অতিরিক্ত আশঙ্কার ফলে, ঘোর অনিচ্ছার ফলে অথবা পূর্বতন প্রেমিকের কথা প্রগাঢ়ভাবে চিন্তা করার ফলেও এইরূপ অসামর্থ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় দৃঢ় লিঙ্গ প্রবেশ করাইতে

গেলে, পুরুষ ও স্ত্রী দুইজনেরই প্রচুর বেদনাবোধ হয়। পুনঃপুনঃ প্রয়াসে ব্যর্থকাম হইয়া পুরুষের লিঙ্গও স্তিমিত হইয়া পড়ে।

অধিকাংশ অরমিতা কুমারীর যোনিনালি-মুখে একটি পার্চমেণ্টের ন্যায় পাতলা ও শক্ত সচ্ছিদ্র পর্দা ঈষৎ কুঞ্চিত অবস্থায় জন্ম হইতে অবস্থান করে। ইহার নাম "সতীচ্ছদ" (Hymen)। প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় সঙ্গমেই সতীচ্ছদটি ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়া আমূল লিঙ্গ-প্রবেশের সুবিধা করিয়া দেয়। কোনো কোনো মেয়ের সতীচ্ছদটি সাধনদণ্ডের পুনঃপুনঃ সজোর ধাক্কায়ও ছিন্ন হয় না অথচ এইরূপ ধাক্কা তাহার পক্ষে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক হয়। ইহা অবশ্য নারীর দেহগত অসামর্থ্য। ডাক্তারেরা এক মিনিটের ছুরি-চালনার দ্বারা এই বাধাকে চিরতরে বিদূরিত করিয়া দিতে পারেন।

সহবাসে ঘোর অনিচ্ছা ও সুখসংবেদনশূন্যতাও সদ্যপরিণীতা মেয়েদের আর একপ্রকার ক্লীবতা। যে-সকল মেয়ে বাল্য বা কৈশোর হইতে ভগাঙ্কুর নামক মূত্রনালীর উর্ধ্বে অবস্থিত ক্ষুদ্র উপাঙ্গটীকে অঙ্গুলি-দ্বারা বা অন্য কোনো অল্প কঠিন বস্তুর দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া বা করাইয়া আত্মরতি করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহাদের অনুভূতিশক্তি এই কেন্দ্রটিতেই চিরনিবদ্ধ থাকিয়া যায়। স্বামী হস্ত-দ্বারা এই যন্ত্রটি কিছুক্ষণ যাবৎ নিষ্পেষণ করিলে তাহারা ইতিহর্ষ লাভ করে। কিন্তু যোনিনালী-মধ্যে সাধনদণ্ড অনুপ্রবিষ্ট করাইলে হয় যন্ত্রণা বোধ করে, নতুবা অস্বস্তি বোধ করে, নতুবা সুস্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করে।

যে যুবতীরা কৈশোর হইতে ক্রমাগত যৌনোত্তেজনার অধীন হইয়া শুধু পুরুষসংসর্গ চিন্তা করিয়া প্রচুর যৌনরসক্ষরণ করিয়াছে অথবা যাহারা বাল্য হইতে কৈশোরের শেষ অবধি ক্রমাগত পুরুষের স্পর্শ, চুম্বন, আলিঙ্গন, বক্ষোনিপীড়ন প্রভৃতি লাভ করিয়াছে এবং যৌবনে দিনের পর দিন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও চাকরিস্থলে পুরুষের সহিত উঠাবসা করিয়াছে ও/বা সময়ে-অসময়ে হৈ-হল্লোড়-রঙ্গ-রহস্য করিয়াছে, তাহাদেরও জননযন্ত্রের অনুভূতিশক্তি অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং সহবাসকে তাহারা বিস্বাদ কর্তব্য বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখে। যাহাদের প্রতিবারই বিপজ্জনক প্রসব হয় এবং বহু সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহাদেরো কয়েক বৎসর পরে মানসিক রতিশক্তিহীনতা অভিব্যক্ত হয়।

অস্থায়ী মানসিক রতিশক্তিহীনতায় হতাশ হইয়া সর্বদেশে সর্বকালে নববিবাহিত যুবক-পতিদের কেহ কেহ উহাকে স্থায়ী দুর্ভাগ্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছে, নতুবা আত্মহত্যা করিয়াছে ও এখনো করিয়া থাকে। অথচ আত্মহত্যার পূর্বে যদি তাহারা কোনো চিকিৎসককে নিজেদের অসামর্থ্যের কথা ব্যক্ত করিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে এই চরম বিয়োগান্ত পন্থা গ্রহণ করিতে হইত না। বিবাহ-প্রাক্কালেও প্রেমাস্পদার দেহোপভোগের অধিকার পাইয়া কোনো কোনো প্রেমিক ব্যর্থকাম হইয়া, এইরূপ নির্মম পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। সাম্প্রতিক কালে উভয়প্রকার পর্যায়ের এ দেশীয় পুরুষের তিনটি আত্মহত্যার কথা আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

অভিনেতার আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত

তন্মধ্যে একজন ছিল সাধারণ রঙ্গালয়ের অতি প্রিয়দর্শন তরুণ অভিনেতা। সে অল্প বয়স হইতেই একটু বেশী রকমের রসানুভূতিশীল ও অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিল। কৈশোরে সে অন্যান্য বালকদেরই মত নিয়মিত পাণিমেহন করিয়াছিল। পরবর্তীকালে মাঝে মাঝে তাহার সুপ্তিস্খলন হইত। ইহাতে সে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িত। এই উপসর্গ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে দীর্ঘ দিন ধরিয়া কবিরাজী, হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসাধীন হইয়া নানারূপ ঔষধপথ্য ব্যবহার করিয়াছিল। কিছুকাল পূর্ব হইতে তাহার এক কৈশোরকালীন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল যে, সে বোধ হয় বিবাহের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে। ঘন ঘন সুপ্তিস্খলনে তাহার সাধনদণ্ড হ্রস্বাকার হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কোনো বন্ধুর পরামর্শক্রমে সে সুপ্তিস্খলন-ব্যাধি হ্রাস করিবার জন্য নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাসে দুইবার করিয়া পাণিমেহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু উহা অভ্যাস করিতে গিয়া সে লক্ষ্য করে যে, তাহার সাধনদণ্ড উপযুক্তরূপ দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইতেছে না এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যেই তাহার রেতঃপাত হইয়া যাইতেছে। এই নূতন উপসর্গের জন্য সে ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া ঔষধ ব্যবহার করিতেছে।

প্রাক্তন সহপাঠীটি তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বলে যে, ঐরূপ অনেকেরই হয়; বিবাহের পূর্বে তাহারও কতকটা ঐ ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। তারপর

বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দৌর্বল্য সারিয়া গিয়াছে, এখন সে ৫।৬।৭ মিনিট ধরিয়া পারস্পরিক তৃপ্তির সহিত রতিক্রিয়া করিতে সমর্থ। বিবাহিত বন্ধুটি তাহাকেও তাড়াতাড়ি বিবাহ করিতে বলিল এবং আরো পরামর্শ দিল এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত চিন্তা না করিতে। এই সকল উপসর্গকে যতই ভয় করা যায়, ততই উহারা চাপিয়া ধরে।...সমীচীন পরামর্শ সন্দেহ নাই।

ইহার পরের সিদ্ধান্তটুকু আমাদের ও ঐ বন্ধুটির যুক্তিসঙ্গত বিচারফল। কথিত সময়ের কিছুকাল পূর্ব হইতেই রঙ্গালয়ের একটি সুদর্শনা অভিনেত্রী তাহার রূপমুগ্ধ হইয়াছিল। বার কয়েক সে তাহার গৃহে ঐ যুবক অভিনেতাটিকে নিমন্ত্রিত করিয়া পানভোজনে আপ্যায়িত করিয়াছিল। ক্রমেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও আকর্ষণ গঙ্গার ভরা কোটালের মত বাড়িয়া উঠে এবং অভিনেত্রীটির আগ্রহাতিশয্যে ও সকরুণ নির্বন্ধে ঐ সুরূপ অভিনেতাটি তাহাকে অল্পকাল-মধ্যে বিবাহ করিতে সম্মত হয়। ইতোমধ্যে উভয়ের মধ্যে কয়েকদিন চুম্বনালিঙ্গনাদি বিনিময় হইয়াছে এবং অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণও অনুমান করে যে, তাহারা উভয়ে শীঘ্রই পরিণয়-বন্ধনে বাঁধা পড়িতে অগ্রসর হইতেছে।

এই সকল কথাও সে তাহার পুরাতন বন্ধুটিকে একদিন বলিতে ভুলে নাই। সে আরও বলে, কি করিয়া সে মাতার নিকট এই বিবাহের কথা ভাঙিবে এবং তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না। অভিনেত্রী যত ভদ্র হউক না কেন, তাহাকে তিনি নিশ্চয়ই গৃহে স্থান দিবেন না। একে তিনি পিতার হস্তে বহু দুঃখ পাইয়াছেন, তাহার উপর শেষ বয়সে যদি পুত্রের নিকট হইতে ব্যথা পান, তাহা হইলে জীবনে তাঁহার আর সান্ত্বনা কোথায়? অথচ অভিনেত্রীটিকে সে সত্যই ভালবাসিয়াছে, তাহার মনে ব্যথা দিতেও তাহার মন সরে না। মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছে সে। মাতাকে না জানাইয়া গোপনে বিবাহ করাটাও তাহার কিছুতেই উচিত হইবে না। বন্ধুটি বলে, তাহার মাতা বিবেচনাহীন নহেন। তিনি অবশ্যই এ বিবাহে মত দিবেন।...তাহার একে ছিল মাতার নিকট হইতে অনুমতি-গ্রহণের সমস্যা; তদুপরি, সে বিবাহের দিন কেবলি পিছাইতেছিল এইজন্য যে, তাহার আংশিক ধ্বজশৈথিল্য ও ত্বরাস্খলন-ব্যাধি তখনো ভালো করিয়া সারে নাই।

ইহার কিছুদিন পরেই তরুণ অভিনেতাটি বিষপানে আত্মহত্যা করে। পূর্বাপর ঘটনাক্রম হইতে কারণটি আমরা অনুমান করিতে পারি। সম্ভবতঃ যুবকটি নিকট-ভবিষ্যতের একটি শুভদিন স্থির করিয়া, ঐ দিন দাওয়ানী মতে বিবাহ করিবে বলিয়া অভিনেত্রীটিকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। প্রতিশ্রুতি-দানের অব্যবহিত পরে একরাত্রে অভিনেত্রীগৃহে পানভোজনের পর উভয়েই পরস্পরকে আদর-সোহাগ করিতে করিতে উত্তেজিত হইয়া পড়ে এবং পরে সম্ভবতঃ তাহারা চরম অভিজ্ঞতা-লাভের জন্য অস্থির হইয়া উঠে। কিন্তু অভিনেতার এই মহামুহূর্তে অসামর্থ্যবোধজনিত আশঙ্কা তাহাকে এরূপভাবে বেড়িয়া ধরে যে, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও সে সাধনদণ্ডকে আদৌ পরিস্ফীত করিতে পারে নাই এবং শিথিল অবস্থায়ই নিজেকে নিঃশেষ করে। বোধ করি ইহার পরদিনই তাহার শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটে।

রতিবিম্বিত কাম (Mixoscopy)

সকল দেশে—বিশেষভাবে সভ্য ও অর্ধসভ্যদেশে পুরুষদেরই ভিতর বেশী-সংখ্যক এরূপ একদল লোক আছে—যাহারা কোনো পশুপক্ষী বা মানুষের সঙ্গম-দৃশ্য না দেখিলে উত্তেজিত এবং সহবাসের জন্য সমুৎসুক হইতে পারে না। কৈশোর ও যৌবনের প্রথম অবস্থায় অবশ্য অনেকেরই গোপনে আত্মীয় বা অনাত্মীয়দের নগ্নাবস্থা দেখিবার একটা দূষিত কৌতূহল থাকে। কেহ কেহ বাল্যবয়সে কোনদিন পিতামাতা বা নিকট-আত্মীয়ের সহবাস-দৃশ্য অকস্মাৎ দেখিয়া ও উহাতে আমোদ অনুভব করিয়া, অতঃপর উহা দেখিবার সুযোগ খুঁজে। বহু কিশোর তদ্দর্শনে নিজেরা উত্তেজিত হইয়া, হয় পাণিমেহন-দ্বারা নতুবা গৃহের কোনো সমবয়সী বা বয়ঃকনিষ্ঠ আত্মীয় বা বালক-ভৃত্যের পায়ুমেহন-দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে।

কাহারো কাহারো এই অভ্যাস এরূপ বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, তাহারা বিবাহের পর কোনো স্ত্রীপুরুষের রতিদৃশ্য না দেখিতে পাইলেও অন্ততঃপক্ষে পক্ষীযুগল, কুকুর-বিড়ালাদির সঙ্গমদৃশ্য দেখিতে পাইলে তবেই সহবাসের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, নতুবা নয়। বহু প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি রাস্তাঘাটে চলিতে

চলিতে কোনো গৃহে বা পার্কে অপরের প্রেমকৃত্য দেখিয়া এত উত্তেজিত হইয়া পড়ে যে, তাহারা অবিলম্বে স্খলৎরেতঃ হইয়া পড়ে, নতুবা তৎক্ষণাৎ কোনো গোপন স্থানে গিয়া আত্মরতি করিতে বাধ্য হয়।

জগতে এরূপ অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় এবং আপনারাও দুইচারিজনের সন্ধান পাইবেন যাহারা চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, কবিগান, পাঁচালি, যাত্রাভিনয় প্রভৃতিতে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনদৃশ্য, স্পর্শ, চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি অথবা কোনো সুন্দরীর অর্ধনগ্ন দেহ অথবা বিলাতী চিত্রনাট্যে strip-tease দেখিয়া অসম্বরণীয়ভাবে কামোন্মত্ত হইয়া পড়ে। বহু বিদেশী চিত্রনাট্যের প্রত্যেকটিতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে এত প্রচুরসংখ্যক চুম্বনালিঙ্গন-দৃশ্য থাকে যে, তাহা এ দেশের অতি সংযতচরিত্র স্ত্রীপুরুষকেও অন্ততঃপক্ষে অন্তরে অন্তরে কিছুক্ষণের জন্য কামোত্তপ্ত না করিয়া ছাড়ে না।

শম্ভুবাবুর 'পুতুল-খেলা' নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, শয়নকক্ষে শম্ভুবাবু ও তৃপ্তি মিত্রের দাম্পত্য বিশ্রাম্ভালাপ ও শয্যার উপর উপচর্যা-দৃশ্যের অভিনয় এরূপ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, বহু তরুণ দম্পতি তো বটেই, মধ্যবয়স্ক পতিপত্নীও রীতিমত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার সম্মুখের তিন-চারিটি আসন-শ্রেণীতে কোনো কোনো দম্পতিকে দেখিলাম এক পার্শ্বের বাহু-দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ভাবোচ্ছ্বাসব্যঞ্জক সীৎকার-ধ্বনি করিতেছেন। ওই প্রণয়দৃশ্য শিথরস্পর্শী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় আসন-শ্রেণী হইতে এক প্রেমিকযুগল পরস্পর করনিবদ্ধকটী হইয়া উঠিয়া গেলেন ; তাঁহারা আর ফিরিয়া আসেন নাই।

বাস্তব-প্রেমকেন্দ্রিক উপন্যাস, নাটক, গল্প, কাব্য পড়িতে পড়িতে ও/অথবা প্রেমিকপ্রেমিকার নানাভঙ্গীর রতিদৃশ্য-সমন্বিত ফটো বা অঙ্কিত চিত্রাবলী দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পাঠকপাঠিকা খানিকটা স্বভাবসঙ্গতভাবেই কামোত্তেজিত হইয়া পড়ে। ঘনিষ্ঠ প্রেমচর্যার দৃশ্যটি অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অনেকেরই উত্তেজনা আপনা-আপনি প্রশমিত হইয়া যায়। ঐ সময় বহু পুরুষেরই ধ্বজদণ্ড ঈষৎ বা পুরাপুরি উন্নমিত হইয়া উঠে। আবার বহু অরমিতা কুমারীর ভগাঙ্কুর দৃঢ়তা-লাভ করিয়া মৃদু মৃদু স্পন্দিত হইতে ও

উহার মধ্যে কণ্ডুতি জাগিতে থাকে। কেহ কেহ উহা অঙ্গুলি-দ্বারা সংবাহন বা বিঘট্টন না করিলে স্থৈর্যলাভ করিতে পারে না।

বহু রমিতা কুমারী বা বিবাহিতা নারী এই জাতীয় উপন্যাস প্রভৃতির স্থলবিশেষ পাঠকালে অদম্য কামাবেগে অস্থির হইয়া পড়িলে, তাহাদের স্তীন-বার্থোলিন গ্রন্থিসমূহ হইতে প্রতিবর্তী ক্রিয়া-প্রসাদাৎ প্রচুর রসক্ষরণ হইতে থাকে এবং সমস্ত শরীরের তাপ ও রক্তচাপ বাড়িয়া যায়। প্রেমাস্পদ নিকটে থাকিলে তৎক্ষণাৎ পাঠ বন্ধ রাখিয়া তাহার নিকট উপযাচিকা হইয়া পরিরম্ভণ কামনা করে, নতুবা স্নানাগারে গিয়া অঙ্গুলি প্রভৃতি অন্তর্নিবেশ দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে রতিতর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এই সকল ক্ষেত্রে পাঠকপাঠিকা কল্পনায় ও চিন্তায় আপনাদিগকে চিত্রদৃষ্ট বা পুস্তকোক্ত নায়কনায়িকার সহিত একাত্মীভূত করে এবং কায়গতভাবে তাহাদের তথাকথিত প্রেমানন্দের পুরাপুরি অংশ গ্রহণ করিতে লালায়িত হয়।

ভদ্র পরিবারেও বহু বর্ষীয়সী নারীর আমরা সন্ধান পাই যাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী-কন্যা বা নিকট-আত্মীয়া কোনো কুমারীর প্রণয় ও পূর্বরাগের ব্যাপারে অসাক্ষাৎভাবে ও অদূর হইতে আপনাদিগকে জড়িত রাখিয়া প্রতিকল্পিত যৌনানন্দ উপভোগ করেন। এমন কি, এই শ্রেণীর মহিলারা একদিকে তাহাদের নীতির ন্যাসরক্ষক সাজিয়া তাহাদিগকে মৃদু মধুর তিরস্কার করেন, আবার অন্যদিকে হয়তো তাহাদের গোপন প্রেমিকদিগকে ধরিয়া নিজেদের গৃহে মাঝে মাঝে চায়ে বা ডিনারে প্রকাশ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া বসেন।

প্রতীয়মান কারণেই গৃহের আওতায় বা হাতায় কন্যা ও তাহার প্রেমিক-দিগের পরিপ্রীণন ও বিশ্রম্ভণে তাঁহাদের ততখানি আপত্তি থাকে না—যতখানি আপত্তি থাকে গৃহ-বাহিরে চক্ষের আড়ালে উহাদের অবাধ মিশ্রণে। তাঁহারা জ্ঞানতঃ এইরূপ ন্যায়ারোপণ করেন যে, গৃহের ভিতরে তাহাদের বিবাহপূর্বিক পূর্বরাগের ব্যাপার বেশীদূর গড়াইতে পারিবে না। আসলে কিন্তু তাঁহারা আড়াল হইতে উহাদের কিছু কিছু প্রণয়-বচন শুনিয়া, অদূর হইতে চুম্বন প্রভৃতি অবলোকন করিয়া ও তাঁহাদের জ্ঞানের অগোচরে সংঘটিত অতিরিক্ত খানিকটা কল্পনা দিয়া ভরাট করিয়া, তাঁহারা শুধু প্রতিকল্পিত আনন্দই পান না, মাঝে

মাঝে যৌবনোচিত কমোদ্দীপনা অনুভব করেন। তৎসহিত স্বামীকেও হয়তো হৃত যৌবরাজ্যে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

এরূপ কোনো কোনো নারীর কথাও আমরা শুনিয়াছি যাঁহারা স্বভাবতঃ মন্দকামা, কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রিতে স্বীয় ভ্রাতা-ভ্রাতৃবধূর অথবা অন্য কোনো আত্মীয়-গৃহে বরবধূর প্রথম মিলন-নিশীথের মেদুর আলাপ, প্রণয়-সম্ভাষণ ও গূঢ়ার্থব্যঞ্জক অন্যবিধ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি মদনসম্পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন এবং স্বামী ঐ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে, অবিলম্বে তাঁহার সহিত গোপনে মিলিত হইয়া তবে শান্তিলাভ করিতে পারিয়াছেন।

এইগুলিকে মৃদু রকমের ও নাতি-অস্বাভাবিক শ্রেণীর সাংঘটিক রতিবিম্বিত কামের দৃষ্টান্ত বলা যায়। কিন্তু যেখানে অপরের রতিদৃশ্য না দেখিলে কোনো স্ত্রী ও বা পুরুষের কামই জাগ্রত হয় না এবং রতিক্রিয়ায় তাহাদের আদৌ লিপ্সা বা সামর্থ্য জন্মে না, সেখানে তাহা আসল ও উৎকট রকমের রতিবিম্বিত কাম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এইরূপ কামের কতকগুলি জ্ঞানোজ্জ্বল উদাহরণ আমাদের পরিজ্ঞানের এলাকায় আসিয়াছে।

সম্পাদকের উদাহরণ

কলিকাতার প্রাচীন শিক্ষিত, ধর্মসংস্কারক এক উদার বংশের কোনো ভদ্রলোক প্রায় ৩৮ বৎসর পূর্বে আমার নিকট নিজে তাঁহার উক্তরূপ কামজ ব্যাধির কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার পদবী বলিব না, কারণ তাহা হইলে তাঁহার বংশ-পরিচয় তৎক্ষণাৎ স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া পড়িবে। ঐ ভদ্রলোকটি কিছুকাল একটি ধর্ম সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং ধর্ম ও পরলোক সম্পর্কে কয়েকখানি নাতিবৃহৎ পুস্তকও লিখিয়াছিলেন।

তিনি মাসের একটি নির্দিষ্ট দিবসে তাঁহার এক বিশ্বস্ত সুহৃৎ ও তাঁহার পত্নীকে সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহাদের বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকার এক প্রান্তে তাঁহার ব্যবহারের জন্য বড় বড় দুইটি শয়নকক্ষ নির্দিষ্ট ছিল। ঐ দিন রাত্রি নয়টা হইতে সাড়ে-নয়টার মধ্যে এই সম্পাদক ভদ্রলোক, তাঁহার স্ত্রী ও বন্ধুদম্পতির আহার সমাধা হইয়া যাইত। তিনি নিজে,

তাঁহার সহধর্মিণী ও মিত্রজায়া এই তিন জনেই মোটামুটি ভালো গান গাহিতে পারিতেন। ঘরে অর্গ্যান ছিল, পর পর তিনজনেই ব্রাহ্ম সঙ্গীত দিয়া আসর আরম্ভ করিতেন। কোনো কোনো দিন সম্পাদকের দুই তরুণী ভ্রাতুষ্পুত্রীও সেই মজলিসে অল্পক্ষণের জন্য যোগদান করিত এবং দুই-তিনটি গান গাহিয়া বিদায় লইত। পরিশেষে দুই মহিলাই রবীন্দ্রনাথ-রচিত দুই-তিনটি প্রেমসঙ্গীত গাহিয়া সেদিনকার মত মজলিসের উপর যবনিকাপাত করিতেন।

দুইটি শয়নকক্ষের মধ্যকার প্রাচীরে একটি দরজা ছিল। একটি কক্ষে—যাহা সম্পাদক মহাশয়ের শয়নকক্ষরূপে ব্যবহৃত হইত—ল্যাজারাসের বাড়ির প্রকাণ্ড পালঙ্ক ছিল। তখনকার মত ঐ কক্ষে বন্ধু ও বন্ধুপত্নী শয়ন করিতেন। পার্শ্বের কক্ষটি অবশ্য ড্রইংরুমরূপে ব্যবহার করা হইত। তথায় গদি-আঁটা চেয়ার ও টেবিল ব্যতীত একটি পৃষ্ঠাশ্রয়শূন্য চওড়া সোফা রক্ষিত ছিল। রাত্রি সাড়ে-দশটা লাগাৎ উভয় কক্ষের উজ্জ্বল বর্তিকা নির্বাপিত করিয়া সবুজ রঙের বাল্বওয়ালা মৃদুশক্তির আলো জ্বালাইয়া দেওয়া হইত। মাঝের দরজাটি অবশ্য খোলা থাকিত।

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পত্নীকে লইয়া ড্রইংরুমের দিকে ঐ উন্মুক্ত দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেন। তাঁহার নিজের অঙ্গে একটি ঢিলা আণ্ডারউইয়্যার থাকিত, স্ত্রীর অঙ্গে মাত্র একটি সায়া ও কাঁচুলি। সম্পাদক মহাশয়ের পর্যঙ্কে বন্ধুটি ও তাঁহার পত্নী শয়ন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে নির্বসন করিতেন এবং মিনিট কয়েক সর্বাঙ্গে নিরতিশয় নিবিড়ভাবে উপচার প্রয়োগ করিতেন। এই দৃশ্য দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক মহাশয়ের ধ্বজোত্থান ঘটিত এবং তাঁহার পত্নীও তৎক্ষণাৎ বিবসনা হইয়া সোফায় শয়ন করিতেন। অতঃপর তিনি তাঁহার ঢিলা আণ্ডারউইয়্যারটি বিদ্যুৎগতিতে খুলিয়া তাঁহার প্রতীক্ষমাণা অর্ধাঙ্গিনীতে উপগত হইতেন। মাসে মাত্র একটি দিন। এই ব্যাপার প্রায় চতুর্দশ বৎসরকাল একাদিক্রমে চলিয়াছিল। তারপর সম্পাদক ভদ্রলোকটি পরলোকগত হন্।

অধ্যাপকের কদর্য রতিবিম্বিত কাম

আরো পাঁচজন ভদ্রলোককে আমি ব্যক্তিগতভাবে বহুদিন ধরিয়া জানি যাঁহারা প্রত্যেকেই আযৌবন শোচনীয়ভাবে রতিবিম্বিত কামের অধীন ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনজনই বাংলা ও বিহারে দীর্ঘকাল ধরিয়া অধ্যাপনা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; ইঁহারা বার্ধক্যক্লিষ্ট অবস্থায় এখনো জীবিত আছেন। একজনের শিক্ষিতা ও সমাজসেবিকা পত্নী কয়েক বৎসর পূর্বে গতায়ু হইয়াছেন। ইঁহাদের একজনের কাহিনী একটু সবিস্তারে বলিতেছি।...ইঁহার ছদ্মনাম পরেশবাবু রাখিলাম। তিনি বিবাহ করিবার এক বৎসর পরেই তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ এক অবিবাহিত বন্ধুকে স্ত্রীর সহিত অতি ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক স্থাপন করিতে প্ররোচিত করেন। নবযৌবনা স্বল্পশিক্ষিতা পত্নীর প্রথম কিছুদিন ঘোরতর আপত্তি দেখা গিয়াছিল; এমন কি স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া তিনি ছয় মাসের অধিক কাল পিত্রালয়ে ছিলেন। বিবাদের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞ পিতামাতা অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া অবশেষে কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দেন এবং হিন্দু স্ত্রীর সনাতন সহিষ্ণুতা ও স্বামিভক্তির প্রতি তাঁহাকে অবহিত হইতে বারংবার উপদেশ দেন। ইঁহার পিতাও ছিলেন অধ্যাপক।

অভাগিনী মুখ বুজিয়া তাঁহার দুর্ভাগ্যের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ঐ সুদর্শন সুগঠিত স্বাস্থ্যবান পরেশবাবু তাঁহার নিজ গৃহের শয়নকক্ষের বিস্তৃত পালঙ্কে পত্নী ও সহপাঠীকে লইয়া শয়ন করিতেন। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্ধকারে টর্চ জ্বালাইয়া শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া পুলকিত আগ্রহে তাঁহার পত্নীর অনিচ্ছাপ্রসূত ব্যভিচার দর্শন করিতেন। উহা দর্শন করিতে করিতে প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁহার ধ্বজোত্থান ঘটিত এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি মন্দ মন্দ গতিতে পাণিমেহন করিতেন। ক্বচিৎ বন্ধুর ক্রিয়া তাঁহার স্খলনের পূর্বে শেষ হইয়া গেলে, তিনি তন্মুহূর্তে স্ত্রীতে যুক্তাঙ্গ হইয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই ইতিহর্ষ লাভ করিতেন।

এইরূপ ৪।৫ বৎসর চলিবার পর বন্ধুটি দিল্লিতে একটি দায়িত্বমূলক সরকারী পদ পাইয়া চলিয়া যান। তখন পরেশবাবু কিছুদিন কুৎসিত কামলীলা বিষয়ক হাতে-লেখা, টাইপ-করা ও গোপনে-মুদ্রিত নানাবিধ কুরুচিকর ইংরাজী ও

বাংলা পুস্তক এবং রাশি রাশি ফরাসী নগ্নচিত্র সংগ্রহ করিয়া, ঐগুলি অভিনিবেশ সহকারে পঠন ও দর্শন করিতেন এবং মাঝে মাঝে কামপীড়িত হইতেন। তখন প্রায় প্রতি রাত্রে কিছুক্ষণ পাণিমেহন করিবার পর স্ত্রীকে সম্ভোগ করিতেন। কিন্তু উহা নামমাত্র সম্ভোগ।

বৎসর দুই পরে পরেশবাবুর আর একটি বন্ধু জুটিয়া যায়, যিনি তাঁহারই মত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ও তখন কোনো স্বনামখ্যাত কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত ছিলেন (পরে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হন্)। তিনিও মাঝে মাঝে এইরূপ ব্যাপারে নিযুক্ত হইতেন—কিছুটা স্বেচ্ছায়, কিছুটা বন্ধুর নিরতিশয় নির্বন্ধে। কিন্তু এই বিসদৃশ আচার তাঁহার রুচি ও বিবেককে ক্রমাগত পীড়িত করিতেছিল। বিশেষতঃ তিনি ৬।৭ বৎসর পূর্বে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং দুইটি সন্তানের পিতা হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ তিনি বন্ধুর গৃহ ও গৃহিণী হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু বন্ধুটি নাছোড়বান্দা। স্ত্রীটি স্বামীর এই অবৈধসংসর্গদর্শনপ্রিয়তাকে দারুণ জুগুপ্সার চক্ষে দেখিলেও খানিকটা উপায়হীনা হইয়া, নিজেকে অবস্থাপ্রবাহে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে স্বামীর প্রতি প্রচণ্ড উষ্মাও প্রকাশ করিতেন। উদারচরিত স্বামী ধ্যানস্থ মহেশের ন্যায় অচল, অটল, কিছুতেই তাঁহার ধৈর্য বা সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটিত না, ঐ নিন্দনীয় স্বভাবেরও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হইত না।

ইতোমধ্যে শ্বশুরালয়ে পরেশবাবুর একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। স্ত্রী পিত্রালয় হইতে যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন কোলের সন্তানটির তত্ত্বাবধান লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং স্বামীর নিকট হইতে পৃথক শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। স্বামী তাঁহার পত্নীর কাছে বড় একটা আসেন না, তাঁহার সহিত বেশী কথাবার্তাও বলেন না। তাঁহার গর্ভধারণ ব্যাপারটাকেই তিনি অপ্রীতির চক্ষে দেখিতেছিলেন; এখন কন্যাসন্তানের প্রতিও তাহার ঘোর ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। সন্তান-জন্মের ছয় মাসের মধ্যে তিনি মাত্র একবার পত্নীসম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাও নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে।

কন্যার যখন ছয় মাস বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াছে, তখন একদিন সন্ধ্যার পর অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার সেই অধ্যাপক বন্ধুটিকে টানিয়া আনিলেন। এবার

শুধু পরেশবাবু নহে, তাঁহার স্ত্রীও তাঁহাকে প্রচুর আদরাপ্যায়ন করিয়া তাঁহাকে উপসর্পণে প্রণোদনা দিলেন। স্ত্রীর ভাবান্তরে পতি খুশিই হইলেন। অতঃপর মাসে দুই-একবার করিয়া অধ্যাপক মহাশয় আসিয়া এই দম্পতির অস্বাভাবিক কামনার প্রীণন করিয়া যাইতেন। পরেশবাবুর স্ত্রীরও দীর্ঘকাল পরে ঐ ভদ্রলোকের প্রতি যেন একটা আকর্ষণ, একটা মোহ জন্মিয়া গেল; কারণ তিনি অন্ততঃপক্ষে উঁহার নিকট হইতে তাঁহার স্বাভাবিক আসঙ্গলিপ্সার চরিতার্থতা লাভ করিতেন। তিনি স্বামীর সম্মুখেই এক-একদিন সজলচক্ষে কাতরকণ্ঠে ভদ্রলোকটিকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে এবং মৌখিকভাবেও তাঁহাকে হাস্যমধুর প্রণয়বচনে অনুরঞ্জিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে স্বামীর রোষ বা আক্ষেপের কোনো কারণই ঘটিত না। বৎসর দুই-তিন এইভাবে কাটিবার পর অধ্যাপক বন্ধুটির একটি পুত্র অপঘাতে মারা যায়। ইহার পর হইতে তিনি বন্ধুপরিবারের সহিত চিরতরে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

কন্যা-সন্তানটির বয়স যখন প্রায় চারি বৎসর, তখন পরেশবাবুর পত্নী পুনরায় গর্ভবতী হন এবং তিনি একাধিক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া চারি মাসের গর্ভ লইয়া পিত্রালয়বাসিনী হন্। অতঃপর ছয় মাসের একটি পুত্র লইয়া তিনি স্বামিগৃহে ফিরিয়া আসেন। পুত্রের বয়স যখন এক বৎসর, মাতার বয়স যখন চব্বিশ বৎসর, পরেশবাবুর বয়স যখন চল্লিশ বৎসর, তখন একদিন তিনি তাঁহার এক সতেরো বৎসর বয়স্ক সুদর্শন ছাত্রকে গৃহে আনিয়া স্ত্রীর সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন।

ছাত্রটি যখন ম্যাট্রিকুলেশনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন তিনি পরীক্ষার পূর্বে উহাকে ছয় মাস কাল পড়াইয়াছিলেন। পরে পাস করিয়া এই ছেলেটি তাঁহারই কলেজে ভর্তি হয় এবং তিনি যে বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন, ঐ ছাত্রটিরও উহা অন্যতম অতিরিক্ত বিষয় ছিল। মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ব্যবস্থানুযায়ী সপ্তাহে দুইদিন করিয়া সে ৫ মাইল দূর হইতে পরেশবাবুর নিকট পড়িতে আসিত। অধ্যাপকটি এই অপরূপ লাবণ্যবান তরুণের প্রতি সমকামিক মোহে যেরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, স্ত্রীকেও সেইরূপ বিষমকামিক মোহে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাহিলেন।

এজন্য বেশী চেষ্টা করিতে হইল না। স্ত্রীর লজ্জা ভাঙিয়া গিয়াছিল, বিচারবুদ্ধি ঘুচিয়া গিয়াছিল। অবশেষে ছাত্রটি তাহার মাতার সম্মতি পাইয়া অধ্যাপকের গৃহে মাঝে মাঝে রাত্রি-যাপন করিতে লাগিল। তারপর পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া এই প্রেমের ত্রিকোণকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল কল্পনাতীত, বিপর্যয়কর ও বেদনাদিগ্ধ ঘটনা ঘটে, তাহার আমূল বিবরণ দিতে গেলে, হয়তো শতাধিক পৃষ্ঠা নিয়োগ করিতে হয়। তাহা করিবার উপায় নাই, প্রয়োজনও নাই। স্বামিস্ত্রী ও শেষোক্ত তৃতীয় জনের মুখ হইতে এই নাটকের আমূল বিবৃতি শুনিবার আমার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য হইয়াছিল।...

পত্নী-বিনিময়

আমি অন্ততঃ তিন জোড়া মিত্রতাবদ্ধ দম্পতিকে জানি যাহারা এক গৃহের সম-তলায় পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বাস করে এবং বহুকাল ধরিয়া রতিবিম্বিত কামচর্যার অনুশীলন করে। ইহাদের দুই জোড়ার মধ্যে আছে দুইটি পিঠোপিঠি ভগ্নী ও দুইজন ভায়রাভাই। বড় ভায়রাভাইটি আমার ভক্ত ও আমার বিষয় সম্পৃক্ত কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। সে অকপটে আমার নিকট স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা চারিজনেই একঘরে একই সময়ে উজ্জ্বলালোকে পাশাপাশি শুইয়া রতিরত হইয়া থাকে।

শুধু তাহাই নহে, একজনের পত্নী প্রতি মাসের কয়েকদিন সাময়িকভাবে অপারগ হইলে, অন্যজনের পত্নী ননদাইয়ের নিকট উপসর্পণযোগ্য হয়। এইরূপ ব্যবস্থা কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে কোনো পক্ষেরই আপত্তি বা আফ্‌শোষের কারণ ঘটে না। ভক্তটি সহাস্যে একদিন কহিল, "সার, আমিই জয়ী পক্ষ। আমি দশ বৎসর বিবাহিত, দুইটি সন্তানের পিতা, ছোট সম্বন্ধিনীটি ছয় বৎসর কাল বিবাহিতা হইয়াও নিঃসন্তান।"

উপরোক্ত ব্যাপারটি হইল—পারস্পরিক সম্মতিতে স্ত্রী-বিনিময়, যাহাকে ইংরাজিতে বলে "wife swopping"। এইরূপ আচার সর্বদেশে বহুকাল ধরিয়া সংগোপনে চলিয়া আসিতেছে। দুই জোড়া গাঢ় বন্ধুত্ববদ্ধ স্বামিস্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতিতে অস্থায়িভাবে স্ত্রী ও স্বামী বদলাবদলির ঘটনা অত্যন্ত

বিরল হইলেও ভারতে ও ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশে সীমায়িতভাবে ঘটে ও ঘটিতেছে। সর্বদেশের পুরাণেতিহাসের পৃষ্ঠা হাতড়াইলেও এরূপ দৃষ্টান্ত দুই-একটি করিয়া পাওয়া যায়। এ যুগে এইরূপ ঘটনা অতি উচ্চপদস্থ সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী এবং অভিজাত-সমাজের ঘনিষ্ঠ মিত্রমিত্রাদের মধ্যে সংগোপনে ঘটে বলিয়া সহজে চুঁয়াইয়া বাহিরে আসে না।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কিছুকাল ধরিয়া পতিপত্নীর সাময়িক অদলবদল-দ্বারা রুচি-বদলের কুরুচিকর ফ্যাশন উচ্চ সমাজজীবনে সংক্রামণ বিস্তার করিতেছে। সম্প্রতি গ্রেট বৃটেনের কোনো কোনো ধনিক সম্প্রদায়ের বন্ধুমহলে বিশেষ বিশেষ হৈ-হুল্লোড়ময় পানভোজনের প্রমোদোৎসবে অন্ততঃ এক রাত্রির জন্যও পাইকারী হারে এইরূপ বিনিময়-ক্রিয়া বেশী রকম চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বোধ হয় তথা হইতে আমাদের দেশের নিত্যসতর্ক নীতিনিষ্ঠ সংস্কৃতিদূতগণ এই অপ্রসংশনীয় ফ্যাশন্ স্বদেশে আমদানি করিয়াছেন।

শ্রীমতী রুমা গুহ ঠাকুরতা সম্ভবতঃ গত জুলাই মাসের কোনো এক সংখ্যার 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রে জায়া-বিনিময় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু টিপ্পনী প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা লইয়া কিছুদিন যাবৎ সম্পাদকীয় চিঠিপত্র মাধ্যমে বাদ-প্রতিবাদ চলিয়াছিল। তিনি দুইজন প্রায় একবয়সী আই. এ. এস. কর্মচারী বন্ধু ও তাঁহাদের সখীমিথুন স্বরূপা অর্ধাঙ্গিনীদের একটি উদাহরণ অধ্যাহার করিয়াছেন। ওই দুইজনই বিদেশে দৌত্য-বিভাগে দায়িত্বমূলক পদে অধিষ্ঠিত। একদিন উভয় বন্ধুর একজনের নিকট উপর হইতে আদেশ আসিল অবিলম্বে অন্য কর্মস্থলে যাইবার। উঁহার স্ত্রী এত তাড়াতাড়ি বর্তমান পরিচিত মহলের মায়া কাটাইয়া চলিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন। অথচ আদিষ্ট কর্মচারীটি একাও কর্মস্থলে অগ্রসর হইতে নারাজ। তখন বন্ধুর স্ত্রীটি তাঁহার পত্নীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে সানন্দে রাজি হইলেন, স্বামীরও সহৃদয় অনুমতি মিলিল। কারণ তিনি নাকের বদলে নাকই পাইলেন, নরুন পাইলেন না।

হিমালয়ের কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে দেখা যায়, বিবাহবিচ্ছেদ না করিয়া, কেবল গ্রামমণ্ডল ও পঞ্চায়েতের অনুমতি লইয়া দুইটি পুরুষ তাহাদের স্ত্রী-বিনিময় করিতে পারে। অবশ্য স্ত্রীরা দ্বিতীয় পুরুষের নিকট স্থায়িভাবে

পত্নীর মর্যাদা পায়। মধ্য প্রদেশের ছত্রিশগড়ের কোনো কোনো অঞ্চলে পত্নী বন্ধক রাখা ও পত্নী-বিনিময় করার প্রথা ইংরাজ-রাজত্বের শেষ অবধি বলবৎ ছিল, বর্তমানে আছে কিনা জানি না। যাহা হউক, এই দৃষ্টান্তগুলি রতিবিম্বিত কামের আলোচনায় অনেকখানি অবান্তর বলিয়া গণনা করিতে হইবে। ইহা ব্যাধি নয়, কুরুচিকর সখ।

প্রেমোন্মাদ (Erotomania)

এই ব্যাধিটিতে প্রেমের ভাবগত, আদর্শগত ও কল্পনাগত দিক লইয়া নিরতিশয় চিন্তা ও চেষ্টা প্রকট হইয়া উঠে। ইহাতে দেহগত কাম ও বারাঙ্গিক ক্ষুধা একেবারে অনুপস্থিত থাকে। প্রেমোন্মাদাক্রান্ত ব্যক্তিটি স্ত্রী বা পুরুষ, কিশোর বা কিশোরী, যুবক বা যুবতী, প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়া হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের কাম্য কোনো রক্তমাংসময় প্রেমপাত্র বা প্রেমপাত্রীও থাকে না ; ইহারা যেন একটা ভাবরূপকে অথবা একমূর্তি বিমূর্ত চিন্তাকে ভালবাসে। সর্ব দেশে কৈশোরে কিছুকালের জন্য লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে এই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়।

আবার ক্ষেত্রবিশেষে তাহাদের কাহারো কাহারো একটি প্রেমপাত্র বা প্রেমপাত্রী জ্ঞানগোচরে থাকে বটে, কিন্তু ইহারা তাহার নিকটে ঘেঁষে না। হয়তো দিনান্তে বা সপ্তাহান্তে একবার দূর হইতে চকিতের জন্য তাহাদিগকে দেখে, তারপর সেই ছবি লইয়া কল্পনার জাল বোনে, তাহার বেদীমূলে তাহারা মনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করে, তাহার কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহারা আহারনিদ্রা ভুলিয়া যায়।

তাহারা হয়তো তাহাকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চভাবমূলক কবিতা ও গান লেখে, তাহাকে সম্বোধন করিয়া রাত্রি জাগিয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাপূর্ণ প্রেমোচ্ছ্বাসময় সুদীর্ঘ পত্র লেখে। কিন্তু প্রেমের উদ্দিষ্টকে সেগুলি দেখায় না বা পাঠায় না। তদুপরি, এই সকল চিন্তা ও চেষ্টায় মুহূর্তের জন্য তাহাদের মনে সম্ভোগেচ্ছা জাগে না, এমন কি তাহাকে চুম্বন, আলিঙ্গন, স্পর্শ করিবার লালসায় তাহার দেহ রোমাঞ্চিত, কামযন্ত্রসমূহ রসাক্ত হইয়া উঠে না। এরূপ করিলে তাহাদের

প্রেমাস্পদ অপবিত্র হইয়া যাইবে, তাহারা নিজেরাও অপবিত্র হইবে—এইরূপ বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে।

এই সকল প্রেমোন্মাদপীড়িত ব্যক্তি প্রেমের লক্ষ্যবস্তুকে কাহারো 'কলুষিত' প্রেমে পড়িতে বা বিবাহজীবনে প্রবেশ করিতে দেখিলে মর্মান্তিক বেদনা পায়। যতদিন তাহারা প্রেমাস্পদের কোনোরূপ বেচাল না দেখে, ততদিন তাহাকে দেব বা দেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করে এবং যতপ্রকার সদ্‌গুণের কথা তাহাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে সংগৃহীত থাকে, তাহার অধিকাংশই ইহারা প্রণয়াস্পদের উপর আরোপ করে। ইহাদের মধ্যে কেহ যদি কখনো প্রেমাস্পদের নিকটে আসিবার অধিকার পায়, তাহা হইলে সে তাহাকে স্পর্শ করে না, প্রয়োজন হইলে দুই-একটি কথা বলে, চোখোচোখী হইলে চোখ নামাইয়া লয়। তাহার জন্য কোন ফাই-ফরমাস খাটিতে পারিলে স্বর্গের সুখ হাতে পায়। তাহাদের আচারে-ব্যবহারে ভাবে-ভঙ্গীতে কচিৎ নিজেদের অন্তরের ভালবাসার কথা প্রেমাস্পদ বা প্রেমাস্পদা জানিতে পারে। জানিতে পারিলে, তাহারা লজ্জায় মরিয়া যায়।...

পাড়ার একটি চতুর্দশ বর্ষীয়া মেয়ে পাঁচ-ছয় মিনিটের রাস্তা হাঁটিয়া প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায়। সে তখন ক্লাস এইটে পড়ে। দশ-বারোখানা বাড়ির পরের বাড়ির অধিবাসী একটি ষোলো বৎসর বয়স্ক কিশোর কিছুদিন হইল এই মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। মেয়েটি দেখিতে সুন্দরী নয়। গাত্রবর্ণ মাঝামাঝি, বয়সের অনুপাতে বেশ রোগা, চোখ দুইটি অবশ্য বেশ বড়ো-বড়ো, হাঁটার ধরনটি বড় মনোরম। কিন্তু এ সকল দৈহিক বৈশিষ্ট্য ছেলেটিকে আকৃষ্ট করে নাই। কেন যে তাহাকে ভাল লাগিল তাহাও সে বলিতে পারে না। ছেলেটি ক্লাস ইলেভ্‌নে পড়ে। তাহারা বৎসরখানেক হইল এই পাড়ায় আসিয়াছে। মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির আলাপ ছিল না। এমন কি, তাহার নাম বা বাড়ির নম্বরও সে জানে না।

মেয়েটি যখন স্কুলে যায়, ছেলেটি নিজের বিদ্যালয়ের পথ পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া, ঐ মেয়েটির পিছনে পিছনে স্কুলের নিকট পর্যন্ত যায়। তাহার সহিত অবশ্য ১৫।২০ হাত ব্যবধান রাখিয়া চলে। প্রায় এক বৎসরকাল এইরূপ

চলিয়াছিল—ছুটির দিন বা দীর্ঘাবকাশকাল ব্যতীত নিত্য। দিন কয়েক তাহাদের ক্লাসের কয়েকটি মেয়ে স্কুলের বারান্দা হইতে এই ছেলেটির পশ্চাদনুসরণ লক্ষ্য করিয়াছিল। তারপর তাহারা সহপাঠিনীকে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে—তাহার পাড়ার ঐ ছেলেটি তাহাকে নিশ্চয়ই ভালবাসে। সে উহাকে ভালবাসে কিনা! এবং কে বেশী, কে কম?…ইত্যাদি।

পরদিন মেয়েটি মাঝরাস্তায় পিছন ফিরিয়া ছেলেটিকে দেখিতে পায় এবং তাহার কাছে আসিয়া বেশ একটু কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি রোজ রোজ আমার পাছু নেন্ কেন? আমার ক্লাসের মেয়েরা ঠাট্টা করে! কাল থেকে আসবেন না।" ছেলেটি কোনো উত্তর না দিয়া মাথা নীচু করিয়া সেখান হইতে নিজের স্কুলের দিকে চলিয়া গেল। অতঃপর আর সে উহার অনুসরণ করে নাই।

মেয়েটির বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। কয়দিন ছুটি চলিতেছে। ছেলেটির টেস্ট সবে দুইদিন পূর্বে শেষ হইয়াছে। মেয়েটি একদিন সন্ধ্যার পর তাহার কোনো আত্মীয়ের বাড়ি হইতে ফিরিতেছে, এমন সময় ছেলেটি একটি নির্জন প্রায়ান্ধকার স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিল, "শোন।" মেয়েটি থমকাইয়া দাঁড়াইতেই ছেলেটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে?" মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া 'না' ইঙ্গিত করাতে ছেলেটি বলিল, "মন দিয়ে পড়ো। এম. এ. পর্যন্ত পড়া চাই। তোমার পেছন পেছন রোজ যেতুম কেন তুমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলে, তার উত্তর এই চিঠিখানার ভেতরে আছে। একলা পড়ে ছিঁড়ে ফেলো।"…

মেয়েটি কোনো কথা না বলিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া খামে-আঁটা চিঠিখানা কম্পিতহৃদয়ে গ্রহণ করিল এবং বাড়ি আসিয়া তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকিয়া তাহা পড়িতে লাগিল। চিঠিখানি পুরা দুই পৃষ্ঠা ভর্তি করিয়া লেখা। সব কথা সে বুঝিতে পারিল না। শুধু এইটুকু বোঝা গেল যে, সে তাহাকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসে; আকাশ যেমন পৃথিবীকে ভালবাসে, চকোর যেমন চাঁদকে ভালবাসে তেমনি ভালবাসা। চিঠির শেষে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত—

"আজি একা বসে ভাবিতেছি মনে ইহারে দেখি—
দুখযামিনীর বুক-চেরা ধন হেরিনু একি!
ইহারই লাগিয়া হৃদ্‌বিদারণ এত ক্রন্দন, এত জাগরণ,
ছুটেছিল ঝড় ইহারই বদন বক্ষে লেখি।
দুখযামিনীর বুক-চেরা ধন হেরিনু একি!

ইহার পর ছেলেটি আর তাহার সহিত কখনো কোনো বাক্যালাপ করে নাই। রাস্তায় বার কয়েক দেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে মাথা নীচু করিয়া দূর হইতে চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কিছুদিন পরে সে কোনো বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতে চলিয়া যায়।…

মেয়েরা যখন প্রেমোন্মাদের অধীন হয়, তখন তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন দেশবিখ্যাত নেতা, রাষ্ট্রনায়ক, বিরাট পণ্ডিত, যুদ্ধবিজয়ী সেনানায়ক, অতিশয় খ্যাতনামা কোনো রঙ্গমঞ্চের বা সিনেমার অভিনেতা, বড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক, বহু-সম্বর্ধিত দানবীর অথবা বহুজনপূজ্য ধর্মগুরুকে দূর অথবা অদূর হইতে ভালবাসে। ইহারা প্রেমাস্পদের শুধু রক্তমাংসের মূর্তি দেখিয়া নয়, তাঁহার একখানা ফটো বা একটি ক্ষুদ্র মৃন্মূর্তি দেখিয়া সাশ্রুলোচনে গাহিতে পারে—"তোমার আসন-তলে মাটির পরে লুটিয়ে রব। তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।"…

বহুদিন পূর্বে লক্ষ্ণৌয়ের একটি মেয়ের মা আমার নিকট আসিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মেয়ে মিউজিক্ কলেজের শেষ পরীক্ষা না দিয়া আসানসোলে কাকার নিকট আসিয়া কেবল রাজনীতির বই ও প্রবন্ধ পড়িতেছে এবং এখানে-সেখানে ভল্যান্টিয়ারি করিয়া বেড়াইতেছে। বয়স বাইশ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, একটু মোটাও হইয়া পড়িয়াছে। ও সুভাষবাবুকে শুধু ভক্তি করে না, মনে মনে ভীষণ ভালবাসে। তাঁহার একখানা ফটো বাঁধাইয়া দুই বেলা ধূপদীপ ফুলপাতা দিয়া পূজা করে। ত্রিপুরীতে গিয়া ভল্যান্টিয়ার হইয়াছিল শুধু সুভাষবাবুকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবার জন্য। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে বলিয়াছিল যে, তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে, সে সুভাষবাবুর সহিত কথা বলিতে পারিয়াছে।

এজন্মে সে আর বিবাহ করিবে না; তপস্যা করিবে যেন আগামী বারে সুভাষবাবুর মত স্বামী পায়।...

কামোন্মাদ

এই ব্যাধি হইল প্রেমোন্মাদের ঠিক উল্টা। ইহা নিছক দেহসার্বস্বিক দুরতিক্রম্য কামনা। ইংরাজীতে পুরুষদের এইরূপ দুরপনেয় ইন্দ্রিয়লালসাকে বলে Satyriasis (স্যাটিরিয়্যাসিস্) এবং মেয়েদের এই রোগের নাম Nymphomania (নিম্ফোম্যানিয়া)।

কামোন্মাদ সাধারণতঃ যুবা বয়সেই দেখা দেয়। ইহারা দিনের মধ্যে একাধিকবার—কখনো কখনো তিন-চারি-পাঁচবার অদম্য রমণস্পৃহার দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাহারা ঐ স্পৃহা প্রশমনের জন্য বৈধ ও অবৈধ সর্বপ্রকার চেষ্টা করে। সর্ববয়সী সর্বসম্পর্কের ও সর্বস্তরের নারীকে কাছে পাইলে, ইহারা তাহাদিগকে কামপ্রশমনের পাত্ররূপ ব্যবহার করিতে উদ্যোগী হয়। এমন কি, নাবালিকা ধর্ষণ করিতেও তাহাদের বিবেকে বাধে না। কামচিন্তা তাহাদের মনে অতি সহজেই আসে এবং চিন্তা আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের সাধনদণ্ড উচ্ছ্রিত হয়; তখন তাহারা যে-কোনো একটি নারী পাইলে তাহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া অর্থাৎ জোর করিয়া তাহার দেহোপভোগে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ লোক মাঝে মাঝে ধর্ষণাপরাধে ধৃত হইয়া প্রহৃত ও কারারুদ্ধ হয়।

হাতের কাছে কোনো নারীকে না পাইলে, ইহাদের কেহ কেহ আত্মরতি করে। কেহ বা সমরতি করিতে বাধ্য হয়। কেহ কেহ এই ব্যাধির প্রসাদন-কল্পে বারবনিতালয়ে গমন করে। কেহ কেহ বিবাহ করিয়া প্রত্যহ আপন-আপন পত্নীকে দিবস-রজনীর যে-কোনো সময়ে তাহাদের স্বতোজাগ্রত প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে উভয়েরই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। পত্নীর দেহ ও মন অচিরে ভাঙিয়া যায়।

ইহাদের মধ্যে সকলের সাধনদণ্ড যে স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় হয় তাহা নয় এবং প্রতি সহবাসে দীর্ঘ সময় লাগে—তাহাও নয়। এ দুইটি বিষয়ে তাহারা প্রায় অন্যান্য লোকের ন্যায় স্বভাবধর্মী। কেবল একদিনের তৃতীয় বা চতুর্থ বা পঞ্চম রমণে তাহাদের স্খলন হইতে স্বভাবতঃই বিলম্ব হয়। ইহাদের

ঘুম ও ঔদরিক ক্ষুধা ক্রমশঃ কমিয়া যায় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে রতিশক্তি-হীনতা, তৎসহ হৃদ্‌রোগ ও অজীর্ণ আসিয়া তাহাদের এই দুষ্ক্রিয়াকে অনেক খানি সংযত করে। ইহার পরও তাহারা অল্পবয়সী বালিকাদিগকে অঙ্কে লইয়া চুম্বন প্রভৃতি করিতে ও তাহাদের গোপনেন্দ্রিয়ে অঙ্গুলি প্রভৃতি অন্তর্নিবেশ করাইয়া প্রতিকল্পিত তৃপ্তি পাইতে সচেষ্ট হয়।

জনৈক বৈষ্ণব বাবাজীর পূর্বজীবন

আমার কলেজের এক প্রাক্তন সতীর্থ বন্ধু বি. এ. পাস করিবার পর উচ্চ আদালতে কেরানির কাজ গ্রহণ করে। তাহাদেরই প্রায় সমকালীন সহকর্মী শ্রীহট্ট জেলানিবাসী এক ভদ্রলোক সতেরো বৎসর বয়স হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত একপ্রকার সমভাবেই কামোন্মাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া ছিলেন।

এক তন্তুবায় পরিবারের মধ্যবয়সী অপুত্রকা বিধবা অন্ধ শ্বশুর সহিত ইঁহার গ্রামের একপ্রান্তে বাস করিত। গ্রামের কিশোর ও নবতরুণদিগকে সে কয়েক বৎসর ধরিয়া ব্যবহারিক রতিতে দীক্ষিত করিতেছিল। দরিদ্র হইয়াও সে কাহারো নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাহিত না। রমণীটিকে বয়ঃকনিষ্ঠরা "ইচ্ছা দিদি" বলিয়া ডাকিত। প্রত্যহ দিনেরাতে পালা করিয়া ঐ গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের তিন-চারিটি ছেলে ও যুবক আসিয়া তাঁহার দেহোপভোগ করিয়া যাইত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার পর যখন কথিত ভদ্রলোকটি প্রায় তিন মাসকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া গৃহে বসিয়াছিলেন এবং আহার-নিদ্রা-আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে বিবেকানন্দ হইতে বঙ্কিমের বইগুলি পড়িয়া শেষ করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি ঐ কুখ্যাতা ইচ্ছাদিদির সংস্পর্শে আসেন। প্রত্যহই তিনি একবার করিয়া ঐ রমণীটির দেহজ্ঞান লাভ করিতেন এবং কিছুক্ষণ তাহার গৃহে থাকিয়া তাহার ফাইফরমাস খাটিয়া দিতেন। এক-একদিন দুইবার পর্যন্ত তাহাকে উপভোগ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না।

ঐ রমণী-সংসর্গে তাঁহার দেহে অচিরে গনোরিয়া ব্যাধি সংক্রামিত হয়। এই ব্যাধির বাড়াবাড়ি অবস্থায়ও ভদ্রলোকটি একবার কিংবা দুইবার করিয়া

ইচ্ছাদিদির সহিত সঙ্গমে নিরত হইতেন। অন্য গ্রামের এক কবিরাজের নিকট হইতে ঔষধ আনিয়া তিনি ইচ্ছাদিদির গৃহে রাখিয়া দিয়া প্রত্যহ তিনবার করিয়া খাইতেন, কারণ ঔষধে বহু অনুপানের সংযোগ থাকিত; গৃহে জানাজানির সম্ভাবনা ছিল। অতঃপর ইচ্ছা তাহাকে যত্ন করিয়া অনুপান সহ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইত, প্রত্যহ তাহার গৃহের গাভীদুগ্ধ অর্ধসের করিয়া পান করিতে দিত। এই সময় ভদ্রলোকের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতকার্যতা-লাভের সংবাদ বাহির হয় এবং অবিলম্বে তাঁহাকে কলিকাতায় গিয়া মেসে থাকিয়া কলেজে পড়াশুনা করিবার জন্য রওনা হইতে হয়।

মেসে থাকিবার সময় তিনি সহ-কামরাবাসী এক সতীর্থের সহিত প্রত্যহ পারস্পরিক সমমেহনে কিংবা পাণিমেহনে লিপ্ত হইতেন; কখনো কখনো একদিনের মধ্যে ঐ দুইপ্রকার ক্রিয়াই সাধন করিতেন। একবার তাঁহারা তিন বন্ধুতে মিলিয়া এক সস্তার বারবনিতালয়ে গমন করেন। তাহার পর হইতে প্রতি-মাসেই তাঁহারা তিন বন্ধুতে মিলিয়া চাঁদা করিয়া বিভিন্ন বারাঙ্গনাগৃহে যাইতেন। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া তিনি ভয়াবহরূপে গনোরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হন এবং মেসে এই ব্যাধির কথা রাষ্ট্র হওয়ায় ম্যানেজার তাঁহাকে অবিলম্বে স্থানান্তরে যাইতে বলেন। অন্য মেসে গিয়া তিনি মাসাধিক কাল কলেজ কামাই করিয়া পুনরায় কবিরাজী চিকিৎসা করাইয়া, রোগের উপসর্গ-গুলি চাপা দেন। কিছুদিন পরে তিনি ঐ মেসের প্রৌঢ়া ঝিকে তাঁহার জঘন্য রিরংসার অংশভাগিনী করিয়া লইলেন।

এই ভদ্রলোকের আর আই-এ পাস করা হয় নাই। দ্বিতীয় বারেও যখন কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, তখন তিনি উচ্চ আদালতে চাকরিতে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু পত্নীকে দেশে রাখিয়া তিনি প্রায় তেরো-চৌদ্দ বৎসর কাল মেসে থাকিতে বাধ্য হন। এই সময়ে সস্তার বারবনিতা ও মেসের ঝি বা তাহার কন্যা তাঁহার শৃঙ্গার-কণ্ডুতির উত্তরসাধিকা হইত। ছুটিতে তিনি নিজের গ্রামে অথবা শ্বশুরালয়ের গ্রামে যাইতেন এবং যতদিন তথায় থাকিতেন, ততদিন প্রত্যহই স্ত্রীতে তো উপরত হইতেনই, তাহা ছাড়া অন্যা ভদ্রা বা অভদ্রা নারীকেও তিনি অঙ্কশায়ী করিতে ত্রুটি করিতেন

না। শ্বশুরালয়ে শুধু শ্যালিকা-সম্পর্কিতা কুমারী ও সদ্যোবিবাহিতা নয়, শ্বশ্রূ-সম্পর্কিতা কয়েকটি বর্ষীয়সী মহিলারও দেহজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তারপর কলিকাতায় যখন বাসা করিয়া স্ত্রীকে লইয়া আসেন, তখনও তাঁহার কামোন্মাদব্যাধির উৎসার কেবল পত্নীর মাধ্যমে হ্রাস পাইত না, নিত্য তাঁহার দেহোপভোগ ছাড়াও তিনি মাঝে মাঝে বাহিরেও তৃপ্তি অন্বেষণ করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের কোনো সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করে নাই। এই দম্পতি সারা বিবাহজীবনকাল জাগ্রত বা সুপ্ত গনোরিয়া-ব্যাধি দেহে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ কাল তিনি স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিয়া তাঁহার সহিত কখনো প্রাণ খুলিয়া মেশেন নাই বা ভালো করিয়া কথা বলেন নাই। মহিলাটি মুখ বুজিয়া এই দুশ্চরিত্র স্বামীকে বরদাস্ত করিতেছেন।

ভদ্রলোকটি তাঁহার অফিসের কয়েকটি বন্ধুর নিকট গর্বিত উৎফুল্লতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি জীবনে অন্যূন আশীজন রমণীর দেহজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিজের স্ত্রী ব্যতীত ত্রিশ জনের বেশী সংখ্যকই ভদ্র কুমারী, সধবা ও বিধবা। যৌবনেও ইঁহার আকৃতি মোটেই আকর্ষণযোগ্য ছিল না। কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত খর্বকায় ও কৃশ; কথাবার্তায়ও কৃষ্টিমাধুর্যের লেশমাত্র ছিল না। ইহার জননেন্দ্রিয় দেহানুপাতে আদৌ বড় ছিল না এবং তাঁহার কোনো রমণই ২।৩।৪ মিনিটের বেশী স্থায়ী হইত না। চল্লিশ বৎসর বয়সের পর উহার ধৃতিশক্তি দ্রুত কমিয়া, এক মিনিট হইতে অর্ধ মিনিটে দাঁড়ায়। অবশেষে পঞ্চাশের আগেই তিনি জন্মের মত ভোগশক্তি হারান। ইহার পর তিনি ও তাঁহার স্ত্রী নবদ্বীপে গিয়া কোনো বিখ্যাত বৈষ্ণব মন্ত্রগুরুর নিকট দীক্ষা লন্। চাকরি হইতে চিরাবসর লাভ করিবার অব্যহিত পরেই তিনি স্ত্রীকে লইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান্। বাতাম্লপীড়িত পক্কশ্মশ্রুল পরম বৈষ্ণব হইয়া তিনি এখনো সস্ত্রীক নিত্যধামের এক পবিত্র কুঞ্জে বিরাজমান।...

জনৈকা উচ্চবংশীয়া মহিলার দৃষ্টান্ত

ভদ্রেতর সকল স্তরেই কামোন্মাদগ্রস্তা নারী দেখা যায়। সাধারণতঃ পনেরো-ষোলো হইতে পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের মেয়েদের মধ্যেই

এই অসুস্থতা অত্যন্ত ঘনীভূতভাবে দেখা যায়। এইরূপ ব্যাধিগ্রস্তা পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্কা একটি মহিলা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। অবশ্য এইরূপ কেস বিরল।

কথিতা মহিলাটি এই শহরের এক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীর গৃহিণী ছিলেন। ইহার পিতাও অন্য প্রদেশের বিরাট ভূম্যধিকারী ছিলেন। ইহারা দুই ভগ্নীই এককালে অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন এবং দুজনেই কৈশোর হইতে কামোন্মাদপ্রবণ ছিলেন। দুই জনেই যৌবন-প্রারম্ভে এ দেশের শ্রীমন্ত অভিজাত পরিবারে বধূরূপে প্রবেশ করেন। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল-মধ্যেই ইহাদের দুস্তর কামতৃষ্ণা পতি দুইটির দেহমনকে তিক্ত, অবসন্ন, সৌহিত্যদিগ্ধ করিয়া দেয়। একটি পতি মধ্যযৌবনেই দেহত্যাগ করেন।

কনিষ্ঠা ভগিনীর জীবনের বেশী অংশব্যাপী এবং জ্যেষ্ঠার মধ্য-প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত বহুমুখী রিরংসার ইতিহাস আমার নিকট অজ্ঞাত। শেষোক্তের শেষার্ধ জীবনের কামোন্মাদজনিত কদাচারের কতকগুলি অবচ্ছিন্ন বিবরণ উঁহার এক বিশ্বস্তা বান্ধবী এবং দুইজন বিশ্বাসযোগ্য ও শিক্ষিত ভদ্রলোকের নিকট হইতে আমাদের শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল। ভদ্রলোক দুইজনের মধ্যে একজন ওই মহিলার স্বামীর জমিদারির ম্যানেজার ও অন্য জন পারিবারিক চিকিৎসক। প্রথমোক্ত জন ওই মহিলার মধ্য-প্রৌঢ়ত্বের কয়েক বৎসরব্যাপী বাধ্যতাজনিত গোপন-প্রেমিক ছিলেন। এই পরিবারের সহিত কুড়ি বৎসরের অধিককাল সংশ্লিষ্ট ডাক্তার সাহেবটি একাধিক বার এই নারীর দুই প্রকার রতিজ ব্যাধির (vencreal diseases) চিকিৎসা করেন।

ডাক্তারবাবুর সাক্ষ্যে জানা যায় যে, যৌবন হইতেই মহিলাটি স্বামীর সহিত ইউরোপীয়ান-অধ্যুষিত বড় বড় ক্লাবে যাইতেন ও তাহাদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন। ইংরাজ কাজকর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত একটি বিশেষ সেবা-প্রতিষ্ঠানের সহিতও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। উপরোধে পড়িয়া তাঁহার স্বামী ক্বচিৎ-কখনো দুই এক চুমুক সুরাপান করিতেন বটে, কিন্তু স্ত্রীটি রীতিমত সুরাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্লাবে ও হোটেলে তিনি ইংরাজ ও আধা-সাহেব বন্ধুদিগের সমাভিব্যহারে বেপরোয়াভাবে শুধু সুরাপানই করিতেন না, তাঁহাদের গৃহে বা হোটেলের শয়নকক্ষে গিয়া

মত্তাবস্থার একাধিক ব্যক্তির সহিত নিধুবনিরত হইতেন। ডাক্তারবাবুর মতে ইঁহার তিনটি পিঙ্গলচক্ষু ও পিঙ্গলকেশ অতি-গৌরবর্ণ পুত্র ইঙ্গশোণিত-মিশ্রণের প্রত্যক্ষ ফল।

ইহা ব্যতীত তিনি সুন্দর স্বাস্থ্যবান ও পূর্ণযুবাবয়স্ক দেখিয়া তভ্য, খানসামা, দারোয়ান্, কোচম্যান্ প্রভৃতি নিযুক্ত করিতেন যাহাদের প্রত্যেককেই তিনি তাঁহার দুস্তোষণীয় রিরংসার উত্তরসাধকরূপে কাজে লাগাইতেন এবং কিছুকাল পরে তাহাদিগকে প্রচুর পারিতোষিক সহ চাকরি হইতে বরখাস্ত করিয়া তাহাদের স্থলে নূতন লোক মনোনীত করিতেন। তদ্ব্যতীত কয়েকটি আত্মীয় ও অনাত্মীয় দরিদ্র ছাত্র তাঁহাদের বহির্বাটীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে তিনি পছন্দমত ইহাদের এক-একজনকে তাঁহার পৃথক শয়নকক্ষে ডাকিয়া পাঠাইতেন। স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কায় ও বিবেকের তাড়নায় কোন কোন ছাত্র কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন তাহাদের বিছানাপত্র লইয়া সরিয়া পড়িত।

স্বামীটি অত্যন্ত সদাশয়, ধৈর্যশীল ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তিনি বহুদিন পূর্ব হইতেই স্ত্রীর এই সরমসম্ভ্রমবোধহীন ব্যভিচারলীলার কথা জানিতেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে তিনি স্ত্রীর দ্বারাই গনোরিয়া-ব্যাধিতে আক্রান্ত হন্। এক-এক সময় অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘকালের জন্য প্রদেশান্তরে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। শতবার তিরস্কার করিয়াছেন, বারকয়েক চাবুকও মারিয়াছেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ব্যাধিত চরিত্র সংশোধন করা যায় নাই। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যেও কাহাকেও কাহাকেও তাঁহার পুংশ্চলী পত্নী প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন। জনসমাজে তাঁহার মুখ দেখাইবার উপায় ছিল না।

স্ত্রীকে মিষ্ট কথায়ও অনেক বুঝাইয়াছেন; তাহার উত্তরে তিনি বলিতেন, "I am helpless. You are too good for me. স্যাভারের রাণী মার্গারিতের মত আমার প্রত্যহ চারবার চাই। পারবে? না পারো give me liberty." ভদ্রলোক তাহার গৃহচিকিৎসককে তাঁহার স্ত্রীর এই দুরন্ত কামোন্মাদ আরোগ্যের জন্য কিছু ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিতে বলেন। কিন্তু ডাক্তার বলেন, এ ব্যাধি না মরিলে সারে না।

ইহার পর ভদ্রলোক স্ত্রীর জন্য পৃথক্ একখানি গৃহ নির্মাণ করাইয়া ও তাহার হাতখরচ বাবদ কয়েক শত করিয়া টাকা বরাদ্দ করিয়া, তাঁহার সহিত পৃথক বাস করিতে লাগিলেন। পঞ্চাশেই তাঁহার দেহমন ভাঙিয়াছিল, নানাব্যাধিতে তিনি পঙ্গুপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বৈকালে মোটরে করিয়া গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে যাইতেন ; বাকি সময় বাড়ি বসিয়া ধর্ম ও পরলোক-তত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক-পত্রিকা পাঠ করিতেন। কচিৎ দুই-একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আসিত।

মহিলার তিনটি পুত্রের কেহই পিতৃস্বভাবের উত্তরাধিকারী হয় নাই। তিনজনই দুষ্ক্রিয়াসক্ত ও দুইজন অতিরিক্ত সুরাপায়ী ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রটি মাতার সহিত একগৃহে অবস্থান করিত। কিছুদিন পরে তিনি ঘটা করিয়া পুত্রের বিবাহ দেন। কিন্তু ছয় মাস যাইতে না যাইতেই ওই মহিলা বধূটীর উপর দারুণ অত্যাচার করিতে এবং তাহার চালচলন ভালো নয়, উহার পশ্চাতে একটা লুকানো ইতিহাস আছে···ইত্যাদি বলিয়া আত্মীয়-সমাজে তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে নানা মিথ্যা অপবাদ তিনি পুত্রের কর্ণে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করাইতে সুরু করিলেন। ইহার ফলে গুণধর পুত্রটি মাঝে মাঝে পানোন্মত্ত অবস্থায় স্ত্রীকে অশ্রাব্য গালিগালাজ সহ মারধর করিতে লাগিল।

মেয়েটি একটি ধনবান ও ক্ষমতাশালী ঠিকাদারের কন্যা, সে একদিন একাই একটি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া কলিকাতার অদূরে তাহার পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া সাশ্রুনেত্রে তাহার প্রতি স্বামী-শ্বশুর শুধু অত্যাচারের কথাই ব্যক্ত করিল না, উহাদের উভয়কে লইয়া যে কুৎসিত সম্পর্কের অভিযোগ আরোপ করিল, তাহা শুনিয়া পিতামাতা উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পত্নীটি তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সে পিত্রালয়েই রহিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে তাহার স্বামী কোনো মোটর-দুর্ঘটনায় মারা যায়।

উক্ত মহিলাটির এক আইনজীবী পুত্রের সহিত আমার আলাপ ছিল। তিনিও কিছুকাল পরে জমি কিনিয়া বাড়ি করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। মাতার কীর্তিকাহিনী তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর অজ্ঞাত ছিল না। পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতারাও ঐ প্রৌঢ়ার কদাচার লইয়া প্রতিনিয়ত আলোচনা

করিত। ঐ আইনজীবীর বিবাহের পর যখন কয়েক বৎসরকাল তাঁহার পিত্রালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ের কিয়দংশ কাল তাঁহার মাতাও সেই গৃহে ছিলেন। আইনঘটিত ব্যাপারে আমাকে ঐ ভদ্রলোকের সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে তাঁহার মাতাকে দেখিবার এবং একদিন তাঁহার সহিত দুই-একটি সৌজন্যবাক্য বিনিময়েরও সুযোগ ঘটে। তখন উঁহার বয়স ৫৬।৫৭র কম হইবে না, কিন্তু তাঁহার সাজসজ্জা-প্রসাধন-রীতি দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারি নাই। বব্-করা কুচ্‌কুচে কালো চুল! কিছুদিন পরে আর একবার কোনো সিনেমাগৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়।

ইহার কয়েক বৎসর পরের কথা। তখন ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষের পর্ব সবে শেষ হইয়াছে এবং পূর্ণোদ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় মহাসমরের তৃতীয় অঙ্ক অভিনীত হইতেছে। মহিলাটির বয়স তখন ৬৪।৬৫র কম নিশ্চিত নয়। তখন কলিকাতায় আমেরিকান্, বৃটিশ, ক্যানাডিয়ান ও অস্ট্রেলিয়ান সেনানী গিস্ গিস্ করিতেছে। একদিন সকালে ট্রামে চড়িয়া ভবানীপুর যাইবার পথে ঐ মহিলাটিকে প্রসাধনানুলিপ্তা হইয়া আধা-মেমসাহেবের পোষাক পরিয়া গড়ের মাঠের মেয়ো রোডে একটি আমেরিকান্ সেনাধ্যক্ষের কটিতে বাহুবেষ্টন করিয়া সহাস্যে বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম। তাহার কিছুদিন পরে কর্পোরেশন্ বিল্ডিংসের নিকটবর্তী একটি সান্ধ্য সিনেমাভিনয় দেখিয়া পদব্রজে গ্র্যান্ট্ স্ট্রীট দিয়া আসিবার কালে তাঁহাকে রিক্সা চড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম, একটি পানবিহ্বল যুবক টমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ও স্কন্ধে মাথা রাখিয়া কি বকিতে বকিতে চলিয়াছে।···

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে সংঘটিত ৫।৬টি নারীর কামোন্মাদের কেস আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। তন্মধ্যে একজনের পূর্ণ ইতিহাস কিছুদিন হইতে আমাদের দপ্তরে রক্ষিত, যাহার বহু অংশ মুদ্রণের অযোগ্য বলিয়া আমাদের আশঙ্কা। এ সম্বন্ধে রাশি রাশি কেস্ ফোরেল, কিশ্, ক্র্যাফ্‌ট্ এবিং, ইভান্ ব্লক্, ফ্রএড, ফেরেন্‌ৎসি, ডেভিড্ হিউম, পোল্ লেক্রোয়া, নাকে, ম্যাক্স নর্দো, টার্দিঅ, ট্যাল্‌মি, ম্যাকহুস হির্শফেল্ট্ প্রভৃতি পণ্ডিতদের

প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনো সর্বদেশের মনোবিকার সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন যুগের কামোন্মাদিনী যোষিৎদিগের মধ্যে আমাদের কল্পনাচক্ষের সম্মুখে সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া উঠে তিনটি মূর্তি—মিশর-রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা, রোম-সম্রাজ্ঞী মেসালিনা ও রাশিয়া-সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন্। ক্লিওপেট্রা এক এক রজনীতে ছদ্মবেশে প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া পতিতালয়ে যাইতেন এবং সমস্ত রজনী ব্যাপিয়া নিজ রূপ বিক্রয় করিতেন। হির্শফিল্টের *Sexual Pathology* পড়িয়া জানা যায় যে, একবার সন্ধ্যা হইতে প্রভাত অবধি তিনি ১২৬ জন মক্ষিকাকে তৃপ্তিদান করিয়াছিলেন।

আর একটি তথ্য জানিয়া রাখা ভালো যে, কামোন্মাদিনী অনেকেই ঋতু-সংহারের (Menopause অর্থাৎ মাসিক ঋতু চিরদিনের মত বন্ধ হওয়ার) পূর্বে বা পরে সত্যকার উন্মাদ হইয়া যায়। তখন তাহাকে গৃহ-পরিবেশের মধ্যে ধরিয়া রাখা যায় না। ঐ সময় তাহারা অবিশ্রান্ত অশ্লীল বাক্য বলিতে থাকে, যাহার-তাহার সম্মুখে বিবস্ত্রা হইয়া পড়ে, রাগিয়া নিজের জননেন্দ্রিয় বিস্ফারিত করিয়া দেখায়, যাহাকে-তাহাকে তাহার দেহোপভোগের জন্য আমন্ত্রণ করে এবং কোনো ইচ্ছুক লোক না পাইলে প্রকাশ্যেই আত্মরতি করিতে থাকে। এমন কি কেহ কেহ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মাঝে মাঝে সহবাসসুলভ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সঞ্চালন করিতে থাকে। এরূপ অন্ততঃ পক্ষে একটি কেস্ আমি স্বচক্ষে রাঁচি উন্মাদাবাসে দেখিয়াছিলাম। বঙ্গীয় উন্মাদাশ্রমে এরূপ দুই-একটি উন্মাদিনীর সন্ধান আপনারা হয়তো সকল সময়ে পাইবেন।

সাদনকাম ও মর্ষণকাম

ইচ্ছাপূর্বক প্রেমাস্পদকে যন্ত্রণা দিবার, তাহার উপর প্রভুত্ব করিবার ও তাহার কষ্ট দেখিয়া বারাঙ্গিক আনন্দ সদৃশ আনন্দ লাভ করিবার দূষিত অভ্যাস ও আচারকে বলে **সাদনকাম** (Sadism)।

যখন স্বাভাবিকভাবে সহবাস করা হয় এবং ঐ সঙ্গে প্রিয়জনের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিবিড়ভাবে চোষণ, ঐগুলিতে মৃদুভাবে নখরাঘাত, দংশন ও কটি বা

জননযন্ত্রের মূলদেশ-দ্বারা একটু কঠোরভাবে আঘাত করা হয় এবং নিবিড় হর্ষানুভবের সময় 'তোমায় কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব, তোমায় কাটিয়া ফেলিব, তোমায় খুন করিয়া ফেলিব, তোমার অধর বা কপোলযুগ চুষিয়া চিবাইয়া খাইয়া ফেলিব' ইত্যাকার বাক্য সোহাগচ্ছলে উচ্চারণ করা হয়, তখন এইরূপ মৃদু সাদনকামকে ব্যাধির পর্যায়ে ফেলা চলিবে না।

কিন্তু যখন রমণকালে দশন-নখর-দ্বারা প্রেমপাত্রকে এরূপভাবে ক্ষতবিক্ষত করা হয় এবং মুষ্টি বা করপত্র-দ্বারা এরূপ প্রচণ্ডভাবে অপর পক্ষের সর্বাঙ্গে আঘাত করা হয় যাহাতে অন্যপক্ষ যন্ত্রণায় চীৎকার করে ও কাঁদে এবং যখন এই যন্ত্রণার লক্ষণগুলি না দেখিলে প্রথম পক্ষের ইতিহর্ষ-লাভ হয় না, তখন তাহাকে ব্যাধির পর্যায়ে ফেলিতে হইবে। আবার কেহ কেহ প্রেমপাত্রকে ঝাঁটা, লাঠি, ছাতা, জুতা, বেত্র, চাবুক, পুনঃ পুনঃ সজোরে লাথি, কিল, চড়, ঘুষি প্রভৃতি মারিলে অথবা কিছুক্ষণ তাহার গাত্রে কোনো কিছু সূচালো অস্ত্র বিঁধাইয়া অথবা দন্ত বসাইয়া রক্তপাত না করিলে, নিধুবনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেই পারে না অথবা তাহার সাধনদণ্ড দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় না। ইহা সাদনকাম ব্যাধির আর এক স্তর উচ্চে। একবার কোনো স্বামী তাহার নববিবাহিতা বধূর সহিত প্রথম-মিলনকালে অতিশয় কামোত্তেজিত হইয়া তাহার একটি কুচবৃন্ত কামড়াইয়া প্রায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। প্রচুর রক্তপাতে মেয়েটি চৈতন্যহীন হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হয়।

এই ব্যাধির উৎকট ও সর্বোচ্চ স্তর হইল—প্রেমপাত্রকে পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত করিয়া আহত করা, অর্ধমৃতবৎ করা, নিহত করা, তাহার এক-একটি অঙ্গ কর্তন করা, কণ্ঠনালী কাটিয়া দেওয়া, অস্ত্র-দ্বারা পেটের নাড়িভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলা, তাহার জননযন্ত্র কাটিয়া ফেলা, শির-ধমনী কাটিয়া রক্তপান করা প্রভৃতি। ইহাতে মূল সহবাস-ক্রিয়া প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু এইরূপ কদর্য ও নৃশংস অত্যাচার-সাধনের সময় অত্যাচারী সহবাসসুলভ আনন্দলাভ করে। শতকরা প্রায় ৯০টি ক্ষেত্রেই সাদনকাম পুরুষের মধ্যে জন্মিতে দেখা যায়।

ঠিক ইহার উল্টা লক্ষণগুলি অর্থাৎ প্রেমিকের হস্তে প্রহার খাইয়া বা বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া কামোত্তপ্ত হইয়া উঠা ও/বা ইতিহর্ষ লাভ করার নাম

মর্ষণকাম (Masochism)। এই দুইটি ব্যাধি সম্বন্ধে দৃষ্টান্তসহ বৈজ্ঞানিক আলোচনা "ফ্রএডের ভালবাসা" ও "ফ্রএডের নারীচরিত্রে" করা হইয়াছে বলিয়া এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না। কেবল এইটুকু এখানে উল্লেখ করিয়া গেলেই যথেষ্ট হইবে যে, মর্ষণকাম মেয়েদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। প্রকৃতি যেন কষ্ট সহ্য করিয়া আনন্দলাভের উপযোগী করিয়াই ইহাদের দেহমন গঠন করিয়াছেন। নহিলে ইহারা কখনো সন্তানের মাতা হইতে পারিত না।

বস্তুকাম ও অঙ্গকাম

সংক্ষেপে এই দুইটি শব্দ বলিতে বুঝায় যে, যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার ব্যবহৃত যে-কোন বস্তুকে অথবা তাহার যে-কোনো অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গকে উহার সমগ্র দেহমনের মতই ভালবাসা। ইংরাজিতে এই দুইটিকে বলে Fetichism (ফেটিশিজ্‌ম্)। স্বভাবতঃ যখন আমরা প্রিয়ার ব্যবহার-করা একখানি চিরুণী, একটি মাথার কাঁটা, চুলের ফিতা, তাহার কাঁচুলি, পরিধেয় বস্ত্র, শায়া অথবা তাহার স্যাণ্ডাল জোড়াকে প্রীতির চক্ষে দেখি, তখন উহাদের সহিত প্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করি না এবং প্রিয়ার সমান বা তাহার চেয়ে বেশী ঐ বস্তুগুলিকে কখনই ভালবাসি না।

কিন্তু প্রিয়জনের ব্যবহৃত একটি বা একাধিক জিনিস দেখিয়াই অথবা স্পর্শ করিয়াই যখন কাহারো কাম জাগ্রত হয় ও/বা সহবাসসুলভ পুলকোপলব্ধি হয় এবং এই অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রিয়জনের উপস্থিতির কোনো প্রয়োজনই বোধ হয় না, তখন তাহাকে ব্যাধির পর্যায়ে ফেলিতে হইবে। ইহাকেই বলে **বস্তুকাম**। এমন কি, লক্ষ্যপাত্রের পরিত্যক্ত কদর্য বস্ত্রখণ্ড দেখিয়াও কোনো কোনো উৎকট বস্তুকামী রাগোত্তপ্ত হইয়া উঠে।

অবিকল এইভাবে প্রিয়জনের কেশ, বক্ষ, নিতম্ব, চরণপল্লব, করপত্র, নয়নদ্বয়, গুল্ফ, গুম্ফ বা জননযন্ত্রের কেশ প্রভৃতিকে কেহ যখন পৃথক করিয়া খণ্ডিতভাবে ভালবাসে, তাহা দর্শনে, পরশনে বা আঘ্রাণে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া উদ্রিক্ত-কাম হয় এবং সমগ্র দেহের প্রতি আকর্ষণ-বোধ করে না, তখন উহা তাহার ব্যাধি বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহাকেই বলে **অঙ্গকাম**। কেহ কেহ প্রিয়ার নখ বা একগোছা চুল সযত্নে কৌটায় রাখিয়া দেয় এবং তাহা নিয়মিত

দেখিয়া ও স্পর্শ করিয়া চরমানন্দ লাভ করে। কেহ কেহ প্রিয়ার চুলের বা গাত্রের গন্ধ পাইয়াই রমণসুলভ তৃপ্তিলাভ করে।

যাহারা সুস্থমস্তিষ্ক ও স্বাভাবিক প্রকৃতির ব্যক্তি, তাহারা সমগ্র মানুষটিকে ভালবাসে বলিয়াই তাহার বিশেষ আকর্ষণীয় অঙ্গগুলিকে বা তাহার ব্যবহৃত বস্তুগুলিকে ভালবাসে। তাহার ঈষৎ-কুঞ্চিত এলায়িত কৃষ্ণকুন্তল, পীবরোন্নত পয়োধর বা গুরু নিতম্বদ্বয় দেখিয়া হয়তো রাগোদ্দীপ্ত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সমগ্রভাবে পাইতে ও উপভোগ করিতে চায়।

আমি এক ব্যক্তিকে জানি, যে বৃদ্ধ বয়সে আমার নিকট স্বীকার করিয়াছে যে, সে যখন ১৩।১৪ বৎসর বয়স্ক কিশোর, তখন পাড়ার কোনো মেয়েকে বা তরুণী বধূকে মনে মনে ভালবাসিলে, সে কোনো অছিলায় তাহাদের কক্ষে প্রবেশ করিত, আলনায় রক্ষিত তাহাদের ছাড়া কাপড়, সায়া, সেমিজ প্রভৃতি স্পর্শ ও চুম্বন করিয়া এবং দীর্ঘ প্রশ্বাসের সহিত পুনঃ পুনঃ সেগুলির গন্ধ গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিত; তারপর নির্জনে তাহাদের নগ্ন মূর্তি কল্পনা করিয়া পাণিমেহন করিত।

পাঁচ বৎসর পূর্বে সদ্যোগতযৌবনা একটি মহিলার কথা শুনিয়াছি, যিনি অধুনা-কুখ্যাত কোনো 'ব্রহ্মচারী' গুরুর মন্ত্রশিষ্যা হইয়া, নিজের স্বামী ও চারিটি পুত্র-কন্যা ছাড়িয়া কয়েক বৎসরকাল গুরুগৃহে বাস করিতেছিলেন। গোবেচারা স্বামী উঁহার খোরপোষ ও গুরুপ্রণামী বাবদ মাসে ১০০৲ করিয়া তাঁহাকে নিয়মিত পাঠাইয়া দিতেছিলেন। কিছুদিন ধরিয়া তিনি দ্বিপ্রহরে গুরুর অর্গলাবদ্ধ কক্ষে তাঁহার পদসেবার অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অতঃপর একটি উচ্চবংশসম্ভূতা শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণী আসিয়া তাঁহাকে স্থানচ্যুত করে। তথাপি তিনি গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাচ্যুত হন নাই। নিত্য তাঁহার গেঞ্জি ও আণ্ডারউইয়্যারগুলি কাচিয়া ইলেকট্রিক ইস্ত্রি-দ্বারা পাট এবং পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেন। প্রত্যহ রাত্রিকালে যখন তিনি অন্য তিনটি সঙ্গিনী-শিষ্যা সহ শয়ন করিতেন, তখন গুরুদেবের একটি পরিত্যক্ত আণ্ডারউইয়্যার বুকে চাপিয়া নিদ্রা যাইতেন। ঐ সঙ্গিনীদের সদ্যপাশমুক্তা একজনই আমাকে এই সংবাদটি দিয়া গিয়াছিলেন।

সমকাম ও সমমেহন

সমকাম (Homosexuality) হইল দুইটি সম-বরাঙ্গজাতির মধ্যে ভাবগত আকর্ষণ ও ভালবাসা। **সমমেহন** (Homosexual practice) তাহাকেই বলা হয় যখন এইরূপ ভালবাসার ফলে দুইটি সমজাতীয় ব্যক্তি একে অপরের কামকেন্দ্রসমূহের বিলসন ও তৎসহিত লৈঙ্গ সংযোগ-দ্বারা আনন্দলাভ করে। বহুক্ষেত্রে পুরুষে-পুরুষে, নারীতে-নারীতে কেবল চুম্বন-আলিঙ্গন চোষণ সম্পীড়ন প্রভৃতির বিনিময় হয়, আর কিছু ঘনিষ্ঠ অঙ্গসংযোগ হয় না।

আবার বহুক্ষেত্রে পুরুষ তাহার প্রেমপাত্রর পায়ুমেহন অথবা তাহার গোপনাঙ্গ চোষণ প্রভৃতি উপচার প্রয়োগ করে। ক্ষেত্রবিশেষে ইহা পারস্পরিকভাবে সাধিত হয়। কেহ কেহ পারস্পরিকভাবে পাণিমেহন করে। নারীদের বেলায় দুইজনে চুম্বন, বক্ষোবিমর্দন ব্যতীত পারস্পরিকভাবে ভগাঙ্কুর-ঘর্ষণ, ভগাধর-চোষণ, অঙ্গুলি-দ্বারা সম্বাধনালী-বিঘট্টন প্রভৃতি করে। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমকাম নিছক ভাবগত থাকিয়াই যায়। শুধু প্রিয়জনের সান্নিধ্য ও মৃদু অঙ্গসংস্পর্শই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়। বহু স্ত্রী ও পুরুষ সমকামীযুগল আজীবন অবিবাহিত ও প্রায়ই পরস্পর পরস্পরের নিকট বিশ্বস্ত থাকে। কচিৎ একপক্ষ অবিশ্বস্ত হইলে, অন্যপক্ষ আত্মহত্যা করে, আশ্রমবাসী হয়, বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া যায়, নতুবা সংসারত্যাগ করিয়া বহুদূরে কোনো অজ্ঞাত স্থানে গিয়া শিক্ষাদান, সেবাকার্য প্রভৃতিতে আত্মনিয়োগ করে।

আমরা সমকামীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বহু তথ্য 'বিয়ের আগে ও পরে' গ্রন্থে ও ফ্রএড্ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ দুইখানিতে দিয়াছি, সেজন্য এ বিষয়ে এখানে বিশদ আলোচনা অপ্রয়োজনীয় মনে করি। শুধু এইটুকু তথ্য আপনাদিগকে মনে রাখিতে বলি যে, এই ব্যাধি শুধু অস্থায়িভাবে বালকবালিকা, কিশোরকিশোরী ও নবতরুণদের মধ্যেই দেখা দেয়—এরূপ নয়, প্রৌঢ়দের মধ্যেও দেখা যায়। দুইটি সত্যকার প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে যেরূপ বয়সের প্রচুর পার্থক্য থাকিতে পারে, স্থায়ী সমকামেও তাহা সম্ভবপর হইলেও সাধারণতঃ দুইটি প্রায় সমবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যেই ইহা ঘটিতে দেখা যায়। কচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে উভয় বরাঙ্গজাতির মধ্যে সমকাম চলিয়া

আসিতেছে। জীবজন্তুদের মধ্যেও—বিশেষভাবে গৃহপালিত জানোয়ারদের মধ্যে—সাময়িক সমকামজনিত আচরণ মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। খৃষ্ট জন্মিবার বহু শত বৎসর পূর্ব হইতেই গ্রীসে ও তৎসন্নিহিত বহুসংখ্যক দ্বীপে দুই প্রকার সমকামই প্রবল ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। পুরুষদের মধ্যে সমকামিক আচার যখন বিস্তারিতভাবে চলে, তখন নারীদের মধ্যে বাধ্যতা-জনিতভাবে এই আচার অনুস্যূত না হইয়া পারে না।

যে সকল সমাজে নারী-পুরুষে অবাধ মেলামেশার প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে, সেখানেও জন্মগত বা অর্জনগত সমকাম একদল স্ত্রীপুরুষকে আকর্ষণ করে। যুদ্ধকালে পাশাপাশি সমকাম ও বিষমকাম-জনিত আচারাচরণ অদ্ভুত তৎপরতার সহিত বাড়িয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে বহু পুরুষের মধ্যে ধাতুগতভাবে সমকামসুলভ প্রেম দুশ্চিকিত্স্য ব্যাধির আকারে দেখা দিয়াছে। বড় বড় রাষ্ট্রনীতিবিদ্, ধনকুবের ব্যবসায়ী ও জ্ঞানধুরন্ধরগণ এই অনৈসর্গিক প্রেমের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সমকামিক প্রেম ও তজ্জনিত আচারাচরণ আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত করাইবার জন্য আন্দোলন সুরু করিয়া দিয়াছেন। আমেরিকায় "Hungry Generation" নামক একটি প্রকাণ্ড দল পুস্তিকা, প্রচারপত্র, বক্তৃতা, চিঠিপত্র মারফৎ সমকামের যুক্তিযুক্ততা দেশ-বিদেশে ছড়াইতে সুরু করিয়াছে। সম্প্রতি ভারতের উপকূলেও ইহাদের প্রচারতরঙ্গ আসিয়া ধাক্কা দিয়াছে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের এবং হোস্টেল ও মেস-জীবন-যাপন-প্রথার সঙ্গে সঙ্গে সমকামিক প্রেম ক্ষিপ্র-গতিতে বিসর্পিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে বহু বিস্ময়কর তথ্য আমাদের হাতে আসিয়া জমিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত একখানি পত্র এ সম্বন্ধে কিছু সাক্ষ্য বহন করিতেছে। আরো ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ও এ যুগের সমকামীদের জীবন-ধারা সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য পরবর্তী গ্রন্থে অধ্যাহার করিবার ইচ্ছা রহিল।

অজাচার বা অন্তর্গমন

বিচারবুদ্ধিহীন ও বিবেকশাসনবর্জিত, নিকট-সম্পর্কিত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যখন যৌনসংযোগ সংঘটিত হয়, তখন তাহাকে **অজাচার** বা **অন্তর্গমন** (Incest) বলে। সর্ব দেশে অসংখ্য পরিবারে এক-একটি বিশেষ বয়ঃক্রমে

মামাতো, পিস্‌তুতো, মাসতুতো, খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো ভাই-বোনের মধ্যে অবৈধ প্রেমের সঞ্চার হয় এবং তাহার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয়ে আকণ্ঠ স্মরগরল পান করিয়া ঘোর বিপদ ডাকিয়া আনে। আজকাল দাওয়ানী বিবাহ-আইনের বিধানে মামাতো-পিস্‌তুতো ও মাসতুতো ভাইবোনে বিবাহ-সংঘটনে কোনো বাধা নাই। তাহার ফলে হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ বিবাহ শত শত হইয়া গিয়াছে, এখনো প্রচুর হইতেছে।

লেখকের পরলোকগত এক বন্ধুর শ্যালিকাপুত্র আইনের বাধা সত্ত্বেও সম্পর্ক গোপন করিয়া তাহার দুই বৎসরের বড় এক জ্যেঠতুতো ভগ্নীকে প্রায় দশ বৎসর পূর্বে দাওয়ানী বিবাহ করিয়াছে। পিতা একদা কয়েকটি জমিদারির দোর্দণ্ডপ্রতাপ নীতিবাদী ম্যানেজার ছিলেন, বর্তমানে এই পুত্রের সংসারে জরাতুর মূক মার্জারের মত বাস করিতেছেন।

দক্ষিণ-ভারতের হিন্দু সমাজে শুধু মামাতো-পিস্‌তুতো ভাইবোনের মধ্যে নয়, মামা-ভাগ্নীর মধ্যেও পরিণয় বহুকাল ধরিয়া সমাজবিধিসম্মত। মুসলমান সমাজেও খুড়তুতো ভাই-বোনে বিবাহ সরিয়ৎ-সম্মত এবং উচ্চবংশীয়দের মধ্যে প্রচুর ঘটিয়া থাকে। খৃষ্টান প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মধ্যেও এইরূপ consanguineous marriage আইনবহির্ভূত নয়।

কিন্তু নিজের ভাইবোনের মধ্যে প্রেম ও বিবাহ দুই হাজার বৎসর পূর্বেও কোনো কোনো দেশে প্রচলিত এবং তিন হাজার বৎসর পূর্বে এইরূপ বিবাহ প্রথা ব্যাপকভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোনো কোনো নৃতত্ত্ববিদের মতে সহোদর ভাই-বোনে বিবাহ প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া রীতিসম্মত ও বাধ্যতাজনিত ছিল। বাইবেলোক্ত আব্রাহাম তাঁহার ভগ্নীকে বিবাহ করেন, এথেন্সের সাইমনও এই পন্থার অনুগামী হইয়াছিলেন। গ্রীক টলেমি বংশ খৃষ্ট আবির্ভাবের পূর্বে কয়েক শত বৎসর ধরিয়া মিশরে রাজত্ব করিয়াছিল। ইহাদের বিরাট সাম্রাজ্য যাহাতে বিভক্ত না হইয়া যায়, সেইজন্য প্রত্যেক রাজাই তাঁহার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া রানীর আসনে বসাইতেন। প্রসিদ্ধা রূপসী ক্লিওপেট্রাও তাঁহার ভাইকে বিবাহ করিয়া মিশরের সম্রাজ্ঞীপদে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন।

ভারতের পুরাণেতিহাসে সহোদর ভাইবোনের ভিতর অবৈধ প্রেম সঞ্চারের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। অধুনা আদালতের কর্ণে এরূপ ঘটনার কথা অত্যন্ত কম সংখ্যকই প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু যাঁহারা গোপনে গর্ভপাত করেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দেন যে, যে-সকল কুমারী ঐ উদ্দেশ্যে তাঁহাদের নিকট আসে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা যায় শতকরা প্রায় ত্রিশটি কেসে তাহাদের দুরবস্থার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা দায়ী। প্রায় ৭০% কেসে কুমারী ও বিধবাদের গর্ভাধান হয় অজাচারের ফলে। তদ্ব্যতীত খুড়তুতো-জ্যেঠতুতো ভাই, খুড়া, মামা, এবং নগণ্য সংখ্যক পিতাও এইরূপ কন্যাদূষণ-পাপে লিপ্ত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। পিতা কর্তৃক কন্যা-ধর্ষণের কেস অথবা বিধবা কন্যার সহিত বিপত্নীক পিতার আপোষে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন অন্যান্য সভ্যদেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত কম হইলেও যত কম বলিয়া আমরা কল্পনা করি, তাহা অপেক্ষা প্রকৃতপক্ষে বেশী সংঘটিত হয়।

প্রাচীনকালেও যে এই ব্যাপার হইত, তাহার প্রমাণ আমরা হিন্দুপুরাণ ও বৌদ্ধজাতক খুঁজিলে গুটিকয়েক পাইব। বিলাতে এখনো এই সম্পর্কে মাঝে মাঝে পুলিস-কেস আদালতের আওতায় আসে এবং অপরাধী পিতা দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুমারী জ্যেষ্ঠা ভগ্নী তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাহার সহিত গোপন যৌনসম্মিলনে প্ররোচিত করে। জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ভগ্নীর অশালীন সম্পর্কঘটিত কয়েকটি কেস আমাদের হাতে আসিয়াছে এবং উহার দুই-তিনটিতে ভগ্নীকে বিপন্ন হইতেও হইয়াছে।

এই ধরনের অনাচার সম্বন্ধে আমার অন্যান্য গ্রন্থে কিছু কিছু আলোচনা আছে। ভগ্নীপতি, যুবক কাকা ও মামা কোনো কোনো কিশোরী ও যুবতীর গর্ভোৎপাদন করিয়াছে, তাহাও আমাদের জ্ঞানের সীমানা-মধ্যে আসিতে ত্রুটি করে নাই। এজন্য তাহাদের পিতামাতাকে কিরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয় ও কন্যাদিগকে বিপন্মুক্ত করিতে কত অর্থ ব্যয় করিতে হয়, তাহাও আমাদের অজ্ঞাত নয়। ভ্রাতাভগ্নীর গোপন সম্মিলন সাম্প্রতিক কালে অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। ইহার জন্য ছেলেমেয়েদের বিবাহ-বয়সের

ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ, সম্ভোজাগ্রতকাম ভ্রাতাভগ্নীর ঘনসান্নিধ্য ও পারস্পরিক সহজলভ্যতা, শয়নকক্ষের অপ্রতুলতা ও দেশের নীতিধর্মহীন শিক্ষাধারা অনেকাংশে দায়ী। সর্বোপরি, অর্ধনগ্না সুন্দরীদের লীলালাস্য-বিভঙ্গিত, আদি রসচটুল, বারাঙ্গিক ভাবোদ্দীপক, ইংরাজী ও হিন্দী ছায়াচিত্র সর্বাপেক্ষা বেশী দায়ী। আশ্চর্য, এই সকল চিত্রদর্শন হইতে অল্পবয়স্কদের প্রতিনিবৃত্ত করিবার মনোবৃত্তি অভিভাবকদের নাই, দেশের শাসকগণও এই সকল চিত্র-প্রদর্শন বন্ধ করিতে আদৌ উৎসুক নহেন।

ষোড়শ প্রসঙ্গ

সুস্মিতার গোপনীয় পত্র

মন্তব্য। মেয়েটির নামের একাংশ গোপন রাখিলাম ও পদবী দিলাম না। এই শহরেরই অধিবাসিনী এবং কলেজে পড়িত। চারি বৎসর পূর্বে ছয় মাসের মধ্যে মেয়েটি আমাকে তিনখানি পত্র লেখে। প্রতি পত্রেই সে আমাকে নারীদের সমকাম সম্বন্ধে পৃথক একখানি পুস্তক লিখিতে নতুবা উভয় জাতির সমকাম সম্বন্ধে একখানি বড় পুস্তক লিখিয়া, তাহার অর্ধেকাংশ নারীদের সমকামিক প্রেমের সোদাহরণ বর্ণনায় নিয়োগ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে। তাহার শেষ পত্রখানি যথাযথ প্রকাশ করিয়া দিতেছি। এই পত্রখানি পাঠ করিয়া পাঠকপাঠিকাগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, পত্রলেখিকা নিজেই হয় ভাবগতভাবে নতুবা বস্তুগতভাবে সমকামিকা এবং এ সম্বন্ধে তাহার হয়তো কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নিশ্চিত প্রচুর কৌতূহল আছে।...

সম্মানভাজন নৃপেনবাবু,

আমার চিঠির উত্তরের আশা যখন পরিত্যাগ করেছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার চিঠি পেলাম। সত্যি ভারী আনন্দ হলো উত্তর পেয়ে। তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ হলো—আপনি আবার সকলের

অনুরোধে একটি বই লিখবেন এবং এই সম্বন্ধে নতুন কিছু লিখবেন শুনে। 'সমকামিতা' সম্বন্ধে জানবার আমার একটা তীব্র ইচ্ছা। কেন? আমার চোখে দেখা কেসটা সম্পূর্ণ আপনাকে লিখে জানালাম। বিশেষ অনুরোধ একটু ধৈর্য ধরে পড়বেন। এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে বা কাল্পনিক নয়, সব সত্যি, আমার চোখে দেখা।

আরো দু'খানি সমকামিতার ভিন্ন ধরনের case পাঠাবার ইচ্ছা আছে। একটি আমার বান্ধবীর বোর্ডিংএর, অপরটি আমার এক বান্ধবীর বৌদির (বিয়ের পরে)। ওদের লিখে দেবার অনুরোধ করেছি। তা না হলে ওদের সাহায্য নিয়ে সম্পূর্ণ caseটা লিখে পাঠাব। বোর্ডিং-এর caseটা অন্য ধরনের। নিত্য নূতন মেয়ের সংগে আসক্তি। কোন একজন না থাকলে অন্য মেয়েকে আকৃষ্ট করে। সম্পূর্ণ সমকামী, চেহারার মধ্য দিয়ে স্বভাব বোঝা যায়। বিশ্রী উগ্র দেখতে। এদের মধ্যে ভালবাসা নেই, শুধু অতৃপ্ত ক্ষুধাকে তৃপ্ত করে। সম্পূর্ণটা ভাল করে জেনে জানাব। আর দ্বিতীয়টি অনেকটা প্রথম কেসটার মত, কিন্তু বিবাহিতা। এটা একটা আশ্চর্য নয় কি?...প্রণাম রহিল। ইতি।

আজ ১৯৬১ সালে যাদের কথা লিখতে বসেছি, তাদের নামটা শুধু ছদ্ম, বাকি সমস্ত কাহিনীটি আমার চোখে দেখা। তাই এই লেখাটি পড়ে কেউ যেন অতিরঞ্জিত বা কাল্পনিক বলে ভুল করবেন না—এইটুকু আমার অনুরোধ।

যাদের কাহিনী লিখতে বসেছি, তারা হচ্ছেন আমার বান্ধবী মিত্রার দিদি কণিকা ব্যানার্জী এবং তার প্রিয়তমা বান্ধবী মিলি বোস। কণিকাদির বাবা প্রফেসর, আর মিলিদির বাবা আই. সি. এস.। দুজনেই সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের। দুজনেই ভারী ভদ্র ও নম্র। আমি দুজনকেই খুব শ্রদ্ধা করতাম। মিলি দি কলেজে নামকরা ছাত্রী ছিল, লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। আর কণিকা দি সুন্দরী ছিলেন।

কতদিন দেখেছি মিলি দি বা কণিকা দি'র সঙ্গে কত ভাল ভাল ছেলে একটু আলাপ করতে বা কথা বলতে পেলেই যেন ধন্য হয় এমন ব্যবহার করে, কিন্তু দুজনকেই দেখতাম ঘৃণার সংগে সরে যেতে। কতদিন শুনেছি বলতে—

যত সব জঘন্য বিশ্রী জিনিষ এই প্রেম। এই সব গায়ে-পড়া ছেলেগুলোকে দেখলে গা-জ্বালা করে। সেই কণিকা দি, সেই মিলি দি, যারা প্রাচুর্যে লালিতপালিত, গাড়ী ছাড়া এক পা-ও যেতেন না, সেই মিলিদি আজ আশ্রমবাসিনী, আর কণিকা দি এক বৃদ্ধ ব্যক্তির স্ত্রী। কিন্তু কেন? কেন?

আজ থেকে প্রায় ৯ বৎসর পূর্বের ঘটনা। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাস। তখন আমি বেশ ছোট ছিলাম। তাই সমস্ত কিছু দেখা সত্ত্বেও ঠিক বুঝতে পারিনি। এই দীর্ঘ নয় বছর পরেও যে আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছি তা নয়। তবে কিছুটা বুঝতে পেরেছি।

পড়ার বই আন্‌তে পাশের বাড়ী মিত্রার কাছে যাই। বাড়ীতে যাবার পথেই বাধা পেলাম। মিত্রাদের ঝি এগিয়ে এসে জানাল—বড়দি ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ নেই। আমি বললাম—ঠিক আছে, কণিকা দি আছেন তো? তাহলেই হবে। বলেই ভিতরে ঢুকতে গেলাম। কণিকাদির ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে ভেজানো ছিল। শব্দ না করে ভিতরে পা দেবার পথেই কণিকাদির চিৎকার শুনে থম্‌কে দাঁড়ালাম। কণিকা দি চিৎকার করে উঠ্‌ল—কে? কে?

আমি চমকে দাঁড়িয়ে পড়্‌লাম। কণিকা দি একা নয়, তার প্রিয়তমা বান্ধবী মিলি বোস পরস্পরে এক বিশ্রী অবস্থায়। আমি অপরাধীর মত বললাম—মিত্রার কাছে এসেছিলাম স্কুলের বইটার জন্যে…। মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে কণিকা দি বল্‌ল—আমরা ভারী ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কে না কে এল! উঃ, কি সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়েছিলাম। তারপর আস্তে করে বললেন, আজ যা দেখলে বা দেখাব, কাউকে ব'লো না, কেমন?

মিলি দি হঠাৎ বলে উঠলেন—কণিকা, সুস্মিতার সামনে কেমন যেন বিশ্রী বিশ্রী লাগছে। তার চেয়ে ও চলে গেলে—

কণিকা দি বললেন, না, না, ও কিছু বুঝবে না। তাছাড়া দুজন মেয়ে, দেখলেই বা কি?…অবাক বিস্ময়ে আমি দেখছিলাম—কণিকা দি আর মিলি দি পরস্পর পরস্পরকে অজস্র চুম্বন করছে আর কি সব বলছিল তা আমি বুঝিনি। তবে মিলি দি বলেছিল—জানিস্ সুস্মিতা, আমরা না প্রেমে পড়েছি,

দুজন দুজনকে ভীষণ ভালবাসি, তাই ত এত আদর করি। তোর মা যেমন তোর ছোট ভাইটিকে আদর করে চুমো খায়, আমরাও তেমনি আদর করছি।…

এর পর আমার কেমন ওদের সম্বন্ধে একটা কৌতূহল হয়। মিত্রাদের বাড়ী গেলেই কণিকা দির খোঁজ নিতাম। কতদিন দেখতাম ছাদের অন্ধকার এক কোণে বসে কণিকা দি আর মিলি দি। আমরা হঠাৎ ছাদে গেলেই বলতেন—এই মিত্রা, তোরা ছাদে কেন? নীচে যা, বড়দের গল্প শুনতে নেই।…

কিন্তু সত্যি কি ওরা গল্প করত? না, সেই প্রথম দিনের মতই আলিঙ্গনরতা অবস্থায় থাকত? মিত্রা বলত—জানিস, দিদি না মিলি দি'কে ভীষণ ভালবাসে। নিজে যা খাবে ওর জন্য রেখে দেবে। ওকে না দিয়ে খায় না। ওরা পরস্পরের মত্ না নিয়ে কোথাও যায় না।…আমাদের কিশোরী-মনে তখন ভারী একটা কৌতূহল ছিল, তাই মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম—কণিকা দি আর মিলি দি ছাদের সেই নির্দ্দিষ্ট কোণে অন্ধকারে বসে কথা বলছে, তারপর হয়ত কণিকাদির কোলে মিলিদি আর কণিকাদি মিলিদিকে অজস্র চুমু খাচ্ছে। মুখে চোখে গলায় সর্ব্বত্র। আবার মিলিদি'র কোলে কণিকা দি; মিলি দি অজস্র চুমু খাচ্ছে, যেন তার শেষ নেই। ওরা প্রায় মিলিত হলেই আদর করত, গল্প করত, প্রায় দু' তিন ঘণ্টা ধরে ওরা পরস্পরকে চুমু খেত। মাঝে মাঝে দেখতাম কণিকাদি কাঁদত, চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ করে জল পড়ছে; বলছে—মিলি, তুমি আমায় এত ভালবাস, এত আদর কর, যদি আমাদের বিচ্ছেদ হয়, তাহলে আমি কি করে বাঁচব?

মিত্রা আমায় বলেছিল—জানিস মিতা? দিদি যদি মিলিদির সংগে রাগারাগি করে, তাহলে বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। মিলিদিও দিদির মত খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে।…

একদিন দুপুরে মিত্রাদের বাড়ীতে আমি, মিত্রা আর কণিকা দি ছিলাম, হঠাৎ মিলি দি এল। দুপুরে ছাদে রোদ, তাই ছাদে না গিয়ে কণিকাদির পড়ার ঘরে ওরা বসেছিল। মিলি দি যেতেই কণিকা দি আমাদের বলে দিল 'তোমরা খেলতে যাও', বলে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। কিন্তু

আমার কৌতূহলী মন কি যেন দেখবার আশায় ছটফট করে মরছে। বললাম, মিত্রা, আজ একটু লুকিয়ে দেখা যাবে না? মিত্রা কানেই নিল না কথাটা; বল্‌ল, কি আর দেখ্‌বি, সেই তো আদর। বললাম, তা হোক্‌, তবুও দেখ্‌ব। মিত্রা বল্‌ল, ঠিক আছে, তুই দেখ্‌ তাহলে, আমি গল্পের বইটা শেষ করি।···বলে আমায় এমন এক জায়গায় দাঁড়াতে বল্‌ল যেখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম অন্য এক দৃশ্য।

কণিকা দি আর মিলি দি বিছানায় শুয়ে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে প্রথমে অজস্র চুমু খেল, তারপর হঠাৎ কণিকা দি মিলি দি'র কানে কানে বলল, খুলব? আপত্তি আছে? মিলি দি বলল, খোল, আপত্তি নেই। কণিকা দি মিলি দি'র ব্লাউজের বোতামগুলি সব খুলে দিল, তারপর বুকের উপর মুখটা নাবিয়ে আন্‌ল, কত চুমো খেল, আরো অনেক কিছু করল ঐ অসমতল স্থানে। মিলিদি চোখ বুজে ছিল। তারপর আবার কণিকাদিকে মিলিদি সেই একই রকম করল। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে পরস্পর পরস্পরকে উপভোগ করল।

এমনি কত মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন অপরাহ্ণে ওদের মিলিত হতে দেখেছি। শুনেছি বিক্ষিপ্ত কথা। দীর্ঘ ন বছর পরে সব মনে নেই, তবে টুকরো টুকরো মনে আছে। কণিকা দি একদিন বলেছিল—মিলি, আমি কিন্তু চিরকুমারী থাকব। কেউ তো জানে না আমরা স্বামী-স্ত্রী। অন্যকে বিয়ে করার আগে বিষ খেয়ে মরব।

আর একদিন কণিকাদি মিলিদি'কে বুকের রক্ত দিয়ে কাগজে লিখে দিয়েছিল—'আমি তোমায় ভালবাসি।' মিলি দি জিজ্ঞাসা করেছিল—কি দিয়ে লিখেছ? কণিকা দি মুখটা নাবিয়ে বলেছিল—বুকের রক্ত দিয়ে। ব্লেড দিয়ে বুক চিরে চিরে সেই রক্ত দিয়ে লিখেছি। মিলিদি চীৎকার করে বলেছিল—সে কি! ব্যথা পাওনি? কণিকা দি আস্তে বলেছিল—ব্যথা পেলেও সহ্য করার ক্ষমতা ছিল।

আমি অবাক হয়ে ভেবেছিলাম—এত ভালবাসা! তারপর, শুনেছি কণিকা দি মিলিদির ওপর অভিমান করে তিন-তিনবার মরতে চেয়েছিল, বিষ খেয়েছিল। মিলিদির সে কি কান্না, পাগলের মত কান্না!

ওদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বে কণিকা দির বাড়ীর লোকেরা বিরক্ত হলেন, এক রকম জোর করে ওদের কথা বলা বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। মা বললেন, ঐ মেয়ের জন্য আমার মেয়ের পড়াশুনো হয় না। রাত নেই, দিন নেই, গল্প আর গল্প। ঐ মেয়েটি আমাদের শনি।

সামান্য কারণে সত্যিই একদিন দুজনের কথা বন্ধ হলো। কণিকা দি বাড়ির ওপর রাগ করে এক বৃদ্ধ প্রফেসারকে বিয়ে করলেন। বাপের বয়সী ভদ্রলোক। এদিকে মিলি দি এম. এ তে কোনো বিষয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে, কিছুদিন একটি মেয়ে-কলেজে প্রফেসারি করেন, পরে চিরকুমারী অবস্থায় আশ্রমবাসিনী হলেন।

সব কিছু ভুলে গেছিলাম। দুটি মেয়ের ভালবাসা, তা আর স্মরণীয় করে রাখবার কি আছে? কিন্তু হঠাৎ গত বছর স্বনামধন্যা লেখিকা শ্রীমতী বাণী রায়ের একটি বই হাতে আসে। তার মধ্যে 'সাফো' গল্পটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুটি মেয়ের প্রেম। গ্রীক নারী সাফোর জীবনের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু আমার কণিকা দি আর মিলি দি'র সংগে এর অনেক তফাৎ। দেখলাম গল্পের নায়িকাকে পুরুষালী স্বভাবের দেখিয়েছেন। একটা বিকৃত যৌন আকর্ষণ বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার দেখা কণিকা দি আর মিলি দি একেবারেই ভিন্ন। কত পুরুষ তো চেয়েছিল, কিন্তু কই কোনদিনও তো সাড়া দিতে চায়নি।···

সেদিনকার কিশোরী আজ যুবতী, তাই সেদিন যা বুঝতে পারিনি, আজ তা উপলব্ধি করার চেষ্টায় খুঁজে বেড়াতে লাগলাম নারীতে নারীতে প্রেমের কাহিনী। কেন এমন হয়? তারপর এই সম্বন্ধে দৈনিক যুগান্তরে গ্রন্থ-তালিকা পেলাম (আমার মত কৌতূহলী পাঠিকাদের সুবিধার্থ সম্পূর্ণ তালিকা তুলে দিলাম)। এই সম্বন্ধে যে বইটি পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন এনেছে, সেটির নাম Jeannete H. Foster এর *Sex Variant Women In Literature*। সমমৈথুনাসক্তা যে সব মেয়েরা সাহিত্যে স্থান লাভ করেছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাঁদেরই আলোচনা।

জেম্‌স্‌ তাঁর *The Bostonians*এ এদের সমাজে বিপদ দেখিয়েছেন।

ব্যাল্‌জাক্‌ তাঁর *Seraphitus-Seraphita*তে এবং মেরি ওল্‌ষ্টোন্‌ক্র্যাফ্‌ট তাঁর *Marya Fiction* (Mss)এ বলেছেন যে, পুরুষের সাহচর্য অপেক্ষা এই ধরনের সংসর্গ ভালো। ভ্যালেন নিজে সমমৈথুনাসক্ত ছিলেন, তাই দোষ-গুণের বিচার না করে তিনি শুধু ছবি এঁকেছেন। ব্যালজাকের *The Girl with the Golden Eyes*এর নায়িকা এমন গভীরভাবে তার প্রেমস্পদার প্রতি আসক্ত যে, ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে সে তাকে হত্যা করতেও দ্বিধা করল না। ক্র্যাফ্‌ট এবিংয়ের মতে ফ্লোবেয়ারের *Salambo*র নায়িকা সমমৈথুনাসক্তা। Collete এ বিষয় নিয়ে কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন। সমালোচকদের মতে এগুলি আত্মজীবনী।···

এ সম্বন্ধে আজও অনেক অনেক জানতে চাই। কেন এমন হয়?···মিত্রা বলেছিল—জানিস্‌, দিদি না আবার পড়তে আরম্ভ করেছে। দীর্ঘ ক' বছর পরে আবার পড়াশুনা সুরু করেছে। মিলি দি অত শিক্ষিত বলে দিদি বলেছে ও-ও এম. এ. পাশ করবে।···দীর্ঘ নয় বছর পরে নাকি ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভুলতে পারেনি। তাই হঠাৎ কোনোদিন রাস্তায় দেখা হলে দুজনে কেঁপে ওঠে, থম্‌কে দাঁড়ায়।···সংসার, সমাজ, সাহিত্য কেন এদের কাহিনী নিয়ে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করে না?··নরনারীর প্রেমই কি প্রেম?···গ্রীসে শুনেছি নারীতে নারীতে প্রেম আজও প্রচলিত।

দীর্ঘ বছর পরে সেদিন পথে মিলিদির' সঙ্গে দেখা হ'ল। মিলি দি শান্ত হাসি হেসে বললেন, কে সুস্মিতা না? ভাল আছ? শুন্‌লাম কলেজে পড়ছ। তারপর, সব ভালো তো?···সাদা চাদরটা গায়ের ওপর ভালো ক'রে টেনে দিলেন। সৌম্য শান্ত চেহারা। শ্রদ্ধায় আমার মাথাটা আপনি নীচু হয়ে গেল। মনে পড়ল কণিকা দি এই মিলিদির জন্যে তিন তিনবার বিষ খেয়েছিল।···· কণিকা দি আজ সংসারী, আর মিলি দি আজ সংসারত্যাগী নারী। নারীর প্রেমে আত্মবিসর্জন দিল।

সপ্তদশ প্রসঙ্গ

কুনালের অরুন্তুদ আত্মকাহিনী

মন্তব্য। প্রায় সাড়ে-চার বৎসর পূর্বেকার কথা। একদিন বৈকাল পাঁচটা লাগাৎ একটি ২৬।২৭ বৎসর বয়স্ক যুবক আমার অবারিতদ্বার পাঠকক্ষে সন্তর্পিত পদক্ষেপে আসিয়া অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে, "সার, আমার কিছু কথা ছিল আপনার সঙ্গে। আপনার কি একটু সময় হবে?" হাতে কাজ ছিল না। সংবাদপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় স্টুডিও-সংবাদগুলির উপর চোখ বুলাইতেছিলাম। যুবকটিকে বসিতে বলিয়া তাহার বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে বলিলাম। গত ৩৮ বৎসরের মধ্যে এরূপ কয়েক শত তরুণ-তরুণী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া আসিয়া, আমার পাঠকক্ষের দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিনম্রস্বরে প্রায় একই রকমের প্রশ্ন করিয়াছে। সুতরাং আমার কর্ণদ্বয় ও আমি এরূপ প্রশ্নে অভ্যস্ত ছিলাম।

এই যুবকটির চেহারায় আকর্ষণযোগ্য কিছুই ছিল না। মুখখানি শুষ্ক। গাল দুটি চাপা, চোখ দুইটি ছোট ছোট ও ভিতরদিকে মগ্ন, সম্মুখের দাঁত দুইটি বাহির-করা, গণ্ডোর্ধ্বের অস্থিফলক দুইটি প্রবর্ধিত, চুলগুলি রুক্ষ ও অবিন্যস্ত, লালাটে চিন্তার কালো মেঘ। ছেলেটি খানিকটা এলোমেলো কথার ভিতর দিয়া যাহা ব্যক্ত করিল, তাহার মর্ম হইল এই যে, সে সংসারের উপর, পৃথিবীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কাহারো সহিত তাহার বনিবনাও হইতেছে না। এমন কি বিধবা মাতার সঙ্গেও না। সে একটি দেশপ্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। ঊর্ধ্বতন অফিসার তাহাকে প্রায়ই বিনাদোষে তিরস্কার করেন, সহকর্মীরা তাহার চালচলন ও চেহারা লইয়া ঠাট্টাতামাসা করে এবং কাজে বিঘ্ন ঘটায়। তাঁহার আর বাঁচিবার সাধ নাই, সে আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প। কেবল এই মাসের মাহিনাটা যেদিন পাইবে, টাকাটা সন্ধ্যার সময় মা'র হাতে দিয়া রাত্রে ইঁদুর-মারা বিষ খাইয়া শুইয়া পড়িবে।

আমার নিকট আসিবার উদ্দেশ্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে, আমার লেখা কয়েকখানি পুস্তক সে পাঠ করিয়াছে। কিছু আলো, কিছু

সান্ত্বনা পাইবার জন্য সে ফ্রএড সম্বন্ধীয় আমার একখানি পুস্তক সদ্য পাঠ করিয়াছে। তাহার আশা ছিল যদি আমার পুস্তক পাঠ করিয়া তাহার জীবনে রুচিবোধ ও মমতা ফিরিয়া আসে। কিন্তু সে আলো পায় নাই, তাহার আশা পূর্ণ হয় নাই। আত্মহত্যা ছাড়া এইরূপ ঘোর অস্বাচ্ছন্দ্যকর মানসিক অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়ার তাহার আর কোনো উপায় নাই। কেবল মায়ের জন্য দুঃখ হয়, বহু জ্বালাযন্ত্রণা কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি তাহাদের কয়টি ভাইবোনকে মানুষ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্রটিকে তিনি দেখিতে পারেন না সত্য, কিন্তু তবু তো গর্ভধারিণী মা!

সে আসিয়াছে দুইটি কারণে: প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিতে—কোনো মনোবিজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতির দ্বারা তাহার মনের শান্তি ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর কিনা এবং দ্বিতীয়তঃ জিজ্ঞাসা করিতে—পরলোক বলিয়া কোনো স্থানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস রাখি কিনা এবং সেখানে পৃথিবীর পাপপুণ্যের বিচার হয় কিনা।...

মানুষ যখন আত্মহত্যা করিতে অগ্রসর হয়, তখনি বুঝিতে হয় যে, সে সংসারের সকলের প্রতি মমতা হারাইয়াছে নিজের দোষেই, 'পৃথিবীতে কেহ ভালো তো বাসে না, এ পৃথিবী ভালো বাসিতে জানে না' এই দার্শনিক মনোভঙ্গী তাহার সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়াছে। হয়তো সে তাহার কোনো প্রেয়সীকে জয় করিতে পারে নাই নতুবা তাহাকে সম্ভোগ করিতে গিয়া লজ্জাকরভাবে নমিতধ্বজ হইয়াছে; তদুপরি সহজপ্রবৃত্তির তাড়নায় এমন কিছু পাপকার্য সে করিয়াছে যাহার চিন্তা তাহাকে এক ঘোর অস্বস্তিকর একটানা দুরাবেশের মধ্যে ফেলিয়া পীড়া দিতেছে।

মনোরম কৌশলে জেরা করিয়া করিয়া তাহার সদ্যাতীত জীবনের কিছু কিছু ইতিহাস টানিয়া বাহির করিলাম। সে বৎসরখানেক পূর্বে আফিসের এক বন্ধুর সহিত কোনো পতিতালয়ে গিয়াছিল। বন্ধুটি তাহার উপস্থিতিতেই ঐ নারীর দেহোপভোগ করিয়া তাহাকে অনুরূপ করিতে আদেশ করে। সে বন্ধুটির উপস্থিতিতে এবং বাতির আলোয় কিছুই করিতে পারিবে না বলায় বন্ধুটি বাহিরে চলিয়া যায় এবং বারনারীটি আলো নিবাইয়া দেয়। তারপর

অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে বিবস্ত্র করিতে গেলে সম্ভবতঃ সে রহস্যচ্ছলে ও তাহার উত্তেজনা-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ তাহাকে বাধা দিতে থাকে। তারপর সে যখন বসনোন্মোচন করে, তখন তাহার সাধনদণ্ড স্তিমিত হইয়া পড়ে, পৌনঃপুনিক প্রয়াসেও উহার দার্ঢ্য পুনরাবর্তন করা যায় নাই।

কলিকাতার উপকণ্ঠে যে কলোনিতে সে থাকে, সেখানে কিছুদিন পূর্বে সে এক দরিদ্রা এক-সন্তানবতী তরুণী বিধবার রূপে আকৃষ্ট হইয়া, তাহার কুটিরে রাত্রিকালে গোপনে বার কয়েক গিয়াছিল এবং কিছু অর্থ-সাহায্যও করিয়াছিল। দুই-রাত্রিতে দুইবার তাহার দেহোপভোগ করিতে গিয়া সে গ্লানিকরভাবে ব্যর্থকাম হইয়াছিল। অতঃপর বিধবাটি তাহার সহিত অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করায় সে তাহার গৃহে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে।...

তিন দিন পরে ঐ যুবকটির আফিসে মাহিনা পাইবার কথা এবং সেই রাত্রেই তাহার সঙ্কল্পিত আত্মনাশের কথা। আমি তাহাকে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তাহার আত্মহননের তারিখ এক মাস পিছাইয়া দিতে সম্মত করাইলাম এবং ইতোমধ্যে তাহার মনে জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ফিরাইয়া আনিতে পারিব বলিয়া আশ্বাস দিলাম। সর্বোপরি তাহাকে বলিলাম যে, তিন দিন পরে রাত্রি আটটার সময় সে যেন তাহাদের কলোনির নিকটস্থ বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াইয়া আমার প্রতীক্ষা করে। তাহাকে বলিলাম যে, আমি তাহাদের গৃহে গিয়া তাহার জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিব। যুবকটি প্রথমে খানিকটা বিস্ময়ান্বিত হইয়া সানন্দে আমার প্রস্তাব অনুমোদন করিল। ঐ সঙ্গে তাহাকে বলিয়া দিলাম তাহার জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী লিখিয়া ৭।৮ দিনের মধ্যে আমাকে দিয়া যাইতে।

সে দুইটি প্রতিশ্রুতিই পালন করিয়াছিল। তাহার মাতাকে গোপনে বলিয়া আসিয়াছিলাম, ইঁদুর-মারা বিষের মোড়কটি খুঁজিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে ও পুত্রের উপর কিছুদিন একটু কড়া নজর রাখিতে। দশ দিন পরে যুবকটি তাহার আত্মজীবনী-লেখা একখানি এক্সারসাইজ বুক আমাকে দিয়া যায়। প্রায় তিন মাস পরে সে হঠাৎ একদিন আমার নিকট উপস্থিত হইয়া খাতাখানি ফেরৎ চায়। সে বলে যে, সে আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু সে শীঘ্রই চাকরি ছাড়িয়া হৃষীকেশের কোনো আশ্রমে গিয়া জীবন কাটাইবে। যাওয়ার আগে সে খাতাখানি পুড়াইয়া দিয়া যাইবে। তৎপূর্বেই খাতার লেখা আগাগোড়া আমি টুকিয়া লইয়াছিলাম। তাহার প্রায় সমস্তটাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য, ছেলেটির একটি কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিয়াছি।

এই কেসটি কেবল মনস্তাত্ত্বিকদের নয়, প্রত্যেক অভিভাবকের পক্ষে যেরূপ চিত্তাকর্ষক তেমনি আলোকপ্রদ। কুনালের জীবনে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, সেগুলি বহু একান্নবর্তী পরিবারে ঘটিতে পারে এবং ঘটেও। ইহাতে দেখিবেন—কি করিয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নীগণ তাহাদের স্বতঃসঞ্জাত কাম ছোট ভাইদের মাধ্যমে প্রসাদন করিতে গিয়া তাহাদিগকে অকালপক্ক ও দুঃসাহসী করিয়া তোলে। কেসটির মধ্যে ভাবিবার ও শিক্ষা করিবার বহু মালমশলা আছে।··· এইবার কুনালের আত্মজীবনী আরম্ভ হইতেছে।—

আমার বয়স যখন ৩॥ বৎসর, তখন আমার বাবা মারা যান। আমরা তখন ৪ বোন ও ২ ভাই ছিলাম। বড়দার বয়স তখন ছিল ১৪ বৎসর। তার পরের তিন বোনের বয়স যথাক্রমে ১২, ৯, ৬, আমার ৩॥ বৎসর। আমার পরের বোনের বয়স ২ বৎসর ছিল, বাবা মারা যাবার ৬ মাস পরে আমার আর একটি বোন জন্মগ্রহণ করে, তার পর বৎসর আমার সবচেয়ে বড় বোনটি টাইফয়েডে মারা যায় ১৩ বৎসর বয়সে। মার কাছে শুনেছি যে, আমার ছোটবেলায় অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধি ছিল বলে বাবা আমায় সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন।

বাবা মারা যান ১৯৩৯ সালে, ৩৯ বৎসর বয়সে gastric ulcer রোগে। বাবা মৃত্যুর পূর্ব্বে যখন অচল হয়ে পড়েছিলেন, তখন চাকুরিস্থান ত্যাগ করে আমাদের নিয়ে দেশের বাড়ীতে এসে উঠেছিলেন।

কিন্তু আমার ঠাকুরমা (বাবার মা) বাবাকে এবং আমাদের সকলকে দিনরাত অশ্রাব্য গালিগালাজ করতেন। অতটা এখন আমার মনে নেই, তবে মার কাছে উহা শুনেছি। কারণ আমরা এদের সংসারে এসে উঠেছি, বাবার আয় বন্ধ। তাই ভয়াবহ অশান্তির মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন সুরু হয়েছিল। এ অবস্থায় বাবা মারা যান্। পর বৎসর বোন মারা যায়।

ঠাকুরমার অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। তার হাত থেকে আমাদের বাঁচতে মাকে দিনরাত অত্যাচার সহ্য করতে হত। এই পরিবেশে একমাত্র আপনার জন বলে তাই মাকেই কেবল পেয়েছিলাম। সমস্ত অশান্তির মধ্যে একমাত্র মার কাছেই সান্ত্বনা পেতাম। তাই মাকে অত্যধিক ভাল লাগত। আমার পরবর্তী বোনের উপর আমার হয়ত কিছুটা ঈর্ষা ছিল। মনে পড়ে একটা গ্লাসে প্রস্রাব করে আমি তাকে মিথ্যা জল বলে খাইয়ে দিয়েছিলুম। সেই বোনও মারা যায় ১৯৪৮ সালে একই টাইফয়েড রোগে।

বাবার হাতে একদিন মার খাওয়ার দৃশ্য ছাড়া বাবার কোন কথাই আমার মনে পড়ে না। মায়ের উপর অভিমান ও আবদার অত্যধিক ছিল। আমার ৫ বৎসর বয়সের সময় মাকে ছেড়ে কাকা-কাকীমাদের সঙ্গে বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হই। যাবার সময় কিছুদিন পূর্ব্বে আমার মাষ্টার কাকার স্কুলের একটি ছাত্রের সঙ্গে ঐ স্কুলেরই একটি নির্জন কক্ষে উভয়ে উভয়ের sex organs touch করেছিলাম। ছেলেটাকে তখন আমি চিনতাম। তাকে খুব ভাল লাগত। কিন্তু সে কে, কোথায় থাকৃত, আজ আর তা আমার কিছুই মনে পড়ে না। শুধু আবছা তার চেহারাটি এবং সে যে স্কুলে বেঞ্চিতে বসত, সেই স্কুলে মাঝে মাঝে যেতাম, শুধু এইটুকুই মনে পড়ে। মনে হয় তখন আমি শান্তি ও কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতাম।

তার কিছুদিন পরেই দেশ ছেড়ে কাকা-কাকীমাদের সঙ্গে বিদেশে চলে যাই। সেখানে মায়ের জন্য ভীষণ দুঃখ হত। পরে অল্প অল্প করে অন্যদের সঙ্গে মিশে যাই। কাকা-কাকীমারা নিজের ছেলেমেয়েদের যে রকম আবদার কুলোতেন, সে রকম আবদার আমার করার কোন উপায়ই ছিল না। সাহসই হত না। মা নেই এখানে, তার মধ্যে কাকীমারা অত্যন্ত রাগী। তাই এই অসম অবস্থায়ই কয়েক বৎসর আমায় থাকতে হয়। এখানেও আমার ছয় বৎসর বয়সের সময় খেলাচ্ছলে একটি সমবয়সী বালকের সঙ্গে উভয়ের sex organ touch করেছিলাম। কিন্তু বড় খুড়তুতো বোন্ উহা দেখতে পেয়ে এসে আমায় এক চড় মারে। তাকে আর এক কাকীমাকে ভয়ানক ভয় করতাম।

কাকার ব্যবহারও ভাল ছিল না। ভীষণ খাটাত, মিষ্টতা ছিল না। নিজের ছেলেকে আমার সামনে অত্যন্ত ভালবাসত। এখানে কালাজ্বরে আমার মরণাপন্ন অবস্থা হওয়ায়, কলিকাতা-নিবাসী আমার এক ডাক্তার কাকা চিকিৎসার জন্যে আমায় কলিকাতায় নিয়ে আসেন। এখানে দীর্ঘ এক বৎসর আমায় শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়েছিল।

আত্মীয়দের উপর বর্ত্তমানে আমার বিতৃষ্ণার সীমা নেই। কারণ তারা ছোটবেলা থেকেই আমাদের সামান্য কারণে রুক্ষ কথা, তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য, আমরা সব বোকা ইত্যাদি এমনভাবে বলত যে, দিনরাত তাদের ভয়ে শশব্যস্ত হয়ে থাকতে হত। এরাই সম্ভবতঃ আমার inferiority complexয়ের গোড়ার কারণ। আমার পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার মূলে আছে এদের নীচ স্বার্থপরতা। লেখাপড়ার অভাবে নিজেকে অত্যন্ত নগণ্য মনে হয়।

এদের কাছে সত্যিকার আন্তরিক ব্যবহার বোধ হয় কোনদিনই পাইনি। এক মা ছাড়া আর কারো কাছে শান্তি পাইনি। কিন্তু এমন মাকে অনেক সময় যেন বিরক্তিকর মনে হয়। আবার মা কোথাও গেলে ভয়ানক অনুতপ্ত হই মাকে শান্তি দিতে পারি না বলে। কেন যেন মনটা প্রায় সময়ই বিরক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে! আমার সমস্ত আচরণ, চালচলন, কথাবার্ত্তা সবই বর্ত্তমানে যেন কৃত্রিমভাবে চলছে। পূর্ব্বের সব যেন গুলিয়ে গেছে। অন্যেরটা নকল করে অন্যের মত হবার ব্যর্থ চেষ্টা করছি।

আমার বয়স যখন ৮॥ বৎসর, তখন আমার বড় এক পিস্তুতো ভাইয়ের সঙ্গে ঘুমিয়েছিলাম। রাত্রে আমার নিদ্রিত অবস্থায় সে আমার উপর homosexuality করে। আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং দেখি আমার বাহ্যদ্বারে পিচ্ছিল পদার্থ লিপ্ত রয়েছে। আমি তার কীর্ত্তির কথা ফাঁস করব বলায় সে ভয় পেয়ে আমাকে কিছু পয়সা দিয়ে ও কথা কাউকে বলতে নিষেধ করে। আমি তা চেপে যাই।

এর বৎসর দেড়েক পরে (১০) আমার বড় বোন আমার নিদ্রিত অবস্থায় আমার sex organ নিয়ে তার sex organকে ঘর্ষণ করতে থাকে। এতে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে থাকি। ও জিনিষটি

তখন অন্তর দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম না। এর কিছুদিন পর আমার ভাইবোনের মধ্যে কে যেন মাকে জিজ্ঞেস করেছিল—কি করে মানুষের বাচ্চা হয়। তা মা উত্তর দিয়েছিল, নাভি দিয়ে ছেলেমেয়ে আসে। প্রশ্নটাতে আমিও যেন খুব কৌতূহলী হয়েছিলাম।

আমার ১১ বৎসরের সময় আমি আমার বড় বোনের (আমার যে বোন পূর্ব্বে আমার নিদ্রিত অবস্থায় sexual act করার চেষ্টা করেছিল) নিদ্রিত অবস্থায় তার কাপড় সরিয়ে তার sex organ আমার sex organ দ্বারা ঘষে তার sex organয়ের উপর তরল বীর্য্যপাত করি। এইটাই আমার জীবনের প্রথম বীর্য্যপাত এবং প্রথম নারীর sex organ ঘর্ষণ। সে টের পায়নি। তখনও পর্য্যন্ত female breastএর ব্যবহার ও female sex organএর অভ্যন্তরভাগ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। কেবল উপর দিয়ে ঘর্ষণেই আনন্দ পেতাম।

তারপর থেকেই ক্রমে ক্রমে আমার নিদ্রিত বোনদের উপর মনোযোগ আকর্ষণ হতে থাকে। এর কিছুকাল পর আমার ছোট বোনের উপর (তখন তার বয়স ৯॥ বৎসর) এই সকল কার্য্য করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু সে প্রতিবারই জেগে যাওয়ায় আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপর যখনই চেষ্টা করেছি, তখনি সে টের পেয়ে গিয়ে পাশ ফিরে শোওয়াতে আমার সমস্ত আশা ব্যর্থ হয়।

তারপর আমি এক খুড়তুতো ছোট বোনের (৮ বৎসর) সঙ্গে আর এক চৌকিতে শুতে আরম্ভ করি। বোধ হয় মা নিজেই এ ব্যবস্থা করেছিল। একদিন রাত্রে আমি উত্তেজিত হয়ে তার প্যাণ্ট খুলে sexual act attempt নিচ্ছি, এমন সময় সে টের পেয়ে গিয়ে ভয়ানক হেসে ওঠে এবং আমার কাছ থেকে সরে শোয়। এতে আমি ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়ি। মা পরদিন তার হাসির কারণ আমায় জিজ্ঞেস করেছিল এবং জিজ্ঞেস করেছিল আমি তার sex organ ইত্যাদি ধরেছিলাম কিনা। আমি একেবারে অস্বীকার করি।

এস্থলে একটি কথা বলি। আমি যে আমার ঐ বোনের উপর নিদ্রিত অবস্থায় অনেক কিছু করলাম, মা হয়ত তার কিছু আভাস পেয়েছিল, তাই তার

এই ধরনের প্রশ্ন। তার কিছুদিন পরে আমার সঙ্গে আমার ছোট বোনের কি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হওয়াতে সে আমার ঐ রাত্রের সমস্ত sex কাহিনী মা এবং খুড়তুতো বোনের সামনে ফাঁস করে। এতে আমি বেশ লজ্জিত হয়ে পড়ি। খুড়তুতো বোন আমার হয়ে বোনকে মন্দ বলে—কেন এসব কথা বলে সকলের সামনে আমায় লজ্জা দিল সে।

এর কিছুকাল পরে মা এবং আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ বোন মামার বাড়ীতে থাকতে যায়। কিন্তু আমার পড়াশোনার জন্য আমায় নিয়ে যায়নি। দিদিও আমার কাছেই থাকে। মায়ের অবর্ত্তমানে আমার মন এমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে যে, দিনরাত শুধু নদীর ঘাটে বসে বসে মা আর মামার বাড়ীর কথা ভাবতাম। মন ভীষণ উদাস হয়ে পড়ত। নদীর যে ঘাট থেকে মামার বাড়ীর নৌকা ছাড়ত, একদৃষ্টে বসে বসে তা দেখতাম, আর ওখানকার অনেক কিছু কল্পনা করতাম। সে এক অপূর্ব্ব feeling ! মাঝিদের মনে মনে ভীষণ শ্রদ্ধা করতাম। ভাবতাম এরাও দিনরাত মামার বাড়ীর দিকে যাতায়াত করে। সত্যই এদের মত যদি আমার সুখী জীবন হতো !

মা একদিন আমাদের বলেছিল, "আমি ত একদিন মরবো, তখন কি হবে ?" মার অবর্ত্তমানের আশঙ্কায় মন আমার এত খারাপ হয়ে পড়ে যে, নিরালায় বসে অনেকক্ষণ কাঁদতাম। ভাবতাম, মা না থাকলে আমাদের জীবনই বৃথা হয়ে যাবে। কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারব না।

এর অনেকদিন পরে আমাদের আত্মীয়স্বজন সমেত আমরা এক খুড়তুতো বোনের বিয়ে উপলক্ষে দূরদেশে যাই। সেখান থেকে মা এবং আমার তিন বোনকে কাকারা কলিকাতায় নিয়ে আসে। একমাত্র আমাকেই নেয় নাই। এতে মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে। ভাবলাম, মেয়ে হয়ে বোনেরা জন্মেছে বলে তারা আমার থেকে অসংখ্য সুবিধা পাচ্ছে। আমি সব দিকেই দুর্ভাগা। বোনেদের এবং কাকাদের উপর বিরক্ত হলাম। কিন্তু কি আর হবে, সবই ভাগ্য। আমি পুনরায় দেশে কাকাদের সংসারে ফিরে এলাম।

এখানকার কাকীমা বরাবরই আমার বিরুদ্ধে ভয়ানক পক্ষপাতিত্ব করত। দিনরাত শুধু আমায় খাটাত ; অথচ খাবার সময় ছেলেমেয়েদের চেয়ে আমায়

কম করে খাওয়াত। এতে মনে খুব লাগত। কাকাও ভীষণ স্বার্থপরের ন্যায় ব্যবহার করত, ভয়ানক শাসন করত। তার ভয়াবহ মারের চোটে অনেকবার কাপড়ে প্রস্রাব করে ফেলেছি।

এই সময় যৌন আকর্ষণ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। অনেক সময় ছোট খুড়তুতো বোনের নিদ্রিত অবস্থায়, তার sex organ আমার sex organএর দ্বারা ঘর্ষণ করে তার organএর উপর বীর্যপাত করতাম। মারাত্মক ভয়ে ভয়ে এ রকম তিন দিন করেছি। কম্পমান বক্ষে করতে হতো যাতে সে নিজে এবং বাড়ীর অপর কেউ কিছু টের না পায়।

তারপর একদিন প্রকাশ্য দিনের বেলায় তাকে হঠাৎ বলে বসলাম সে যদি আমায় একটু sxeual act করতে দিতে রাজী হয়। তবে তাকে আমি ঘুড়ির অনেক সুতো দেব। তাতে লজ্জিত হয়ে সে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। একবার ভাবলাম বলপূর্ব্বক তাকে sexual act করাতে বাধ্য করি। শেষে বাড়ীতে অন্যদের ভয়ে সে যাত্রা তাকে মুক্তি দেই। যখনকার কথা বলছি, তখন আমার বয়স ছিল ১৩ আর এই খুড়তুতো বোনটির বয়স ছিল ৮, আর তার বড়টির ছিল ১০।

আমার চেষ্টা তখন ছোট জনেরই উপর বেশী চলত। কারণ বড় জন অনেক দিন আগেই আমার কীর্ত্তির পরিচয় পেয়ে গেছে। তাই তাকে হবে না জেনে তার আশা ছেড়েছিলাম। অনেক সময় নির্জ্জন ঘরে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার sex organ বের করে শুয়ে থাকতাম। উদ্দেশ্য যদি আমার ঐ অবস্থা দেখে এবং আমাকে নিদ্রিত ভেবে ওরা আমার দিকে আগ্রহান্বিত হয়ে ওদের তরফ থেকেই আমার সঙ্গে sexual act করে ; কিন্তু একদিনও তাদের দেখা পাইনি।

কিছুদিন পরে আমাদের পাশের বাড়ীর দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে তাদের বাইরের ঘরে শুয়েছিলাম। এদের সঙ্গে উপর্যুপরি কয়েকদিন homo-sexuality করেছিলাম। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে পূর্ণ সম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছিলাম। এতে লজ্জার কোন কারণই তখন দেখতে পেতাম না। তখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হৃদ্যতা বেশ ভালই ছিল।

এর কিছুদিন পর আমার কাকীমার এক ভাই আমাদের বাড়ীতে পড়াশোনার সুবিধা হবে বলে থাকতে আসে। ছেলেটাকে আমার একদম পছন্দ হত না। আমার সঙ্গে সে ভাল ব্যবহার করত না। তার মেজাজটা একটু রুক্ষ এবং ভদ্রতাজ্ঞান খুব অল্পই ছিল। প্রথম এসে সেই দিনই সে আমার সঙ্গে unnecessary ঝগড়া বাঁধায়। তখন থেকেই তার উপর আমার বিতৃষ্ণা ধরে যায়। তখন পাড়ায় ওর চেয়ে আমার অনেক বেশী influence ছিল। ও আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলত বলে ওকে দেখলেই আমার বিরক্তি লাগত।

সে ভাল ফুটবল খেলত বলে ক্রমে দেখলুম আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কেউ কেউ তার দিকে আমার থেকেও বেশী ঝুঁকে পড়েছে। তখন যেন আমার পরাজিত মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুও যদি আমাকে অবহেলা দেখিয়ে আমার বিরক্তিজনক লোকটিকে বেশী প্রাধান্য দেয়, সেটা আমি কি করে সহ্য করব? এই পরাজিত মনোবৃত্তি একদিন মারাত্মকভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। সে ঘটনাটা এবার বলছি।

আমাদের পিছন দিক্‌কার বাড়ীতে এক নূতন ভাড়াটে এসেছিল বছর খানেক আগে। তারা আমার পাশের বাড়ীর অন্তরঙ্গ বন্ধুর, যাদের সঙ্গে আমার homosexuality হত, কি রকম যেন আত্মীয় হত। তাদের বড় মেয়ের নাম ছিল মায়া। সে অনেক সময় আমাদের সঙ্গে কেরাম খেলতে আসত। তাকে যেন আমার খুব ভাল লাগত। তার বয়স তখন ছিল অনুমানিক ১০।১১ বৎসর। আমাদের সঙ্গে কেরাম খেলত বলে তার মা তাকে মাঝে মাঝে ভীষণ মন্দ বলত। এই মায়াকে নিয়ে আমার চিরশত্রু কাকীমার ভাই হাসি-মস্করা করত। এটা আমার বেশী ভাল লাগত না।

মায়াকে একদিন তাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উলঙ্গ অবস্থায় প্যান্ট পাল্টাতে দূর থেকে দেখে আমি বেশ আনন্দ পাই এবং আমার পাশের বাড়ীর বন্ধুর সঙ্গে এই নিয়ে তামাসা করি। যাই হোক, এর কিছুদিন পর মায়ার বাবা কয়েকদিনের জন্য এক জায়গায় বেড়াতে যায়। তখন তাদের বাড়ীতে ঘুমোবার জন্য মায়ার মা আমার পাশের বাড়ীর সেই বন্ধুকে বলে। পূর্ব্বেই

বলেছি সেই বন্ধু মায়াদের আত্মীয় হতো। সে আবার আমাকেও সেই বাড়ীতে ঘুমাবার কথা বলে।

মায়ার উপর একেই ত আমার আন্তরিক টান্, তার মধ্যে মায়াদের বাড়ীতে ঘুমালে মায়াকে সামনাসামনি দেখতে পাব বলে আমি সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তাব গ্রহণ করি। সে-রাত্রে মায়াদের বাড়ীতে অনেক রাত্রি অবধি আমি আর বন্ধু কেরাম খেল্লাম। মায়া একবার মাত্র আমাদের ঘরে ঢুকে বন্ধুর সঙ্গে দুই-একটা কথা বলে চলে যায়। আমি আর কথা বলার কোন সুযোগ পেলাম না। মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম আজ যখন কোন কথাই বলা হল না, কাল না-হয় বলব। আশা নিয়ে কালকের রাত্রির জন্য অপেক্ষা করলাম।...কিন্তু পরদিন সেই বন্ধুর কাছ থেকে জীবনের চরমতম আঘাত লাভ করলাম। সে আঘাতের রেশ আজ পর্য্যন্ত আমায় পদে পদে দলিত মথিত করছে।

এত মারাত্মক আশার পরে পরদিন সেই বন্ধুটি আমায় মায়াদের বাড়ীতে ঘুমোবার জন্যে না ডেকে, আমার শত্রু সেই কাকীমার ভাইকে ডেকে নিয়ে গেল। এতে মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। ঘণ্টা দুই নিজের বিছানায় শুয়ে হু হু করে নিজের অদৃষ্টের জন্য কাঁদলাম। এই ভয়াবহ আঘাত আমি মোটেই সহ্য করতে পারিনি। সেই আঘাত আজ প্রতি পদে জীবনের কাছ থেকে পাচ্ছি। সেইদিন থেকেই নিজের ক্ষমতার উপর অবিশ্বাস দেখা দিতে থাকে। মনে ভীষণ দুঃখ পেলাম মায়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সুযোগ হ'ল না বলে। মায়াই আমার জীবনের সর্ব্বপ্রথম নারী যার দিকে আমার প্রেম প্রথম ধাবিত হইয়াছিল। কিন্তু সুযোগের অভাবে সে প্রেম মনেই থেকে গেল।

বোনেদের উপর নেহাৎ শারীরিক আকর্ষণ অনুভব করতাম, প্রেম মনে ছিল না। আজ আমার জীবনে আত্মবিশ্বাসের অভাবের মূলে হয়ত বা বন্ধুটির সেই আঘাত দেওয়ার (আমায় অবহেলা দেখিয়ে আমার শত্রুকে ঘুমোতে আহ্বান করার) স্মৃতি কাজ করতে পারে। আজ চারদিকেই আমি পরাজিত। মানুষের ভালবাসা পাওয়ার মনোবল আমি হারিয়ে ফেলেছি।

আমায় সবাই যেন অবহেলা করে। আমার সঙ্গে মিশবার কারও কোন আগ্রহ নেই। সবাই আমার ওপর আগ্রহহীন। সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলার আগ্রহ আমি যেন হারিয়ে ফেলেছি। স্বতস্ফূর্তভাবে মুখে কথা যোগায় না। চিন্তাভাবনা করে artificially কথা বলে যেতে হয়। মনে হয় ভেতরকার ভাবটা যেন স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করতে পারছি না। যেন এলোমেলোভাবে বেরোচ্ছে। তাতে না থাকে প্রাণ, না থাকে প্রসঙ্গের সঙ্গে কথার যোগাযোগ। তাই কোন মানুষই আমার সঙ্গে মিশে আনন্দ পায় না।

মানুষের সঙ্গে কথা বলতে যেন আমার দম বন্ধ হয়ে যায়। জোর করে কথা বলে যেতে হয়, সে কথায় যেন প্রাণের সাড়া পাই না। তাই একে একে সবার সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ হারিয়ে ফেলেছি। জীবনকে অভিশপ্ত ব্যর্থ মনে হয়। নিজের স্বাস্থ্য ও মুখের গড়ন কুৎসিত মনে হয়। মনে হয় আমার মুখের সামনের দিকটা ছুঁচোর মত চোখা অনেকটা। তাই সবাই আমায় উপহাস করে, অবহেলা দেখায়। আমার স্বাস্থ্য ও মুখের আকৃতির জন্য সম্ভবতঃ কোন মেয়েই আমাকে ভালবাসে না।...তাই দিনরাত সর্বক্ষণ আমি তাদের কথা ভাবলেও কোন মেয়েই আজ অবধি আমার প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখায় নি। তাই আমার একমাত্র আশা হ'ল—যদি কোনদিন কোন মেয়ে নিজ থেকে আমায় প্রচণ্ড ভালবেসে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করে, তবেই তাকে আমি পাব, তার আগে নয়।

কিন্তু সে আশা যে অলীক, তাহাতো বাস্তব জগতে পদে পদে এদের আগ্রহের অভাবের বিনিময়ে আমি অনুভব করছি। হয়ত যতদিন বাঁচব, ততদিন ব্যর্থ আশার বোঝাই আমায় বয়ে যেতে হবে। আমি লোকের সঙ্গে মিশতে পারি না বলে মনে যে কি নিদারুণ দুঃখ ও হতাশার সৃষ্টি হয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মনে হয় আমার যেন কোন দিকেই কোন ক্ষমতা নেই। বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রাণপ্রাচুর্য্য, বন্ধুবান্ধব, চেহারা, স্বাস্থ্য—মানুষের দৃষ্টি-আকর্ষণ অথবা মানুষের ভালবাসা পাওয়ার মত কোন গুণই আমার নেই।...

আজ আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাটছে একদিকে বহির্জগৎ আর একদিকে অন্তর্জগৎ দুইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য লেখাপড়া

মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। আজ যখন নিজের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে নিজের পড়াশোনার ব্যাপারের তুলনা করি, তখন মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে। ভাবি আমার আত্মীয়দের মাঝে আমি কেমন করে দাঁড়াব! এদের সঙ্গে তো আমার আকাশ-পাতাল difference. এই ভয়াবহ বৈষম্য আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

আমি আমার পুরাতন বন্ধুদের সামনে দাঁড়াবার সমস্ত যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছি। আমার জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে পড়েছে। এই শান্তিহীন জীবনের গ্লানি আমায় প্রতিদিন দগ্ধ করে মারছে। এই ভয়াবহ অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তিও আমার নেই।...গভীর দুঃখেই আত্মহত্যার মত কাপুরুষোচিত জিনিষকেও মনে দৃঢ় আসন দিতে আমি বাধ্য হয়েছি।

একটা কথা বাইরের লোকেরা বুঝেও বুঝে না, সেটা হ'ল—অনেক সময় তারা আত্মহত্যার নিন্দার ছলে বলে যে, আত্মহত্যা না করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা কর। আত্মপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা কি আমি করি না! আমার প্রতিটি মুহূর্তের ইতিহাসই আত্মপ্রতিষ্ঠা করার নিরলস প্রচেষ্টার ইতিহাস, কিন্তু বিকৃত ও ধ্বংসপ্রবণ, ব্যক্তিত্ববর্জ্জিত আমার unconscious মন-দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা কল্পনা করতে পারেন? বহির্জগতের কাছে খুব অবহেলা পাই বলে মনে প্রচণ্ড ক্রোধ ও প্রতিহিংসার উদয় হয়। কিন্তু এর জন্য বর্ত্তমানে ত আমিই দায়ী। লোকের সঙ্গে মিশবার কায়দাই তো আমি ভুলে গেছি।...কিন্তু এই কায়দাটা আগে আমার খুব জানা ছিল। তবে আজ আমি এত চেষ্টা করেও কেন পারছি না আমার পুরাতন মনোভাবকে সঞ্জীবিত করে দিয়ে লোকের সঙ্গে অবাধে মিশতে?

সুতরাং এতে দেখা যায়, ইচ্ছা থাকলেই কষ্টের উর্দ্ধে উঠ্‌তে পারা যায় না। এই অবস্থায় আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর কি গত্যন্তর আছে? আমিও চাই বাঁচতে। কিন্তু অসুস্থ, দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ, শান্তিহীন জীবন নিয়ে নয়। মানুষের মত বাঁচতে চাই। চাই ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি, বুদ্ধির সুস্থ অবস্থা।...মেয়েদের জন্য আমার মন সর্ব্বদাই উন্মুখ হয়ে থাকে। এদের সামান্য একটু ক্ষণিক চাহনি আমার প্রাণে ব্যর্থ আশার সঞ্চার করে। এদের অবহেলা আমার জীবনে

হতাশার সর্ব্বনাশা প্লাবনের সৃষ্টি করে। আজ অবধি এদের কারও সামান্য দৃষ্টিও আমি আকর্ষণ করতে পারিনি। তাই জীবনকে নীরস, অভিশপ্ত মনে হয়।

অবশ্য আমার নিজের মনও এর জন্য অনেকখানি দায়ী। Inferiority Complex আমায় এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, আমার তরফ থেকে তাকে তাড়ানোর দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করতেও সাহস পাইনি। ভাবি, আমার যে কুৎসিৎ চেহারা, আমার হাবভাবে যে বুদ্ধিহীনতা ও আড়ষ্টতা প্রকাশ পায়, তাতে মেয়েরা আমায় ভালবাসা ত দূরের কথা, আমাকে দেখে তারা কৌতুক অনুভব করে। অথচ আমার মনে তাদের প্রেম পাওয়ার জন্য চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী কি প্রচণ্ড ব্যাকুলতা!...

* * *

আবার সুরু করছি আমার অতীত জীবনের ঘটনা।...কাকা তার স্কুলে নিয়ে আমার পড়াশোনার ব্যবস্থা করে। একদিন দুইদিন তিনদিন যখন দেখলাম যে আমার roll call হয় না, অথচ রোজই স্কুলে যাচ্ছি, তখন মাকে ব্যাপারটা জানালাম। মা কাকাকে ব্যাপারটা জানাতে কাকা রুক্ষভাবে উত্তর দিলেন—তাকে ভর্ত্তি করা না করা আমি বুঝব। সে যেমন স্কুলে যাচ্ছে তেমনি যাবে।...

কয়টি বছর স্কুলে গেলুম। বেতন দিই না এবং আমার roll call হয় না বলে সহপাঠীদের কত অপমান কত বাঁকা কথা যে সহ্য করেছি, তার সীমা নেই। কাকার স্বার্থপরতায়, নীচতায় এবং নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য মন কতবার ব্যথিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি যে অসহায়!

আর একটি বাল্যস্মৃতি আমার মনে আছে।...একদিন পাশের ক্লাসের একটি ছেলে আর একটি ছেলেকে আমার নামে বলছে যে, ছেলেটার চেহারা যেন বাঁদরের মত দেখতে। কথাটা আমার খুব মনঃপূত না হলেও হজম করতে বাধ্য হই। কারণ ছেলেটা গুণ্ডা শ্রেণীর বলে ওকে যথেষ্ট ভয় করতুম। তখন ক্লাসের অনেক ছেলের উপরই আমি বিতৃষ্ণ ছিলাম। কারণ তারা অনেকে আমায় 'বিড়াল্যা' (বিড়াল) বলে খেপাত।...

আমার জীবনে criticism জিনিষটা অসম্ভব ভোগ করেছি। একদিন

(১৯৪৮ সাল) আমার সবচেয়ে বড়দিদি আমায় 'ছুঁচোমুখো' বলায় আমার মনে তখনকার মত খুব affect না করলেও পরবর্ত্তীকালে নিজ চেহারার কুশ্রীতা সম্বন্ধে যখন আমার প্রত্যয় হতে সুরু করে, তখন দিদির এই বিশেষণটি সত্য বলে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে।...

১৯৪৭ সালে আমি ক্লাস VI থেকে ক্লাস VIIএ উঠি। কাকা আমায় আমার রুচিবিরুদ্ধ এবং সঙ্গীসাথীহীন একটা হাইস্কুলে ভর্তি করে। মনে ভীষণ আঘাত লাগল। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল অন্য একটা স্কুলে ভর্তি হবার। আমার যাবতীয় অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সবাই ভর্তি হয়েছিল ওই স্কুলটায়। নিজের অদৃষ্টকে পুনরায় ধিক্কার দিলাম।...স্কুলের উপর বিতৃষ্ণায় পড়াশোনার উপর থেকে ধীরে ধীরে মন সরে যেতে লাগল। তার উপর কাকীমার স্বার্থপর আচরণে মন এত তিক্ত হয়ে উঠেছিল যে, একদিন কাউকে কিছু না বলে মাত্র বার আনা পয়সা সম্বল করে দেশ থেকে পালিয়ে কলকাতার কাকাদের সংসারে চলে আসি।

তখন মা-বোনেরা এই বাসাতেই ছিল। কিন্তু দেশ থেকে চলে এলাম বলে এখানকার কাকা-কাকীমারাও সমানে আমার সঙ্গে তুচ্ছতাচ্ছিল্যমূলক ব্যবহার সুরু করল।...১৯৪৮ সালের শেষের দিকে আমার বড় ভাই বদলি হয়ে কলিকাতা আসে এবং কাকাদের কাছ থেকে মা এবং ছোট বোনকে নিয়ে আলাদা বাড়ীতে উঠে যায়। তার ব্যবহারও একেবারে অমনুষ্যোচিত, বর্ব্বরের মত ছিল। সে কিছুতেই আমায় তার বাড়ীতে স্থান দেবে না প্রতিজ্ঞা করে, আমার অপরাধ আমি দেশ থেকে কেন এলাম।

এই সময়টিতে আমি ভগ্নীপতির বাড়ীতে ছিলাম। বড় বোনের ব্যবহারও ভাল ছিল না। এখানে আমার সেজ বোনও (দিদি) ছিল (যে আমার ছোট বেলায় আমার নিদ্রিতাবস্থায় আমার সঙ্গে sexual act করতে গিয়ে আমার দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল)। আমার তখন যেন sexual actএর প্রবল তৃষ্ণা সবে সুরু হয়েছিল। এই বোনের নিদ্রিতাবস্থায় আমি উত্তেজিত হয়ে তার কাপড় তুলে তার সঙ্গে sexual act করার প্রবল চেষ্টা করতাম। কিন্তু প্রতিবার তার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে ব্যর্থ হতাম। কারণ টের পেয়ে

সে আমায় লাথি মেরে সরিয়ে দিত। আবার সে যখন ঘুমিয়ে পড়ত, আবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু একদিনের জন্যও কৃতকার্য্য হতে পারিনি।

একদিন রাত্রে যখন আমি ঐরূপ চেষ্টা করছিলাম, তখন অন্য বিছানায় নিদ্রিত আমার বড় বোন এবং তার husband ব্যাপারটা দেখে ফেলে এবং আমায় নানা রকম রুক্ষ ভাষায় গালিগালাজ করে। মনে প্রচণ্ড ভয় ও লজ্জা নিয়ে পরদিন ভোরে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি এবং দুপুর অবধি রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।...তারপর কম্পিতহৃদয়ে পুনরায় বাড়ীতে প্রবেশ করে দূরে থেকে দেখলাম মা এসেছে এবং ভগ্নীপতি তাকে আমার কথা বলে অপদার্থ জানোয়ার ইত্যাদি বলচে। অচিরে সেখান থেকে আমায় বিদায় নিতে হল। দাদার বাড়ীতে এসে তার অশ্রাব্য গালিগালাজের মধ্যে সুদীর্ঘকাল আমায় বাস করতে হ'ল। সে যতক্ষণ বাড়িতে থাকত, ততক্ষণই ভয়ে উৎকণ্ঠায় বিরক্তিতে মন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত।

ওর দুর্ব্যবহারে জীবন আমার তিক্তবিরক্ত হয়ে পড়েছিল। ওর কদর্য্য ব্যবহার সুদীর্ঘকাল ভোগ করায় আমার মনের সমস্ত শান্তি স্ফূর্ত্তি, energy ধ্বংস হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, সে একদিন আমার নিদ্রিতাবস্থায় আমার উপর homosexuality করে। বিরক্তিতে মন আমার বিষিয়ে উঠে। এই সময় আমার বয়স ছিল ১৪।...

এর কিছুদিন পূর্ব্বে আমার সমবয়সী এক পিস্‌তুতো ভাই আমাকে hand pollution সম্বন্ধে উৎসাহ দেয় এবং বলে যে, যদি কোন মেয়ের sex organএর কথা ভেবে নিয়ে hand pollution করি, তাহলে অত্যন্ত আনন্দ পাব। আমি তার কথায় তখন গা দিই নি। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে আমি সেই ভাবটাকে সামনে রেখে ভীষণ hand pollution সুরু করি। এমন কি, দিনে ২।৩ বারও করতাম।...দেড় বছর পরে আমি দেশে ফিরে যাই।...

১৯৫০ সালে পাকিস্তানে ভয়ানক দাঙ্গার পর কাকা তার পরিবার ও মালপত্র সহ কিছুদিনের জন্য হিন্দুস্থানে চলে আসে। আমিও সাথে আসি। এরপর কিছুদিন মামার বাড়ী আসি। কাকা পুনরায় দেশে ফিরে যাবার পর আমিও পালিয়ে দেশে ফিরে যাই। কয়েকদিন পরে কাকা আবার

আমায় কলকাতায় তার ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আগের মত সেই অশ্রাব্য গালিগালাজ ও দুর্ব্যবহার। কিছুদিন পরে মা, ছোট বোন ও আমি দাদার বাড়ীতে চলে আসি। মার ওপর তখন আমার মেজাজ যেন চড়তে সুরু করে। বাড়ীতে আমিও দাদার মত মা ও বোনের উপর কম অত্যাচার করিনি। কেন জানি না, মন যেন সহজেই ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ত।...

এর পর আমি ধীরে ধীরে আমার ছোট বোনের উপর sexually আকর্ষিত হয়ে পড়ি। এর বহু পূর্ব্বেই আমি আমার অন্য বোনদের প্রতি sexually আচরণ করলেও এই বোন তখন ছোট ছিল বলে ওর দিকে attracted হইনি।...বাড়ীতে তখন আমরা ৪ জন ছিলাম, দাদা, আমি, মা ও এই বোন। একই বিছানায় মা, আমি ও বোন ঘুমাতাম। আমার বোনের বয়স ছিল তখন ১২ বৎসরের কিছু বেশী, আমার প্রায় ১৭। সে ঘুমোলে আমি দুরু দুরু বক্ষে তার বস্ত্র অপসারণ করে তার sex organএ হাত দিতাম। মনে প্রচণ্ড আগ্রহ হত তার সঙ্গে sexual act করবার। কিন্তু যখনই তার সঙ্গে sexual act করতে attempt নেই, তখনই সে নড়ে উঠায় আমার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হয়।

ক্রমে মা ও বোন ব্যাপারটা স্পষ্ট অনুধাবন করে ফেলে। মা ভয়ানক সাবধান হয়ে পড়ে যাতে আমি বোনকে কিছু না করতে পারি। কিন্তু আমার মানসিক অবস্থা তখন এরূপ যে, নিবৃত্ত হওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল। প্রতিবারই চেষ্টার সময় বোন ও জিনিষটা বুঝে ফেলে এবং এপাশ-ওপাশ করে। সে মাকে আমার কীর্তিয় আভাস দেওয়ায় মা অবিশ্রান্তভাবে আমায় অপমানসূচক নানা রকম কথা বল্‌ত। তাতে দিনের বেলায় বেশ লজ্জিত feel করতাম, আবার সুযোগ পেলেই মা বোনের উপর প্রচণ্ড আক্রোশ দেখাতাম নানা ব্যাপারে। ক্রমাগত ৯ বছর ধরে বোনের উপর অবিশ্রান্তভাবে চেষ্টা করেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও কৃতকার্য হতে পারি নি।... Hand pollution দ্বারা মনের ও দেহের উত্তেজনা কিছুটা শান্ত করতাম—কল্পনায় বোনের organকে উদ্দেশ করে।...Recently তার বিয়ে হয়েছে—এখন সে মুক্তি পেয়েছে আমার অত্যাচার থেকে।...

অষ্টাদশ প্রসঙ্গ

দুইটি প্রাণ, পাঁচখানি চিঠি

মন্তব্য। ৩৭ বৎসর পূর্বে এই ক্ষেত্রে কর্মজীবন আরম্ভ করার পর হইতে আজ পর্যন্ত উত্তর-ভারতের নানা স্থানের এবং ভারতের বাহিরের কোনো কোনো রাষ্ট্রের অন্ততঃপক্ষে সাড়ে চারি-সহস্রাধিক নানাবয়সী পুরুষ ও স্ত্রীর নিকট হইতে পাঁচ সহস্রাধিক পত্র পাইয়াছি। ইঁহারা আমার নিকট হইতে তাঁহাদের প্রেম ও কাম-জীবন সম্পর্কিত নানারূপ সমস্যামূলক প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছিলেন, নিজেদের অথবা আত্মীয়দের নানারূপ রতিজ ব্যাধি ও মনোবিকারের প্রতিকার সম্বন্ধে উপদেশ চাহিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ নিজেদের পতনাভ্যুদয়বন্ধুর দাম্পত্য জীবনের আনুপূর্বিক কাহিনী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

এই চিঠিগুলি হইতে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা-গবেষণার সহায়তামূলক তথ্যগুলি বাছিয়া লইয়া, তাহাদের অধিকাংশগুলিই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। প্রায় আড়াই শত চিঠি ও আত্মকাহিনী গত ত্রিশ বৎসর হইতে সাবধানে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছিলাম ভবিষ্যতে উহাদের অন্তর্বস্তুগুলিকে আমার পুস্তকসমূহের বিভিন্ন স্থানে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ-স্বরূপ ব্যবহার করিবার জন্য। এই সযত্নসংগৃহীত মূল্যবান খৎপত্রের বোধ হয় এক-চতুর্থাংশ আমার বিভিন্ন পুস্তকে অধ্যাহার করিয়াছি, কয়েকটিকে এই পুস্তকেও কাজে লাগাইতেছি। বাকিগুলিকে এজীবনে আর কাজে লাগাইতে পারিব কিনা জানি না। অথচ প্রত্যেক চিঠিখানিই যেমন কৌতূহলপ্রদ ও নূতন সমস্যাজ্ঞাপক, তেমনি বিস্ময়োদ্দীপক ও জ্ঞানসঞ্চারক।...

গত ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে আমি বোম্বাই শহরের একই ঠিকানা হইতে দুইটি তরুণ-তরুণীর পাঁচখানি পত্র পাই। দীর্ঘকাল পরে প্রয়োজন বুঝিয়া এইস্থানে ঐ পত্রগুলি অগ্রপশ্চাৎ তারিখানুক্রমে যথাযথ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। পত্রগুলিই লেখকলেখিকা-সম্পৃক্ত এক মর্মস্পর্শী জীবনকাহিনী ব্যক্ত করিবে। শেষ পত্রখানি পাওয়ার পর আমি বহুকাল ইংরাজী ও বাংলা উপন্যাস পড়ি নাই, সিনেমাও দেখি

নাই। কেন, তাহা পত্রগুলি পাঠের পর আপনাদের বুঝিতে বোধহয় বিলম্ব হইবে না।

(তরুণের প্রথম পত্র)

৪।৯।৪৫

মাননীয় মহাশয়,

যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া আপনি যুবকসমাজে যে প্রভূত আলোকসম্পাত করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি ২৪ বৎসর বয়স্ক যুবক, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে এক মহাব্যাধি আমার শরীরে বাসা বাঁধিয়াছে। নিরাময় হইয়াছি, কিন্তু নীরোগ হইতে বোধ হয় পারি নাই। তাই সেই সম্বন্ধে আপনার কাছে আমার কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে। আশা করি, সেই সকল বিষয়ের যথাযথ উত্তর দিয়া এই হতভাগ্যের জীবনে কিঞ্চিৎ আলোকসম্পাত করিবেন।

২০ বৎসর বয়সে আমি জাহাজে চাকুরী লই। সেই সময় আমার অটুট স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য, তখন আমার প্রাণে যৌনাবেদন পৌঁছিলেও উত্তেজনা বা কামের তাড়না অনুভব করিতে পারি নাই। দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও আনন্দ লইয়াই দিন কাটাইতাম। এই সময়ের মধ্যেই আমি কর্মে এমন দক্ষতা-লাভ করিয়াছিলাম যে, ১৯৪৩ সালে যখন আমাদের জাহাজের captain হঠাৎ Alexandriaতে অসুস্থ হইয়া পড়েন ও ছুটি লইতে বাধ্য হন্, তখন তাঁহার স্থলে Board of Trade আমায় acting captain নিযুক্ত করেন। এত কম বয়সে এই সম্মান আমার পূর্বে হয়তো আর কেহ লাভ করেন নাই।

সেই সময়ে Alexandria হইতে একটি ফরাসী যুবতী (নাম Augustine) আমাদের জাহাজে ফার্ষ্ট ক্লাস কেবিনে যাত্রী হন্। তিনি আসিতেছিলেন বোম্বে। তিনি খুব সুন্দরী, ১৮।১৯ বৎসর বয়স্কা তরুণী। জানি না কেন তিনি প্রথম দেখার পর হইতেই আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার প্রয়াস পাইতেন। আমি কিন্তু প্রায়ই তাঁহাকে আমল দিতাম না, কিন্তু তিনি

এমনই গায়েপড়া ছিলেন যে, শেষ আমি তাঁহার সাথে আলাপ-আলোচনায় বাধ্য হইলাম।

কবি নই, তবু একটা কথা বলি। চাঁদিনী রাতে সমুদ্রের বুকে যে দৃশ্য হয়, তাহা অতি মনোরম। এমনি কত চাঁদিনী রাতে আমি ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে সেই শোভা দেখতাম। এই সময় চুপি চুপি Augustine আমার পাশে এসে দাঁড়াতেন প্রায়ই। আমি বিরক্ত হতাম। শেষে একদিন তিনি আমায় প্রেম নিবেদন করলেন। আমি প্রত্যাখ্যান করলুম। কিন্তু আবার একদিন…।

তিনি এত নির্লজ্জ ছিলেন যে, বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েও ক্ষান্ত হন নি। ৩রা মে সারাদিন সমুদ্রের বুকে প্রলয়ের খেলা চলেছিল। সারাদিন অবিশ্রাম খাটুনির পর বৈকালের দিকে সব শান্ত হয়ে গেল। বাতাসের বেগও নেই, সমুদ্রও চঞ্চল নয়। রাত্রে rest hourএর সময় শুতে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গেই গভীর সুষুপ্তি।…

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল একটা তৃপ্তিতে। অনুভব করলাম দুখানি কোমল বাহু আমায় বেষ্টন করে রয়েছে। আর হয়েছে ইন্দ্রিয়ে-ইন্দ্রিয়ে মিলন। জোর করে উঠে বসলুম। Augustine যে আমার ঘুমের সুযোগ নিয়ে এমন কাজ করবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।…

তিন-চারদিন পরে হঠাৎ লিঙ্গে যেন একটু একটু বেদনা অনুভব করলুম। তখন এ বিষয়ে কোন যত্ন নিইনি। তারপর বোম্বায়ে এলুম। তখন লিঙ্গে ঘা ফুটে উঠেছে। ডাক্তার…১২টা Bismuth আর ১২টা Mapharside injections দিতেই ঘা ভাল হয়ে গেল। Bismuth যখন ছ'টা নিয়েছি ও Mapharside পাঁচটা, তখনই ঘা ও যাবতীয় উপসর্গ ভাল হয়ে গিয়েছিল। তা সত্বেও বাকী injectionগুলি নিয়েছি। অকপটে সব বললাম। এখন কয়েকটি কথা আমার জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি যদি তার সদুত্তর দেন্ তো বড়ই বাধিত হব।

এখন আমি বড়ই যৌবনের ক্ষুধা অনুভব কচ্ছি, কিন্তু ঐ ব্যাধির পর কি বিবাহ করা সমীচীন বলে মনে হয়? যদিই বা বিবাহ করি, পরে আমার ব্যাধির জড় আমার ভবিষ্যৎ সন্তানে বা স্ত্রীর দেহে বীভৎস কিছু সৃষ্টি করবে

কিনা? এক্ষেত্রে যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি পালন করি? জন্মনিয়ন্ত্রণের সহজ উপায় কি? দয়া করে যদি আমার এই সমস্যাগুলি সমাধানে সহায়তা করেন তো বড়ই বাধিত হব। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আজ এমন জায়গায় এসে পৌছেচি যেখানে খালি অনুশোচনা ছাড়া আর কিছু নেই।

আমার এক বন্ধুর নিকট আপনার ঠিকানা পেয়েছি এবং সে-ই আমাকে আপনার কাছে লিখতে অনুরোধ করে। আমি আগামী ২০ তারিখে বোম্বাই ছাড়ব। অতএব অনুগ্রহপূর্বক যদি ইতিমধ্যে আমায় নির্দেশ লিখে পাঠান তো আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকব। আপনি আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

স. সা. ব.

[আমি ১০ই তারিখে ঐ চিঠির যথারীতি উত্তর দিই। তারপর—]

(তরুণের দ্বিতীয় পত্র)

১৫।৯।৪৫

মান্যবরেষু,

আপনার পত্র পেয়েছি। স্নেহের দাবী যখন স্বীকার করেছেন, তখন এইখানেই ইতি করবার ইচ্ছা আপাততঃ নেই। গোড়া থেকে বলা গেল।

সত্যই আমার সম্বন্ধে আপনি একটু অবিচার করেছেন। পাপ যখন অকপটে স্বীকার করেছি, তখন তার শাশ্বত (?) কারণটাও স্বীকার করবার মত সাহস ও আত্মদৃঢ়তা আমার আছে। মেয়েটির সম্বন্ধে যে কথা আপনাকে বলেছি, সে কথা অতিরঞ্জিত নয়, বর্ণে বর্ণে সত্য। হয়তো একথা মানবসমাজে অবিশ্বাস্য, কিন্তু জীবনের ইতিহাসে সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ অধ্যায়।

নারীদেহের উপর লোভ আমার কোনদিনই ছিল না। উপরন্তু ইন্দ্রিয়-পরিচালনার উপর একটা বৈজাতিক ঘৃণা ছিল। বাড়ী থেকে একাধিকবার বিবাহের তাগিদ এসেছিল কিন্তু তা উপেক্ষা করেছি। আমি বাগদত্ত। যখনই বাড়ী গিয়েছি, তখনই ও-পক্ষ থেকে বহুবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি। ভবিষ্যৎ-স্ত্রী সুন্দরী। তরুণীর আকর্ষণও আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পারেনি। কারণ, তখনও আমার যৌনক্ষুধা জাগেনি। নারী সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম। কারণ,

ইচ্ছা ছিল সংযমী হব। আর বাল্যকাল হতেই তার সাধনা করতাম। সেই সংযমের সাধনাই আমার জীবনের ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে রাখ্‌ল! জানেন, পিতার মৃত্যুশয্যায়ও তাঁকে শান্তি দিতে পারিনি, তাঁর বাগ্‌দানের অবমাননা করেছিলুম। ভাগ্যের এক ইঙ্গিতে সেইদিনই স্বর্গ থেকে নরকে নেমে এসেছিলুম। হয়তো পিতার অশ্রুজল আমার এই কুৎসিত ব্যাধিরূপে দেহে এসেছে।

Augustine সম্বন্ধে আপনাকে যে কথা বলেছি, তার এক বর্ণও কল্পনা নয়, প্রতি শব্দটি রূঢ় বাস্তবের প্রতীক।

আমার সবচেয়ে বড়ো অনুশোচনা—আপনি আমায় মিথ্যাভাষী মনে করেছেন, কিন্তু হয়তো আমি সত্যবাদী রামচন্দ্র নই, তবু মিথ্যা বলাটাকে আমি ঘৃণা করি। জানেন আমি আমার ভবিষ্যৎ শ্বশুরালয়ে আমার এই ব্যাধির কথা বলেছিলাম এবং তাঁহার কন্যাকে অন্যপাত্রস্থ করতেও অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তাঁদের কন্যার এই ব্যাধিগ্রস্ত পতিই বাঞ্ছনীয়; কন্যাও অন্যকে পতি স্বীকার করতে নারাজ। এই সঙ্কটে পড়েও বটে, আর অধুনা আমি যৌনক্ষুধা বোধ করছি বলেও বটে, আপনার কাছে উপদেশ চেয়েছিলাম। আপনি আমার অভাব পূর্ণ করেছেন, এজন্য আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ।

আগামী ১লা তারিখে আমি ইউরোপ চলেছি, কবে ফিরবো জানি না। তবে আজকের মত শেষ করি। নমস্কার। ইতি

স. সা. ব.

[এ চিঠিরও আমি ২২।৯।৪৫ তারিখে জবাব দিই। উহাতে আমি তাঁহাকে স্পষ্টই জানাই তাঁহার শরীরে কোনো ব্যাধিবিষ নাই, তিনি ফিরিয়া আসিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহার বাগদত্তাকে বিবাহ করিতে পারেন। তাঁহার Soft chancre হইয়াছিল, উহা রক্তকে দূষিত করে না, স্ত্রী বা সন্তানে সংক্রামিত হয় না। আমি পরামর্শ দিই তিনি বরং W. R. Test করাইয়া negative result পাইয়া নিশ্চিন্ত হউন। তাঁহার বিবাহের সংবাদ পাইলে, আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাইব বলিয়া সানন্দ আশ্বাস জানাই। ইহার প্রায় পৌনে তিন মাস পরে —]

(তরুণীর প্রথম পত্র)

১৫।১২।৪৫

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

মহাশয়, প্রথমেই বলিয়া রাখি, আপনি আমাকে চিনিয়া না থাকিলেও আমি আপনাকে চিনি। এই পত্রে আপনাকে একটি গোপনীয় বিষয় জানাইব। আশা করি তার যথাযথ উত্তরদানে আমায় সুখী করিবেন। আমি একজনের বাগদত্তা এবং তাঁহাকেই স্বামীরূপে জানি। বাল্যকাল হইতেই তাঁহারই গৃহে আমি লালিত-পালিত এবং বলিতে লজ্জা নাই যে, আমি তাঁহাকে ভালবাসি।

কিন্তু এক বৎসর হইল আমি তাঁকে বেশ উদাস ভাব অবলম্বন করিতে দেখিতেছি এবং আমাকে তিনি বিবাহ করিতে অনিচ্ছা জানাইয়াছেন। আমি গোপনে অনুসন্ধান করিয়া আজ দিন কয়েক হইল, তাঁর বাক্সের মধ্যে দুইখানি পত্র পাইয়াছি। সে পত্র দুইখানি আপনার। আমি ব'র কথা বলিতেছি। দেখিলাম তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন। শুনিয়া হতাশ হই নাই এবং আপনার নিকট পথ জানিতে শরণাপন্না হইয়াছি। আশা করি আমার কতকগুলি জিজ্ঞাস্যের উত্তরদানে সুখী করিবেন।

উনি ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ আমি করিতে পারি না। আমাদের মিলন যদি সম্ভব হয়, তাহলে কি ওঁর থেকে আমার দূরে থাকা উচিত?

সঙ্গমের ফলে ওঁর ঐ ব্যাধি কি আমারও হইতে পারে? সংক্রামণের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? এ ক্ষেত্রে যদি জন্মনিরোধ করা হয়, তাহা হইলে তাহার কোন্ পন্থা অবলম্বন করা উচিত?

হয়তো আমার অবস্থা আপনি বুঝিতেছেন। লেখাপড়া শিখিলেও, আধুনিকতার দোহাই দিলেও আমরা হিন্দু নারী—কত অসহায়। নারীর নারীত্ব ছেড়ে দিতেও পারি, সব চেয়ে বড় যে সুখ তাও চাই না, কিন্তু একজনের বাগদত্তা হয়ে অন্যকে বিবাহ করা অসম্ভব।

একটা কথা ওঁকে যেন জানাবেন না যে, আমি আপনার সহিত পত্রালাপ করিয়াছি। উনি বোধহয় আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ফিরিবেন। ইতি—

সু. মু.

[২৩।১২।৪৫ তারিখে এ পত্রের উত্তর দিই, তাহার মধ্যে মিঃ ব.র আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে আমার দৃঢ়তাব্যঞ্জক অভয়াশ্বাস ছিল। মিঃ ব.কে আমি উঁহার পত্রের কথা কিছুই জানাইব না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিই। ইহার কয়েক দিন পরে—]

(তরুণীর দ্বিতীয় পত্র)

২৯।১২।৪৫

পরম শ্রদ্ধাভাজন,

আপনার পত্র পাইয়াছি, কিন্তু আমার আসল প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন। এই পত্রটা একটু বড় করেই লিখ্‌ছি, কারণ আপনার কাছে গোপন কিছুই রাখা উচিত নয়।

খুব ছেলেবেলায়, যখন সংসারে আমার কেউ ছিল না, সেই সময় কেমন করে জানি না এঁদের সংসারে এসে পড়ি। আমার বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন এঁর পিতা মারা যান্। তিনি কেন জানি না এঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের টাকাকড়ি ও জমিদারী দিয়ে যান, এঁকে একপয়সাও দেন নাই। তার পরে ভাইয়েরা বাড়ী থেকেও এঁকে চলে যেতে বলেন, আমারও ঠিক সেই অবস্থা। কিন্তু ইনি শুধু আমাকে নিয়ে এক কাপড়ে বোম্বাই চলে আসেন। এখানে ওঁর দিদি আমাদের ধরে রাখেন—নইলে আমাদের ইচ্ছা ছিল দুজনেই বিলাত চলে যাব। তখন হতে এখানেই আছি।

আমি I. Sc. পাশ করি। পরে কলেজ ছেড়ে ওঁর আছে কাব্য ও ন্যায় পড়ি। সংসারে নানা কাজের জন্য আর পড়াশোনা হয়ে ওঠেনি। উনি নিজে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ও নানা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের বই পড়েছেন। এত কম বয়সে অত পড়াশোনা করতে খুব কম লোককেই দেখেছি। আমাদের বাড়ীতে ৪।৫টি এমন ছেলেমেয়ে আছে যাদের সংসারে কেউ নেই। রাস্তা হতে এদের এনে উনি মানুষ করছেন। আমার মনে হয় যে-কোন মেয়েই ওঁকে কেবল ভালবাসতে পেলেই ধন্য হয়ে যাবে। একটী মুহূর্তের ভুলের জন্যে কি মনোকষ্টই না পাচ্ছেন, তা না দেখলে কেউ ধারণা করতে পারবে না।

সেই কারণে আমিও একেবারে মনের শান্তি হারিয়ে ফেলেছি। কি করি, কি করলে সব ঠিক হয়ে যায় বলুন তো? অনেক তর্ক করি বিবেকের সঙ্গে, কিন্তু মেয়েছেলের মন বোঝে কোথায়?

উনি জান্‌তেন আমি ওঁকে ভালবাসি, তবু দিনের পর দিন একান্ত নির্জনে কাছে পেয়েও এতটুকু কামনার চঞ্চলতা প্রকাশ করেন নি। বহুবার অযাচিত-ভাবে ওঁর কাছে গিয়েছি দেহের ক্ষুধা নিয়ে, কিন্তু ওঁর কাছ থেকে একটু আদর আর দু' একটা চুম্বন ছাড়া আর কিছুই পাই নি। অনেক দুঃখে জীবনে এই প্রথম আপনার কাছে এ কথা স্বীকার করলুম। ওঁর যে কি করে এই রোগটা এল এ কথা ভাবতেও আমার বুক ভেঙ্গে যায়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত আমি ওঁর কাছে থাক্‌ব, থাকতেই হবে। কিন্তু মনের কামনাকে কি করে চেপে রাখ্‌বো? আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম জন্মনিয়ন্ত্রণের সহজ ও নিশ্চিত উপায় কি, কিন্তু তার তো উত্তর দেন নি। আশা করি পরবর্তী পত্রে তা জানাবেন।

উনি এখন কায়রোতে রয়েছেন। এখানে এলেই আমরা কোলকাতায় যাবো। তখন যদি আপনার দর্শনপ্রার্থী হই, আহ্বান করবেন, না, দ্বার থেকেই বিদায় দেবেন? ওঁকে তো ভাই বলে স্বীকার করেছেন, আর আমায় কি কিছু বলে স্বীকার করবেন না? আশা করি এই পত্রের জবাব তাড়াতাড়ি পাবো, নইলে রাগ কর্‌বো। অনেক বাজে বক্‌ে আপনার সময় নষ্ট করেছি। ক্ষমা পাব নিশ্চয়ই। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিবেন। ইতি

সু. মু.

[অতিশয় নিবিড় কর্ম্মব্যস্ততা বশতঃ এ পত্রের জবাব দিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। তাহাদের আসন্ন বিবাহে আমি পূর্বাহ্নিক আশীর্বাদ পাঠাইয়াছিলাম এবং কলিকাতায় পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দুইজনকে হাসিমুখে আমাদের গৃহে আসিয়া দেখা করিতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলাম। সাক্ষাৎমত তাহাদিগকে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি বলিয়া দিব, এই আশ্বাস দিই।...তারপর বজ্রাঘাত।]

(তরুণের তৃতীয় পত্র)

২৬।২।৫৬

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

দাদা, আজ হয়তো এই একটা অবান্তর চিঠি পাঠিয়ে আপনার মূল্যবান সময়ের অনেকটা অপব্যয় করে দেবো। কিন্তু হয়তো সেই অপরাধের পুরস্কার পাবো একটু সমবেদনা ও দু' ফোঁটা দরদঢালা অশ্রুজল! এই বিরাট বিশ্বটায় এত কিছু থাক্‌তেও সেইটাই আজ আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ, মহান্ সান্ত্বনা।

মানুষ তো নাগপাশের মত আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা রয়েছে। মুক্তির দাবী করেছ, কি রাজার জাতের পায়ের কাঁটাওয়ালা জুতোগুলো পিঠের ওপর জোরে জোরে পড়তে থাকবে। পিঠ কেটে রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়বে, তবু সেই মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার দাবী! আর ভগবান এমন নির্বিকার যে, উনি জড় হিমালয়কেও হার মানিয়েছেন। বলুন তো, যে লোকটাকে তেত্রিশ কোটি ভক্ত মিলে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে ও হাজার হাজার উপচারে পূজো করে' বুক চাপড়ে ডাকছে, সে লোকটা কি এমন ধ্যানে বসেছে যে, এই সর্বহারাদের দিকে একটিবার মাত্র চোখ খুলে চাইলেই অমনি তার দেবত্ব চলে যাবে!

এই ভগবানের নিষ্ঠুর পরিহাসের এমন একটি কাহিনী আপনাকে বলতে যাচ্ছি যা শুনে আপনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকবেন। দাদা, বলতে পারেন, একটা মানুষ গতজন্মে কত পাপ করলে তাকে দিনের পর দিন এত বড় বড় আঘাত বুক পেতে সইতে হয়? আজ আমি এমন একটা অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি যার কল্পনাও আমি কোনদিন করতে পারিনি। মনটাকে এতটুকু শান্তি দিতে পাচ্ছি না। আমার জ্ঞান, সামর্থ্য, অর্থ, সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে গেছে। দাদা, আমি 'সু'কে হারিয়ে ফেলেছি।

কি করে কোন্ পথে সে চলে গেছে, তা আজ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র টের পেলুম না। এখনো দেখছি আমার আশেপাশে তার সাধের সংসার সাজানো রয়েছে। এ বাড়ীর প্রত্যেক ধূলিকণায়, অণুপরমাণুতে যেন তার সুকোমল করের স্পর্শ মাখানো রয়েছে, শুধু সে-ই নেই। কত সাধ, কত স্বপ্ন বুকে নিয়ে এক দুর্দ্দিনে দু'জনে হাত-ধরাধরি করে পথে বের হয়েছিলুম। আজ এই

হৃদয়হীন পৃথিবীটার বুকের ওপর আমায় একলা ফেলে রেখে সে কোথায় চলে গেল! পারলুম না তাকে ধরে রাখতে।

বিয়ের বাসর ফুলে ফুলে সাজাতে গিয়ে, তারই প্রাণহীন দেহটাকে ফুলে ফুলে সাজিয়ে চিতাগ্নির লেলিহান ক্ষুধার মুখে দিয়ে ছাই করে ফেল্‌লুম। কেমন করে তাকে ফিরে পাব বল্‌তে পারো দাদা? যাবার সময় শুধু আমার দুই হাত ধরে সে বলে গেল, ওগো, আমি যাচ্ছি, কিন্তু যেতে তো চাই না, তবু কেন ওরা আমায় নিয়ে যাবে? ওগো, ওদের ফিরে যেতে বলো।... কান্‌তে কান্‌তে সে দুটি হাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরেছিল। সেই ভীরু কম্পিত অসহায় হাত দুখানির স্পর্শ আজও আমার সারা দেহে ও মনে লেগে রয়েছে। ভুল্‌তে পাচ্ছি না, ভুল্‌তে পারি না।

মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে আপনার লেখা দু'খানি চিঠি সে আমায় দিয়ে গেছে; বলে গেছে—দাদাকে ব'লো তাঁর মুখের হাসি আমি আর দেখে যেতে পাল্লুম না।...যখন সব শেষ হয়ে গেল, দেখ্‌লুম তার সেই মৃত্যুশীতল মুখের উপর একটা ব্যথার কালো মেঘ আর দুই চোখের কোলে দু' ফোঁটা অশ্রু। সেই অশ্রুতেই আমার সকল স্বপ্নের অবসান।

ঘরে-বাইরে আজ তার স্মৃতি যেন শত চক্ষু মেলে শত ওষ্ঠ খুলে আমায় ব্যঙ্গ কর্‌ছে—কেমন, ভালবাসবে আর?...যে আমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, আজ সে কোথায়, কত দূরে? কবে সে আমার কাছে এসে চোখের জল মুছিয়ে বল্‌বে—ওগো, এই-যে আমি এসেছি, ফিরে এসেছি, মুখ তুলে চাও।...

আমি কাল বাইরে চলে যাচ্ছি, কবে ফির্‌বো জানি না। এই জনবহুল পৃথিবীতে আমার কেউ নেই—কেউ নেই। শুধু জানিয়ে গেলাম ভগবানের বিচার, মানুষের বিচার। ইতি।

স. সা. ব.

শেষ

এই গ্রন্থকারের লেখা

১। ফ্রএডের ভালবাসা ... ... ৮·৫০
(প্রেমের গতি, প্রকৃতি, প্রকার, বিকৃতি-বিশ্লেষণ)

২। ফ্রএডের নারীচরিত্র .... ৮·৫০
(জগতের দেখা, অদেখা, শোনা, না-শোনা নারীদের জীবন-রহস্য)

৩। বিয়ের আগে ও পরে ... ... ৫·৫০
(প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর অবশ্যপাঠ্য জীবনগীতা)

৪। ওগো বর ওগো বধূ .... ৫·০০
(বিবাহে উপহার দিবার বহুচিত্রিত শ্রেষ্ঠ বই)

৫। ওগো প্রেমিক পিতা ও মাতা ... ৪·০০
(দাম্পত্যজীবন, গর্ভধারণ, সুখপ্রসব ও শিশুপালন)

৬। জন্ম-শাসন ... . ৬·০০
(গর্ভ-সংযমের আদি, তথ্যবহুল, নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ)

৭। একান্ত গোপনীয় .... ২·০০
(প্রেমজীবনের রকমারি প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তরাবলী)

৮। যৌবনের যাদুপুরী ... ... ২·০০
(সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও উপভোগ-শক্তিরক্ষা ও বৃদ্ধির উপায়)

নরনারীর যৌনবোধ, নারী বিপথে যায় কেন, প্রেম ও কাম-বিজ্ঞান, কইব কথা কানে কানে প্রভৃতি পুস্তক বর্তমানে ছাপা নাই। শেষোক্ত বইখানি এই সালের শেষে বাহির হইবে। সচিত্র, মূল্য ২·৫০ মাত্র।